# মুক্তিযুদ্ধে নাটোর জেলা: পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও সহযোগীদের গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে এম.ফিল
ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

আগস্ট ২০১৭

**সুমা কর্মকার**

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়,ঢাকা

বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

# মুক্তিযুদ্ধে নাটোর জেলা: পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও সহযোগীদের গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ

**সুমা কর্মকার**

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে এম.ফিল

ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

আগস্ট ২০১৭

তত্ত্বাবধায়ক

**ড. মুনতাসীর উদ্দিন খান মামুন**

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

# প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করছি যে, সুমা কর্মকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে আমার তত্ত্বাবধানে 'মুক্তিযুদ্ধে নাটোর জেলা: পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও সহযোগীদের গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। আমার বিবেচনায় এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এই গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমি পাঠ করেছি এবং এম.ফিল ডিগ্রির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দানের সুপারিশ করছি।

(ড. মুনতাসীর উদ্দীন খান মামুন)
অধ্যাপক
ইতিহাস বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

# ঘোষণা

আমি ঘোষণা করছি যে, এম.ফিল ডিগ্রি অর্জনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে দাখিলকৃত 'মুক্তিযুদ্ধে নাটোর জেলা: পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও সহযোগীদের গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ' শীর্ষক অভিসন্দর্ভের কোনো অংশ কোনো ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার জন্য অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে আমি উপস্থাপন করিনি।

সুমা কর্মকার

Dhaka University Institutional Repository

# নিবেদন

'মুক্তিযুদ্ধে নাটোর জেলা: পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও সহযোগীদের গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ' শীর্ষক এম.ফিল অভিসন্দর্ভটি ২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে নিবন্ধিত।

২০১৩-২০১৪ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে আমি এম.ফিল কোর্সে ভর্তি হই। মাস্টার্স শেষ করে এম.ফিল কোর্সে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করি। এক্ষেত্রে নিজ জেলা নাটোর এর মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করলে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন। গবেষণার সার্বিক বিষয়ে স্যার শত ব্যস্ততার মাঝেও আমাকে সময় দিয়েছেন। আমি যখন কোন একটি অধ্যায় লিখে নিয়ে যেতাম, স্যার তখন আমাকে সেই অধ্যায় মনযোগ সহকারে পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর কথা বলতেন। কোন বিষয় বা অধ্যায় নিয়ে সমস্যায় পড়লেই স্যারের পরামর্শ নিয়েছি। স্যার এত সহজে এত সুন্দর সমাধান দিয়েছেন যে আমার কাজ তাতে গতি পেয়েছে। স্যারের উৎসাহ-অনুপ্রেরণাযুক্ত পরামর্শ ও সহযোগিতার কারণে আমি কাজটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। স্যারের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।

ড. মুনতাসীর মামুন আমাকে প্রথমেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মাহবুবর রহমান প্রতিষ্ঠিত হেরিটেজ আর্কাইভস অব বাংলাদেশ হিস্ট্রি ট্রাস্ট, রাজশাহীতে পাঠান। সেখান থেকে নাটোরের মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যা বিষয়ে প্রাথমিক বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করি। অধ্যাপক ড. মাহবুবর এক্ষেত্রে আমাকে অনেক সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

আমার গবেষণা কাজকে ত্বরান্বিত করতে সবসময় পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করেছেন আমার বিভাগের বড় ভাই জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক তপন পালিত। সময়ে সময়ে আমার গবেষণাকর্মেও খোঁজ খবর নিয়েছেন এবং যথাসময়ে গবেষণা সম্পন্ন করার পরামর্শ দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। এছাড়াও বিভাগের বড় ভাই বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটির গবেষণা সহকারী রাজীব কুমার মণ্ডল প্রাথমিকভাবে আমাকে গবেষণা বিষয়ে পরামর্শ, তথ্য ও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের ফটোকপি দিয়ে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছেও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণা কাজের তথ্য সংগ্রহের জন্য নাটোর জেলায় যাই। এখানে জেলা কমান্ডার আব্দুর রউফ সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মোজাম্মেল হকের প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যিনি আজ আমাদের মাঝে নেই। তিনি লালপুর, বাগাতিপাড়া উপজেলা দুটিতে তথ্য সংগ্রহে নিরলসভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন।

আমার কর্মস্থল বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এম.ফিল কোর্সে ভর্তি হওয়া থেকে শুরু করে অভিসন্দর্ভ জমাদানের পূর্ব পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের কর্মকর্তা, কর্মচারীবৃন্দ আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

গবেষণা কাজের তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও জাদুঘর থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, ন্যাশনাল আর্কাইভ, হেরিটেজ আর্কাইভ, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির অফিস উল্লেখযোগ্য। এসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারীদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

আমার এই গবেষণাকর্মের ক্ষেত্রে দলিলপত্র দিয়ে বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ, নাটোর জেলার ৭টি উপজেলার মুক্তিযোদ্ধা সংসদের উপজেলা কমান্ডারগণ সাহায্য করেছেন। এছাড়া তথ্য সংগ্রহেও তাঁরা সাহায্য করেছেন। এজন্য তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

গবেষণাকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের সহকারী অধ্যাপক আহম্মেদ শরীফ এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রাক্তন গবেষণা কর্মকর্তা মামুন সিদ্দিকী প্রাসঙ্গিক বইপত্র, পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে কাজটি দ্রুত সম্পন্ন করার তাগিদ দিয়েছেন। তাঁদের ধন্যবাদ।

আমার গবেষণা কাজে সবসময় আমার মা, বড় ভাই-বোন, শশুর-শাশুড়ী, ভগ্নিপতি, ছোট ভাই-বোন, ছোট মাসি, দেবর আমাকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। আমার স্বামী শ্রী বিশ্বজিত চন্দ্র দাস ও ছোট ভাই সৈকত চৌধুরী অমিত কে সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাই। তথ্য সংগ্রহে বড় ভাই প্রণব কুমার, মাসি মুক্তিরানী মজুমদার, ছোট ভাই সন্দীপ চৌধুরী, বোনের ছেলে সৌমিক সাহাও অনেক সাহায্য করেছেন। তাদের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

সুমা কর্মকার

# সূচিপত্র

**অধ্যায় বিভাজন**


| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রস্তাবনা | | | ১-৩ |
| ভূমিকা | | | ৪-৭ |
| প্রথম অধ্যায় | : | ভৌগোলিক বিবরণ | ৮-১৫ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | : | গণহত্যা, নির্যাতন ও মানবতাবিরোধী অপরাধ | ১৬-৩৫ |
| তৃতীয় অধ্যায় | : | নাটোর সদর উপজেলা | ৩৬-৭২ |
| চতুর্থ অধ্যায় | : | লালপুর উপজেলা | ৭৩-১০২ |
| পঞ্চম অধ্যায় | : | গুরুদাসপুর উপজেলা | ১০৩-১১৯ |
| ষষ্ঠ অধ্যায় | : | সিংড়া উপজেলা | ১২০-১৩৫ |
| সপ্তম অধ্যায় | : | বড়াইগ্রাম উপজেলা | ১৩৬-১৫০ |
| অষ্টম অধ্যায় | : | নলডাঙ্গা উপজেলা | ১৫১-১৫৮ |
| নবম অধ্যায় | : | বাগাতিপাড়া উপজেলা | ১৫৯-১৬৬ |
| উপসংহার | : | | ১৬৭-১৭৩ |
| পরিশিষ্ট | : | | ১৭৪-২৫৮ |
| আলোকচিত্র | : | | ২৫৯-২৯৭ |
| গ্রন্থপঞ্জি | : | | ২৯৮-৩০৫ |

# পরিশিষ্ট


পরিশিষ্ট-১ : নাটোর সদর উপজেলার গণহত্যায় শহীদদের তালিকা ও পরিচয় ১৭৪-১৮১

পরিশিষ্ট-২: নাটোর সদর উপজেলার ঘাতক-দালাল রাজাকারের তালিকা ও পরিচয় ১৮২-১৮৬

পরিশিষ্ট-৩ : লালপুর উপজেলার গণহত্যায় শহীদদের তালিকা ও পরিচয় ১৮৭-১৯৬

পরিশিষ্ট-৪ : লালপুর উপজেলার ঘাতক-দালাল রাজাকারের তালিকা ও পরিচয় ১৯৭-২০১

পরিশিষ্ট- ৫ : লালপুর উপজেলার একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা ২০২-২০৮

পরিশিষ্ট-৬ : গুরুদাসপুর উপজেলার গণহত্যায় শহীদদের তালিকা ও পরিচয় ২০৯-২১৪

পরিশিষ্ট-৭ : গুরুদাসপুর উপজেলার ঘাতক-দালাল রাজাকারের তালিকা ও পরিচয় ২১৫-২১৭

পরিশিষ্ট-৮ : সিংড়া উপজেলার গণহত্যায় শহীদদের তালিকা ও পরিচয় ২১৮-২২১

পরিশিষ্ট-৯ : সিংড়া উপজেলার ঘাতক-দালাল রাজাকারের তালিকা ও পরিচয় ২২২-২২৬

পরিশিষ্ট-১০ : বড়াইগ্রাম উপজেলার গণহত্যায় শহীদদের তালিকা ও পরিচয় ২২৭-২২৯

পরিশিষ্ট-১১ : বড়াইগ্রাম উপজেলার ঘাতক-দালাল রাজাকারের তালিকা ও পরিচয় ২৩০-২৪৭

পরিশিষ্ট-১২ : নলডাঙ্গা উপজেলার গণহত্যায় শহীদদের তালিকা ও পরিচয় ২৪৮-২৪৮

পরিশিষ্ট-১৩ : নলডাঙ্গা উপজেলার ঘাতক-দালাল রাজাকারের তালিকা ও পরিচয় ২৪৯-২৫১

পরিশিষ্ট-১৪ : বাগাতিপাড়া উপজেলার গণহত্যায় শহীদদের তালিকা ও পরিচয় ২৫২-২৫৩

পরিশিষ্ট-১৫ : বাগাতিপাড়া উপজেলার ঘাতক-দালাল রাজাকারের তালিকা ও পরিচয় ২৫৪-২৫৮

Dhaka University Institutional Repository

# আলোকচিত্র

চিত্র-১ : ফতেঙ্গাপাড়া বধ্যভূমি

চিত্র-২ : ১৯৭১-এ রামপুরা খালে বহু মানুষকে হত্যা

চিত্র-৩ : ফতেঙ্গাপাড়া শহীদ স্মৃতিসৌধ

চিত্র-৪ : শহীদ মাহবুব আলী সেলিমের কবর

চিত্র-৫ : মোকরামপুর গণহত্যার স্থান

চিত্র-৬ : তেবাড়িয়া ব্রিজ গণহত্যার স্থান

চিত্র-৭ : আহমেদপুর ব্রিজ গণকবর

চিত্র-৮ : লিয়াকত আলী ব্রিজে হ্যাপী, অবিনাশ ও আতাউর রহমান আতাকে হত্যা করে হানাদার বাহিনী

চিত্র-৯ : সামসুল হুদা হ্যাপী, অবিনাশ ও আতাউর রহমান আতার গণকবর

চিত্র-১০: নাটোর সদর হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডে জীবনকৃষ্ণ মানিকে হত্যা করে হানাদার বাহিনী

চিত্র-১১ : শকুলপট্টির গ্রীন একাডেমীর পিছনে বহু মানুষকে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দালালরা

চিত্র-১২ : কাপুড়িয়াপট্টির কালীবাড়ি হলে অনেক বাঙালিকে হত্যা করে পুঁতে রাখা হত

চিত্র-১৩ : লালবাজার কালী বাড়ি ক্যাম্প

চিত্র-১৪ : ছাতনী  গণকবর ও শহীদ মিনার

চিত্র-১৫ : ছাতনী দিঘীর পাড়ে অনেক বাঙালিকে হত্যা করে

চিত্র-১৬ : ছাতনী গণহত্যায় শহীদদের নামফলক

চিত্র-১৭ : ফুলবাগান শহীদ স্মৃতি মিনার

চিত্র-১৮ : ফুলবাগান বধ্যভূমি

চিত্র-১৯ : নাটোর উপজেলা পরিষদ ক্যাম্প

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র-২০ : নাটোর উপজেলা পরিষদ মসজিদটি জোরপূর্বক বহু মানুষ দিয়ে নির্মাণ করে পাকিস্তানিহানাদার বাহিনী

চিত্র-২১ : চৌকিরপাড় বধ্যভূমি যেখানে বর্তমান নাটোর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অবস্থিত

চিত্র-২২ : উত্তর চৌকির পাড় গণহত্যার স্থান(কালুর মোড় সড়কের পাশে)

চিত্র-২৩ : নাটোর কানাইখালী শহীদ স্মৃতিসৌধ

চিত্র-২৪ : নাটোর মাদ্রাসা মোড় স্মৃতিস্তম্ভ

চিত্র-২৫ : শংকর গোবিন্দ চৌধুরী চত্বর

চিত্র-২৬ : লালপুর ময়না শহীদ স্মৃতিসৌধ

চিত্র-২৭ : লালপুর ময়নার এই আম গাছের সাথে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে মোসলেম আলী মোল্লা, সৈয়দ আলী মোল্লা ও আব্দুস সাত্তারকে

চিত্র-২৮ : লালপুর রামকান্তপুর বধ্যভূমি

চিত্র-২৯ : রামকান্তপুরে ঘাতক বাহিনীর নির্যাতনের শিকার তইজ উদ্দিন

চিত্র-৩০ : গোপালপুর সুগার মিলে শহীদ সাগর স্মৃতিস্তম্ভ

চিত্র-৩১ : শহীদ সাগর পুকুরে প্রায় ৩০০-৪০০ জন লোককে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী

চিত্র-৩২ : গোপালপুর চিনিকলের প্রশাসক শহীদ লেফটেন্যান্ট আনোয়ারুল আজিম

চিত্র-৩৩ : পরিবারের সাথে লেঃ আনোয়ারুল আজিম

চিত্র-৩৪ : লেঃ আনোয়ারুল আজিমকে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করা হয়

চিত্র-৩৫ : লেঃ আনোয়ারুল আজিমের ব্যবহার্য জিনিসপত্র

চিত্র-৩৬ : গোপালপুর চিনিকলের  সি,আই,সি শহীদ আব্দুর রহমান আমিন

চিত্র-৩৭ : গোপালপুর চিনিকলের এ,সি,ডি,ও শহীদ আবুল হাসেম

চিত্র-৩৮ : গোপালপুর চিনিকলের একাউন্টস ক্লার্ক শহীদ মুনসুর রহমান

চিত্র-৩৯ : গোপালপুর চিনিকলের ক্লার্ক শহীদ মোসাদ্দারুল হক

চিত্র-৪০ : গোপালপুর চিনিকলের চীফ এ্যাকাউন্টটেন্ট শহীদ সাইফুদ্দীন আহমেদ

চিত্র-৪১ : গোপালপুর চিনিকলের বৈদ্যুতিক ফিটার শহীদ এস,এম নজরুল ইসলাম

চিত্র-৪২ : গোপালপুর চিনিকলের কেইন সুপারেনটেনডেন্ট শহীদ গোলজার হোসেন

চিত্র-৪৩ : গোপালপুর চিনিকলের সি,এস,বি,এ শহীদ এস,এম,এ কালাম

চিত্র-৪৪ : লালপুর ধুপইল-পঁয়তার পাড়া বধ্যভূমি ও স্মৃতিসৌধ

চিত্র-৪৫: লালপুর বিলমাড়িয়া গণকবর

চিত্র-৪৬ : বিলমাড়িয়া শহীদ স্মৃতিসৌধ

চিত্র-৪৭ : লালপুর নীলকুঠি ক্যাম্প (বর্তমানে সেখানে বিলমারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত)

চিত্র-৪৮ : প্রায় রাতে একটি সার্টল ট্রেন এসে রাত ১১/১২ টার দিকে লালপুর বাওড়া ব্রিজে লোকজনকে হত্যা করা হতো

চিত্র-৪৯ : বাওড়া ব্রিজ গণকবর

চিত্র-৫০ : গুরুদাসপুর বিয়াঘাট গণহত্যার স্থান ১ (ছহির উদ্দিনের উঠান)

চিত্র-৫১ : বিয়াঘাট গণহত্যার স্থান ২

চিত্র-৫২ : বিয়াঘাট উচ্চবিদ্যালয় স্মৃতিস্তম্ভ

চিত্র-৫৩ : পোয়ালশুড়া পাটপাড়া স্মৃতিস্তম্ভ

চিত্র-৫৪ : তুলসী নদী ব্রিজ যেটি মুক্তিযোদ্ধারা ভেঙ্গে ফেলে নাটোর-গুরুদাসপুরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে

চিত্র-৫৫ : উত্তর নারিবাড়ীর শীতানাথ ও বলরাম হালদারের সমাধি

চিত্র-৫৬ : উত্তর নারিবাড়ীর নীলরতন, মনীন্দ্রনাথ ও নবরামের সমাধি

চিত্র-৫৭ : দিলীপ, সুরেশ সহ ১১ জনের সমাধি

চিত্র-৫৮ : সিংড়ার উত্তর দমদমার রথীন্দ্রনাথ চক্রবতীর বাড়ি

চিত্র-৫৯ : কলম গণকবর

চিত্র-৬০ : কলম গণত্যার স্থান

চিত্র-৬১ : হাতিয়ানদহ গণকবর ও স্মৃতিসৌধ

*Dhaka University Institutional Repository*

চিত্র-৬২ : হাতিয়ানদহ গণত্যার স্থান ২

চিত্র-৬৩ : হাতিয়ানদহ গণত্যার স্থান ৩

চিত্র-৬৪ : লারকিমারী বিলে প্রায় দুই শত লোককে হত্যা করে

চিত্র-৬৫ : মফিজ সরদারের কবর (লারকিমাড়ি বিল গণহত্যার শিকার)

চিত্র-৬৬ : বড়াইগ্রামের ধানাইদহ ব্রিজে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে স্থানীয়রা

চিত্র-৬৭ : বড়াইগ্রামের ধানাইদহ গণকবর

চিত্র-৬৮ : বড়াইগ্রামের পারকোল গণকবর

চিত্র-৬৯ : বড়াইগ্রামের কালিকাপুর স্মৃতিসৌধ

চিত্র-৭০ : বড়াইগ্রামের নটাবাড়িয়া কালির ঘুণে গণহত্যার শিকার বিশ্বনাথ চাকী ও সুশীল পালের সমাধি

চিত্র-৭১ : বড়াইগ্রামের বনপাড়া রোমান ক্যাথলিক মিশন

চিত্র-৭২ : নলডাঙ্গার চকপাড়া গ্রাম কূপ গণহত্যার স্থান

চিত্র-৭৩ : নলডাঙ্গার নসরতপুর গ্রামের দিলীপ কুমার হত্যার স্থান

চিত্র-৭৪ : পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাকান্ডের শিকার নলডাঙ্গার নসরতপুর গ্রামের দিলীপ কুমারের সমাধি

চিত্র-৭৫ : বাগাতিপাড়ার দয়রামপুরে রাজাকার বাহিনীর হত্যার শিকার মেঘনাথ সাহার সমাধি

চিত্র-৭৬ : বাগাতিপাড়ার বেগুনিয়া গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যার শিকার শহীদ স্বপন চক্রবর্তীর সমাধি

চিত্র-৭৭ : নাটোর মহারাজা জে.এন. স্কুল এন্ড কলেজ যেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প ছিল

Dhaka University Institutional Repository

# প্রস্তাবনা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বা তৃণমূল পর্যায়ের ইতিহাস তুলে ধরতে পারলে মুক্তিযুদ্ধের একটি জাতীয় ইতিহাস প্রণয়ন সহজ হবে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস নিয়ে অনেক কাজ হয়েছে। যেমনঃ আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের "মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস"[১ম–৩য় খন্ড], এছাড়া বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে বহু জেলার অসংখ্য মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক গ্রন্থ লেখা হয়েছে। নাটোর নিয়ে কম কাজ হয়েছে বা সেগুলো আংশিক। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমি 'মুক্তিযুদ্ধে নাটোর জেলা: পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও সহযোগীদের গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ' বিষয়টি নিয়ে কাজ করেছি। অধিকাংশ অভিসন্দর্ভে ১৯৪৭-১৯৭১ পর্যন্ত বিস্তৃত ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। ১৯৭১ সালের নয় মাসের বিবরণের মধ্যে যুদ্ধ বা প্রতিরোধ যুদ্ধ বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুদ্ধের বিবরণ এবং অন্যান্য বিষয়গুলোও আংশিক। এর ফলে একটি অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধের বিস্তৃত বিবরণ হারিয়ে গিয়েছে। আমি গুরুত্ব আরোপ করেছি মার্চ, ১৯৭১ থেকে ডিসেম্বর, ১৯৭১ এর ঘটনাবলী। এছাড়া  গুরুত্ব আরোপ করেছি মুক্তিযুদ্ধে যে গণহত্যা হয়েছে, নারী ধর্ষণ হয়েছে এবং মানবতাবিরোধী অন্যান্য অপরাধসমূহ এবং নাটোরের বিভিন্ন অংশে তৃণমূল পর্যায়ের বিবরণ ফিল্ড সার্ভের মাধ্যমে সংগ্রহ করেছি। এই গণহত্যা বিষয়ে বা মানবতাবাদের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার কারণ একটি যে, আমাদের প্রজন্ম বা পরবর্তী প্রজন্ম যদি না জানে হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসররা অত্যাচার-নির্যাতন করেছিল এদেশের মানুষের উপর, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের একটি বড় অংশ বাদ পড়ে যায় এবং আমরা একারণে মুক্তিযুদ্ধ বিস্মৃত হই। অভিসন্দর্ভের ক্ষেত্রে নাটোর বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ আমি দেখেছি এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অধ্যায়গুলো ভাগ করেছি। আশা করি এই অভিসন্দর্ভটির মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে যে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল ও একটি এলাকায় কিভাবে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও সহযোগীরা মানবতাবিরোধী অপরাধ তথা গণহত্যা, নির্যাতন করেছিল তার ইতিহাস পাওয়া যাবে।

**গবেষণার উদ্দেশ্য**

মুক্তিযুদ্ধে নাটোর জেলার মানবতাবিরোধী অপরাধ তথা গণহত্যা, নির্যাতন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেয়ার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধে নাটোর জেলার তৃণমূল পর্যায়ের মানুষের ত্যাগ তিতিক্ষার ইতিহাস যা মানুষ বিস্মৃত হয়েছে, বা আংশিক জেনেছে সে সম্পর্কে মানুষকে পূর্ণাঙ্গ ধারণা দেয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

**গবেষণা পদ্ধতি**

সাধারণত গবেষণার কাজ অর্থবহ ও নির্ভুলভাবে করার জন্য সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কারণ গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রে নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে গবেষণার কাজে বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ ও এর বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে বিভিন্ন জাতীয় আর্কাইভস, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর, জাতীয় জাদুঘর-এ সংরক্ষিত দলিলপত্র, স্থানীয় মুক্তিযুদ্ধ সংস্থার সংরক্ষিত দলিলপত্র ব্যবহার, মুক্তিযোদ্ধা ও প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। তথ্য যাচাই-বাছাই করা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া  বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, বিভিন্ন স্মরণিকা, বিভিন্ন ওয়েবসাইটও ব্যবহার করা হয়েছে।

*Dhaka University Institutional Repository*

**অধ্যায় বিভাজন**

গবেষণা কর্মটিকে মোট নয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছি।

**প্রথম অধ্যায়ে,** নাটোর জেলার ভৌগোলিক বিবরণ আলোচনা করা হয়েছে। এখানে নাটোর মহকুমার জেলায় রূপান্তর, জনজীবন, নদ-নদী, খাল-বিলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রভৃতি তুলে ধরা হয়েছে।

**দ্বিতীয় অধ্যায়ে,** গণহত্যা, নির্যাতন ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বিবরণ আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যা, গণহত্যার উদ্দেশ্য, নারী নির্যাতনের সংখ্যা, ধরণ, মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী ও তাদের বিচারকার্য প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।

**তৃতীয় অধ্যায়ে,** নাটোর সদর উপজেলায় সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন, শান্তিকমিটি, গঠন আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের চিত্র তথা গণহত্যা নির্যাতন ও মানবতাবিরোধী অপরাধের বর্ণনা(সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে), নাটোর সদরের বিভিন্ন এলাকায় সংঘটিত গণহত্যার বর্ণনা রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও স্মারক, গণকবর প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।

**চতুর্থ অধ্যায়ে,** লালপুর উপজেলায় সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি শান্তি কমিটি, গণহত্যা-নির্যাতনের বিবরণ (সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে), বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা ও নির্যাতন স্মৃতি ও স্মারক, বধ্যভূমি ও গণকবর প্রভৃতি বর্ণনা করা হয়েছে।

**পঞ্চম অধ্যায়ে,** গুরুদাসপুর উপজেলার ভৌগোলিক পরিচয়, সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি, শান্তি কমিটি, গণহত্যা-নির্যাতনের বিবরণ(সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে), স্মৃতি-স্মারক, প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।

**ষষ্ঠ অধ্যায়ে,** সিংড়া উপজেলার ভৌগোলিক পরিচয়, সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি, শান্তি কমিটি, গণহত্যা নির্যাতনের বিবরণ(সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে), বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা, স্মৃতি-স্মারক, বধ্যভূমি প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

**সপ্তম অধ্যায়,** বড়াইগ্রাম উপজেলার ভৌগোলিক পরিচয়, সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি, শান্তি কমিটি, গণহত্যা-নির্যাতনের বিবরণ(সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে), বিভিন্ন স্থানের গণহত্যা স্মৃতি স্মারক, বধ্যভূমি-গণকবর প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

**অষ্টম অধ্যায়ে,** নলডাঙ্গা উপজেলার ভৌগোলিক পরিচয়, সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি, শান্তি কমিটি, গণহত্যা-নির্যাতনের বিবরণ(সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে), বিভিন্ন স্থানের গণহত্যা, স্মৃতি স্মারক, বধ্যভূমি-গণকবর প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

**নবম অধ্যায়ে,** বাগাতিপাড়া উপজেলার ভৌগোলিক পরিচয়, গণহত্যা-নির্যাতনের বিবরণ(সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে) প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।

উপসংহারে নাটোর জেলায় গণহত্যা, নির্যাতন ও মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি সামগ্রিক মূল্যায়ন করা হয়েছে। এখানে নাটোর জেলার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, গণকবর ও বধ্যভূমি সংরক্ষণ প্রভৃতি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা স্থান পায়।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার অংশটি পুরো গবেষণাকর্মের সারবস্তু। নাটোর জেলার ৭টি উপজেলাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী দালাল-রাজাকার-আলশামস প্রভৃতি সংগঠনের দ্বারা গণহত্যা ও নির্যাতন তথা মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত হয়। নাটোর জেলার আনুমানিক প্রায় ১৫ থেকে ১৬ হাজার, কোন কোন ক্ষেত্রে ২০ হাজার মানুষের গণহত্যার কথা জানা যায় যেখানে নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ কেউ বাদ যায়নি। কোন বিশেষ ধর্ম নয়, বরং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে হত্যা, নির্যাতন চালানো হয়। পুড়িয়ে দেয়া হয় অসংখ্য ঘরবাড়ি, লুটপাট করা হয় গবাদি পশু, ধন-সম্পদ প্রভৃতি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এসব সহযোগীদের মধ্যে স্থানীয় লোকজন সহ অবাঙালি বিহারিও ছিল। এসব দালাল-রাজাকারদের সকলের বিচার এখনও সম্পন্ন হয়নি। এমনকি গণকবর ও বধ্যভূমিগুলিও প্রায় অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে। এসব গণকবর ও বধ্যভূমি সংরক্ষণের ব্যবস্থা, দালাল, রাজাকারদের বিচারের ব্যবস্থা করা হবে বলে নাটোর জেলাবাসী তথা ভুক্তভোগী, নির্যাতিত নারী-পুরুষ গভীরভাবে আশা করে।

Dhaka University Institutional Repository

# ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘ সংগ্রামের গৌরব-উজ্জ্বল সময় মুক্তিযুদ্ধ। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণ বাংলাদেশের মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল দেশকে শত্রু মুক্ত করতে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যা-ধ্বংসযজ্ঞ, এদেশের মা-বোনদের সম্মান হানি, স্বজন হারানোর বেদনা প্রভৃতিও মানুষের মাঝে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগিয়েছিল। এই উদ্দীপনা শুধু এদেশের বিশেষ কোন শহরকে কেন্দ্র করে নয়, বরং ছড়িয়ে পড়েছিল প্রতিটি জেলা থেকে শুরু করে প্রত্যন্ত গ্রামেও। আর এ ঢেউ থেকে নাটোর জেলার জনগণও দূরে ছিলেন না।

রানী ভবানীর জমিদারী ও বিখ্যাত চলনবিলের সৌন্দর্যমন্ডিত নাটোর বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। নাটোর জেলার জনগণ শুধু যে ১৯৭১ সালেই তাদের স্বাধীনতার স্পৃহা বা নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছিলেন তাই নয়, বৃটিশদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে নীল চাষের বিরুদ্ধে করেছেন নীল বিদ্রোহ। সাহেবদের সেই নীলকুঠী ছিল লালপুর থানার বিলমারিয়া ইউনিয়নে। এছাড়া ব্রিটিশ বিরোধী অসহযোগ আন্দোলনেও নাটোর জেলার অধিবাসীরা ছিলো সোচ্চার। পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের অন্যান্য অঞ্চলগুলোর মতো নাটোরের অধিবাসীরাও অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞ, অত্যাচারের সাক্ষী-এ বাংলাদেশের মাটি। সেদিন থেকেই বাঙালি জাতিকে সম্পূর্ণ বা আংশিক নিমূলের জন্য প্রয়াস চালিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যা মূলত গণহত্যা। নরপিশাচ এই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগীদের ভয়াল থাবা নাটোর জেলাবাসীর জীবনেও পড়েছিল মার্চ-মাসের শেষের দিকে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগিরা নাটোর জেলার বিভিন্ন স্থানে নির্মমভাবে হত্যা করেছে এ অঞ্চলের প্রায় ১২ থেকে ১৫ হাজার মানুষকে। আর নির্যাতিত হয়েছে অসংখ্য নারী। ঘর বাড়ি তথা স্থাবর সম্পত্তি হয়েছে লুট ও অগ্নিদগ্ধ। আর তাদের এ কর্মকাণ্ডে সহায়তা করেছে বিহারী ও এদেশীয় কিছু দালাল-রাজাকার-আলবদর-আলশামস প্রভৃতি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এসব সহযোগীদের দ্বারা বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প স্থাপন এবং নাটোর জেলার বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা, নির্যাতন তথা মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করে।

১৯৭১ সালে নাটোর জেলার প্রতিটি উপজেলাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা আক্রমণ করেছিল। আর এ উপজেলা গুলোতে সংঘটিত করেছিল গণহত্যা, নির্যাতন তথা মানবতাবিরোধী অপরাধ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নাটোর জেলার মানুষ বীরদর্পে নিজ মাতৃভূমি তথা দেশের মানুষকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিল। যার প্রমাণ পাওয়া যায় লালপুর উপজেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে। ৩০শে মার্চ লালপুর উপজেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী প্রথম বাঁধার সম্মুখীন হয় নাটোর জেলাবাসীর দ্বারা। এই প্রতিরোধ যুদ্ধে নাটোরের স্থানীয় অনেকে শহীদ হন। সেই সাথে পাকিস্তানি একজন মেজর সহ কিছু সৈন্য নিহত হয়। এতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্রোধ বৃদ্ধি পায়। ১লা এপ্রিল বিহারীদের সাথে নাটোরের স্থানীয়দের সংঘর্ষ হয়। এই সংঘষের সূত্র ধরে ১২ই এপ্রিল নাটোরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং গণহারে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে হত্যা করতে শুরু করে। সেই সাথে অনেক নারী নির্যাতিত হয় তাদের দ্বারা। এদের মধ্যে শুধু হিন্দু নারী ছিল তা

Dhaka University Institutional Repository

নয়, বরং বহু মুসলিম নারীও ছিল যাদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন নির্যাতন করা হত। এছাড়া লুট-পাট, অগ্নিসংযোগও করে। নাটোর সদর, লালপুর, গুরুদাসপুর, সিংড়া, বড়াইগ্রাম, নলডাঙ্গা ও বাগাতিপাড়া সহ নাটোর জেলার ৭টি উপজেলাতে একইভাবে গণহত্যা, নির্যাতন তথা মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটিত করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগীরা।

নাটোর সদরের ছাতনী, ফুলবাগান, চৌকিরপাড় প্রভৃতি এলাকার বহু মানুষ গণহত্যার শিকার হয়। লালপুর প্রতিরোধ যুদ্ধের সময় অনেক নিরাপরাধ মানুষ যারা লুকিয়েছিল, তাদেরকেও হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী । এছাড়া লালপুর উপজেলার সুগার মিল, বিলমাড়িয়া, রামকান্তপুর, বাওড়া ব্রীজ প্রভৃতি এলাকার বহু মানুষ গণহত্যার শিকার হয় এবং বিলমারিয়ার অনেক নারী নির্যাতিত হয়। গুরুদাসপুর উপজেলার বিয়াঘাট, কাছিকাটা প্রভৃতি, সিংড়া উপজেলার কলম, হাতিয়ানদহ, লারকিমারী বিল প্রভৃতি, বড়াইগ্রাম উপজেলার পোঁয়ালশুড়া পাটপাড়া, বনপাড়া মিশন, নটাবাড়িয়া কালিরঘুন প্রভৃতি, নলডাঙ্গা উপজেলার চকপাড়া, নসরতপুর প্রভৃতি এবং বাগাতিপাড়া উপজেলার দয়রামপুর, বেগুনিয়া প্রভৃতি এলাকার বহু মানুষ গণহত্যার শিকার হয় এবং বহু নারী নির্যাতিত হয়।

আমাদের বাড়ি নাটোর জেলার সদর থানার ১নং ওয়ার্ডের অন্তর্ভুক্ত উত্তর চৌকিরপাড় এলাকায়। তাই বাবার কর্মসূত্রে ঢাকায় থাকা হলেও নাটোর যেতাম। জীবনানন্দ দাশ কবিতায় বলেছেন "নাটোরের বনলতা সেন"। রানী ভবানীর বাড়ির পিছন দিকের দিঘির অপর প্রান্তে আমাদের বাড়ি। এছাড়া নাটোরের বিখ্যাত চলনবিল এ জেলার অহঙ্কার যা এই জেলা সম্পর্কে জানার আগ্রহ জন্মাত। এক পর্যায়ে এই আগ্রহ এই জেলার মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কেও জানতে কৌতূহল সৃষ্টি করল।

বাবা সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেননি। কিন্তু যখন তার মুখে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার, অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করার কথা শুনতাম, আবার মা-র মুখে তাদের বাড়িতে যখন রাজাকার এসেছিল, তখন কী করছিলেন কীভাবে সে সময়কার দিনগুলো কেটেছে, তাদের এ সব কিছুই মনে এক ধরনের যেমন ভীতি জন্মাত তেমনই অন্য দিকে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে আরও জানতে উৎসাহ দিত। এছাড়া প্রতিবছর খবরের পাতায় মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সচিত্রসংবাদ প্রকাশিত হত, সেগুলো পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভকে বাড়িয়ে দিত। মুক্তিযুদ্ধে নাটোর জেলার কী ভূমিকা ছিল, তা সম্পর্কে ধারণা লাভ করবার মত উৎস ছিল নিতান্তই সামান্য। তবে ইচ্ছা ছিল এ অঞ্চলটির এই তথ্যগুলো জানার, উপলব্ধি করার। স্নাতকোত্তর পাশ করার পর সেই সুযোগ ও উৎসাহ পেলাম অধ্যাপক মুনতাসীর মামুনের মাধ্যমে। স্যারের তত্ত্বাবধানে নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের তথ্যাবলী সংগ্রহ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি নাটোরের মানুষের এত আত্মত্যাগ, তাদের সাহসিকতা।

নাটোর জেলা নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখির পরিমাণ খুব বেশি নয়। জমিদার-রাজবাড়ি-চলনবিল প্রভৃতি নিয়ে কিছু লেখা থাকলেও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে খুবই স্বল্প। ২০০৯ সালে প্রকাশিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুজিত সরকারের *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* বইটি নাটোর জেলার সামগ্রিক মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত প্রথম একটি গ্রন্থ। যদিও নাটোর জেলার বিভিন্ন স্থানের মুক্তিযোদ্ধারা দাবি করেন যে, তার বইটিতে সকল তথ্য সঠিক নয়। কিছু ক্ষেত্রে তিনি ভুল তথ্য আবার কোন ক্ষেত্রে আংশিক বিবরণ উল্লেখ করেছেন। গণহত্যা নির্যাতন প্রভৃতি তথ্যগুলোর বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। এছাড়া অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ

Dhaka University Institutional Repository

দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস* (২য় খণ্ড) গ্রন্থে নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের আংশিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এ গ্রন্থে ৭-৮ টি গণহত্যার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তবে তা আংশিক ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সুকুমার বিশ্বাসের *একাত্তরের বধ্যভূমি* গ্রন্থে ৩-৪টি গণহত্যার বর্ণনা রয়েছে, যার অধিকাংশই আংশিক বর্ণিত। এছাড়া অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ কোষ* (২য় খণ্ড) এ সারা দেশের ৯০৫টি বধ্যভূমি শনাক্ত করা হয়েছে। এখানে নাটোর জেলার ৮-৯টি বধ্যভূমির কথা বলা হয়েছে আংশিকভাবে।

সাঈদ বাহাদুর রচিত *গণহত্যা ও বধ্যভূমি-৭১* গ্রন্থে ৫টি গণহত্যার বর্ণনা আংশিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পাদিত- *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*(৬ষ্ঠ খণ্ড) গ্রন্থে নাটোর জেলার গণহত্যার মাত্র কয়েকটি বর্ণনা করা হয়েছে আংশিক ভাবে ।

এ কারণে এ অঞ্চলের মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, নির্যাতন ও মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহ যা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা করেছিল সে বিষয়ে কাজ করতে উৎসাহিত হয়েছি। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের বিবরণ অনেক গ্রন্থেই রয়েছে। গণহত্যা ও নির্যাতন বিষয়ে গ্রন্থের সংখ্যা কম ও বর্ণনা আংশিক ।

মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক ধারনা প্রদানের মাধ্যমে বর্তমান প্রজন্মকে অবহিত করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনেক তথ্য বিলুপ্ত হয়ে গেছে। মাঠ পর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে তার প্রমাণ পেয়েছি। অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয়দের জিজ্ঞাসা করে তথ্য পাওয়া যায়নি। এই জেলার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সাধারণ মানুষের ভূমিকা, গণহত্যা, গণকবর, নির্যাতন প্রভৃতি বিভিন্ন তথ্য আজও রয়েছে অজানা। এছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীরা, নির্যাতিতদের সবাই বেঁচে নেই। যাঁরা আছেন তাঁরাও বয়স্ক, কারও স্মৃতিশক্তি প্রায় শেষ পর্যায়ে। তাই এ বিষয়গুলো সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ তথ্য লিপিবদ্ধ না হলে আগামী প্রজন্ম তাদের গৌরবগাথা এ আত্মত্যাগ সম্পর্কে জানতে পারবে না কোনদিন।

নাটোর জেলার গণহত্যা, নির্যাতন ও মানবতাবিরোধী অপরাধ বিষয়ে তথ্যসংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে গণহত্যা নির্যাতন প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ করে নির্যাতন, রাজাকার-আলবদর প্রভৃতি বিষয়ে অনেকেই ছিলেন মৌন। নির্যাতিত অনেক নারী বিয়ে করেছেন, সংসারে রয়েছেন। তাই সামাজিকতার ভয়ে মুখ খুলেন না। তা ছাড়া সেই দুঃর্বিসহ স্মৃতি আর কেউ মনে রাখতে চায় না। রাজাকার-আলবদর প্রভৃতির নাম অনেকেই বলতে চাননি। মূলত তারা অনেকে মারা গেছে, কেউ হয়ত শক্তিশালী বা ক্ষমতা সম্পন্ন নাম বললে ক্ষতি হতে পারে চিন্তা করে বলেননি। তারপরও যথাযথ তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়েছে এই গবেষণাকর্মে। এছাড়া স্বাধীনতা লাভের ৪৫ বছর পরও এই গণহত্যা ও নির্যাতন কেন্দ্রগুলোর সবকটি চিহ্নিত করার কার্যকর ব্যবস্থা বা সংরক্ষণের প্রয়াস নেয়া হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে গণকবরগুলো চিহ্নিত হয়েছে, তবে দখল করে নিয়েছে সেসব স্থানের ক্ষমতাশালীরা। এভাবে প্রতিটি বধ্যভূমি যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তবে বর্তমান ও আগামী প্রজন্ম জানতেই পারবে না পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা কি নির্মম ব্যবহার করেছিল এ অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে।

এই গবেষণাকর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে বেশ কিছু নতুন গণকবর ও বধ্যভূমির কথাও জানা গিয়েছে যা এই অভিসর্ন্দভে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও নাটোর জেলার বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা হয়েছে, তবুও তথ্য, প্রমাণের ভিত্তিতে প্রাপ্ত যৌক্তিক বিষয় গুলোই এ অভিসর্ন্দভে স্থান পেয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অটুট রেখে ইতিহাসের উপকরণ : প্রাথমিক উৎস, দ্বৈতয়িক উৎস, পত্র-পত্রিকা, প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, গণকবর, বধ্যভূমি, নির্যাতন কেন্দ্র প্রভৃতির ভিত্তিতে গবেষণা কার্য সম্পাদনের প্রচেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে টেপ রেকর্ডার, ক্যামেরা ব্যবহার করা হয়েছে তথ্য সংগ্রহের জন্য।

*মুক্তিযুদ্ধে নাটোর জেলা: পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও সহযোগীদের গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ* বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন নাটোর জেলার বর্তমান মুক্তিযোদ্ধা জেলা কমান্ডার আবদুর রউফ সরকার। এছাড়াও অনেকের সহায়তা পেয়েছি। তাদের সহায়তায় এই লেখা সম্পূর্ণ করার কাজ সহজ ও ত্বরান্বিত হয়েছে। আমার এ কাজের মধ্যে দিয়ে নাটোর জেলার মানুষের মুক্তিযুদ্ধে নানা আত্মত্যাগ, তাদের অবদান, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের মানবতাবিরোধী নানা অপকর্ম প্রভৃতি বর্তমান প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা এবং তাদের মধ্যে নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস সম্পর্কে অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে পারলেই এ কাজের সার্থকতা।

Dhaka University Institutional Repository

# প্রথম অধ্যায়

# ভৌগোলিক বিবরণ

## সূচনা

বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগের একটি অন্যতম ঐতিহ্যমণ্ডিত জেলা নাটোর। ভারতবর্ষের জমিদারদের শাসনপর্বে খ্যাত রানী ভবানীর নামটি প্রায় সকলেরই জানা। এছাড়া বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বিল হিসাবে পরিচিত চলনবিল এ জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবহমান।

বাংলার অন্যতম জনপদ পুন্ড্রবর্ধনের এক সামান্য অংশ নাটোর। লস্করপুর ও ভাতুরিয়া পরগণা নিয়ে নাটোরের সৃষ্টি। লস্করপুর পরগণার শেষ প্রান্ত এবং কানাইখালী মৌজার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল পরিচিত হয়ে উঠে নাটোর নামে। এই অঞ্চলের অধিকাংশই ছিল জলাভূমি এবং এটি উন্নয়নমূলক সংস্কারের বাইরে ছিল।[১] জলাভূমি এবং এটি উন্নয়নমূলক সরকারের বাইরে ছিল। জানা যায়, নাটোর ছিল একটি বিল যার নাম ছিল ছাইভাঙ্গা। ১৭০৬ সালে রাজা রামজীবন রায় এই বিলটি ভরাট করে তার জমিদারীর রাজধানী স্থাপন করেন।[২] ১৮২১ পর্যন্ত রাজশাহী জেলার কেন্দ্রীয় কার্যালয় ছিল নাটোরে। ১৮৪৫ সালে নাটোর মহকুমা ও ১৮৬৯ সালে নাটোর পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। নাটোর মহকুমা যে চলন বিল থেকে সৃষ্ট তার প্রমাণ *'আইন-ই-আকবরী'*-তেও পাওয়া যায়। ১৯৮৪ সালে নাটোর পূর্ণাঙ্গভাবে একটি জেলায় পরিণত হয়। ১৮৫৯ এবং ১৮৬০ সালে নীলকুঠি বিদ্রোহ নাটোর- এ সংগঠিত হয়েছিল।[৩]

## আয়তন, অবস্থান, জলবায়ু ও ভূ-প্রকৃতি

বাংলাদেশের উত্তরে নাটোর অবস্থিত। এ জেলাটির আয়তন ১৮৯৬.০৫ বর্গ কিলোমিটার। এই জেলাটি ২৪.২৫ থেকে ২৪.২৫ দ্রাঘিমাংশ-এ অবস্থিত। এই জেলার সীমার দিকে লক্ষ করলে দেখা যাবে- উত্তরে নওগাঁ ও বগুড়া জেলা, দক্ষিণে পাবনা ও কুষ্টিয়া জেলা, পূর্বে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমে রাজশাহী জেলা রয়েছে। নাটোর জেলাটি চলনবিল থেকে সৃষ্ট এবং এর অধিকাংশ এলাকা সমতল ভূমি (Plain land) নদী-নালা সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল। এ জেলার বার্ষিক তাপমাত্রা ৩৭.৮ সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১.২ সেলসিয়াস। বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১৮৬২ মিলিমিটার। নাটোরের লালপুর থানায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।[৪] গ্রীষ্মকালে প্রচুর গরম থাকে এ অঞ্চলটিতে।

## জনজীবন

নাটোর জেলার পল্লী অঞ্চলের মানুষ বিক্ষিপ্তভাবে ঘরবাড়ি নির্মাণ করা পছন্দ করত। চাষের জমি কিংবা ঝোপ জঙ্গল দ্বারা এক বাড়ি থেকে আরেক বাড়ী পৃথক করা হত। প্রতিটি গৃহে অন্তর্গত ছিল চাষের জমি, বাগান বা ফলমূলের গাছ। বাড়ি আব্রু রক্ষার জন্য বাড়ির চতুর দিকে হয় বাঁশের বেড়া বা বন জঙ্গল অথবা ঝোপ-ঝাড় বৃক্ষ রোপন করা হত। এ সমস্ত বৃক্ষ ঝড়ের দাপট থেকে বাড়িটি কিছুটা রক্ষা করত। ভূমি নিচু হওয়ার জন্য প্রতিটি গৃহ নির্মাণের সময় গৃহের নিকটবর্তী কোন স্থানে খাল খনন করে মাটি এনে বসতভিটা উঁচু করা হত। বর্ষায় খাল গুলি জল পূর্ণ হয়ে গৃহস্থের প্রয়োজন মেটাত। বর্ষাকালে বাসগৃহের চর্তুদিকে জলমগ্ন হলে নাটোরের অনেক বাড়ি দ্বীপের মত মনে হতো। যোগাযোগ রক্ষার জন্য তখন ঐ সমস্ত এলাকার মানুষ নৌকা, চাড়ি, কলা গাছের ভেলা বা বাশের সাঁকো তৈরি করে নিতো। গবাদি পশুর খাদ্যাভাব দেখা দিত।

Dhaka University Institutional Repository

এছাড়া মশার উপদ্রব বাড়তো। নানা প্রকার অসুখ দেখা দিত। জলকাঁদায় রাস্তা ঘাট ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ত। গ্রীষ্মকালে তা আবার ধুলায় রূপান্তরিত হত।

নাটোরের পল্লী অঞ্চলগুলোতে মাটির দেয়াল যুক্ত বাড়িতে বসতি ছিল নিম্ন আয়ের মানুষের। বাড়িগুলো ছিল উলুখড়ের ছাওনি যুক্ত। সম্পন্ন লোকেরা করগেট টিনের ছাউনি যুক্ত বাড়িতে বাস করত। পাকা বাড়ির সংখ্যা ছিল বেশি। খড়ের বা টিনের চারচালা বা আট চালাও দেখা যেত প্রচুর। নাটোর অঞ্চলের এ চিত্রটি স্বাধীনতা অর্থাৎ ১৯৭১-এর আগ পর্যন্ত ছিল। বর্তমান অবস্থা এর বিপরীত নয়। প্রায় একই রকম, তবে উন্নত ব্যবস্থার কারণে এখন পূর্বের তুলনায় জনজীবন অনেকটা উন্নত। অনেক বিল শুকিয়ে গিয়েছে। নদীর কিছু অংশ মরে গিয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত প্রভৃতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান।[৫]

**নদ-নদী, খাল-বিল**

নদ-নদী বিধৌত নাটোর জেলার প্রধান নদ-নদী হল নন্দকুজাঁ, বারনই, গোধাই, বড়াল, গুড়নাই বা গুনাই, নারদ, করতোয়া, আত্রাই, চেঁচুয়া, ভাদাই, বানগঙ্গা, ফুলঝোর, চিকনাই, খলিশাডাঙ্গা প্রভৃতি। বিলের মধ্যে চলন বিল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়। এছাড়া হালতি বিল, সাঠ্ঠগাড়ি বিল, বাঁইড়ার বিল, হিয়ালা বিল, লারকিমারী বিল উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য জলাশয়-বেশানী-গুনানিখাল, নিয়ামত খাল, সাত্তার সাহেবের খাল, পানাউল্লাহ খাল, নবীর হাজীর জোলা, পিয়াদসারা জোলা, গাঁড়াবাড়ি-ছারুখালি খাল, খুবজীপুর-বামনবাড়িয়া নালা প্রভৃতি।

## কয়েকটি বিলের বর্ণনা

নাটোরে বিল রয়েছে অসংখ্য। এই বিলগুলো নাটোর জেলার সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করেছে অনেক গুণ। বিলগুলোতে যখন পানি না থাকে, তখন এগুলোতে চাষাবাদ করে অঞ্চলগুলোর মানুষ। এই অঞ্চলের মানুষের অন্যতম বিনোদন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে বিলগুলো। নিম্নে কয়েকটি বিলের বর্ণনা দেয়া হলো :

**চলন বিল**

চলনবিল বাংলাদেশের অন্যতম বিশাল বিল। একটি কথা প্রচলিত আছে ‘বিল দেখ তো চলন, গ্রাম দেখ তো কলম’। বিলটির নামকরণ কিভাবে হলো সে সম্পর্কে তেমন জানা যায় না। তবে অনুমান করা যায়, এই বিলের মধ্যে দিয়ে আত্রাই, বড়াল, নন্দকুজা, ভদ্রাবতী, করতোয়া, নাগর, পাঙ্গাল প্রভৃতি নদী সারা বছর ধরে চলমান থাকতো, ফলে এই বিলের মধ্যে সারা বছর জল বিদ্যমান থাকতো। এ কারণেই হয়তো তার নাম ‘চলন’। এই বিশাল জলাভূমি রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া জেলা জুড়ে অবস্থিত। অনেকে মনে করে এটি একটি পরিত্যাক্ত নদীগর্ভ। বহুদূরে এর সীমানা ছিল উত্তরে আত্রাই স্টেশন থেকে নিমচাঁদপুর, পূর্বে নিমচাঁদপুর থেকে মালঞ্চ, পশ্চিমে মালঞ্চ রেল স্টেশন থেকে আত্রাই রেল স্টেশন। ত্রিভূজাকৃতি এই জলাভূমির কিছু অংশ নাটোর মহকুমায় অবস্থিত। ক্রমাগত পলিমাটি জমতে জমতে এই জলাভূমি ক্রমশ সংকুচিত হয়ে বর্তমানে এর সীমানা দাঁড়িয়েছে উত্তরে বগুড়া জেলার কিছু অংশ, দক্ষিণে ঈশ্বরদি ও আটঘরিয়া থানার(পাবনা) অংশ, পশ্চিমে নওগাঁ মহকুমার আত্রাই ও রানীনগর থানার কিছু অংশ এবং পূর্বে সাঁড়া-সিরাজগঞ্জ রেল পথের কিছু অংশ। প্রাচীনকালে উত্তরবঙ্গে যাতায়াতের অন্যতন প্রধান জলপথ ছিল এই বিল।

সমগ্র চলন বিলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন নামে বর্ণনা করা হয়েছে। প্রধান অংশ অবশ্যই চলনবিল নামে আখ্যাত হয়েছে। অন্যদের নাম হালতি বিল, রোড় বিল, বিন্নাগুড়ি বিল এবং বোসখালী বিল। আদিতে সমগ্র চলন বিলের আয়তন ছিল ৪২১ বর্গমাইল। এর মধ্যে ২৭৯ বর্গমাইলের মধ্যে ১০৯ বর্গমাইল বৎসরের কোনো না কোন সময় চাষের উপযোগী হয় এবং ৩৩ বর্গমাইল এলাকায় সারা বৎসর জল থাকে।[৬]

চলন বিল যেমন শুকনো মৌসুমে এ অঞ্চলের মানুষকে নানা প্রকার শস্য সরবরাহ করে, তেমনি অন্যদিকে বিভিন্ন জলজ যেমন- শাপলার ফল, সিঙ্গার, শালু, মাখন, পদ্ম ইত্যাদিও এ বিলে প্রচুর পাওয়া যেতো।[৭]

**হালতি বিল**

হালতি বিল নলডাঙ্গা উপজেলার অন্তর্গত, খাজুরা, পিপরুল, মাধনগর এবং ব্রহ্মপুর ইউনিয়নের একটি বিস্তৃত এলাকার অংশ। প্রাকৃতিক অপার সৌন্দর্যের জন্য এটি বাংলাদেশের 'দ্বিতীয় কক্সবাজার' নামে পরিচিত। বৈশাখ থেকে কার্তিক এই ৭ মাস বিলটি ৫-৮ ফিট জলমগ্ন থাকে। এই বিলটি আত্রাই নদীর সাথে সংযুক্ত।

হালতি বিলের একটি অংশে যেখান প্রায় সারাবছর জল থাকে সেখানে মাছের পবিত্র স্থান বলে খ্যাত। বর্ষাকালে অনেক পর্যটক বা ভ্রমণ পিপাসু মানুষ পাটুল হাঁপানিয়া এলাকায় নৌ-ভ্রমণে আসে।

যখন বর্ষাকালে বিলটি পানিতে পূর্ণ থাকে, তখন ছোট গ্রামগুলিকে দেখতে ছোট ছোট দ্বীপের মত মনে হয়।এই বিলের মধ্যে ৮ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি রাস্তা আছে যা পিপরুল ইউনিয়নকে খাজুরিয়া ইউনিয়নের সাথে যুক্ত করে। জলমগ্ন থাকায় এই রাস্তাটি প্রায় ৬ মাস ব্যবহার উপযোগী থাকে, বাকী সময় জলে ডুবে থাকে।[৮] বর্ষাকালে হালতি বিলের ঢেউ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত দেখায় এবং উত্তরবঙ্গের পর্যটকদের সমুদ্র-সৈকত দেখার পিপাসা মেটায়। তাই হালতি বিলের তীরবর্তী পাটুল-হাঁপানিয়া এলাকাকে পাটুল-হাঁপানিয়া মিনি সি-বিচ নামে পরিচিত।[৯]

**লারকিমারী বিল**

সিংড়া উপজেলায় অবস্থিত একটি বিল এটি কলম ও পারসাঁঐল গ্রামের মধ্য দিয়ে অবস্থিত। এছাড়া নাটোর জেলার বিভিন্ন থানায় আরও অসংখ্য বিল রয়েছে।

## কয়েকটি নদীর বর্ণনা

নাটোর নদী নালা সমৃদ্ধ একটি জেলা। নদীগুলোতে বর্ষাকালে পানি বৃদ্ধি পেলে নৌকা চলাচলের উপযোগীতা বৃদ্ধি পায়। অনেক নদীতে শুষ্ক মৌসুমে পানি কমে যায়। যেমন : মরা বড়াল। নদীগুলো উপজেলাগুলোর মাঝে সংযোগ সৃষ্টি করেছে। নিম্নে কয়েকটি নদীর বর্ণনা দেয়া হলো :

**করতোয়া**

নাটোর জেলার প্রাচীন নদী এটি। সপ্তম শতকে বরেন্দ্রীর পূর্ব সীমান্ত দিয়ে করতোয়া প্রবাহিত হোত। এই নদী হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়ে দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলাকে দ্বিখন্ডিত করে বাংলাদেশে প্রবেশ করে। জলপাইগুড়ি থেকে প্রবাহিত দক্ষিণের পুরোনো প্রবাহের নাম করতোয়া । করতোয়া হিন্দুদের কাছে

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র নদী বলে বিবেচিত হয়। লঘু ভারত-এ এই নদীকে বলা হয়েছে ‘বৃহৎ পরিসরা পূণ্যা করতোয়া’। মহাভারতের বনপর্বে তীর্থযাত্রা অধ্যায়ে বলা হয়েছে ‘করতোয়া পুণ্যাতোয়া’।

### আত্রাই বা আত্রেয়ী নদী

আত্রাই বা আত্রেয়ী নদীর নাম মহাভারতে উল্লিখিত আছে। এই নদী জলপাইগুড়ি থেকে উৎপন্ন হয়ে দিনাজপুর জেলার মধ্যে রাজশাহী এসে কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হয়ে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা মহাদেবপুর মান্দা থানা হয়ে পুনরায় রাজশাহী জেলার বাগমারা থানার দিকে প্রবাহিত হয়েছে। তার একটি শাখা কয়রাবাড়ি, নন্দনালা ও আহসানগঞ্জ হয়ে আত্রাই ঘাটের দেড় কিলোমিটার নিচ থেকে ‘গুড়’ নামে সিংড়া একান্নবিঘা যোগেন্দ্রনগর-কালাকান্দেরের মধ্যে দিয়ে চাঁচকৈড় ত্রিমহোনায় নন্দকুজা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। আত্রাই নদীর আরেকটি শাখা যোগেন্দ্রনগর-তেলকুপি ত্রিমোহনা থেকে পূর্বদিকে গুরুদাসপুর থানার খুবজিপুর গ্রামে পৌঁছে চলনবিলের সাথে তার অস্তিত্ব বিপন্ন করে ফেলেছে।[১০]

জলপাইগুড়ি থেকে প্রবাহিত মধ্যবর্তী ধারা আত্রাই নাটোর জেলাকে নানা ধারা-উপধারা, শিরা-উপশিরার মতো জড়িয়ে রেখেছে। এর মূলধারা তিস্তা থেকে বেরিয়ে সোজা দক্ষিণবাহী হয়ে চলনবিলের ভিতর দিয়ে জাফরগঞ্জের কাছে করতোয়ার সাথে মিলিত হোত। আত্রাই-এর ছোট একটি শাখা পশ্চিমবাহী পদ্মায় পড়েছে। এইভাবে আত্রাই নদী চলন বিলের প্রাণ সঞ্চার করে নাটোর মহকুমাকে সঞ্জীবিত করেছে। ১৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দে হিমালয়ের পাদদেশে প্রবল বর্ষণে যে বিরাট বন্যা হয় তাতে আত্রাই ও করতোয়া নদীর সমৃদ্ধি বিনষ্ট তিস্তা নদীর বিপুল জলরাশি ফুলছড়ি ঘাটের কাছে মৃতপ্রায় ব্রক্ষ্মপুত্র নদকে স্ফীত করে।[১১]

### বড়াল

পদ্মার মোহনা বড়াল নদীর উৎপত্তি স্থান। রাজশাহী জেলার চারঘাট থানা থেকে বড়ালের উৎপত্তি হয়ে বাগাতিপাড়া-বড়াইগ্রামের মধ্যে দিয়ে পাবনা জেলার চাটমোহর থানার নূননগর গুমানি নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। এই নদী নন্দনগাছি-আড়ানি-লক্ষণহাটি ও জয়ন্তীপুর হয়ে বাগাতিপাড়ার দয়রামপুরে এসে দ্বিখন্ডিত হয়েছে। এর উত্তর ভাগের নাম নন্দকুজা। এর দক্ষিণবাগ বড়াইগ্রামের শ্রীখন্ডি-জোয়ারী-তিরাইল-মৌখারী-লক্ষীকোল-জোনাইল হয়ে চাটমোহর থানার ওপর দিয়ে বেড়া থানার দিকে অগ্রসর হয়েছে।

### মরা বড়াল

মরা বড়াল নামে যে নদীটি চারঘাটের মূল বড়ালের অংশ হিসেবে পরিচিত সেই নদীটি চারঘাট থানার অনুপনগর-রুস্তমপুর-আড়ানি-জামনগর-গালিমপুর-দয়ারামপুর-নন্দকুজা-বড়াইগ্রাম হয়ে সেও নূননগরে গুমানির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। শত বছর আগে বড়াল ছিলো স্রোতস্বিনী আর গতিময়। তবে বর্তমানে এটি বর্ষাকালে নৌকা চলাচলের উপযোগী, শুস্ক মৌসুমে যা নয়। প্রচলিত আছে যে, জোড়াদীঘির ধনাঢ্য চৌধুরীদের সময় এ নদীটির স্থান ছিল পদ্মার পরই। রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে নদী পথে ঢাকায় যাতায়াতের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ ছিল বড়াল নদী। নবাব-জমিদার-অমাত্যদের বজরা এই পথে ঢাকায় যাতায়াত করতো।

### নন্দকুজা নদী

মূল নদী বড়াল বাগাতিপাড়া উপজেলার দয়ারামপুর এসে দ্বিখন্ডিত হয়ে উত্তরাংশের যে ধারা আটঘড়ি-আহমেদপুর-হালসা-নাজিরপুর গুরুদাসপুর ও চাচঁকৈড়ের দক্ষিণ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সিংড়া-কলম-

Dhaka University Institutional Repository

একান্নবিঘার ওপর দিয়ে বিভিন্ন নামে প্রবাহিত হয়ে যে নদীটি ত্রিমুহানী নামক স্থানে এসে মিলিত হয়ে আরো পূর্বদিকে বয়ে গেছে। তার নিজ ধারা শেষ হয়েছে যমুনা নদীতে গিয়ে।[১২]

**নারোদ**

নাটোর শহরের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত নারোদ একটি প্রশাখা। এটি মুশাখা নদের একটি শাখা। এটি একটি মৃতপ্রায় নদী। নাটোরের পূর্ব দিকে এটি অন্য নদীর সাথে যুক্ত হয়েছে যেটি দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত নারোদ প্রবাহ নামে খ্যাত এবং এই যুক্ত প্রবাহ পূর্ব পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে আত্রাইয়ের পুরাতন প্রবাহের সাথে মিলিত হয়েছে।[১৩]

## কয়েকটি খালের বর্ণনা

নাটোর জেলায় অসংখ্য খাল রয়েছে। এগুলোর বেশিরভাগই জনসাধারণের উদ্যোগে খনন করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি খালের বর্ণনা দেয়া হলো :

**বেশানী-গুমানি খাল**

গুরুদাসপুর থানার বেশানী নদী থেকে বিলসা কাঠাবাড়ি ও পিপলা ধামাইচ হাটের নিজ দিয়ে প্রবাহিত গুমানি নদী পর্যন্ত দীর্ঘ সাত কিলোমিটার দীর্ঘ খালটি বেশানী গুমানী নামে পরিচিত ।

**নিয়ামত খাল**

নাটোর জেলার নামৈট গ্রামের সমাজকর্মী নিয়ামত আলী খানের উদ্যোগে খনন করা হয়। নামৈট থেকে দলগাছা-দৈউলা হর্ণি মানিকচাপর-একদিলতলা-বনকুড়ি-তেঘইর-গোয়ালবাড়িয়া-স্থাপনদীঘি-মুষ্টিগড়-পাঁড়েরা-হুলহুলিয়া হয়ে জয়নগরে এসে আত্রাই নদীর সাথে মিলিত হয়েছে। খালটির দৈর্ঘ্য ১০ কি:মি।

**সাত্তার সাহেবের খাল**

গুরুদাসপুর থানার হাঁসমারি গ্রামের কলেজ শিক্ষক আব্দুস সাত্তার সাহেবের বিশেষ উদ্যোগে ইরিগেশন বিভাগ আশি হাজার টাকা ব্যয়ে খালটি খনন করে। খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৯ কিঃ মিঃ ।

**খুবজিপুর-বামনবাড়িয়া নালা**

পূর্ত বিভাগের তত্ত্বাবধানে খনন করা খুবজিপুর ত্রিমোহনায় যাওয়া আত্রাই থেকে বামনবাড়িয়া হয়ে চলন বিলের মধ্যে বিলসা মৌজায় গুমানী বেশানী খালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এই খালটির দৈর্ঘ্য প্রায় ৩ কিঃ মিঃ।

**পানাউল্লাহ খাল**

১৯৩৮ সালে নাটোর মহকুমার অফিসার পানাউল্লাহ আহম্মেদের ২৫৬৭ টাকা অর্থ সাহায্যে সিংড়া থানার পালসা গ্রাম থেকে বয়ে চলা খালটি নামা-কুমিরা বিলের কাছে নাগর নদীর সঙ্গে যুক্ত।

**নবীর হাজীর জোলা**

আনুমানিক ১৯৩০ সালে চর কাঁটা বাড়ি গ্রামের হাজী নবীর উদ্দিনের উদ্যোগে কাঁটা বাড়ি গ্রামের দক্ষিণ থেকে গুমানি নদী পর্যন্ত ২ কিঃ মিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত খালটি স্থানীয় জনসাধারন খনন করে। স্থানীয় নাম ‘লবোর জোলা’।

**পিয়াদামারা জোলা**

এই জোলা লালপুর থানায় অবস্থিত। অনেকে মনে করেন এটি মানুষের খনন কৃত নয়। এটি বড়াল নদীর একটি ক্ষুদ্র শাখা।

**গাঁড়াবাড়ি ছাড়খালি খাল**

১৯৬৩ সালে জনগণ এ খালটি স্বেচ্ছাশ্রমে খনন করে।[১৪]

নদী-খাল জোলা উপবিল প্রভৃতি নিয়েই সমগ্র চলন বিল। এসব জলাশয়গুলো বিলের অলংকার স্বরূপ। অনেক ক্ষেত্রে সমগ্র নদীগুলো চলন বিলে পানি সরবরাহ করে। আবার কিছু নদী চলনবিলের পানি নিষ্কাশনে সাহায্য করে। যেমন গুড় ও অষ্টামাশিয়া।

**উপজেলা-থানা-ইউনিয়ন-গ্রাম**

এক সময় রাজশাহী জেলার সদর দপ্তর ছিল নাটোর। তখন থেকে এখানে অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন স্থাপনা গড়ে ওঠে। ১৮২৫ সালে রাজশাহী জেলা সদর নাটোর থেকে রামপুর-বোয়ালিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। পুলিশ সাবডিভিসন হিসেবে নাটোরের পরিচয় ১৮২৯ সাল থেকে। নাটোর থানা সৃষ্টি হয় ১৭৯৩ সালে, মহাকুমা ১৮২৯ সালে, এবং পৌরসভা সৃষ্টি হয় ১৮৬৯ সালে। ১৯৫৯ সালে পৌরসভাকে টাউন কমিটিতে রুপান্তর করা হয়। পূর্বে এটি রাজশাহী জেলার একটি মহকুমা ছিল। নাটোর ১৯৮৪ সালে জেলায় উন্নীত হয়। বর্তমানে নাটোর রাজশাহী বিভাগের একটি জেলা।[১৫]

১৮৪৫ সালে নাটোর মহকুমা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে এই মহকুমার অধীনে ৬টি উপজেলা বা থানা ছিল। ২০০০ সালে আরেকটি উপজেলা বা থানাকে যুক্ত করা হয়। নাটোর মহকুমায় যে ৬টি উপজেলা ছিল, সেগুলো হল নাটোর সদর, সিংড়া, গুরুদাসপুর, বড়াইগ্রাম, লালপুর, বাগাতিপাড়া। ২০০০ সালে নতুন যে থানা বা উপজেলাটি যুক্ত হয়, সেটি হল নলডাঙ্গা। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত নাটোর জেলায় পৌরসভা ছিল তৎকালীন মহকুমা সদর-এ মাত্র একটি। বর্তমানে ৮ টি পৌরসভা রয়েছে। ১৮৪৫ সালে নাটোর মহকুমার অধীনে ইউনিয়ন পরিষদ ছিল ৫৫টি। ১৯৭৪ সালের পরিসংখ্যান ব্যুরোর রির্পোট থেকে নাটোর জেলার ৫১টি ইউনিয়নের উল্লেখ পাওয়া যায়। বর্তমানে নাটোর জেলায় ৫২ টি ইউনিয়ন রয়েছে।

**নাটোর সদর উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলো হল :**

১) ছাতনী, ২) তেবাড়িয়া, ৩) দিঘাপতিয়া, ৪) লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া, ৫) বড় হরিশপুর, ৬) কাফুরিয়া, ৭) হালসা

**সিংড়া উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলো হল :**

৮) শুকাশ, ৯) ডাহিয়া, ১০) ইটালী, ১১) কলম, ১২) চামারী, ১৩) হাতিয়ানদহ, ১৪) লালোর, ১৫) শেরকোল, ১৬) তাজপুর, ১৭) চৌগ্রাম, ১৮)ছাতারদিঘী, ১৯) রামনন্দ খাজুরা

**গুরুদাসপুর উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলো হল :**

২০) নাজিরপুর, ২১) বিয়াঘাট, ২২) খুবজীপুর, ২৩) ধারাবারিষা, ২৪) মসিন্দা, ২৫) চাপিলা

**বড়াইগ্রাম উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলো হল :**

২৬) জোয়াড়ী, ২৭) বড়াইগ্রাম, ২৮) জোনাইল, ২৯) নগর, ৩০) মাঝগাঁও, ৩১) গোপালপুর, ৩২) চান্দাই

**লালপুর উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলো হল :**

৩৩) লালপুর, ৩৪) ঈশ্বরদী, ৩৫) চংধুপইল, ৩৬) আড়বাব, ৩৭) বিলমাড়িয়া, ৩৮) দুয়ারিয়া, ৩৯) ওয়ালিয়া, ৪০) দুড়দুরিয়া, ৪১) অর্জুনপুর বরমহাটি, ৪২) কদিমচিলান

**বাগাতিপাড়া উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলো হল :**

৪৩) পাঁকা, ৪৪) জামনগর, ৪৫) বাগাতিপাড়া, ৪৬) দয়ারামপুর, ৪৭) ফাগুয়ারদিয়াড়

**নলডাঙ্গা উপজেলার অন্তর্ভুক্ত ইউনিয়নগুলো হল :**

৪৮) ব্রহ্মপুর, ৪৯) মাধনগর, ৫০) খাজুরা, ৫১) পিপরুল, ৫২) বিপ্রবেলঘরিয়া

গ্রামসংখ্যা ১৯৭৪ সালের পরিসংখ্যান রিপোর্ট অনুযায়ী ছিল ১২৭৩ টি। বর্তমানে নাটোর জেলায় ১৪৩৪টি গ্রাম রয়েছে। এই অভিসন্দর্ভে নাটোর জেলার যেসব উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম এলাকাগুলোতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ নির্যাতন তথা মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটন করেছিল, সে বিষয়গুলোর মধ্যে যেগুলো সনাক্ত করা গিয়েছে সেগুলি উল্লেখ করা হবে। এমন বহুস্থান রয়েছে, যেখানে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছিল বলে শোনা গিয়েছে। কিন্ত কালের গর্ভে অনেক কিছুই বিলীন হয়ে গেছে। এছাড়া উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে সেগুলো উল্লেখ করা সম্ভব হয়নি। যেসব ক্ষেত্রে উপযুক্ত প্রমান পাওয়া গিয়েছে সেসব ঘটে যাওয়া ঘটনার বর্ণনা দেওয়ার প্রচেষ্টা করা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে।

উল্লিখিত উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম, মহল্লাগুলো ছাড়াও নাটোর জেলার এমন বহু স্থানে পাকিস্তানি বাহিনী ১৯৭১ সালে গণহত্যা,ধ্বংসযজ্ঞ, নির্যাতন, লুটপাট চালায়। এগুলোর সব সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। কালের গর্ভে অনেক কিছুই বিলীন হয়ে গেছে। সবার পরিচয় পাওয়া যায়নি। যেসব অঞ্চলে পাওয়া গেছে শুধু সেসব এলাকার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হয়েছে।

**তথ্য নির্দেশ**

[১] জয়ন্ত কুমার রায়, ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, *উত্তরবঙ্গের নগরায়ণ*, নাটোর, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৩

[২] মোঃ মাকসুদুর রহমান, *নাটোরের মহারানী ভবানী*, রাজশাহী, ১৯৯৮, পৃ. ৫৫

[৩] জয়ন্ত কুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[৪] সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া-ষষ্ঠ খন্ড, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১, পৃ. ৩৭৮-৩৮১।

[৫] জয়ন্ত কুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২

[৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ৮১-৮২

[৭] সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৫

[৮] উইকিপিডিয়া

[৯] জেলা বাতায়ন (http://natoresadar.gov.bd/)

[১০] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০

[১১] জয়ন্ত কুমার রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[১২] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[১৩] Ashraf siddiqui (gerenal editor), *Bangladesh District  Gazetteers*, Rajshahi, Bangladesh Government Press, Dacca, 1976, Page. 13

[১৪] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

[১৫] শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (নাটোর)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ২৬

# দ্বিতীয় অধ্যায়

## গণহত্যা, নির্যাতন ও মানবতাবিরোধী অপরাধ

'গণহত্যা' শব্দটি সাধারণভাবে বোঝায় অনেক মানুষকে গণহারে নির্বিচারে হত্যা করা। শব্দটির প্রাথমিক অর্থ থেকে আমরা এ ধারণা পাই।

'গণহত্যা' শব্দটি বাংলায় ব্যবহার করা হয় ইংরেজি-জেনোসাইড (Genocide) এর অনুবাদ হিসেবে।

ইংরেজী ভাষায় 'ম্যাসকিলিং' (mass killing) শব্দটির অনুবাদও 'গণহত্যা' করা হয়েছে। উল্লিখিত দুটি শব্দের অনুবাদ বাংলায় এক হলেও এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এক নয়।

ব্যাপক হত্যাকাণ্ড বোঝাবার জন্য ইংরেজিতে 'ম্যাসকিলিং' (mass killing) 'ম্যাস মার্ডার' (Mass murder) 'ম্যাসাকার'(Massacre) 'এক্সটার্মিনেশন' (extermination) পগ্রম (Pogrom) 'হলোকস্ট' (holocaust) এর ব্যবহার কয়েকশ বছর ধরে করা হলেও, 'জেনোসাইড শব্দটি প্রথম চয়ন করেছেন পোল্যান্ডের আইনজ্ঞ লেমকিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ন্যাৎসি গণহত্যার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তিভোগী লেমকিন গ্রীক (Genose)এবং ল্যাটিন (cidere) শব্দ দুটি যুক্ত করে genocide চয়ন করেছেন। (genos) অর্থ জাতি মানুষ এবং (cidere) অর্থ হত্যা করা।

লেমকিন 'ম্যাসকিলিং' (mass killing)-এর পার্থক্য নির্ণয় করেছেন এভাবে- প্রথমটি ব্যাপক ও নির্বিচারে হত্যাকান্ড বোঝাবার জন্য ব্যবহার করা হলেও দ্বিতীয়টির অর্থ আরও গভীর ও ভয়াবহ। লেমকিন বলেছেন একটি জাতি, সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিক নির্মূলের জন্য যে হত্যাকান্ড পরিচালিত হয় সেটি 'জেনোসাইড'।[১]

আন্তর্জাতিক আইনে জেনোসাইড বা গণহত্যা কথাটির অর্থ হল কোন সরকার দ্বারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো জাতিগত, ধর্মীয় বা গোত্রীয় দলভুক্ত জনগণের বিনাশ করা।[২]

১৯৪৪ সালে জেনোসাইড শব্দটি গঠিত হলেও, এর দ্বারা যে অপরাধ বুঝানো হয় তা ইতিহাসে বারবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে ১৯৩০-এর দশক ও যুদ্ধকালীন নাৎসি জার্মানি, ইউরোপীয় ইহুদি সমাজ ও পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য জাতীয় দলকে ধ্বংস করার জন্য রীতিমতো প্রচেষ্টা চালায় ।[৩]

১৯৪৫ সালে নাৎসি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত নুরেমবার্গের ট্রাইবুনালে 'হলোকষ্ট' শব্দটির ব্যাখ্যায় যে 'জেনোসাইড' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেখানে জাতিগত বা ধর্মীয় কারণে মানবগোষ্ঠীর ওপর উৎপীড়নের কথা বলা হয়েছে। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘের এক প্রস্তাবে 'জেনোসাইড' কে আন্তর্জাতিক অপরাধ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও অপরাধ হিবে এটি সংজ্ঞায়িত হয়েছে ১৯৪৮ সালের ৯ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'কনভেনশন অন দি প্রিভেনশন এ্যান্ড পানিশমেন্ট অব দি ক্রাইমস অব জেনোসাইড' (Convention on the prevention and punishment of the Crimes of genocide CPPCG)।[৪] এ নিম্নবর্ণিত যে কোনো কার্যকরা যাহার উদ্দেশ্য একটি জাতি, উপজাতি, নরগোষ্ঠী ধর্মীয় কিংবা রাজনৈতিক ব্যক্তিসমষ্টিকে সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক হত্যা করা গণহত্যার পর্যায়ে পড়বে। যেমন-

১. কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা করা

২. কোনো গোষ্ঠীর সদস্যদের সাংঘাতিক দৈহিক বা মানসিক ক্ষতিসাধন করা;
৩. ইচ্ছাকৃতভাবে কোন গোষ্ঠীর ওপর এমন পরিকল্পিত জীবনধারা চাপিয়ে দেওয়া যাতে তাদের দৈহিক অস্তিত্ব সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে বিনষ্ট হয়;
৪. কোনো গোষ্ঠীর মধ্যে মানব জন্ম রোধের জন্য কোনো ব্যবস্থা প্রয়োগ করা;
৫. কোনো গোষ্ঠীও শিশুদেরকে জোরপূর্বক অন্য গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত করা প্রভৃতি।

এছাড়াও ১৯৪৯ সালের কনভেনশনে আরও কিছু অপরাধকে শাস্তিযোগ্য বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

যেমন-

১. গণহত্যার জন্য ষড়যন্ত্র।
২. গণহত্যার পক্ষে সরাসরি ও প্রকাশ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি।
৩. গণহত্যার প্রচেষ্টা ও
৪. গণহত্যার সহযোগিতা।

যে ব্যক্তি শেষোক্ত বিধিতে বর্ণিত গণহত্যা বা অন্য কোনো আচরণ করবে তাকে শাস্তি দেওয়া হবে, তা যে শাসনতন্ত্র অনুসারে দায়িত্ব ভারপ্রাপ্ত শাসক (rulers) সরকারি কর্মচারী বা সাধারণ ব্যক্তি বিশেষ হোক না কেন।[৫]

ফজলুর রহমান, তার *বাংলাদেশের গণহত্যা*গ্রন্থে গণহত্যা সম্পর্কে আরও দুটি বিষয় আইনসিদ্ধ বলে সাধারণভাবে বিবেচনা করেছেন। খুনীচক্রের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের অভিপ্রায় সম্পর্কে অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই।

রাষ্ট্রপতি বা সেনাধ্যক্ষ তার সেনাদের গণহত্যার আদেশ দিলে অথবা তাদের গণহত্যা থেকে বিরত করতে ব্যর্থ হলে তিনিও গণহত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন। এছাড়া ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো জাতীয় গোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং বুদ্ধিজীবী হত্যাও গণহত্যার সামিল। কারণ সেক্ষেত্রে জনসংখ্যার অধিকাংশই হয়তো অসহায়। অর্ধশিক্ষিত বা অশিক্ষিত হিসাবে বেঁচে থেকে গোষ্ঠীর সমাজ জীবনের মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেয়।[৬]

কালের স্রোত ধারায় গণহত্যার এ ধরনের বহু নজীর লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন খুনীচক্রের হাত থেকে সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ বা জাতি কখনই ছাড়া পায়নি। জীবন, সম্পদ, কখনো মান সম্মান পদদলিত হয়েছে অত্যাচারী, ক্ষমতাবানদের হাতে।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছিল, বিশ্বের মানচিত্রে এরকম নজীর খুবই কম। আর এ গবেষণায় মূলত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের দ্বারা গণহত্যার শিকার প্রতিটি বাঙালি হিসাবের মধ্যে আসবে। কোনো ক্ষেত্রে একজন মানুষকেও যদি যুদ্ধের নিয়মবহির্ভূত হত্যা করা হয় তাও গণহত্যার পর্যায়ে পড়বে। শরণার্থী শিবিরে যাওয়ার সময় নিহত বা শিবিরে মহামারী, অনাহার, ক্ষতজনিত আঘাতে মারা গেলে, তাও শহীদদের সংখ্যার সাথে যুক্ত হবে।[৭]

## ১৯৭১ এ বাংলাদেশে গণহত্যার সংখ্যা

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন অর্থাৎ ২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের সহযোগীরা ত্রিশ লক্ষ বাঙালিকে হত্যা করে। যদিও গণহত্যা গবেষক ম্যাথিউ হোয়াইট ১৯৭১ এ বাংলাদেশে নিহতের সংখ্যা দেখিয়েছেন মাত্র ৫ লক্ষ। তবে পুরো বাংলাদেশের প্রতিটি জেলার গণহত্যার আনুমানিক সংখ্যা দেখলে বোঝা যাবে ১৯৭১-এ নিহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ বা তার অধিক হতে পারে। তার চেয়ে কম নয়। স্যামুয়েল টটেন সম্পাদিত 'সেঞ্চুরি অব জেনোসাইড' গ্রন্থে বাংলাদেশের গণহত্যায় নিহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ বলা হয়েছে। 'এনসাইক্লোপেডিয়া আমেরিকানা (২০০৩), 'ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক' ও 'কম্পটন্‌স এনসাইক্লোপিডিয়া' তেও ৩০ লক্ষ উল্লেখ করেছে। শুধু ৭১ এর ২৫ মার্চের কালরাত্রিতে ঢাকায় নিহতের সংখ্যা সিডনির 'মর্নিং হেরাল্ড' লিখেছে ১০ হাজার থেকে ১ লক্ষ (২৯/০৩/১৯৭১) আর 'নিউইয়র্ক টাইমস' লিখেছে ১০ হাজার (২৯/০৩/৭১)।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আমেরিকার 'সেন্ট লুইস' পোস্ট-এর (০১/০৮/১৯৭১) থেকে জানা যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পোল্যান্ডে নাৎসীদের গণহত্যার পর এই হত্যাকাণ্ড হচ্ছে সবচেয়ে নৃশংস। সরকারি হিসেব অনুযায়ী প্রথম চার মাসে ২ লক্ষ থেকে ৭ লক্ষ বাঙালি নিহত হয়েছে এবং ৬৫ লক্ষ শরণার্থী হয়েছে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। ১৯৭১ সালে ঢাকায় অবস্থানরত বৃটিশ সাংবাদিক সাইমন ড্রিং মনে করেন ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ হতে পারে।[৮]

১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পর সোভিয়েত সংবাদ সংস্থা তথা বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি জেলায় তদন্ত করে মুক্তিযুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ৩০ লক্ষ বলে রিপোর্ট করেছে।[৯]

## ১৯৭১ এ গণহত্যার উদ্দেশ্য

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সালে ঢাকায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে নারকীয় গণহত্যা শুরু করে ছিল শান্তিপ্রিয় বাংলাদেশের মানুষের ওপর তা টানা নয় মাস ধরে ছড়িয়ে পড়েছিল সমগ্র বাংলাদেশে। নির্বিচারে গণহত্যার পাশাপাশি সনাক্তকরণের মাধ্যমে হত্যার প্রক্রিয়াও আরম্ভ হয়েছিল ২৫শে মার্চ থেকে। পুরো বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়াই ছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের চিন্তায়। বাঙালির দোষ ছিল তারা গণতন্ত্র চেয়েছিল। বাঁচতে চেয়েছিল পাকিস্তানি সমরনায়কতান্ত্রিক মৌলবাদী শাসন চক্রের হাত থেকে। আর বাঙালির এ ধরণের আদর্শ পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। ফলে বাঙালি জাতির ওপর নেমে এসেছিল শাসক চক্রের অপরিসীম নির্যাতন, নিপীড়ন যা মানবতাবাদের বিরুদ্ধে ছিল।[১০]

শাহরিয়ার কবির তার, *একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার* গ্রন্থে পাকিস্তানি বাহিনী বা বাঙালি হত্যার বেশ কিছু কারণের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন,

> 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা' ও 'ইসলাম রক্ষার' দোহাই দিয়ে একাত্তরে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা স্মরণকালের বৃহত্তম গণহত্যাটি সংঘটিত করেছিল।[১১]

স্বাধীনতাযুদ্ধের সমর্থক মার্কিন সিনেটের ডেমোক্রোট দলীয় সদস্য এ্যাডলাই স্টিভেনসন কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের বধ্যভূমিগুলো দেখে এসে ৩০ জানুয়ারী বলেছিলেন 'বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নৃশংসতা ছিল ভয়াবহ এবং মানবজাতির ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। এই বর্বরতা মানুসের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে।

মার্কিন সিনেটের অপর সদস্য এডওয়ার্ড কেনেডি বলেন, 'মানুষের মস্তিষ্কে এ 'ধরনের বর্বরতার চিন্তা আসতে পারে এ কথা ভাবতেও কষ্ট হয়।'

ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে মালরো বলেছিলেন 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসীদের নৃশংসতার নিদর্শন আমি দেখেছি, কিন্তু এখানকার নৃশংসতা তার চেয়ে অনেক বেশি।'[১২]

এই গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, নির্যাতনের প্রক্রিয়া দীর্ঘ ৯ মাস ধরে চলার পরও শেষ হয়নি। যদিও ১৯৭১ সালে ১৬ ডিসেম্বর প্রায় ৯২ হাজার পাকিস্তানি সৈন্যের আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়। তবু ১৯৭২ সালেও লুকিয়ে থাকা পাকিস্তানি সৈন্য ও তাদের সহযোগীরা বিভিন্ন স্থানে শতাধিক বাঙালিকে হত্যা করে।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি  হানাদার বাহিনী যে নির্বিচারে গণহত্যায় মেতে উঠেছিল তাতে তারা চিহ্নিত  করে গণহত্যায় লিপ্ত হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে বা আরো নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, তারা বাঙালি জাতি, হিন্দুধর্মালম্বী, আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী ও ছাত্র শিক্ষকসহ সকল প্রকার পেশাজীবিদেরকে বেছে নিয়েছিল হত্যার লক্ষ্য হিসেবে। যেন পুরো বাঙালি জাতি আর মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে।

লুইস হ্যারেন দি টাইমস (লন্ডন) পত্রিকায় বাংলাদেশে গণহত্যা সর্ম্পকিত একটি রিপোর্ট গণহত্যার শিকার জনগোষ্ঠীর একটি শ্রেণী বিন্যাস করেন। পাকিস্তানিরা তাদের প্রধান শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

১. আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীও সমর্থকদের
২. কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের
৩. মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সহযোগীদের
৪. নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হিন্দু সম্প্রদায়কে এবং
৫. ছাত্র ও বুদ্ধিজীবিদের।[১৩]

পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যার শিকার হয়েছেন ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈনিক পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস বাহিনীর লোক, পুলিশ এবং আধা সামরিক, আনসার ও মুজাহিদ বাহিনীর লোক। এক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত বাহিনীকে নির্দেশ করে বাঙালির শক্তিকে দূর্বল করার আরেকটি প্রয়াস পাকিস্তানি বাহিনীর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

অ্যান্থনি ম্যাসাকারেনহাসের বর্ণনায় জানা যায়, পাকিস্তানি বাহিনীর অনেক সদস্যরা নাকি হিন্দু পুরুষদের কেবল হত্যা করে, হিন্দু নারী ও শিশুদেরকে ছেড়ে দেয়। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের কর্মী, সদস্য তথা সংগ্রামী ছাত্র-ছাত্রী, অধ্যাপক ও শিক্ষকদের মতো বাঙালি বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায় নিন্দিত হতেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কাছে।[১৪]

২৫শে মার্চ তারা ঢাকায় যে গণহত্যা শুরু  করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের হত্যার মধ্য দিয়ে তা চলেছে নয় মাস ধরে। বিজয় লাভের পূর্ব পর্যন্ত তারা শিক্ষক বুদ্ধিজীবী সহ জ্ঞানদীপ্ত বাঙালিদের হত্যা করেছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্র যেখান থেকে প্রতিরোধ আসতে পারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সেসব জায়গায় আক্রমণ করেছে। যেমন পিলখানায় পূর্বপাকিস্তান রাইফেলের সদর দপ্তর, রাজারবাগ পুলিশ লাইন, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলে ও জগন্নাথ হল। এছাড়া সংবাদপত্র অফিস ও হিন্দু মন্দির প্রভৃতিও বাদ যায়নি তাদের আক্রমণের থাবা থেকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তারা দেখেছে ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী কতটা সংগ্রামী। আর তাই তাদের বাঁচিয়ে রাখলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর জন্য তা অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। বাঙালি জাতি হত্যার এই প্রক্রিয়া সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সারা বাংলাদেশে এই গণহত্যা চালিয়েছে। তারা কোন কোন ক্ষেত্রে প্রথমদিকে মুসলিমদের ছেড়ে দিলেও পরবর্তীকালে গরিব ধনী, হিন্দু মুসলমান, ছোট বড়, পুরুষ মহিলা কেউই আর রক্ষা পায় নি।[১৫]

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে অনেক লোকজন তাদের পরিবার নিয়ে আশ্রয় নিতে রওয়ানা হয়েছে প্রতিবেশী দেশে। ১৯৭১ সালে প্রায় এক কোটি পুরুষ, নারী ও শিশু সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আশ্রয় নেয়। রাস্তায় তাদের ক্ষুধা তৃষ্ণায় জীবন হুমকি আসন্ন হলেও বাঁচার তীব্র ইচ্ছা ছিল। অনেকে পথের মধ্যেই ক্ষুধা তৃষ্ণায় মারা গিয়েছে, আবার অনেকে কোন গ্রামে আশ্রয় কালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর রোষাণলে পড়েছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাত্রদের আবাসিক হলগুলোতেও আক্রমণ চালায় পাকিস্তানি হানাদর বাহিনী। ফলে সেখানেও নির্মম গণহত্যা চলে যেমনঃ রোকেয়া হল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), জগন্নাথ হল (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) প্রভৃতি থেকে লাশ পাওয়া যায় শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী। ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত শাঁখারি বাজার, তাঁতীবাজার এলাকায় মন্দির। এছাড়া রেসকোর্স ময়দানের পার্শ্ববর্তী রমনাকালী বাড়িতেও চলে হত্যাযজ্ঞ। শুধুমাত্র শাঁখারিবাজার এ প্রায় আটহাজার নারী পুরুষ ও শিশুকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী।[১৬] বিভিন্ন চার্চে বাঙালি অনেকে আশ্রয় নিচ্ছে জেনে সেখানেও হামলা করে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী।[১৭]

হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকদেরকে হত্যা করার করা ছিল পাকিস্তানি বাহিনী তাদের ভারতের অনুচর বলে মনে করত, এবং তারা পূর্ব বাংলার মুসলিমদের ধর্ম নষ্ট করে দিচ্ছে এটা ভাবত। আর তাই তারা তাদের হত্যা করত। পাকিস্তানি বাহিনীর মূল উদ্দেশ্য ছিল যেকোন উপায়ে বাংলাদেশে বাঙালি জাতির উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। উপনিবেশ গড়ে তোলা ও তাকে ইচ্ছেমত শোষণ করে নিজ দেশের স্বার্থ উদ্ধার করা। আর তাই এই গণহত্যার মাধ্যমে বাঙালি জাতিকে মেরুদন্ডহীনে পরিণত করে, তাদের মেধা শক্তি, মনোবল ধ্বংস করে, মানসিকতা নষ্ট করে তাদের একটি পঙ্গু জাতিতে পরিণত করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী।

পাকিস্তান সরকার তাদের এই হত্যাযজ্ঞকে বৈধ করতে যুক্তি দাঁড় করেছিল যে অবাঙালিদের ওপর পূর্ব পাকিস্তানে যে গণহত্যা চলছিল এবং বাঙালি অফিসার (সেনাবাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ইত্যাদি) বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিলেন তা ঠেকানোর জন্য পাকিস্তান সরকার একটি অভিযান শুরু করে।[১৮] পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন সহযোগী তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের লেখনী, ভাষায় গর্বের সাথে তারা সেটা উল্লেখ করেছে। তারা অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখ করেছে যে, বাংলাদেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার্থে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী এ ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছেন। দুর্বৃত্ত (মুক্তিযোদ্ধাদের) দের শাস্তিদানের জন্য তারা এ আক্রমণ চালিয়েছে। তাতে কিছু মানুষ মারা গিয়েছে।

অ্যান্থনী মাসকারেনহাস পাকিস্তান সরকারের এ ধরনের যুক্তিগুলোকে নাকচ করে উল্লেখ করেছেন-

- অবাঙালিহত্যার পূর্বেই পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল।
- বাঙালি অফিসারদের আসন্ন বিদ্রোহ করা বিষয়টি ২৬ মার্চ রাতে পরিকল্পনা হয়নি, কাজেই মাত্র একরাত আগে .....ধর্মঘট আহ্বানের পক্ষে কোনো যুক্তি নেই।
- পাকিস্তান সরকার একটি রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল এবং তার তথাকথিত সমাধান রূপে নাৎসিপদ্ধতিতে গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল।
- বাংলাভাষা ও সংস্কৃতির বিলোপসাধন, যা তারা ১৯৫২ সালে করতে চেয়েছিল, সম্ভব হয়নি তখন, তাই এখন তা ফলপ্রসূ করার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল।

এভাবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি যেকোন উপায়ে বাঙালি জাতিকে শোষণ করে, তাদের অধিকার বঞ্চিত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির প্রচেষ্টা চালায়। আর ধ্বংসযজ্ঞ এর ব্যাপারে বিশ্বে প্রচার করতে থাকে যে, তারা আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য এ ব্যবস্থানিয়েছে। এ ধরনের অপ্রপ্রচার চালালেও তারা সত্যকে গোপন রাখতে পারেনি। বাঙালি জাতি শত দুর্দশা, লাঞ্ছনা, অত্যাচার সহ্য করেও নিজেদের মনোবল হারায়নি। আর এক পর্যায়ে এই সংগ্রামী জাতি অর্জন করেছে তাদের স্বাধীন বাংলাদেশ।[১৯]

## ১৯৭১ সালে নির্যাতন

নির্যাতন ও ধর্ষণে তফাৎ আছে। কিন্তু নারী ধর্ষণের ক্ষেত্রে অনেকে নির্যাতন শব্দটিই ব্যবহার করেন। কারণ, এই শব্দটির মধ্যে যেন সংকোচ, লজ্জা লুকিয়ে আছে। ধর্ষিত নারীদেরও যেসব সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে সেখানে তারা ধর্ষণের বদলে ‘অত্যাচার’ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। শহর গ্রামের সবাই। ‘নির্যাতন’ থেকে ‘অত্যাচারের’ অর্থ বরং খানিকটা ব্যাপক। এখানে ‘ধর্ষিত’ ও ‘অত্যাচারিত’ একই অর্থে ব্যবহৃত হবে। তবে, বলে রাখা ভালো অনেক সময় নির্যাতন, অত্যাচার, ধর্ষণ একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।[২০]

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় সহযোগীরা নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েই শুধু ক্ষান্ত হয়নি। হত্যার পূর্বে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন অব্যাহত প্রক্রিয়ায় চলতে থাকে। সেটা যে শুধু নারীদের উপরই করা হত তাই নয়, অনেক পুরুষদের ধরে এনে তাদের অত্যাচার, নির্যাতন করে হত্যা করা হত। তবে নারীদের উপর তারা ঘটায় নৃশংসতা বর্বরতা ও পৈশাচিক নির্যাতন। নির্যাতনের অন্যতম একটি অংশ ছিল ধর্ষণ। পাকিস্তানি প্রশাসন থেকে এ প্রক্রিয়ায় বাঙালি জাতিকে মানসিকভাবে দুর্বল করার আরেকটি নির্দেশ বা অনুমোদন দেয়া হয়েছিল। জানা যায়, মুক্তিযুদ্ধের সময় ‘বেলুচিস্তানের কসাই’ নামে কুখ্যাত পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লে.জে. টিক্কা খান তার সৈন্যদের বলেন, ‘Kill the Bangalis, rape their women loot their valuables and their properties.’[২১]

এভাবে গণহত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা। যুদ্ধের শুরু থেকেই তারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গণহত্যা, লুটপাট ধ্বংসলীলা চালানোর পাশাপাশি ধর্ষণ ক্রিয়া অব্যাহত রাখে। আর এক্ষেত্রে তাদের সহযোগী এদেশীয় দোসররাও তাদের সাথে এসব পৈশাচিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ও মদত দেয়।

হাসিনা আহমেদ *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ (চতুর্থ খণ্ড)* বইতে উল্লেখ করেছেন বাংলাদেশ ব্যাপী কিভাবে ধর্ষণ কর্মকান্ড গণহত্যা চালাচ্ছে পাকিস্তানি সেনারা।[২২]

## নির্যাতনের উদ্দেশ্য

তৎকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকার বিবরণ থেকে জানা যায় সমগ্র বাংলাদেশে ধর্ষণের মাধ্যমে তারা একটি নতুন জাতি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তারা নিজেদের খাঁটি মুসলমান মনে করতো। তাই তাদের রক্ত এদেশীয়দের সাথে মেশালে তারা খাঁটি রক্ত হবে ও একটি খাঁটি মুসলমানদের জাতি সৃষ্টি হবে।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভেবেছিল এদেশের পরিবারগুলোর নারীদের এভাবে সম্ভ্রম লুটের মাধ্যমে তারা বাঙালিদের মনোবল ভেঙ্গে দিবে, তারা আর পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যেতে পারবে না।

মোট কথা, পাকিস্তানের দমন নীতির একটি হাতিয়ার ছিল-

১. ধর্ষণ
২. ধর্ষণের মাধ্যমে 'নতুন জাতির সৃষ্টি যাতে বাঙালি জাতীয়তাবাদ আর মাথাচাড়া দিয়ে না ওঠে।
৩. কলোনির অধঃস্তন মানুষ হিসেবে যেন তেন ব্যবহার। যেন মানুষ মানুষ নয়, সামগ্রী মাত্র।
৪. জৈব আকাঙ্ক্ষা মেটানোর রাস্তা এবং এক রকম প্রতিশোধ সংস্থা যা প্রথম ও দ্বিতীয়টির সম্পূরক।[২৩]

তাদের যেসব দালাল সহযোগী (রাজাকার আলবদর প্রভৃতি) ছিল, তারাও তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রভুদের সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছে। যার ফলে এসব নরপিশাচদের লালসার সম্মুখে অসংখ্য নারীকে তাদের সম্মানের সাথে সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে জীবন পর্যন্ত দিতে হয়েছে। কোন কোন নারী গর্ভবর্তী হয়েছে। জীবন তাদের দুর্বিষহ নরকে পরিণত হয়েছে। নির্যাতিত শুধু নারীরাই হয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়ির পুরুষদের ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ক্যাম্পে। তাদের উপরও চালিয়েছে অকথ্য নির্যাতন। আর এরপর তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছে কোন রাস্তার ধারে, পুকুরে, জঙ্গলে, কখনও বা নদীতে।

## নারী নির্যাতনের সংখ্যা

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে অসংখ্য নারী নির্যাতন চালিয়েছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা। এসব নির্যাতিত নারী অনেকেই সমাজ, পরিবার এর সম্মান রক্ষার্থে তা প্রকাশ করেনি। তাদের সংখ্যা যে কম ছিল না, তা বলাই বাহুল্য।

মুক্তিযুদ্ধে নারী নির্যাতনের সংখ্যা সরকারি হিসেবে ২ থেকে ৩ লক্ষ বলা হলেও ৭২ এর জানুয়ারিতে নির্যাতিত নারীদের চিকিৎসা সাহায্য দেয়ার জন্য ঢাকায় আগমনকারী আন্তর্জাতিক রেডক্রসের চিকিৎসক অস্ট্রেলিয়ার জিওফ্রে ডেভিসের মতে এই সংখ্যা ৪ লক্ষেরও বেশি। ডাঃ ডেভিস বলেন,

> নির্যাতিত প্রায় ২ লক্ষ মহিলা অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। সরকারি কর্মকর্তারা বাংলাদেশে জেলাওয়ারী হিসেবে করেছেন। সারা দেশের ৪৮০টি থানা ২৭০ দিন পাকিস্তানি সেনাদের দখলে ছিল। প্রতিদিন গড়ে ২ জন করে নিখোঁজ মহিলার সংখ্যা অনুসারে লাঞ্ছিত মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লাখ। কিন্তু এছাড়াও যে হানাদার বাহিনী গ্রামে গ্রামে হানা দেবার সময় যেসব তরুণীকে ধর্ষণ করেছে তার হিসাব রক্ষণে সরকারি রেকড ব্যর্থ হয়েছে। এসব রক্ষিত

তরুণীদের অন্তঃসত্ত্বার লক্ষণ কিংবা রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিলে হয় তাদের পরিত্যাগ করা হয়েছে, নয়তো হত্যা করা হয়েছে। সেটা ৪ লক্ষ ৩০ হাজারের মধ্যে হতে পারে।[২৪]

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেছেন, ধর্ষিতা ও নির্যাতিতদের সংখ্যা এর চেয়ে বেশি।[২৫] নিউজ উইকের একটি প্রতিবেদনের কথা ধরা যাক উদাহরণ হিসেবে।

১৯৭১ সালের ১৫ই নভেম্বর পত্রিকাটি লিখেছিল, মুক্তিবাহিনীকে দমন করার নামে কিছুদিন আগে পাকিস্তানি সেনারা ডেমরা নামে এক গ্রামে অভিযান চালায় (যেখানে মুক্তিবাহিনীরা আদৌ ছিল না)। তারা ১২ থেকে ৩৫ বছরের বেশি বয়সের সমস্ত মহিলাদের ধর্ষণ করে এবং গুলি করে মারে ১২ বছরের বেশি বয়সের সমস্ত পুরুষদের।

দখলদার বাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতনের ঘটনা ব্যতিক্রম নয়। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনী বাংলাদেশে যে নারী নির্যাতনের ক্ষেত্রে নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে তার দ্বিতীয় কোনও নজির নেই। নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে বহু নারী আত্মহত্যা করেছেন। পাকিস্তানিরাও তাদের ধর্ষণকামী প্রভৃতির কারণে বহু নারীকে ভয়ংকর সব নির্যাতনের পর হত্যা করেছে।[২৬]

যুদ্ধ এবং সামাজিক দুর্যোগকালে গণধর্ষণ সম্পর্কে আমেরিকান সাংবাদিক ও গবেষক সুজান ব্রাউনমিলার এর একটি বহুল আলোচিত গ্রন্থ হচ্ছে 'এ্যাগেইনস্ট আওয়ার উইল মেন উইমেন এ্যান্ড রেপ'।

সুসান ব্রাউনমিলার লিখেছেন :

> 'Rape in Bangladesh had hardly been restricted to beauty… girls of eight and grandmothers of seventy-five had been sexually assaulted'.
>
> "পাকিস্তানিরা স্থানিকভাবেই শুধু ধর্ষণ করেনি, শত শত নারীকে মিলিটারি ব্যারাকে নিয়ে আটকে রেখেছে রাতে ব্যবহারের জন্য"।[২৭]

এখানে তিনি ৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে ধর্ষণের শিকার নারীদের সংখ্যা ২ থেকে ৪ লক্ষ এর কথা উল্লেখ করেছেন। এসব নারীদের যুদ্ধপরবর্তী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নেয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তারা বঞ্চিত হয়েছে পরিবার থেকে, পরিত্যক্ত হয়েছে স্বামী থেকে। সুজান ব্রাউনমিলারের মতে, নয় মাসের মুক্তিযুদ্ধে আটবছরেও শিশু থেকে পচাঁত্তর বছরে দাদি নানিরাও পাকিস্তানি সৈন্যদের ধর্ষণ থেকে রেহাই পাননি। মাসের পর মাস বাঙ্কারে আটক রেখে তাদের উপর্যুপরি ধর্ষণ করা হয়েছে।[২৮]

> "কোন কোন এলাকায় ১২ ও ১৩ বছরের বালিকাদের শাড়ি খুলে নগ্ন করার পর ধর্ষণ করা হয়েছে। যাতে তারা পালিয়ে যেতে বা আত্মহত্যা করতে না পারে"।[২৯]

## নির্যাতনের বিভিন্ন ধরণের পদ্ধতি

নির্যাতনের জন্য পাকিস্তানি সামরিক কর্মকর্তা ও সাধারণ সৈন্যরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি গ্রহণ করত। যে সম্পর্কে শাহরিয়ার কবির *একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হলো-

১. অশ্লীল ভাষায় গালাগালি, তৎসঙ্গে চামড়া ফেটে রক্ত না বেরুনো পর্যন্ত শারীরিক প্রহার।

২. পায়ের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা, তৎসঙ্গে বেয়নেট দিয়ে খোঁচানো ও রাইফেলের বাট দিয়ে প্রহার।
৩. উলঙ্গ করে ঘন্টার পর ঘন্টা উন্মুক্ত স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখা।
৪. সিগারেটের আগুন দিয়ে সারা শরীরে ছ্যাঁকা দেয়া।
৫. হাত ও পায়ের নখ ও মাথার ভেতর মোটা সূঁচ ঢুকিয়ে দেয়া।
৬. মলদ্বারের ভেতর সিগারেটের আগুনের ছ্যাঁকা দেয়া এবং বরফ খন্ড ঢুকিয়ে দেয়া।
৭. চিমটে দিয়ে হাত ও পায়ের নখ উপড়ে ফেলা।
৮. দড়িতে পা বেঁধে ঝুলিয়ে মাথা গরম পানিতে বার বার ডোবানো।
৯. হাত পা বেঁধে বস্তায় পুরে উত্তপ্ত রোদে ফেলে রাখা।
১০. রক্তাক্ত ক্ষতে লবণ ও মরিচের গুড়া ছড়িয়ে দেয়া।
১১. নগ্ন ক্ষতবিক্ষত শরীর বরফের স্ল্যাবের ওপর ফেলে রাখা।
১২. মলদ্বারে লোহার রড ঢুকিয়ে বৈদ্যুতিক শক দেয়া।
১৩. পানি চাইলে মুখে প্রসাব করে দেয়া।
১৪. অন্ধকার ঘরে দিনের পর দিন চোখের ওপর বড় আলোর বাল্ব জ্বেলে ঘুমাতে না দেয়া।
১৫. শরীরের স্পর্শকাতর অংশে বৈদ্যুতিক শক প্রয়োগ প্রভৃতি। এছাড়া যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রেও ভয়ঙ্কর নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যরা।[৩০]

পাকিস্তানি সৈন্য এবং তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আল শামস, শান্তি কমিটির সদস্যরা বিভিন্নভাবে নারী ও পুরুষদের নির্যাতন করেছেন। তারা নারীদের ধর্ষণ করেছে বিভিন্ন ভাবে। ডা. এম. এ হাসান, *যুদ্ধ ও নারী* গ্রন্থে নারী নির্যাতনের চারটি ধরনের কথা উল্লেখ করেছেন সেগুলো হল-

১. স্পট রেপ অর্থাৎ ২৫ ও ২৬ মার্চ এর গণহত্যার পর পাকিস্তানি বাহিনী বিভিন্ন বাড়ি, নেতা ব্যক্তি, সম্প্রদায়ের বাড়ি গিয়ে পুরুদের নির্যাতন করা ও কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যা ও ধরে নেওয়ার সময় নারীদের উঠিয়ে নিয়ে বা সেই বাড়িতেই ধর্ষণ করেছে।
২. স্পট গণধর্ষণ অর্থাৎ কোন বাড়িতে আক্রমণ করে গণধর্ষণ করেছে।
৩. সেনাঘাঁটি ও ক্যাম্পে বন্দি নারীদের ধর্ষণ।
৪. যৌনদাসী কোন কোন ক্ষেত্রে শহর ও গ্রামের যুবতীদের বন্দি করে ক্যাম্পে অন্ধকারে রেখে দিনের পর দিন অত্যাচার করেছে। কখনও তারা তাদের যৌনদাসী করে এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে নিয়ে গিয়েছে পাকিস্তানি সৈন্যদের সম্ভোগের জন্য।[৩১]

অবশ্য, একদিক থেকে বিচার করলে এই বিভাজনে তেমন কিছু আসে যায় না। অ্যাকাডেমিক আলোচনা ছাড়া স্থানিক বা গনর্ধষণ যাই হোক না কেন অন্তিমে তা ধর্ষণই। আবার স্থানিক ধর্ষণও অনেক সময় পরিণত হয়েছে গণধর্ষণে। গণধর্ষণের পর আবার যৌন দাসত্বে।

স্পট রেপ বা স্থানিক ধর্ষণ মার্চ থেকে শুরু করে পাকিস্তানিদের পরাজয় পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। গ্রামে গ্রামে বাড়িতে বাড়িতে ঢুকে, এমনকি শহরাঞ্চলেও বাড়িতে ঢুকে ধর্ষণ করেছে। অনেক সময় দুই-তিন জন সৈন্য এসে একই নারীকে ধর্ষণ করে চলে গেছে। এ ধরনের ঘটনা বেশি ঘটেছে।[৩২]

এভাবেই ২৫শে মার্চ ১৯৭১ এ পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী বাংলাদেশের মানুষের ওপর অপারেশন সার্চ লাইট দিয়ে শুরু  করে ছিল নারকীয় কার্যক্রম। গণহত্যা ও নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞ ইত্যাদি থেকে ছোট শিশু থেকে বয়োবৃদ্ধ কেউ ছাড় পায়নি। বিশ্বে এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে তা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা ও করেছে। কিন্তু সত্য ঠিকই প্রকাশিত হয়েছে।

## মানবতাবিরোধী অপরাধ

মানবতাবাদের বিরুদ্ধে কৃত সকল কর্মকাণ্ডই মূলত মানবতাবিরোধী অপরাধ এর পর্যায়ে পড়ে। আন্তর্জাতিক অপরাধসমূহ (ট্রাইবুনালস) আইন, ১৯৭৩ অনুযায়ী "বেসামরিক জনসমষ্টির যে কাহারো বিরুদ্ধে কৃত নরহত্যা, উচ্ছেদ, ক্রীতদাসতুল্য জবরদস্তি, ধর্ষণ, বিতাড়ন, কয়েদ, অপহরণ, আটক, শারীরিক নির্যাতন ধর্ষণ কিংবা অপর অমানবিক কার্যসমূহ কিংবা রাজনৈতিক, গোষ্ঠীগত, উপজাতিগত বা ধর্মীয় কারণে শাস্তি প্রদান যেখানে অপরাধ সংঘটন হইয়াছে, তাহা সে স্থানের প্রচলিত আইনবিরুদ্ধ হোক কিংবা না হোক।[৩৩] মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধটি যেন একটি 'Widespread and systematic' সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে সংঘটিত হয়। আর অন্যটি হলো: অপরাধী যখন মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধটি সংঘটন করবে তখন তার যেন ঐ 'Widespread and systematic' সংঘাতের ব্যাপারে জ্ঞান থাকে। এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসররা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার বিপক্ষে অবস্থান নেয় এবং একটি ব্যাপক Widespread এবং systematic সংঘাতের পটভূমিতে যাবতীয় অপরাধ সংঘটন করে।[৩৪] গণহত্যা ও নানা ধরনের যুদ্ধাপরাধসমূহ প্রায় পনেরো রকম মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘঠিত হয়েছিল ১৯৭১-এ বাংলাদেশের মাটিতে।[৩৫]

একাত্তরে বাঙালি জাতিকে চিরতরে নির্মূলের লক্ষ্যে উর্ধতন পাকিস্তানি সমর নায়করা এবং তাদের অধঃস্তন সেনারা মানবতাবিরোধী যে অপরাধগুলো করে তা হলো-

১. ২৫শে মার্চ থেকে শুরু করে  ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকা শহরসহ দেশের সর্বত্র নির্বিচার হত্যা, ধর্ষণ, লুট, ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ ও গণহত্যা সাধন।
২. সামরিক পদক্ষেপ শুরুর পর গ্রামাঞ্চলগুলোতে তথাকথিত দুষ্কৃতকারী দমনের নামে নির্বিচার হত্যা, অগ্নিসংযোগ ও সাধারণের সম্পত্তির ধ্বংস সাধন।
৩. শুধু সামরিক অভিযানের প্রথম দিকেই নয়, একাত্তরের ডিসেম্বরে যুদ্ধেরচূড়ান্ত পর্যায়ে বুদ্ধিজীবী ডাক্তার, প্রকৌশলী প্রভৃতি পেশাজীবীদেরকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা।
৪. ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের অফিসার ও সৈন্যদের এবং ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস ও পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ বাহিনীর সদস্যদের নিরস্ত্র করার সময় বা বিদ্রোহ দমনের অজুহাতে তাদেরকে শঠতামূলকভাবে হত্যা করা এবং তাদেরকে Fair Trial এর সুযোগ না দেয়া।
৫. পাকিস্তানি আর্মি অফিসার ও সৈন্যদের দ্বারা প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য এবং জাতির অহংকারকে ধ্বংস করবার জন্য সাড়ে চার লাখের বেশি বাঙালি নারীকে নির্যাতন ও ধর্ষণ এবং বহু সংখ্যক নারীকে হত্যা করা।
৬. যুদ্ধ চলাকালীন ও যুদ্ধ শেষে অন্তত সাড়ে সাতশ' বাঙালি নারীকে ভোগের জন্য বন্দী করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া এবং বেশ্যালয়ে আটকে রাখা।

৭. নির্দোষ বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানকে সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা এবং ব্যাপক গণহত্যা
৮. অনেক নিরাপরাধ নারী পুরুষকে আইন বহির্ভূতভাবে বন্দী করে নির্যাতন ও গুম করে ফেলা।
৯. সংখ্যালঘু হিন্দুদের পরিকল্পিতভাবে হত্যা, নির্যাতন, জাতিগত নিধন ও শুদ্ধি অভিযান।

উল্লেখিত মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ ও নারী নির্যাতন সংঘটনের কথা এম. এ. হাসান *প্রসঙ্গ ১৯৭১ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৩৬]

কখনও কখনও তারা নিরীহ মানুষদের কাছ থেকে তাদের টাকা পয়সা, গহনা লুট করে, তাদের হত্যা করে। পরে আগুন ধরিয়ে সব কিছু পুড়িয়ে ফেলত। এভাবে শারীরিক, মানসিক ভাবে অত্যাচার করত যা মানবতার বিরুদ্ধে।

### পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গণহত্যায় সহযোগী

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে যোগ দিয়েছিল এদেশীয় কিছু লোক (যারা তথাকথিত বাঙালি মানসিকতার অধিকারী) আর কিছু অবাঙালি । রাজাকার, আলবদর, আল শামস। শান্তিকমিটি ও বিহারীরা বাঙালি বুদ্ধিজীবী, পেশাদার শ্রেণীসহ সর্বস্তরের বাঙালি হত্যা নির্যাতনে, এছাড়া ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে গণহত্যা, তথা ধ্বংসযজ্ঞে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ দলগুলোর মধ্যে ছিল মুসলিম লীগ, জামায়াত, পিডিপি প্রভৃতি। রাজাকার, আলবদর,আলশামস, শান্তি কমিটি নামক সংগঠন ছাড়াও অনিয়মিত মুজাহিদ বাহিনী ও ইষ্ট পাকিস্তান সিভিল এন্ড আর্মড পুলিশ (ইপিকাপ) ও ছিল পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী হিসেবে। এসব দল সংগঠনগুলো সার্বিকভাবে গণহত্যা, নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে সাহায্য করে।

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন 'দালাল' শব্দের উদ্ভব এবং দালাল কারা সে সম্পর্কে *মুক্তিযুদ্ধ কোষ চতুর্থ খণ্ডে* বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন,

> 'রাজাকার', 'দালাল' যোগাসাজশকারী বা 'কোলাবরেটর 'আলবদর' আল-শামস' শব্দগুলোর সঙ্গে ১৯৭১ সালে আগে বাঙালির কোনো পরিচয় ছিল না। দালাল শব্দটির সঙ্গে অবশ্য পরিচয় বাঙালি অনেক দিনের। তবে, ১৯৭১ সালে 'দালাল' বা দালালি' যে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে অর্থ নয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী বিভিন্ন গ্রুপ গঠন, গ্রুপের সদস্যদের মানসিকতার ভিত্তিতে উদ্ভব হয়েছে শব্দগুলোর। ১৯৭১ সালের পরিপ্রেক্ষিতে দালাল কে ? ২৪ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে 'দালাল অধ্যাদেশ' এর মাধ্যমে বাংলাদেশের কোলাবরেটরদের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এভাবে-

১. পাকিস্তান হানাদার বাহিনীকে বাংলাদেশে বেআইনি দখল টিকেয়ে রাখার জন্য সাহায্য করা, সহযোগিতা বা সমর্থন করা।
২. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দখলদার পাকিস্তানিবাহিনীকে বস্তুগত সহযোগিতা প্রদান বা কোনো কথা, চুক্তি ও কার্যাবলীর মাধ্যমে হানাদার বাহিনী সাহায্য করা।
৩. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা যুদ্ধের চেষ্টা করা।

৪. মুক্তিবাহিনীর তৎপরতার বিরুদ্ধে এবং মুক্তিকামী জনগণের কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

৫. পাকিস্তানি বাহিনীর অনুকূলে কোনো বিবৃতি প্রদান বা প্রচারণায় অংশ নেয়া এবং পাকিস্তানি বাহিনীর কোনো প্রতিনিধি, দল বা কমিটির সদস্য হওয়া।[৩৭]

উল্লিখিত সকল গ্রুপই এর আওতায় পড়ে। সে অর্থে রাজাকার, কোলাবরেটর, আল বদর বা পাকিস্তানপন্থী সবাইকেই দালাল বলা হয়।

রাজাকার বাহিনী বা রাজাকারদের সংগঠন করেছিল তৎকালীন পাকিস্তান সরকার। জেনারেল টিক্কা খান ১৯৭১ সালের জুন মাসে রাজাকার অধ্যাদেশ জারি করেছিলেন। পূর্বতন আনসার, মুজাহিদদের নিয়ে প্রাথমিকভাবে এ দল গঠিত হয়। কিন্তু পরে, বিভিন্ন শ্রেণীর পাকিস্তানপন্থীরা এই বাহিনীতে যোগ দেয়। এরা সবাই ছিল সশস্ত্র। হানাদার বাহিনীর দোসর হিসেবেই তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে লড়েছে।

অধ্যাপক মুনাতাসীর মামুন কর্তৃক গৃহীত এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল নিয়াজী বলেছিলেন যে, 'রাজাকার বাহিনীর তিনি স্রষ্টা। তারা যথেষ্ট খেদমত করেছে পাকিস্তানি বাহিনীকে।[৩৮] রাজাকারের শুদ্ধ উচ্চারণ রেজাকার ফরাসি শব্দ। 'রেজা' হল স্বেচ্ছাসেবী, 'কার অর্থ কর্মী'। এককথায় রাজাকার শব্দের অর্থ স্বেচ্ছাসেবী। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় হায়দ্রাবাদের নিজাম অনিচ্ছুক ছিলেন ভারতের সঙ্গে যোগ দিতে। আত্মরক্ষার জন্য তিনি গঠন করেছিলেন একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যার নাম দেওয়া হয়েছিল রেজাকার বাহিনী।[৩৯]

মুক্তিযুদ্ধের সময় জামায়াত নেতা এ. কে.এম.ইউসুফ শব্দটি ধার করেন এবং খুলনায় রেজাকার বাহিনীর সুত্রপাত করেন। *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়* গ্রন্থের তথ্য অনুযায়ী ৯৬ জন জামায়াত কর্মী নিয়ে এই বাহিনীর সূত্রপাত যা পরে পুরো বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

পূর্বোক্তগ্রন্থ অনুযায়ী-"প্রশাসনিকভাবে এই বাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অর্ন্তভুক্ত হলেও তাদেরকেও তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। সেগুলো হল-

**প্রথমত :** যারা 'পাকিস্তান' ও ইসলামকে রক্ষার জন্য বাঙালি হত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিলেন।

**দ্বিতীয়ত :** যারা লুটপাট, প্রতিশোধ গ্রহণ, নারী নির্যাতন করার একটি সুযোগ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং

**তৃতীয়ত :** গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ যারা সীমান্তের ওপারে চলে যেতে ব্যর্থ হয়। এ ধরনের লোককে প্রলুব্ধকরণ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীতে অর্ন্তভুক্ত হয়।[৪০]

রাজাকার বাহিনী যাদের নিয়ে গঠিত হোক না কেন, এই বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করত জামায়াতে ইসলামী। রাজাকারদের বিভিন্ন স্থাপনা পাহারা দেয়া মুক্তিবাহিনীর খোঁজ করা প্রভৃতি কাজে ব্যবহার করা হতো। বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে এরাই ছড়িয়ে পড়েছিল। সে কারণে, বাঙালিদের কাছে রাজাকার শব্দটি বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে।

বিভিন্ন পেশায় বা পদে থেকে এবং রাজনীতিবিদ হিসেবে যারা হানাদারদের সহযোগিতা করেছে সেই সময়, তাদের চিহ্নিত করা হয়েছে 'কোলাবরেটর' হিসেবে। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, সাংবাদিক অনেকেই ছিলেন।[৪১]

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই দালালদের দ্বারা গঠিত হয় শান্তি কমিটি। ২৬ এপ্রিল, ১৯৭১ সালের '*দৈনিক পাকিস্তানে*'র সংবাদ অনুসারে "স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ রাখা ও গুজব রচনাকারীদের দূরভিসন্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্য এই কমিটি গঠিত হয়েছে। এর সদস্য ছিল পাকিস্তান আদর্শের অনুসারী বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, এলিট, যারা অস্ত্রহাতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ করতে যায় নি। অন্যান্যর তুলনায় শান্তি কমিটিরও সদস্যরা ছিল বলা যেতে পারে'নরমপন্থী'। কিন্তু হত্যাকান্ডের পরিকল্পনায় বা অংশগ্রহণে তারা নিষ্ক্রিয় ছিল না অনেক ক্ষেত্রে।[৪২]

আলবদর ছিল ডেথ স্কোয়াড। রাজাকার বাহিনীর পরপরই এটি গঠিত হয়। তবে, রাজাকার অধ্যাদেশের মতো কোন আইনগত বিধান এর ভিত্তি নয়। কিন্তু, পাকিস্তান বাহিনী প্রেরণায় এরা সংগঠিত হয় এবং হানাদার বাহিনীর সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল গভীর। আল-বদর বাহিনীকে অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ হানাদার বাহিনীই যুগিয়েছে। রাওফরমানআলির নোটে আল বদরদের উল্লেখ আছে। অবশ্য, সরকারিভাবে পাকিস্তানি বাহিনী তা অস্বীকার করেছে।

আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন জামায়াত ইসলামের নেতা মতিউর রহমান নিজামী। ৭ নভেম্বর ১৯৭১ সালে তারা 'আল বদর দিবস' পালন করে। ১৪ নভেম্বর ১৯৭১ সালে নিজামী '*দৈনিক সংগ্রাম* এ আলবদর বাহিনী সম্পর্কে লেখেন-

> ..... আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাকিস্তানিসেনার সহযোগিতায় এদেশের ইসলাম প্রিয় তরুণ ছাত্র সমাজ বদর যুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আল বদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিনশত তের। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে তিনশততের জন যুবকের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বদর যোদ্ধাদের সেইসব গুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি, আল বদরের তরুণ মুজাহিদদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ সেই সর্বগুণাবলী আমরা দেখতে পাব।" তিনি আরও বলেন,-"পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে গঠিত আল-বদরের যুবকেরা এবারের বদর, দিবসে নতুন করে শপথ নিয়েছে, তাদের তেজোদ্দীপ্ত কর্মীদের তৎপরতার ফলেই বদর দিবসের কর্মসূচী দেশবাসী তথা দুনিয়ার মুসলমানের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইনশাআল্লাহ বদর যুদ্ধের বাস্তব স্মৃতিও তারা তুলে ধরতে সক্ষম। তরুন যুবকেরা আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দু বাহিনীকে পর্যুদস্ত করে হিন্দুস্থানকে খতম করে যারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।
>
> রাজাকারদের সঙ্গে আল বদরদের খানিকটা তফাত ছিল। রাজাকাররা সামগ্রিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিরোধিতা করেছে, সংঘর্ষ হলে খুন করেছে, লুটপাট ও ধর্ষণ করেছে। অনেকে যুদ্ধকালীন দুরবস্থার কারণে বাধ্য হয়েও রাজাকার হয়েছে, কিন্তু আল বদরদের লক্ষ্য ছিল স্থির। প্রকৃতিতে তারা ছিল অতীব হিংস্র ও নিষ্ঠুর। তারা বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছে। তারা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষ করে, দিতে চেয়েছে। কারণ তারা অনুধাবন করেছিল, যে ধরনের শাসন তারা করতে চায়, বুদ্ধিজীবীরা হয়ে উঠবে তার প্রধান প্রতিবন্ধক। মুক্তিযুদ্ধ তো ছিল একটি আদর্শগত লড়াইও। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল

বাংলাদেশ তত্ত্বে বিশ্বাসী যা পরে প্রতিফলিত হয়েছিল ১৯৭২ সালের সংবিধানে। দালালরা ছিল পাকিস্তান তত্ত্বে বিশ্বাসী।[৪৩]

আল বদর বাহিনীর সংগঠনের সূত্রপাত জামালপুর শহরে। পাকিস্তান বাহিনী ২২ এপ্রিল জামালপুর দখল করে নিলে, জামালপুরের ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি মুহাম্মদ আশরাফ হোসেনের নেতৃত্বে আল-বদর বাহিনী গঠিত হয়। জামালপুর মহকুমায় আল বদর বাহিনী কর্তৃক ৬ জন মুক্তিবাহিনীকে হত্যার মাধ্যমে তাদের 'কৃতিত্ব' প্রকাশিত হয়ে পড়লে জামায়াত ইসলামী নেতৃত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, রাজাকারদের চেয়ে উন্নততর মেধাসম্পন্ন রাজনৈতিক সশস্ত্র ক্যাডার গড়ে, তোলার সুযোগ বর্তমান। .....আগষ্ট মাস হতেই সারাদেশে ইসলামী ছাত্রসংঘকে আল বদরে রূপান্তরিত করা হয় এবং নভেম্বরে শেষ সপ্তাহে ও ডিসেম্বরের প্রথম পক্ষে তাদের বুদ্ধিজীবী হত্যার তালিকা দিয়ে অপহরণ, নির্যাতন ও হত্যার জন্য পাঠান হয়। তাদের মদ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করে ইসলাম ও পাকিস্তান রক্ষার নামে বুদ্ধিজীবী হত্যায় নামান হয়।

২৫শে নভেম্বর ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের কার্যকরী পরিষদ পুর্নগঠিত হয়। আবু সাইয়িদ তার গ্রন্থে লিখেছেন এই পরিষদে বুদ্ধিজীবি হত্যাকারী খুনী আল বদর কমান্ডাররা অর্ন্তভুক্ত হয়। জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মসলিশের শুরার সদস্য সামসুল হকের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিটির সদস্যরা ছিল-

১. মোস্তফা শওকত ইমরাান
২. নূর মোহাম্মদ মল্লিক
৩. এ.কে. মোহাম্মদ আলী
৪. আবু মোঃ জাহাঙ্গীর
৫. আশরাফুজ্জামান
৬. আ.শ.ম. রুহুল কুদ্দুস
৭. সর্দার আব্দুস সালাম।

আলবদদের কার্যকলাপ ছিল নিষ্ঠুরতায় পূর্ণ। এভাবে বাংলাদেশ আদর্শের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, তাদের সৃষ্ট বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজ শুরু করে ।

বাকি রইল আল-শামস। এরা আল-বদর ধরনেরই আরেকটি স্কোয়াড। হত্যাই ছিল যাদের মূল লক্ষ্য।[৪৪]

এছাড়াও পাকিস্তানি বাহিনী এ সময় আরও কিছু সংগঠন গড়ে তোলে নিজেদের সহযোগীতার জন্য। যেমন- অনিয়মিত মুজাহিদ বাহিনী ও ইস্ট পকিস্তান সিভিল এন্ড আর্মড পুলিশ (ইপিকাপ)। সেনা বাহিনী তাদের ভাষায় এই দলগুলোকে দেশপ্রেমিক বলে চিহ্নিত করে এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে সামরিক অপারেশনে সহযোগিতার জন্য আল-বদর (জামায়াতে ইসলামীর সশস্ত্র বাহিনী), আল-শামস (মুসলিম লীগের সশস্ত্র বাহিনী) এর মতো সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী গঠনের জন্য উৎসাহিত করে যেসব বিহারী যুবকের পিতামাতা বা পরিবারের সদস্যরা ২৫ মার্চে আগে বা পরে যারা (বাঙালি ও বিহারী দাঙ্গায়) গিয়েছিল, তাদের নেওয়া হয় ইপিকাপ ও মুজাহিদ বাহিনীতে। এই বিহারী সম্প্রদায় নিজ নিজ এলাকায় সামরিক প্রশাসনের ছত্রছায়ায় বাঙালির মিছিল সভা ও স্বাধীনতাকামীদের ওপর আক্রমণ চালায়। এসব বাহিনী ও গোষ্ঠী বাঙালি নির্যাতন ও নিধনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হতে রাজাকার বাহিনীর মাধ্যমে।

## গণহত্যার ধরণ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় সারা দেশে হত্যার কোনো নির্দিষ্ট ধরন ছিল না। পাকিস্তানিরা প্রথমে ট্যাঙ্ক ও মর্টারের গোলাবর্ষণকরে এবং মেশিনগানের গুলিতে হত্যা করেছে এক একটি জনপদের বিশাল জনগোষ্ঠীকে। বাড়ি থেকে ধরে এনে লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলিকরে হত্যা করা হয়েছে। বাড়ি বাড়ি হানা দিয়ে গুলি করে বা বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয়েছে। গায়ে আগুন ধরিয়ে দিয়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে। জ্যান্ত কবর দেয়ার বহু ঘটনাও ঘটেছে। কখনও পশুর মতো জবাই করে হত্যা করা হয়েছে। কখনও শারীরিক নির্যাতন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করে হত্যা করা হয়েছে। শেষোক্ত পদ্ধতি তারা সাধারণত অনুসরণ করত মুক্তিযোদ্ধাদের ক্ষেত্রে। মুক্তিযোদ্ধাদের জিপের পেছনে বেঁধে প্রচণ্ড বেগে জিপ চালিয়ে সারা শহর টেনে হিচঁড়ে হত্যা করাও বহু ঘটনা রয়েছে।

শাহরিয়ার কবির *একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার* গ্রন্থে ক্যাপ্টেন সুজাউদ্দিন আহমেদের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বলেন-

> মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে সন্দেহকারীদের গায়ে গ্রেনেড বেঁধে পিন খুলে তাদের পালাতে বলত পাকিস্তানিরা। হতভাগ্য দৌড়াতে গিয়ে কয়েক সেকেন্ডের ভেতর গ্রেনেড বিষ্ফোরণে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেত। পাকিস্তানিরা এই দৃশ্য দেখে উল্লাস প্রকাশ করত।

যাদের গুলি করে বা গ্রেনেড বিষ্ফোরণের মাধ্যমে হত্যা করা হত তারা সরে বেঁড়ে যেত। পাকিস্তানি বাহিনী যেসব পদ্ধতি অনুসরণ করত তা মধ্যে সবচেয়ে নৃশংস ছিল নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করা। বাঙালিদের হত্যার জন্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নির্যাতনের এমন ভয়ঙ্কর সব পদ্ধতি অনুসরণ কত যা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নয়।[৪৫]

## গণহত্যা, নির্যাতন ও মানবতাবিরোধী অপরাধের প্রেক্ষিতে বিচারকার্য

মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের এদেশীয় দোসরা সমগ্র বাংলাদেশে গণহত্যা, নির্যাতন তথা মানবতার বিরুদ্ধে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল তার প্রেক্ষিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিল স্বাধীন বাংলাদেশে গঠিত প্রথম সরকার। ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে প্রাথমিক ভাবে "বুদ্ধিজীবী" হত্যা তদন্ত কমিশন গঠিত হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ মন্ত্রীসভার বৈঠকের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে এটি গঠিত হয়েছিল। কমিশনের কাজ হল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তার সহযোগীরা যে ক্ষয়ক্ষতি গঠন করেছে তার অনুসন্ধান চালানো। এক্ষেত্রে এ কমিশনকে লিখিত ও মৌখিক উপায়ে রিপোর্ট পেশ করার কথা বলা হয়েছিল। স্বাধীনতার ওই সব দালালদের বিচার শুরু  হয়েছিল।[৪৬]

১৯৭২, ২৪ জানুয়ারি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এদেশীয় সহযোগীদের বিচারের জন্য দালাল আইন প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে দালাল আইন সংশোধন করা হলেও মুক্তিযুদ্ধের সময় গণহত্যায় নেতৃত্বদানকারী অনেকে ছাড়া পেয়ে যান। এই আইনে বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে অপরাধের বিচার ও অপরাধীকে শাস্তি প্রদানের কথা বলা হয়। দেশের অভ্যন্তরে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিরোধকে কেন্দ্র করে কতিপয় মুক্তিযোদ্ধাদের নামে ১৬ই ডিসেম্বর রাতারাতি গড়ে ওঠা 'ষোড়শবাহিনী' দেশীয় শত্রুদের বিরুদ্ধে

তাদের শক্তি, ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করেছিল। প্রতিনিয়ত প্রধানমন্ত্রির দপ্তরে এ ধরণের সংবাদ জমা হতে থাকলে বঙ্গবন্ধু সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিলেও বিচার কার্য তেমন গতি লাভ করেনি।[৪৭]

১৯৭৩ সালের ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে ৩৭,৪৭১ জন দালালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এতসব আইনগত বিধান ছাড়াও ক্ষমতা দেয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত মাত্র ৭৫২ ব্যক্তি দন্ডিত হয়। অবশিষ্ট ২০৯৬ ব্যক্তি খালাস পান। যদিও সরকার আইনগত ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ৭৩টি বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করেছিলেন।

তবুও ২২ মাসে ২৮৪৮টি মামলা বিচার কার্য সম্পন্ন হলে মাসে ১৩০টির এবং দিনে ৩-৪টির বেশি বিচার কার্য নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়নি।[৪৮]

১৯৭৫ সালে দালাল আইন বাতিল হয়ে যাওয়ায় যাদের বিরুদ্ধে রায় হয়েছিল তারাও মুক্তি পেয়ে যায়। বুদ্ধিজীবি হত্যাকান্ডের জন্য দায়ের হওয়া প্রায় একশটি মামলাসহ গোটা বিচার প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে ১৯৯২ এর জানুয়ারিতে শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে গঠিত হয় ‘একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি’। ফেব্রুয়ারিতে একই উদ্দেশ্যে তারই নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সকল রাজনৈতিক দল ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় ‘জাতীয় সমন্বয় কমিটি।’ এভাবে গড়ে উঠে গণআন্দোলন। এরপর গণহত্যার শিকার ও ভুক্তভোগীরা ফৌজদারী আইনে মামলা করলেও তা কোন ফলপ্রসূ রূপ লাভ করতে পারেনি।

২০০৮ সালের নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতত্বে মহাজোট সরকার তাদের নির্বাচনী প্রচারণায় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার অর্ন্তভুক্ত করে। এই বিচার দ্রুত আরম্ভ করার জন্য ২৯ জানুয়ারি (০৯) জাতীয় সংসদে সর্বসম্মত প্রস্তাবও পাশ হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ২০১০ সালের ২৫ মার্চ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল গঠন করে এবং এর মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার শুরু হয়।

২০১২ সালের ২২শে মার্চ গঠিত হয় আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল ২। মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় প্রথম রায় আসে ২০১৩ সালের ২১শে জানুয়ারী। ২০১৩ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি মানবতাবিরোধী অপরাধী কাদের মোল্লাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই রায় স্বাধীনতাকামী সচেতন নাগরিকগোষ্ঠী মেনে নিতে পারেনি। ফলে রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্র শাহবাগ মোড়ে সম্মিলিতভাবে যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার রায়ের পুনঃবিবেচনা এবং যথোপযুক্ত শাস্তি দাবি করে। এ আন্দোলনই গণজাগরণ মঞ্চ তৈরির মূল ভিত্তি। পরবর্তীকালে শাহবাগ মোড়ের নামকরণ করা হয় প্রজন্ম চত্বর। গণজাগরণ মঞ্চের মাধ্যমে স্বাধীনতার চেতনার নবজাগরণের ধারা প্রবহমান হয়ে ওঠে।[৪৯] সম্প্রতি একাধিক যুদ্ধাপরাধীর মামলার রায় হয়েছে ও কয়েকটি মামলার রায় কার্যকর হয়েছে। অপরদিকে পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার কথা ছিল পাকিস্তান সরকারের কিন্তু পাকিস্তান সরকার তা করেনি। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল গঠিত হওয়ার পর বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড পুনরায় আলোচনায় আসে, যা মধ্যবর্তী সময়ে কোন বিচারের আশা দেখেনি। গণহত্যা, নির্যাতন তথা মানবতাবিরোধী অপরাধের সঙ্গে যুক্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের মাধ্যমে শুরু হয় বিচার প্রক্রিয়া।

মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠন, বিচার এবং রায় কার্যকরের মধ্যে দিয়ে মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচার আন্দোলন সফলতা লাভ করে। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এখনও শেষ হয়নি। অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ও বাঙালি জাতি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সত্যিকারের সফলতা আসবে এবং মানবতাবিরোধী অপরাধীদের বিচারের জন্য যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা সফল পরিসমাপ্তি ঘটবে।[৫০]

গণহত্যা ও নির্যাতনের পর পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের এদেশীয় দোসররা নিহতের লাশগুলো কখনও একসাথে কবর দিত, কখনও বা এগুলো রাস্তায় পড়ে থাকত এবং শেয়াল, কুকুর, শকুন তা ছিড়ে খেত। আর তাই রাস্তার বিভিন্ন স্থানে পড়ে থাকতে দেখা যায় অর্ধ লাশ, কোনটার ক্ষেত্রে হাড়গুলো পড়ে আছে। স্বাধীনতার পর বহু স্থানে মাটি খুঁড়ে হাড় হাওয়া গিয়েছে। বহু বধ্যভূমি ও গণকবর আজও পড়ে রয়েছে। কোন কোন গণকবর এর চিহ্নও আজ খুঁজে পাওয়া যায় না। সেখানে বাড়িঘর গড়ে উঠেছে। কোনটি পরিণত হয়েছে জঙ্গলে।

যুদ্ধকালীন বিভিন্ন চিত্রে দেখা যায়, নদীর পানিতে লাশ ভেসে আছে। যেক্ষেত্রে একসাথে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হত, সেখানে হয়ত পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী ও তাদের দোসররা চলে গেলে স্থানীয়রাই কবরস্থ করত। বহু আহত মানুষ বেয়োনেট এর আঘাতে সারা জীবন কষ্টে জীবন ধারণ করছে। কেউ বা সে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে মারা গিয়েছে। কখনও জীবন্ত মানুষকে কবর দেয়া হয়েছে, কখনও বা ব্রাশফায়ার করার পর তারা বেঁচে আছে কিনা নিশ্চিত করেছে, কাউকে একটু নড়তে দেখলে পুনরায় তাকে গুলি করা হয়েছে।

গণহত্যা ও নির্যাতনের নিদর্শনস্বরূপ অনেক গণকবর ও বধ্যভূমি রয়েছে। পাকিস্তানি বাহিনী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিরীহ ও সাধারণ মানুষদের ধরে নিয়ে এসে যে জায়গায় হত্যা করত তা বধ্যভূমি হিসেবে পরিচিত। এগুলো মূলত পাকিস্তানি ক্যাম্পগুলোর আশে পাশে হত। ক্যাম্পে ধরে এনে নির্যাতন করে বধ্যভূমিতে এনে হত্যা করা হত এবং লাশ গুলো সেখনেই পড়ে থাকত যা শিয়াল কুকুর, শকুন প্রভৃতি ছিড়ে খেত।

গণকবর হল যেখানে একই কবরে, এক সাথে অনেককে কবর দেয়া হত। বধ্যভূমিতে পড়ে থাকা লাশ গুলো স্থানীয়দের দ্বারা মাটি চাপা দেওয়া হত একসাথে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যার আগে যাদের হত্যা করা হবে তাদের দিয়ে গর্ত খুড়ে পরে তাদের হত্যা করে সেই গর্তে কবর দেওয়া হত।[৫১] ১৯৭১ সালে পুরো বাংলাদেশের বেশিরভাগ রাস্তায়ই তখন পড়েছিল মৃতদেহ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যা করেছিল এদেশীয় প্রায় ৩০ লক্ষবাঙালিকে। গণকবর ও বধ্যভূমির সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক বিভিন্ন বই পত্র থেকে তথ্য নিয়ে যে তালিকা প্রস্তুত হয়েছে তাও সম্পূর্ণ নয়। অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ কোষ* দ্বিতীয় খণ্ডে গণকবর ও বধ্যভূমি সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। তবে এই খণ্ডে ৯০৫টি গণহত্যা, গণকবর, বধ্যভূমি ও নির্যাতনের তালিকা দেয়া হয়েছে। যদিও এটি এ পর্যন্ত প্রকাশিত সংগ্রহের মধ্যে অনেক অনেক ব্যাপক, তবু এতে সম্পূর্ণ তথ্য নেই। যদিও এ গ্রন্থটি অনেক তথ্য সমৃদ্ধ হয়েছে।

উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায় ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা যে নির্মম গণহত্যা, নির্যাতন চালিয়েছিল বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করতে, তা তাদের পৈশাচিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক। নির্যাতনের মধ্যে নারীধর্ষণ ছিল সবচেয়ে নিষ্ঠুর। গণহত্যার সাক্ষী গণকবর ও বধ্যভূমি যেমন রয়েছে, নির্যাতিত, অত্যাচারিত হওয়া বহু আহত মানুষ যারা শারীরিক যন্ত্রণা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করছেন, তেমনি রয়েছে ধর্ষিত বহু নারী তথা বীরাঙ্গনা যাদের বয়ে চলতে হচ্ছে দুঃসহ জীবন। তাদের অনেকেরই স্বামী পরিবার বঞ্চিত হয়ে শারীরিক, মানসিক বেদনাময় জীবন অতিবাহিত করছেন। অনেকে স্বামী সন্তান, ভিটে মাটি, মান সম্ভ্রম হারিয়ে লাঞ্ছিত জীবন নিয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থেকে চলে গিয়েছেন না ফেরার দেশে।

গণকবর ও বধ্যভূমি গুলো সংরক্ষণের প্রয়াস খুব কম থাকায় অনেক স্থান ক্ষমতাবানদের হাতে চলে যাচ্ছে, সেখানে গড়ে উঠছে স্থাপনা। অনেক স্থান দখল হয়ে যাওয়ায় জানা বা বোঝার উপর নেই যে সেখানে কোন বধ্যভূমি বা গণকবর ছিল। আবার কোনটি এত ঝোপ জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে যে সেখানে কোন গণকবর আছে তা বোঝার উপায় নেই।

তথ্য নির্দেশ

[১] শাহরিয়ার কবির, *শহীদ স্মারক বক্তৃতা-১*, *বাংলাদেশের গণহত্যা*, *আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বিচার*, ১৯৭১ গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৩

[২] ফজলুর রহমান, *বাংলাদেশের গণহত্যা*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১১

[৩] মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ (*দ্বিতীয় খণ্ড), সময়, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ১২৫-১২৬

[৪] শাহরিয়ার কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

[৫] মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

[৬] ফজলুর রহমান, বাংলাদেশে গণহত্যা, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১১

[৭] আহমেদ শরীফ, *নীলফামারী ১৯৭১*, *গণহত্যা ও নির্যাতন*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৪

[৮] শাহরিয়ার কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-১০

[৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯

[১০] আহমেদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[১১] শাহরিয়ার কবির, *একাত্তরের গণহত্যা*, *নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, সময়, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১১

[১২] শাহরিয়ার কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২

[১৩] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, *দলিলপত্রঃ অষ্টম খণ্ড*, হাক্কানী পাবলিশার্স, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪, পৃ. ৫২২-৫২৩

[১৪] আহমেদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬

[১৫] হাসান হাফিজুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২৪-৫২৫

[১৬] অ্যান্থনী মাসকারেণহাস, *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ*, পপুলার পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ. ১২৩

[১৭] অ্যান্থনী মাসকারেণ হাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬

[১৮] আহমেদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[১৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯

[২০] মুনতাসীর মামুন, *বীরঙ্গনা ১৯৭১*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৬

[২১] আতাফুল হাই *শিবলী* (সম্পাদিত), *স্থানীয় ইতিহাস সংখ্যা* ৭, রাজশাহী, ২০১২, পৃ. ৪৮

[২২] হাসিনা আহমেদ, *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ(চতুর্থ খণ্ড)*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ৩৩-১১৮

[২৩] মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

[২৪] শাহরিয়ার কবির, *একাত্তরের গণহত্যা*, *নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭

[২৫] মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[২৬] শাহরিয়ার কবির, *বাংলাদেশের গণহত্যা*, *আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

[২৭] মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[২৮] শাহরিয়ার কবির, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

[৩০] শাহরিয়ার কবির, *একাত্তরের গণহত্যা*, *নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৫

[৩১] এম এ হাসান, *যুদ্ধ ও নারী*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ২১-২৭

[৩২] মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৩৩] মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী,*আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন*, *১৯৭৩ সহজপাঠ*, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ঢাকা, ২৭ মে ২০০৯, পৃ. ৪৩-৪৪

[৩৪] মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৪

[৩৫] এম এ হাসান, *প্রসঙ্গ ১৯৭১ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ২২

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮

[৩৭] মুনতাসীর মামুন, *রাজাকারের মন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৯

[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫

[৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

[৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১১-১৬

[৪৫] শাহরিয়ার কবির, *একাত্তরের গণহত্যা*, *নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৪৬] আহমেদ শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০

[৪৭] তপন পালিত, *মানবতাবিরোধী অপরাধ*, *বিচার আন্দোলন ১৯৭১-২০১৩*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫১-৫৩

[৪৮] মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ (চতুর্থ খণ্ড)*, সময়, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৫৪২

[৪৯] তপন পালিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২২-৪২৪

[৫০] প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩

[৫১] প্রাগুক্ত, *মুক্তিযুদ্ধ কোষ-দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ১০

# তৃতীয় অধ্যায়

## নাটোর সদর উপজেলা

মুক্তিযুদ্ধের সময় নাটোর সদর উপজেলায় যে ব্যাপক প্রাণহানি, ধ্বংসযজ্ঞ ও ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা নাটোর জেলার অন্য কোনো উপজেলায় হয়নি। এপ্রিল মাস থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধকালীন পুরো সময় এ অঞ্চলে চলে ব্যাপক গণহত্যা, নির্যাতন। এছাড়াও লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে যুক্ত হয়েছিল অবাঙালি বিহারী সম্প্রদায়। এ দু'য়ের অত্যাচার, নির্যাতনে নাটোর সদর উপজেলার মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল দুর্বিষহ।

নাটোর সদর উপজেলায় বাঙালিদের পাশাপাশি বিহারী, মাড়োয়ারী প্রভৃতি বিভিন্ন অধিবাসীর বাস ছিল বহু আগে থেকেই। এই বিহারী সম্প্রদায়ের মানুষজন মূলত মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্ব থেকে নাটোরবাসীর সাথে নানা ঝামেলা সৃষ্টির শুরু করে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে এরাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অন্যতম প্রধান সহযোগী হিসেবে গণহত্যা, নির্যাতন সহ বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক ও মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডে যুক্ত হয়।

**অবস্থান:**

২৪°১৯ থেকে ২৪°৩৫ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫১ থেকে ৮৯°০৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অংশে নারদ নদের উত্তর তীরে অবস্থিত শহরের নাম নাটোর। প্রাচীন ঐতিহ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যমন্ডিত নাটোর। এই নাটোরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে নাটোর সদর উপজেলা। নাটোর সদর উপজেলার উত্তরে আত্রাই ও বাগমারা উপজেলা, পূর্বে সিংড়া ও গুরুদাসপুর উপজেলা, দক্ষিণে বড়াইগ্রাম ও বাগাতিপাড়া উপজেলা এবং পশ্চিমে পুঠিয়া। এ উপজেলার আয়তন ৪০১.২৯ বর্গ কি.মি.। জনসংখ্যা প্রায় ৪০০০৩০ জন (২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)।[১] পাকিস্তান আমলে ১৯৬৪ সালে শেষ আদমশুমারি হয়। সেক্ষেত্রে ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি থেকে জানা যায়, নাটোর সদর উপজেলার ইউনিয়ন ছিল ১২টি,[২] তবে ২০০০ সালে নলডাঙ্গার অধীনে কয়েকটি ইউনিয়ন অর্ন্তভূক্ত হওয়ায় বর্তমানে ৭টি রয়েছে। পৌরসভা একটি এবং গ্রাম - ২৯৩টি, মৌজা রয়েছে - ২৬৩টি। নাটোর সদর থানার ইউনিয়ন সমূহ হল - ছাতনী, তেবাড়িয়া, দিঘাপতিয়া, লক্ষ্মীপুর খোলাবাড়িয়া, বড় হরিশপুর, কাফুরিয়া, হালসা।[৩]

১৭১০ সনে রাজা রাম জীবন রায় মোঘল আমলের কিছুকাল এখানে রাজত্ব করেন। তারপর বিভিন্ন জন এ এলাকায় রাজত্ব করেন। ১৮২১ কি.পর্যন্ত নাটোরে রাজশাহী জেলার সদর কার্যালয় স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে সদর কার্যালয় রাজশাহী চলে যায়। ১৯৮৪ সালে নাটোর জেলা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন থেকেই নাটোর সদর উপজেলার সৃষ্টি। মহারানী ভবানীর স্মৃতি বিজড়িত নাটোর সদর উপজেলা অন্যতম ঐতিহ্য হল এখানকার নাটোর রাজবাড়ী, উত্তরা গণভবন, কাঁচাগোল্লা নামক মিষ্টান্ন প্রভৃতি। মুক্তিযুদ্ধের সময় নাটোর সদর উপজেলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলাহ কলেজ, নাটোর কালিবাড়ী, রাজবাড়ী, গণভবন প্রভৃতি স্থান পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের ক্যাম্প হিসেবে ব্যবহার করতো। এ উপজেলায় রয়েছে নারদ ও বারনই নদী। প্রায় সবধরনের খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়। প্রচুর আখ উৎপন্ন হয়। এ উপজেলার ১০টি ইউনিয়নে ক্ষুদ্র নৃ গোষ্ঠীর বসবাস রয়েছে। যেমন- পাহান, উরাও, তেলী, সাঁওতাল, ভূঁইয়া, বাগতী, চৌহান প্রভৃতি।[৪]

নাটোর সদরে যেসব ইউনিয়ন, গ্রাম ও এলাকাতে গণহত্যা ও নির্যাতন অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর বর্ণনা উল্লেখ করা হল-

**ছাতনী ইউনিয়ন :**

নাটোর সদর উপজেলার অন্যতম স্থান ছাতনী। ১৯৭১ সালে নাটোর জেলার সবচেয়ে ভূক্তভোগী ও ক্ষতিগ্রস্থ এই ছাতনী ইউনিয়ন। এ ইউনিয়ন নাটোর শহর থেকে মাত্র ৫ কি.মি. পশ্চিমে। এই ইউনিয়নে নাটোর সদর আসনে সত্তরের নির্বাচনে বিজয়ী শঙ্করগোবিন্দ চৌধুরীর বাড়ি ছিল। জমিদারী আমলে নাটোর শহরে তাদের বাড়ি নির্মিত হলেও তাদের পিতৃপুরুষের বাড়ি ছিল ছাতনী। জানা যায়, ১৯০০ সালের পরপরই ছাতনী ইউনিয়নের ছাতনী গ্রামের প্রভাবশালী হিন্দু ব্যক্তির উদ্যোগে ছাতনী গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপন করা হয়। সেই সময়ে ছাতনী গ্রামে বিভিন্ন রাজার উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তাদেরই প্রচেষ্টার ইউনিয়ন বোর্ডটি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৩৫ বা ১৯৪০ সালের মধ্যে ইউনিয়ন বোর্ডটি ছাতনী ইউনিয়নের ৬নং ওয়ার্ডের পন্ডিতগ্রামে স্থানান্তরিত হয়। ২০০৬ সাল থেকে কার্যক্রম ইউনিয়ন কমপ্লেক্স-এ পরিচালিত হচ্ছে।[৫]

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী, ছাতনী ইউনিয়নের আয়তন ৮৭৪১ একর। ওয়ার্ড- ৯টি, গ্রাম -৩৭টি। জনসংখ্যা ৩৩০৬৫ জন। এই ইউনিয়নের উত্তরে ৫নং বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়ন এবং দক্ষিণে ২নং তেবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ। এ অঞ্চলে পুঁথি পাঠ, পালাগান, বিয়ের গান, শাড়ি গান প্রভৃতি ঐতিহ্য বিদ্যমান।[৬]

**ছাতনী গ্রাম :**

বর্তমানে ছাতনী গ্রামের লোকসংখ্যা ২৬৭৯ জন। এ গ্রামের পাকিস্তানি দিয়ে বড়াই নদীর একটি অংশ বয়ে গেছে। এ গ্রামটি ১নং ছাতনী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড এ অবস্থিত। ছাতনী গ্রাম মূলত নাটোর আওয়ামীলীগের অন্যতম ব্যক্তিত্ব শঙ্করগোবিন্দ চৌধুরীর পিতৃপুরুষের স্থান বলেই অধিক পরিচিত। তবে পূর্ব থেকেই ছাতনী গ্রামের হাঁড়ি, কলসী, সরা বিশেষ উল্লোখযোগ্য ছিল। এ গ্রামটি নাটোর সদর উপজেলা থেকে প্রায় ১০ কি.মি. দূরত্বে অবস্থিত। এটি ছাতনী ইউনিয়নের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। এ গ্রামের স্লুইচ গেইট নামক স্থানটিতে ১৯৭১ সালে এ গ্রামসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রাম থেকে বহু লোককে নিয়ে এসে নির্বিচারে হত্যা করা হয়। এসময় নির্যাতিত হয় অসংখ্য নারী। বর্তমানে ছাতনী গণকবরে নির্মিত হয়েছে শহীদ মিনার। শহীদদের পরিবার আজও সেই দুঃসহ স্মৃতি মনে করে শিউরে উঠে।[৭]

**ভাবনী গ্রাম :**

ছাতনী গ্রামের স্লুইচ গেইটের নিকটবর্তী একটি গ্রাম ভাবনী। এ গ্রামটি ছাতনী ইউনিয়নের অর্ন্তগত। ১৯৭১ সালে এ গ্রামটিতে খুব বেশি পরিবার ছিল না। বাড়িঘর ছিল টিন, মাটি, কাঠ, বাঁশ ইত্যাদি দ্বারা নির্মিত। বর্তমানেও বেশির ভাগ ঘর-বাড়ি এরকমই। গ্রামের অধিকাংশই কৃষিজীবী। এ গ্রামটির বর্তমান লোকসংখ্যা ৮৪৮জন। এ গ্রামটি থেকে অনেক মানুষকে ধরে নিয়ে ছাতনী স্লুইচ গেইটে হত্যা করা হয়। মুক্তিযুদ্ধের সময়। নির্যাতিত হয় বহু নারী।[৮]

**দিঘাপতিয়া ইউনিয়ন :**

নাটোর সদর থেকে প্রায় ১১ কি.মি. দূরে অবস্থিত এ ইউনিয়নটি। এটি পূর্বে হাতিয়ান্দহ ইউনিয়ন, পশ্চিমে ছাতনী ইউনিয়ন, উত্তরে পিপরুল ইউনিয়ন ও দক্ষিণে বড় হরিশপুর ইউনিয়ন দ্বারা বেষ্টিত।[৯] ২০০১ সালের আদমশুমারি থেকে জানা যায়, এ ইউনিয়নের আয়তন প্রায় ৮২৩১ একর। এ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত

রয়েছে ২৬টি গ্রাম। এ ইউনিয়নের জনসংখ্যা প্রায় ৪১০০০ জন।[১০] ১৯৭৪ সালের প্রথম আদমশুমারি থেকে জানা যায়, এ ইউনিয়নের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১৬৬০৬ জন।[১১] এ ইউনিয়নের অর্ন্তভুক্ত ১টি নদী রয়েছে। নদীটির নাম নারদ নদী। নদীটি দিঘাপতিয়া ইউনিয়নের ধরাইল গ্রামের পাকিস্তানি দিয়ে বয়ে চলেছে। নাটোর শহর থেকে ৩ কি.মি. উত্তরে এক মনোরম পরিবেশে ইতিহাসখ্যাত দিঘাপতিয়া রাজবাড়ী তথা উত্তরা গণভবন অবস্থিত যেটি এ ইউনিয়নের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। নাটোরের রানী ভবানী তাঁর নায়েব দয়ারামের উপরে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁতে দিঘাপাতিয়া পরগনা উপহার দেন। ১৯৬৬ সালে এটি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সরকারি ভবন হিসেবে সংস্কার করা হয়। এ অঞ্চলটিতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনীরা ক্যাম্প করেছিল।[১২] যেখানে বহু নর-নারীকে ধরে এনে অত্যাচার করা হত। এই ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত রয়েছে দিঘাপাতিয়া গ্রাম, ভাতুরিয়া, ফুলবাগান প্রভৃতি গ্রাম। এ ইউনিয়নের একটি নদী নারদ যা ধরাইল গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবহমান।

**ফুলবাগান :**

এটি দিঘাপাতিয়া ইউনিয়নের অর্ন্তগত একটি এলাকা। নাটোর-তাহিরপুর সড়কের পাশে এ এলাকাটি একটি নিচু এলাকা। ফলে বর্ষাকালে পানি জমে থাকতো। বর্তমানে এখানে খুব বেশি ঘরবাড়ি নেই। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এ এলাকায় বহু লোককে এনে নির্যাতন ও হত্যা করা হয়। মোঃ মোসলেম উদ্দিন নামক বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন সিপাহির বর্ণিত একটি লেখায় জানা যায়। প্রায় ১৫-১৬ হাজার লোককে পাকিস্তানি বাহিনীরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে।[১৩] ফুলবাগানের মধ্যস্থ একটি পুকুর আছে যেটি বর্তমান নাটোর উপজেলা পরিষদের বিপরীতে অবস্থিত। এখানে ক্যাম্প করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী। তাই বিভিন্ন স্থান থেকে নারী-পুরুষ ধরে আনত। অনেক পুরুষকে দিয়ে তারা উপজেলা পরিষদের ভেতরে মসজিদ নির্মাণ করিয়ে তাদের পরে হত্যা করে ফেলে দিয়েছিল এই পুকুরে।

**দিঘাপতিয়া গ্রাম :**

বর্তমান উত্তরা গণভবন অবস্থিত এখানে। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ স্থানে ক্যাম্প করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী।[১৪] প্রায় প্রতিদিন বহু নারী-পুরুষকে ধরে এনে নির্যাতন করত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী।

**বড় হরিশপুর ইউনিয়ন :**

১৯৪১ সালে এই ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপিত হয়। জেলা সদর হতে দূরত্ব ৫ কি.মি.দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। উপজেলা সদর হতে ৫ কি.মি. দক্ষিণ পূর্বে এ অবস্থিত।[১৫] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি থেকে জানা যায়, এ ইউনিয়নের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ২০৯৮২ জন।[১৬] বর্তমানে এ ইউনিয়নের আয়তন ৮২৩৪ একর ও জনসংখ্যা ৩১১৮৫ জন। বর্তমানে গ্রামের সংখ্যা ৩৮টি (২০০১ সালের আদমশুমারি)।[১৭] নারদ নদীর উৎপত্তিস্থল রাজশাহী জেলার মহানন্দা নদী হতে প্রবাহিত হয়েছে এ ইউনিয়নের পাশ দিয়ে। খাল রয়েছে বেশকটি। যেমন- ফতেঙ্গাপাড়া খাল, মোকরামপুর খাল, রামপুর খাল, জাঠিয়াল খাল, দিয়ারভিটা, রহিমকুড়ি, কামারদিয়ার এবং শংকরভাগ খাল।[১৮]

**ফতেঙ্গাপাড়া :**

এটি বড় হরিশপুর ইউনিয়নের একটি গ্রাম। দত্তপাড়া নাটোর সদর থানা থেকে প্রায় ১৫ কি.মি. দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত। এখান থেকে নাটোর ঢাকাগামী রোডের ডানদিকের রাস্তা ধরে প্রায় অর্ধেক কি.মি. দূরে অবস্থিত রয়েছে ফতেঙ্গাপাড়া গ্রাম। এই গ্রামে ১৯৭১ সালে এত ঘরবাড়ি ছিল না যা বর্তমানে রয়েছে। মাত্র

কয়েকটি পরিবার ছিল এখানে। আর চারদিকে জঙ্গল, মাঠ আর খালবিল। ফতেঙ্গাপাড়া খালে ১৯৭১ সালে বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা প্রচুর মানুষকে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এ গ্রামের আয়তন ছিল ২৭২ একর ও জনসংখ্যা ছিল ৫৪৮ জন।[১৯] বর্তমানে জনসংখ্যা ১২৪৮ জন(২০০১ সালের আদমশুমারি)।[২০]

**নাটোর পৌরসভা :**

এটি ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। আয়তন ১৪.৮০ বর্গ কি.মি.। ওয়ার্ড সংখ্যা ৯টি, মৌজা ১১টি, মহল্লার সংখ্যা ৩৩টি। জনসংখ্যা ৮৬৫৬৬ জন (২০১১ সালের আদমশুমারী)।[২১] এই পৌরসভার কয়েকটি উল্লোখযোগ্য ওয়ার্ড এর মহল্লার বর্ণনা দেয়া হল ঃ

**চৌকিরপাড় :**

নাটোর পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড এ অবস্থিত এটি। ১৯৭৪ সালে এটি ২নং ওয়ার্ড এ ছিল।[২২] প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্যমন্ডিত এ স্থানটি। রানী ভবানীর রাজবাড়ির নিকটবর্তী এ এলাকাটি দিঘি দিয়ে ঘেরা। দিঘির শান্ত নিবিড় প্রকৃতি এ এলাকাটিকেও যেন দিয়েছে প্রশান্তি। এ মহল্লার ২টি দিক অর্থাৎ উত্তর চৌকিরপাড় ও দক্ষিণ চৌকিরপাড়। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী উত্তর চৌকির পাড়ের জনসংখ্যা ছিল ৮২৬ ও দক্ষিণ চৌকিরপাড়ের জনসংখ্যা ৭৮৪ জন।[২৩] এ মহল্লার দিঘিগুলো বর্ষাকালে পানিতে ভরে উঠে। অন্য সময়গুলো স্বাভাবিক পানি থাকে যা জনসাধারণের কাজে সাহায্য করে। রাস্তাগুলো অনেক ক্ষেত্রে চলার অনুপযোগী। বাড়িগুলোর বেশিরভাগই ইট-সিমেন্টের তৈরি, কিছু টিন ও মাটির ঘরবাড়ি রয়েছে। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করে এখানে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এ মহল্লায় পাকিস্তানিবাহিনী ও তার সহযোগীরা অতর্কিত আক্রমণ করে এবং উত্তর ও দক্ষিণ দু'দিকের বহু মানুষকে হত্যা ও কয়েকজন নারীর সম্ভ্রম লুট করে। অনেক নারীকে ধরে নিয়ে নিকটবর্তী লালবাজার মহল্লায় অবস্থিত কালীবাড়ী নিয়ে যায়।

## সর্বদলীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি গঠন

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। এ ঘোষণার পর নাটোরবাসী বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। রেসকোর্স মাঠে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণ ছিল জাতির জন্য দিক নির্দেশনা। বাঙালি জাতিকে আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার দিক নির্দেশনা। বঙ্গবন্ধুর প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ আওয়ামী লীগ নেতা শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী ও নাটোর মহকুমা কর্মকর্তা (এস.ডি.ও) কামাল হোসেন সিদ্দিকী যুক্তভাবে বেতারের মাধ্যমে শোনার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু ভাষণ চলাকালে হঠাৎ প্রচার বন্ধ করে দেয় ঢাকা বেতার কর্তৃপক্ষ। এতে বিক্ষোভে নাটোরবাসী প্রতিবাদ মিছিল বের করে। ৮ই মার্চ সর্বস্তরের জনতা, ছাত্ররা পাকিস্তানি আক্রমণ প্রতিরোধ করতে তথা আত্মরক্ষার প্রস্তুতি নিতে থাকে। প্রাথমিক প্রস্তুতি হিসেবে নাটোর শহরে যুবকদের নিয়ে **'জয়বাংলা বাহিনী'** গড়ে তোলা হয়। এছাড়া ৮ই মার্চ-ই নেতৃস্থানীর ব্যক্তিদের নিয়ে শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী (**এম,পি,এ**) এর নেতৃত্বে গঠিত হয় সর্বদলীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম কমিটি। এর নেতৃত্বে আরও ছিলেন এ্যাডভোকেট সাজেদুর রহমান খান, খন্দকার আবু আলী (ন্যাপ সহ সভাপতি), আ.খ.ম. আনিস-উল-ইসলাম (ন্যাপ ভাসানী নেতা), আশরাফুল ইসলাম (**এম.এল.এ**), আঃ রাজ্জাক, আহাদ আলী সরকার, সাইফুল ইসলাম, কামরুল ইসলাম, ড. মোবারক, রফিকুল ইসলাম, জিল্লুর,

সৈয়দ মোতাহার হোসেন মাথা মৌলভী, রমজান শেখ (আওয়ামী লীগ নেতা), আব্দুর রহমান (শ্রমিক নেতা), মমতাজ উদ্দিন প্রামাণিক প্রমুখ।

১৯৭১ সালের জানুয়ারী মাসে ছাত্রলীগ, আওয়ামী লীগ সমন্বয়ে সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল। আর তখন ন্যাপ, আওয়ামী লীগ প্রভৃতি দল একত্র হয়েছিল। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়েছিল যেখানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মুজিবর রহমান রেজা, এ্যাড. কামরুল ইসলাম, মুজিবর রহমান সেন্টু (ছাত্রলীগ), গোলাম রাব্বানী রঞ্জু, শেখ আলাউদ্দিন, ফজলুল (ছাত্রলীগ সভাপতি), সফিউল খান টিপু প্রমুখ।[২৪] ৮ই মার্চ ১৯৭১ সালের, বিকেল বেলা নাটেরের হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে সংগ্রাম কমিটির তত্ত্বাবধানে পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা লাল-সবুজের পতাকা উত্তোলন করেন নাটোরের পুরাতন কোট বিল্ডিংএ তৎকালীন ছাত্রলীগের প্রচার সম্পাদক শেখ আলাউদ্দিন। তার সঙ্গে ছিলেন ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক মজিবর রহমান সেন্টু। এছাড়াও ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম চৌধুরী, ছাত্রলীগেরঅপর নেতা মীর কাশেম টগর, টিপু চৌধুরী প্রমুখ। একই দিনে মহকুমা প্রশাসকের বাসভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন তৎকালীন ছাত্রলীগের সহ সভাপতি ও এন,এস কলেজের ভি.পি. কামরুল ইসলাম ও জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি মজিবর রহমান রেজা। তিনি যুদ্ধে রাজাকারদের হাতে শহীদ হন।

২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ভবনে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা তোলার খবর যখন নাটোরে ৩রা মার্চ ছড়িয়ে পড়ে, তখন থেকেই নাটোরে শুরু হয় পাকিস্তানি পতাকা পোড়ানো। স্বাধীনতাকামী জনগণ, ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক নাটোর শহরে জমায়েত হতে থাকে। ৪ই মার্চ স্থানীয় মিনার সিনেমার মোড়ে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। ৮ই মার্চ নাটোর জেলার সদরে প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয় তাই এদিনটি নাটোর জেলার প্রথম পতাকা উত্তোলনের দিন। ১৩ই মার্চ এস.ডি.ও কামাল হোসেন সিদ্দিকী ও শঙ্করগোবিন্দ চৌধুরীর নেতৃত্বে এক সর্বদলীয় সভার মাধ্যমে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও করনীয় ইত্যদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ, সশস্ত্র বিভিন্ন বাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তারাও এখানে একত্র হয়। এদের মধ্যে অন্যতম হাবিবুর রহমান (আনসার এ্যাডজুটেন্ট) জাফর আহমেদ (নাটোর মহকুমার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা), ক্যাপ্টেন হাবিবুর রহমান (মহকুমা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা) প্রমুখ।[২৫]

আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মোজাফফর) এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ নাটোর শহরের যুবকদের সংগঠিত করে সামরিকভাবে পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীকে মোকাবেলা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে নাটোর জেলা ভাসানী ন্যাপের নেতা কর্মীরাও এ কর্মসূচিতে যোগদান করেন। নাটোর সদর উপজেলার নবাব সিরাজ উদ দৌলা কলেজ হোস্টেল মাঠকে (বর্তমানে সেখানে রাণী ভবানী সরকারি মহিলা কলেজ স্থাপিত হয়েছে) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয় সেসময়। ই.পি.আর সামরিক বাহিনীর বাঙালি সদস্যরা স্বাধীনতাকামী যুব সমাজকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। শঙ্করগোবিন্দ চৌধুরী ও সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দ নাটোর বাসীদের উদ্বুদ্ধ করে দেশকে রক্ষার জন্য।

## নাটোর সাংস্কৃতিক সংগঠনের ভূমিকা

নাটোর জেলার 'সাকাম' ও বঙ্গলক্ষ্মী সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গীত বিভাগ বলে খ্যাত, এছাড়া 'উদীচী' ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম দ্বারা মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করেছিল। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় 'মনোবীণা' নামক সংগঠনের অবদান সবচেয়ে বেশি। প্রদ্যুৎ লাহিরী (ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত) এই সংগঠনের প্রাণ পুরুষ। 'বঙ্গশ্রী'-নামক সংগঠনটিও ভূমিকা রেখেছিল সংগ্রামরত বাঙালিদের সাহস সৃষ্টিতে।[২৬]

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিভিন্ন সংগ্রামী কবিতা, সংগীত ও নেতাদের উৎসাহ নাটোরবাসীদের আরও প্রেরণা দিয়েছিল দেশকে স্বাধীন করার কাজে।

## সংঘর্ষের সূত্রপাত

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকাসহ সারা দেশে গণহত্যা শুরু হয়। তার কিছুদিন পূর্বেই অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে নাটোর শহরে অবাঙালিদের সাথে জামায়াত-মুসলিম লীগের কতিপয় নেতা-কর্মী শলা পরামর্শ করে একটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলো। স্বাধীনতা লাভের জন্য আত্মত্যাগে প্রস্তুত জনতা তখন ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে একত্র হয়। সাম্প্রদায়িক অপশক্তি প্রথমে হিন্দুদের ব্যবসাকেন্দ্র আক্রমণ করে। এরপর স্বাধীনতার জন্য যারা কাজ করছিলেন, তাদের ভারত ও হিন্দুদের দালাল বলে অত্যাচার শুরু করে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর ব্যবসাকেন্দ্র আক্রমণ করে তাদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টির চেষ্টা করে। জেলা-থানা-গ্রাম পর্যায়ে গঠিত সংগ্রাম কমিটির সদস্যরা সাম্প্রদায়িক অপশক্তিকে প্রতিহত করার জন্য লাটি-সোটা-বল্লাম নিয়ে রাত জেগে পাহারা দিয়েছেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালিদের সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়ে অবাঙালি গোষ্ঠী। নির্বাচনের ফলাফল বানচালের জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের কৌশল হিসেবে তারা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষত উত্তর বঙ্গের অবাঙালি অধ্যুষিত অঞ্চলে আক্রমণ করেছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর অত্যাচারের পর তারা আওয়ামী লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কর্মীদের আক্রমণ করে। আত্মরক্ষার্থে স্বাধীনতা প্রিয় বাঙালি এবং অবাঙালি পশুশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই প্রতিরোধের ফলে বাঙালি ও অবাঙালি দালালদের মনোবল ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বিধস্ত করে রেখেছিল। পঁচিশে মার্চ পর্যন্ত স্থানীয় উদ্যোগী জনতা পালা করে শহরের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করেছেন। সাধারণ মানুষ, শ্রমজীবী, কর্মজীবী সকলে মিলে এক ঐক্য গড়ে তুলেছিল, শহরাঞ্চলে অবাঙালিদের প্রতিরোধ করা হলে বিহারীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। তারা এবং স্বাধীনতা বিরোধী বাঙালিরা এরপর গ্রামাঞ্চলে দাঙ্গা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে। নাটোর জামহুরিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক হাফেজ আব্দুর রহমান ছিলেন নাটোর জেলার অন্যতম প্রধান ঘাতক। তিনিই মূলত নাটোর সদর সহ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাসের সৃষ্টি করে। এসব ঘাতক-দালালরা গোপনে গোপনে নিজেদের যোগাযোগ রক্ষা করেছে। অপেক্ষা করেছে কখন তাদের মদদ দাতা পাকিস্তানি সৈন্যরা আসবে। মূলত ২৫শে মার্চের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঢাকা আক্রমণ করলে তাদের মনোবল বৃদ্ধি পায়। এরপর তারা সশস্ত্রভাবে তৎপর হয়। নাটোর সদর থানায় পাকিস্তানি বাহিনী প্রথম প্রবেশ করে ১৩ই এপ্রিলের দিকে। তার পূর্ব পর্যন্ত নাটোর সদর থানার স্বাধীনতাকামী সম্মিলিত বাহিনী প্রতিরোধ অব্যাহত রেখেছিল। ২৯শে মার্চ লালপুর থানায় পাকিস্তানি বাহিনী

প্রবেশ করে ও সেখানে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। নাটোর সদর উপজেলা সহ আশে পাশের বিভিন্ন স্থান থেকে সাধারণ জনতা, ইপিআর প্রভৃতি সকলে ঐক্যবদ্ধ ভাবে শেখ মুজিবরের ভাষণ অনুযায়ী যার যা আছে তাই নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এভাবে পাকিস্তানি  বাহিনী ধীরে ধীরে সমগ্র নাটোরে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য আক্রমণ চালাতে থাকে।

নাটোর সদর উপজেলা ১৩ই এপ্রিলের মধ্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অধীনে আসে। অত্যাচার, নির্যাতন, গণহত্যা অব্যাহতভাবে চলতে শুরু করে। বিহারীদের সাথে সংঘর্ষের পর সংখ্যালঘুরা অনেকেই পাড়ি জমিয়েছিলেন ভারতের দিকে। কেউবা অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেও পড়েছিলেন নিজ ভিটেমাটির মায়ায়। ২৯শে মার্চ লালপুর উপজেলার ময়না প্রতিরোধ যুদ্ধের পর কয়েকদিনের মধ্যে মহকুমা প্রশাসক কামাল হোসেন সিদ্দিকীর বাসভবনে কন্ট্রোলরুম থেকে পাকিস্তানি সেনাদের নগরবাড়ী ঘাট থেকে আসার খবর পাওয়া যায়। মার্চের শেষ দিকে ১ জন পাকিস্তানি আর্মি গ্রামের বিহারী পাড়ায় আশ্রয় নেয়। এক পর্যায়ে বিহারী ও সাধারণ জনতার মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ১১ই এপ্রিল নাটোর বড় হরিশপুর দত্তপাড়া ব্রিজের উপর প্রতিরোধ করে মুক্তিযোদ্ধারা ও স্থানীয় স্বাধীনতাকামী জনগণ। আহমেদপুর ব্রিজের নিকট উভয় পক্ষ যুদ্ধ হয়। ধীরে ধীরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নাটোর শহরকে তাদের ২নং হেড কোর্য়াটারে পরিণত করে। শত শত গাড়ি নিয়ে নাটোর শহরে প্রবেশের সময় রাস্তার দুই পাশে নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা, বাড়ি ঘরে অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ, নির্যাতন করতে থাকে। নাটোর শহরের প্রায় দশ কিলোমিটার দূর থেকে রকেট ল্যান্সার নিক্ষেপ করে আর শহরে প্রবেশ করে গান পাউডার ছিটিয়ে দিয়ে অগ্নিসংযোগ করে নাটোর শহরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে। শত শত গাড়ি নিয়ে নাটোর শহরে প্রবেশের সময় রাস্তার দুই পাশে নিরস্ত্র মানুষকে হত্যা, বাড়ি ঘরে অগ্নি সংযোগ। লুটতরাজ নির্যাতন করতে থাকে। নাটোর শহরের প্রায় দশ কিলোমিটার দূর থেকে রকেট ল্যান্সার নিক্ষেপে করে আর শহরে প্রবেশ করে গান পাউডার ছিটিয়ে দিয়ে অগ্নিসংযোগ করে নাটোর শহরকে ধ্বংস স্তুপে পরিণত করে।

## নাটোর সদরে শান্তি কমিটি গঠন

মুক্তিযুদ্ধের শুরু হওয়ার পরপরই দালালদের দ্বারা গঠিত হয় কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি। ২৬শে এপ্রিল, ১৯৭১ সালের *দৈনিক পাকিস্তানে'র* সংবাদ অনুসারে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা দ্রুত পুনঃপ্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রবিরোধী ও সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে জনগণকে সজাগ রাখা ও গুজব রচনাকারীদের দূরভিসন্ধি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠিত হয়েছে।[২৭] মূলত শান্তিকমিটির উদ্দেশ্য ছিল বাঙালিদের পক্ষে যারা আছেন তাদের নিধন করা। আর এই একই উদ্দেশ্যে নাটোর সদর থানায় মে মাসের দিকে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। রাজশাহী শান্তিকমিটির সভাপতি আয়েনউদ্দিনের তথ্য থেকে জানা যায় পাকিস্তান সমর্থনকারী মাহমুদের চেষ্টায় এটি গঠিত হয়।

শান্তি কমিটির সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৮৬। নাটোর মহকুমার শান্তি কমিটির সভাপতি ছিলেন কাঁচু উদ্দিন মোক্তার (কাঞ্চু) এবং সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার খান চৌধুরী (মধু)। আরও ছিলেন মুসলিম লীগ সদস্য দুদু মিয়া। শ্রমিক লীগের সভাপতি আব্দুর রহমান, আজিজ সরকার, রবিউল ইসলাম, হুজুর নওয়াব আলী, মমিন উল্লাহ প্রমুখ। এছাড়া অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন *শান্তি কমিটি ১৯৭১* গ্রন্থে নাটোর জেলা শান্তিকমিটির একটি তালিকা উল্লেখ করেছেন। এখানে ৬ জনের নাম জানা যায়। সেগুলো হলো :

১. মজিবর রহমান

২. আনোয়ারুল

৩. জলিল

৪. সহকারী কৃষি কেমিস্ট জামিল সিদ্দিকী

৫. ফোরম্যান হাজী আসগর আলী

৬. সহকারী প্রকৌশলী আনসারী

এছাড়াও যারা নাটোর মহকুমা শান্তি কমিটিতে ছিলেন, তারা হলেন–

১. ইসমাঈল হক, পঞ্চগড়, ২. এস এম হালিম, (সিও) ডেভ, পঞ্চগড়, ৩. এ.সামাদ, সি ইউএস, পঞ্চগড়, ৪. এইচএইচকে দাদ, ৫. আবু আলম ইমাম মোহাম্মদ (পুলিশের সি আই), পঞ্চগড়, ৬. লুৎফর রহমান, (এম ইউসি) কাজল দিঘী, ৭. খামির উদ্দিন প্রধান, (এম ইউসি) কাজল দিঘী, ৮. তবিবুর রহমান (এম ইউসি) পঞ্চগড় , ৯. আবদুল হাই (এম ইউসি) পঞ্চগড়, ১০. এফ করিম, পঞ্চগড়, ১১. মোজাম্মেল হক প্রধান, ১২. শেকুল ইসলাম চৌধুরী, ১৩. আলতাফ হোসেন প্রধান, ১৪. একে আজাদ, ১৫. নাজির আহমেদ, ১৬. সেময় আলী, ১৭. মোস্তফা মওলানা, ১৮. কাসির উদ্দিন সরকার, ১৯. আব্দুল আজিজ, ২০. আফাজ উদ্দিন সরকার, ২১. আব্দুল আজিজ, ২২. আফাজউদ্দিন, যোগদায়েল, ২৩. প্রমান আলী, ভিতরগড়, ২৪. আনাজ উদ্দিন, কুলুপাড়া, ২৫. জামাল উদ্দিন, বড়শাহী, ২৬. লেহাজ উদ্দিন, ধাক্কামারা, ২৭. আবেদিন আসদ, ২৮. শফিউল আলম, ২৯. শফিউদ্দিন আহমেদ, মাগুরা, ৩০. ফায়েজ উদ্দিন, ৩১. বাছের উদ্দিন আহমদ, ৩২. আনাজ উদ্দিন, ৩৩. আফাজ।

মূলত মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলাম, পিডিপি, কেএসপি প্রভৃতির সদস্যরাই বা সমর্থনকারীরাই শান্তিকমিটিতে ছিলেন।[২৮] শান্তিকমিটির অন্যতম সদস্য মকিম মোল্লা ছাতনী ইউনিয়নে ত্রাস সৃষ্টিতে পাকিস্তানি বাহিনী ও হাফেজ আব্দুর রহমান (অবাঙালি রাজাকার) কে সহযোগিতা করেছিল। এছাড়া নাটোর সদর থানায় অবস্থিত জেলাপরিষদের নিকটবর্তী সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, আলাইপুর এ শান্তিকমিটির সদস্যরা বিভিন্ন স্থান থেকে বহু মেয়ে (প্রায় ৫০০ জন) কে ধরে এনে এখানে রাখে। তারা বিহারীদের সাথে মিলিত হয়ে এটা করেছিল। এছাড়া বহু এলাকায় (আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ) প্রভৃতি অধ্যুষিত) তারা হামলা, লুটপাট, হত্যা চালায়। নাটোর সদর থানার ছাতনী ইউনিয়নে শান্তিকমিটি গঠিত করেছিল স্থানীয় কয়েকজন পাকিস্তান সমর্থনকারী। এদের নেতা ছিলেন মকিম মোল্লা, আব্দুল মৃধা। এছাড়া অন্যান্য সহযোগী আব্দুর রউফকারী, মতি ভূইয়া, চান্দ গাজী, মুহম্মদ আলী (সদস্য সচিব) প্রমুখ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও হাফেজ আব্দুর রহমানকে সহযোগিতা করেছিল ছাতনী গণহত্যা, নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞে।

## মুক্তিযুদ্ধে নাটোরে রাজাকার ও আলবদরের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের চিত্র

২৫শে মার্চের কালো রাতের পর মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে নাটোর জেলাতেও শুরু হয় দেশের স্বাধীনতা ও নিজেদের রক্ষার এক সর্বাত্মক লড়াই। নাটোর সদর থানায় অবাঙালিদের সাথে স্থানীয়দের সংঘর্ষ চলে কিছুদিন। ২৯শে মার্চ-৩০শে মার্চ এ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী প্রথম নাটোর জেলার লালপুর উপজেলায় বাঁধা প্রাপ্ত হয় এবং পরাজিত হয় স্থানীয়দের প্রতিরোধের মুখে। এরপর নাটোর জেলার সকল উপজেলার

মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল। নাটোর সদর থানায় লেঙ্গুরিয়ার বিহারী পাড়ায় (অবাঙালি) পাকিস্তানি সেনা লুকিয়েছিল। স্থানীয় আনসার, পুলিশ, সেনা ও মুক্তিকামী জনতা খবর পেয়ে চলে আসে এবং উভয়ে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে পাকিস্তানি সেনাদের সাথে সাথে বাঙালিও নিহত হয়। এঘটনার পর বিহারিদের সাথে বাঙালিদের সংঘর্ষের ঘটনা অব্যাহত থাকে। অবাঙালি হাফেজ আবদুর রহমানকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় আরও বিহারীরা ক্ষিপ্ত ছিল। স্থানীয় অনেকে পরিবার নিয়ে অন্য কোন গ্রাম, জেলা বা ভারতের দিকে চলে গেলেন। অনেকেই রয়ে গেলেন নিজবাড়িতে সব দেখা-শুনা করার জন্য। স্থানীয়রাই পাহারা দিত দলবেঁধে প্রতিরোধের জন্য। লালপুর উপজেলায় প্রতিরোধের থেকে শুরু করে ১২ই এপ্রিল পর্যন্ত নাটোরের সম্মিলিত বাহিনী প্রতিরোধ টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ১৩ই এপ্রিল বিহারী তথা স্থানীয় পাকিস্তান সমর্থনকারীদের সহায়তার নাটোর সদর থানায় প্রবেশ করে। রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি পাকিস্তান সমর্থনকারী স্থানীয় ও অবাঙালিরা নাটোর সদরে ত্রাস সৃষ্টি করে। এদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫২৫ জন। তারা লুটপাট, ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা নির্যাতন শুরু করে। পাকিস্তানের এসব দোসররা স্থানীয়দের একদিকে বলে পরিবারের যারা অন্য কোথাও চলে গিয়েছে তারা যেন ফিরে আসে। ভয়ের কিছু নেই। অন্যদিকে তারা তাদের ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে এসব দোসররা মিলিত হয়ে শান্তি বাহিনী গঠন করে। রাজাকার, আলবরদের নিয়ে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নাটোর সদর পুরোটা ঘিরে ফেলে এবং সেখানে তাদের দ্বিতীয় হেডকোয়ার্টার স্থাপন করে। ফলে নাটোর সদর থানার বহু স্থানে তারা ক্যাম্প স্থাপন করে। আর তাদের দালালদের সহযোগিতায় বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে হত্যা করে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা বহু নিরীহ মানুষদের ক্যাম্পে ধরে নিয়ে এসে নির্যাতন করে হত্যা করে। বহু নারীকে ক্যাম্পে বন্দী করে ধর্ষণ করে। এভাবে যুদ্ধকালীন পুরো ৮ মাস সময়টা চলতে থাকে। নাটোর সদর থানার বহু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাড়িঘর-এ লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করা হয়। এছাড়া সাধারণ মানুষকে দিয়ে জোরপূর্বক বিভিন্ন কাজ করাত। উদাহরণ স্বরূপ: নাটোর উপজেলা পরিষদে তখন ক্যাম্প স্থান করেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ও তাদের দোসরার। এখানে বহু নিরীহ মানুষকে ধরে এনে তাদের দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করে এবং অবশেষে তাদের হত্যা হত্যা করে ফুলবাগান (উপজেলা পরিষদের সম্মুখবর্তী গণকবর) এ ফেলে রাখা হত।

নাটোরের অধিকাংশ স্থান পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের মাধ্যমে বধ্যভূমিতে পরিণত হয়। এখানে প্রায় ১২ হাজার বাঙালিদের (নারী, পুরুষ, শিশু) হত্যা করা হয়। নাটোরের বাইরের অন্য অঞ্চল থেকেও বাঙালিদের ধরে এনে নৃশংসভাবে হত্যা করে বিভিন্ন নদী-নালা, খাল-বিল, গোরস্তান ও পতিত ভূমিতে ফেলে দেয়া অথবা পুঁতে ফেলা হত। এদের মধ্যে অনেককে জীবন্ত ও মাটিচাপা দেয়া হয়েছে। পাকিস্তান হানাদার ও তাদের দোসরদের নৃশংসতা ও বর্বরোচিত হত্যাকান্ড সে সময়ে যারা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাদের অনেকেই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। '৭১ এ তখন হেড কোয়ার্টারে অবস্থানরত পাকিস্তানি বাহিনীর পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কুখ্যাত মেজর শেরওয়ানীর প্রত্যক্ষ মদদে অবাঙালি হাফেজ আব্দুর রহমান ও দোসররা জেলায় বিভিন্ন স্থানে হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন অব্যাহত রাখে।[২৯]

### নাটোর সদর থানায় গণহত্যা ও নির্যাতন সূচনা

৭ই মার্চের ভাষণের পর নাটোরের মানুষ আরও প্রতিবাদী হতে থাকে। বিহারীরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির চেষ্টা করলেও শঙ্করগোবিন্দ চৌধুরীর প্রচেষ্টায় তা প্রতিরোধ করা হয়। ময়না প্রতিরোধ যুদ্ধেরপর

বিহারীদের সাথে পাকিস্তানিদের যোগসূত্র বৃদ্ধি পায়। একপর্যায়ে বাঙালিদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। বিহারীরা এ সময় পরাজিত হয় ও অনেকে বন্দী হয়। পরে পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনী স্থানীয় এই দোসরদের সহযোগিতায় ১৩ই এপ্রিল নাটোর সদর থানায় প্রবেশ করে এবং হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। আগেরদিন রাতে নাটোর কন্ট্রোলরুম পাবনা দাশুড়িয়া কন্ট্রোল রুম থেকে পাকিস্তানি বাহিনীর নাটোরে আসার সংবাদ জানা যায়। ১৩ই এপ্রিল নাটোরে প্রবেশ করে শহরের মাদ্রাসামোড়ে সম্মিলিত বাহিনীর তৈরি বাংকারে প্রহরারত মুক্তিপাগল যোদ্ধাকে হত্যা করে। এর পূর্বে প্রবেশপথে আব্দুল বারেককে হত্যার মধ্য দিয়ে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। আর এক্ষেত্রে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে হাফেজ আব্দুর রহমান। ময়না প্রতিরোধ যুদ্ধের পরপরই বহু মানুষ বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। এদের অনেকে প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে যায়। স্থানীয় দোসররা এদেরকে সনাক্তকরে তাদের পরিবার পরিজনদের উপর চড়াও হয়। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুট পাট থেকে নিরীহ বাঙালিরাও রেহাই পায়নি। পুরো নাটোর শহর তাদের দখলে ছিল। ফলে নাটোর জেলার অন্যান্য স্থান তাদের আক্রোশ থেকে রক্ষা পায়নি।

## পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প সমূহ

নাটোর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দুই নম্বর হেডকোর্য়াটার ছিল। ফলে নাটোর সদর পুরোটাই তাদের দখলে চলে যায়। অবাঙালি বিহারি তাদের সহযোগিতা করায় এ অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ বহু স্থানে তারা ক্যাম্প স্থাপন করে। সেগুলো হল:

১. পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ডিভিশনাল ক্যাম্প, ফুলবাগান, নাটোর (বর্তমানে উপজেলা পরিষদ)।
২. উত্তরা গণভবন, দিঘাপাতিয়া।
৩. কালীবাড়ী, দিঘাপতিয়া।
৪. ডোমপাড়া মাঠ কাঁঠালবাড়ীয়া, নাটোর।
৫. মহারাজা হাইস্কুল মাঠ, বঙ্গজল।
৬. পি.টি. আই কান্দিভিটা।
৭. নাটোর বড়গাছা ডাকবাংলো।
৮. নবাব সিরাজ উদ দৌলা কলেজ মাঠ
৯. স্টেশন ডাকবাংলা
১০. ভোকেশনাল, মদ্রাসা মোড়।
১১. আনছার হল, কানাইখালী, নাটোর এন.ডি.টি.আই, বঙ্গজল, উপরবাজার।

### নাটোর কালীবাড়ি নির্যাতন কেন্দ্র

নাটোরের কালিবাড়ি ও ফুলবাগানে হানাদার বাহিনী কীভাবে অত্যাচার করত, তার বর্ণনা দিয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা মোঃমোসলেম উদ্দিন।

২৪শে এপ্রিল আমার বাড়ি পাকিস্তানি বাহিনীর জনৈক সহযোগী একদল পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে এসে ঘরের দরজা ভেঙ্গে আমাকে ধরে লাথি মারতে মারতে স্থানীয় কালীবাড়িতে নিয়ে যায়। বলা প্রয়োজন এখানে অত্যাচারের কেন্দ্রভূমি ছিল। তারা সেখানে আমার হাত, পা বেঁধে পা উপরের দিকে তুলে লটকিয়ে অত্যাচার

করে। সে অত্যাচারের ভেতর ছিল বেত দিয়ে প্রহার, চাকু দিয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থান কাঁটা। শরীর কেটে তারা আনন্দ পেত। তারা জানতে চাচ্ছিল যে চট্টগ্রামে আমি কতজন পাঞ্জাবিকে হত্যা করেছি, কতটি রাইফেল কোথায় কীভাবে লুকিয়ে রেখেছি, বাংলাদেশ সম্পর্কীয় কী কী তথ্য আমি জানি?

আমার কাছ থেকে কোনো তথ্য উদঘাটন করতে ব্যর্থ হলে তারা আমাকে কালীবাড়ি থেকে নাটোরের ফুল বাগানে অপারেশন ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে বৈদ্যুতিক শক আমার গলায় দেয়া হয়। হাত পা বেঁধে ডেকচির মধ্যে করে পানির হাউজে নিক্ষেপ করে। ১০-১২ মিনিট সেখানে রাখার পর অর্ধমৃত অবস্থায় সেখান থেকে তুলে আবার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। আমার হাত পেছনে বাঁধা ছিল। কিছু আগে আমার সাক্ষাতেই চারজন লোককে গুলি করে হত্যা করে। কৌশলে হাতের বাঁধন খুলার চেষ্টা করছিলাম। এক সময় আমি আমার হাতের বাঁধন তাদের অগোচরেই খুলতে সমর্থ হন। ফুলবাগানের মধ্যস্থ পুকুরের চারদিকে মিলিটারিরা তখন সশস্ত্র পাহারায় ছিল। হাতের বাঁধন খুলেই ঘুরে সঙ্গীন উঁচানো সিপাইয়ের হাতের রাইফেল কেড়ে পুকুরে ফেলে দেই এবং বক্সিং মেরে তাকে ধরাশায়ী করি। তার পর পুকুরে ঝাঁপ দেই। ইতোমধ্যে অবশিষ্ট সৈন্যরা পুকুরের চারিদিকে সচেষ্ট হয়ে ওঠে এবং আমাকে লক্ষ্য করে বেপরোয়া গুলি চালানো শুরু করে। যখন পুকুরের পাড়ে উঠছিলাম, ঠিক সে সময় একটি গুলি আমার কানে আঘাত করে। সাথে সাথে আর একটি গুলিও আমার বাম বাহুর নিচে লাগে। এতে আমি অবশ্য খুব বেশি আহত হইনি। তাদের সকলের সব রকমের অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে বর্বরদের ব্যূহ ভেদ করে পালিয়ে আখের জমির ভেতর দিয়ে ক্রলিং করে নাটোরে পৌঁছাই। শরীর দিয়ে তখন অনবরত ধারায় রক্তপাত হচ্ছিল। উলঙ্গ অবস্থায় যখন নাটোরের সিনেমা হলের মোড়ে পৌঁছাই তখন একদল বিহারি আবার আমাকে ধরে ফেলে। সেখানেও তারা বেদম প্রহার করতে শুরু করে। পূর্বের মতই পালাতে সচেষ্ট হই। এই ফুলবাগান ক্যাম্পের নিকটেই প্রায় ১৫-১৬ হাজার লোককে পাকিস্তানি পশুরা নির্মমভাবে হত্যা করেছে বলে জানান মোঃ মোসলেম উদ্দিন।[৩০]

১৭ই ডিসেম্বর নাটোর শহরের প্রবেশ মুখে পাকিস্তানি হানাদারেরা ছায়াবাণী সিনেমা হলের সম্মুখে অজ্ঞাতনামা কয়েকজন ব্যক্তিকে হত্যা করে। দেশব্যাপী জনতার উল্লাস দেখে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। নির্যাতিত বাঙালিদের দেখেই এই নয় মাস তারা অভ্যস্ত ছিল। ফলে এসময় যাকে যেখানে পেয়েছে, হত্যা করেছে।[৩১]

এসব ক্যাম্পগুলোতেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন চালাত। এগুলো থেকে সমগ্র নাটোর জেলার বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ পরিচালনা করে বহু মানুষকে হত্যা করে। এছাড়া বহু মুক্তিযোদ্ধাসহ  বহুমানুষকে ধরে এনে নির্যাতন করে হত্যা করত। বহু নারীকে তারা এ ক্যাম্পগুলোতে ধরে নিয়ে আসত। এরপর শুরু হত নারকীয় অত্যাচার, ধর্ষণ। ইচ্ছে হলে কাউকে ধর্ষণের পর ছেড়ে দিত। না হলে সেখানেই হত্যা করত। এছাড়া নাটোরের শকুলপট্টিতে (গ্রীন একাডেমী বর্তমান) বহু নারীকে তারা ধরে এনে ধর্ষণ ও নির্যাতনের পর হত্যা করে সেখানে পুঁতে ফেলত বলেও জানা যায়।

## নাটোর সদর থানায় গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

২৫শে মার্চের কালরাত্রির পর থেকেই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নানাভাবে নাটোরে প্রবেশের চেষ্টা করেছে। স্থানীয় জনগণের প্রতিরোধের ফলে তা সম্ভব হচ্ছিল না। ঘটনাক্রমে ২৯শে মার্চ নাটোরের লালপুর থানার ওয়ালিয়ায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে বাঙালিদের প্রতিরোধ যুদ্ধ হয় এবং এখানে প্রায় ১৩ জন স্বাধীনতাকামী শহীদ হন। এ সময় লালপুর থানার ময়না গ্রাম ও গোপালপুর সুগার মিলে বেশ কয়েকজন

পাকিস্তানি সেনা নিহত হয়। ১লাএপ্রিল সকালে নাটোর রেল গেটের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে লেঙ্গুরিয়ার বিহারি পাড়ায় কয়েকজন হানাদার সৈন্য জনতার অবরোধের শিকার হয়। হাজার হাজার মানুষ লাঠিসোঁটা, বল্লম, বন্দুক, তীর ধনুক ও রামদা ইত্যাদি নিয়ে ঐ পাড়া আক্রমণ করেন। জনতা পাকিস্তানি বাহিনীর সদস্যদের ধরে এনে হত্যা করে। এই ঘটনাই পাকিস্তানি বাহিনীকে নাটোর দখলে অতি আগ্রহী করে তোলে। ১১ই এপ্রিল নগরবাড়ি ঘাট থেকে শেলিং করতে করতে পাকিস্তানি বাহিনী সামনের দিকে এগুতে থাকে। ১২ই এপ্রিল প্রতিরোধ বাহিনী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নাটোর জেলখানার সকল কয়েদিকে ছেড়ে দেয়া হয়। বিহারি হাফেজ আব্দুর রহমানও ছাড়া পায়। সে পরবর্তীকালে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার প্রধান সহায়কের ভূমিকা পালন করে।[৩২]

১২ই এপ্রিল সকাল থেকেই নাটোরে বিক্ষিপ্তভাবে রকেট শেলিং হতে থাকে। একটি শেল কাপুড়িয়া পট্টিতে বস্ত্র ব্যবসায়ী রবি বসাকের বাড়ির উপর পড়লে রবি বসাকের স্ত্রীর দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়।[৩৩] এভাবেই ১২ই এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নাটোর শহরে প্রবেশ করে হত্যাযজ্ঞ, অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করে। অনেকেই এসময় প্রাণভয়ে শহর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী শহরে প্রবেশ করে হাফেজ আব্দুর রহমানের মাধ্যমে বিহারী পাড়ায় সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা দেয়। ফলে পাকিস্তানি বাহিনী বিহারী সহযোগীদের সাথে নিয়ে স্বাধীনতাকামী বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। নিরীহ মানুষদের রাস্তাঘাট, দোকান বা বাড়ি থেকে ধরে এনে অত্যাচার, নির্যাতন ও হত্যা করে। কখনও ঘরের মধ্যে, কখনও বা লাইন করে পথের মধ্যে গণহত্যা চালিয়েছিল। ধরে নিয়ে গিয়েছিল বহু নারীদের। এভাবে দীর্ঘ নয় মাস ধরে চলতে থাকে।

কোন কোন ক্ষেত্রে পাকিস্তানি বাহিনী রাস্তায় কোন লোককে দেখলে তাকে ধরে জিজ্ঞাসা করত- 'তুম হিন্দু হ্যায় অর মুসলিম?' এভাবে নিরীহ ধর্মভিত্তিক গণহত্যাও করত। যদি মুসলিম হত, তবে অনেক ক্ষেত্রে পার পেত। অনেক ক্ষেত্রে আবার মেরে ফেলত। সবক্ষেত্রে নারীদের অত্যাচার আর পুরুষদের হত্যা, নির্যাতন সমভাবে ছিল না। অনেক এলাকায় যুবতী নারী ছাড়া বেশি বয়স্ক নারীদের ধরা হত না। অনেক ক্ষেত্রে কোন বাছ বিচার ছিল না।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১২ই এপ্রিল নাটোরে প্রবেশের মধ্য দিয়ে হত্যা, নির্যাতন শুরু করে নাটোর শহরের অন্যতম দালাল হাফেজ আবদুর রহমান, কাঁচু মোক্তার প্রমুখর মাধ্যমে। মুক্তিযোদ্ধা হুজুর আলী জানান,

> নগর বাড়ি ঘাট থেকে পাবনা হয়ে নাটোরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি সেনারা। আর বড় হরিশপুর ইউনিয়নে তারা হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সে এলাকায় তখন লোকজন কম ছিল। তারা বিভিন্ন অঞ্চল থেকে লোকদের ধরে নিয়ে এসে ফতেঙ্গাপাড়া গ্রামে হত্যা করে, কখনও বা অর্ধমৃত অবস্থায় লোকদের কবর দিত। আর এক্ষেত্রে গ্রামের মানুষদের দিয়ে জোরপূর্বক কবর খোঁড়া ও মাটি দেওয়ার কাজ করত। অনেক লাশকে নিকটবর্তী খালে ভাসিয়ে দেয়া হত। পুরো নয় মাস ধরে হানাদার বাহিনী ও তাদের দালালরা এ হত্যাকান্ড চালিয়েছে। অনেক বাড়িঘর পুড়িয়ে দিয়েছে। লুটপাট করেছে। বড় হরিশপুর ইউনিয়নের মোকরামপুর মৌজাতেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা হত্যা করেছে দুজন মানুষকে।[৩৪]

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ সংঘটনের এক পর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিতে নাটোর বোর্ডিং-এর মালিকের ভাই উলফাত মারা যান এবং ন্যাপ সদস্য মসলেম উদ্দিন গুলিবিদ্ধ হন।

মাসুদ আহমেদ ও মোঃ আব্দুর রহিম জানান,

> মোসলেম উদ্দিন ও তাঁর ভাগ্নে উলফাত মোটর সাইকেলে করে একটু বাইরে বের হয়েছিলেন কাজে পৌরসভা। পার্কের সামনে (বর্তমান কেন্দ্রীয় মসজিদ) এলে পথে বাঁধা দেয় পাকিস্তানি সেনারা। তাঁদের কাছে জানতে চায় তারা মুসলিম কিনা। এরপর তাঁদের গুলি করে পাকিস্তানি সেনারা। উলফাত উঠতে চেষ্টা করলে পুনরায় তাকে গুলি করে। এরপর তাঁদের গুলি করে পাকিস্তানি সেনারা। উলফাত উঠতে গুলি কোমর ছুঁয়ে তলপেট দিয়ে বেরিয়ে যায় মোসলেম উদ্দিনের। চুপ করে সেখানে কিছুক্ষণ পড়েছিলেন সহ্য করে। পাকিস্তানি সেনারা চলে গেলে তিনি নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করেন। কিন্তু উলফাত ঘটনাস্থলেই মারা যান। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নাটোর শহরের বেশ কিছু স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। নাটোর পি.টি.আই, নাটোর এন.এস.কলেজ, দিঘাপতিয়া গণভবন, নাটোর মহারাজবাড়ি, কালী বাড়ি, রানীভবানী স্কুল, বর্তমান উপজেলা পরিষদ (ফুলবাগান) প্রভৃতি বহু স্থানে। ফলে পুরো নাটোর জেলাকে তারা উত্তর বঙ্গের ভাগাড় বা বধ্যভূমিতে পরিণত করেছিল।[৩৫]

শ্রী আনন্দ জমাদার জানান, কিভাবে অসংখ্য আহত মানুষ যারা পাকিস্তানি বাহিনীর গুলি খেয়ে নাটোর সদর হাসপাতালে আসত চিকিৎসার জন্য। তিনি বলেন,

> ১৬ই এপ্রিল নাটোর সদর হাসপাতালে কর্মচারী জীবন কৃষ্ণ মানিকে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। কুখ্যাত ঘাতক দালাল হাফেজ আব্দুর রহমানের পরামর্শে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী জীবনকৃষ্ণ মানির বাসায় আক্রমণ করে। সেখানে তাঁকে অত্যাচার করে। আহত অবস্থায় জীবন কৃষ্ণ মাণিকে হাসপাতালে নেয়া হয়। হাসপাতালের সকলে মিলে তাঁর চিকিৎসা করছিল। সুস্থ করার জন্য হানাদার বাহিনী ও দালালরা জানতে পেরে সেখানে যায়। লুকানোর চেষ্টা করা হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। পুরুষ ওয়ার্ডের পেছনের একটা বেডে শুয়ে থাকা জীবন কৃষ্ণের পেটের উপর ৩ থেকে ৪ রাউন্ড গুলি করা হলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

শ্রী আনন্দ জমাদার ডা. বলাই চন্দ্র বসাক হত্যা সম্পর্কে জানান। তিনি বলেন,

> কাপুড়িয়া পট্টি তাঁর বাড়ি ছিল। সেখানে কয়েক জন মহিলা (বিহারী) তাঁর বাড়ি এসে জানায় যে, একটা মেয়ে অন্তঃস্বত্তা। তাঁর বাচ্চা হবে। ডা. বলাই যেন তাদের সাথে যায়। ডা. বলাই পরিস্থিতি বিবেচনা করে যেতে রাজি না হলেও তাঁকে জোর করে নিয়ে যায় তারা। নাটোর পৌরসভার ভেতরে নিয়ে তাঁকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়। তখন ডা. বলাই বলেন-"আমি তো অন্যায় করিনি। আমি তো চিকিৎসক, তাই কোথাও যাইনি, আমাকে ছেড়ে দাও।' কিন্তু তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয় না। কয়েকজন বিহারী পুরুষ তাকে পর পর চার রাউন্ড গুলি করলে। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

নাটোর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, শকুলপট্টির মন্দির(বর্তমান গ্রীন একাডেমী) তে বহু নারী পুরুষদের এনে অত্যাচার, নির্যাতন করে হত্যা করা হত এবং স্থানীয় লোকদের দিয়ে তাদের গর্ত করে কবর দেয়া হত।[৩৬] তপন কুমার সিংহ জানান, নাটোর কালীবাড়ি মন্দিরেও বহু মানুষকে ধরে নিয়ে আসা হত, নির্যাতন ও হত্যা করা হত। কালীবাড়িতে বলি দেয়ার খর্গ দিয়ে বলি দিত। সেখানে নিকটবর্তী পুকুরে গর্তে ফেলে দেয়া হত মৃতদেহ গুলো।[৩৭]

১৬ই এপ্রিল চৌকির পাড়ে প্রবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনী। সেখানে পিয়ন হাফিজুর রহমানকে হত্যা করে। হিন্দু অধ্যুষিত চৌকির পাড়ের বহু হিন্দু পরিবার কয়েকদিন অন্য স্থানে লুকিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে ঘাতক দালাল (স্থানীয় লোকেদের) কথায় নিরাপদ মনে করে তাঁরা অনেকে বাড়ি ফিরে আসে। ১৯শে এপ্রিল পুনরায় দালালদের পরামর্শে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ফিরে আসে চৌকির পাড়ে। এ-এলাকার হিন্দুরা মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করছে বলে তাদের জানায় দালালরা।

১৯শে এপ্রিল রাত ১২টার পর চৌকির পাড় আক্রমণ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দালালদের সহযোগীতায়। উত্তর চৌকিরপাড়ের নিতাই চন্দ্র বাগচী জানান,

> গভীর রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সাথে নিয়ে আসে দালালরা। তারা জানতে পেরেছিল যে বাগচী বাড়িতে মুক্তিযোদ্ধাদের স্থান দেয়া হয়েছে। এখবরটি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রধান নওশের আলী খানকে জানায় হাফেজ, মফিজ প্রমুখ রাজাকার দালালরা। কালীচন্দ্র বাগচী, কানাইলাল বাগচী, দুলাল বাগচী ও মতি বাগচী সহ তাঁদের ও আশে পাশের বাড়িগুলোতে আশ্রয় নেয়া বহু মানুষকে লাইন করে নিকটবর্তী খালের পাশে দাঁড় করায়। পরে তাঁদের অনেককে বেয়োনেট দিয়ে আঘাত করে এবং অনেককে গুলি করে। নিতাই চন্দ্র বাগচীর পেটে বেয়োনেট চার্জ করলে তিনি মরার মত পড়েছিলেন। কালী বাগচীর ভাইয়ের স্ত্রীসহ পার্শ্ববর্তী আরেকটি বাড়ি থেকে একজন মহিলাকে তুলে নিয়ে যায় তারা। পরে নির্যাতন করে ছেড়ে দিয়েছিল।[৩৮]

সমীপ বাগচী জানান, যখন সকলকে লাইনে দাঁড় করে হত্যা করছিল, তিনি কোনমতে সে স্থান থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। কালী বাগচীদের বাড়ির কর্মচারী সোনা দাস, অনুরোধ দাসকেও অত্যাচার, নির্যাতন করে বেয়েনেট र्जर्জ করে। অনুরোধ বেঁচে যান, তবে সোনা দাস মারা যায় গুলি লেগে।[৩৯]

সাবিত্রী বিশ্বাস জানান, ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর ছোট ভাই ভবেশ দাসকে তুলে নিয়ে বেয়নেট চার্জ ও গুলি করে হত্যা করে। ভবেশ দাসের পিতার উপরও একই ভাবে অত্যাচার করলেও সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান।[৪০]

চৌকিরপাড়ের স্থানীয় প্রভাবশালী রসুল সরকারকেও নাটোর থানায় নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করা হয়। দক্ষিণ চৌকিরপাড়েও একই সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা আক্রমণ করে নিরীহ বাঙালির উপর। প্রদীপ কুমার দাস জানান, তাদের পরিবারের পাঁচ জনকে হত্যার কথা। তিনি বলেন,

> শ্রী ভাদু চন্দ্র দাস, শ্রী দীলিপ কুমার দাস, ফকির চন্দ্র দাস, হরেন্দ্রনাথ, শম্ভু দাস প্রমুখ সহ আরও বহু মানুষকে বেয়ালেট চার্জ ও গুলি করে হত্যা করে নিকটবর্তী দিঘির পাড়ে অবস্থিত একটি স্থানে যেখানে বর্তমান নাটোর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অবস্থিত। সেখানেই সকল লাশ গুলো মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল।চৌকির পাড়ের মণি কুমার দাসকেও হত্যা করা হয় উত্তর চৌকির পাড়ে।[৪১]

হরিদাসী মোহন্ত জানান, পাকিস্তানি হানাদার আসছে শুনে অনেকে পালিয়ে গেলেও তাঁর ছেলে দুলাল মোহন্ত ও দেবর কালিপদ মোহন্ত বাড়িতেই থেকে গেল। পাকিস্তানি বাহিনী ও দালালরা আক্রমণ করলে দুলাল মোহন্ত গাছের উপর উঠে জীবন রক্ষা করতে পারলেও কালিপদ মোহন্তকে হত্যা করে হানাদার বাহিনী।[৪২]

প্রদীপ কুমার দাস জানান, স্থানীয় লোকদের (যুবক বৃদ্ধ) বাড়ি থেকে বের করে এনে “পাকিস্তান জিন্দাবাদ” স্লোগান দিতে থাকে বর্বররা। তারা বৃদ্ধদের গুলি করে। আর যুবকদের প্রায়ক্ষেত্রে বেয়োনেট চার্জ

করে। দিলীপ চন্দ্র দাসকে বেয়োনেট চার্জ করার পর তিনি ঐ অবস্থায় কাঁতরাতে কাঁতরাতে বাড়ি আসেন। মায়ের কাছে জল পান করতে চাইলো। কিন্তু মুখে প্রচন্ড আঘাতে জল দিলেও তিনি তা মুখে নিতে পারছিলেন না। ঐ অবস্থায় ওখানেই তার মৃত্যু হয়।[৪৩]

মাধব চন্দ্র দাস সাক্ষাৎকারে জানান,

> তিনি ঘরে বসে দর্জির কাজ করছিলেন। এমন সময় তাঁকে এবং তাঁর দাদা যাদব চন্দ্র দাসকে বাবা, মাসতুতো ভাই রবি সহ, তাঁদের বাড়িতে আশ্রিত নারায়ণ ঠাকুর, মনি রায়, গোপাল দাস সহ প্রায় ৪০-৫০ জনকে একত্রে লাইনে দাঁড় করে বেয়োনেট চার্জ ও গলি করা হয়। মাধব চন্দ্র ও যাদব চন্দ্র সহ অনেক সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান।মনি রায়কে বলি দেয়ার খর্গ দিয়ে হত্যা করা হয়। আকালু ঠাকুর নামক একজন পুরোহিতকে নিকটবর্তী বঙ্গজল নামক স্থানে পাঁচ রাউন্ড গুলি করে হত্যা করে ঘাতকরা।[৪৪]

চৌকিরপাড়ে হত্যাযজ্ঞের পাশাপাশি নির্যাতন, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগও করা হয়। দিপালী রায় জানান, পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে-"এ্যা তেরা আধমি কাহা হ্যায়?" দিপালী জানান বাড়ি নেই। পড়ে সে হিন্দু কিনা জানতে চায়। এক পর্যায়ে তাঁর কাছে সংরক্ষিত টাকা-পয়সা জোর করে নিয়ে যায়। দিপালীর আট বছরের ছেলেকে ধরে নিয়ে যেতে চাইলে তাঁর শাশুড়ীর অনুরোধে ছেড়ে দেয় তাঁরা।[৪৫]

২৩/২৪শে এপ্রিল এর দিকে হানাদার বাহিনী হালসা আক্রমণ করে। নাটোর সদর উপজেলার আওয়ামী লীগ সভাপতি মোঃ ওসমান আলী প্রামাণিক জানান, পাকিস্তানি বাহিনী শান্তি কমিটির প্রধান কচিম উদ্দিন (পোস্ট মাস্টার) এর সহযোগিতায় এ এলাকায় প্রবেশ করে। কচিম উদ্দিন, রাজাকার মিয়ার উদ্দিন প্রমুখ দালালরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে জানায়, বিপ্রহালসা গ্রামের হরিদাস ও বরদাচরণ রায় প্রভাবশালী হিন্দু ব্যক্তি দু'জন মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করে। সে যাত্রায় হানাদার বাহিনী চলে যায়। ২৪শে এপ্রিল পুনরায় হালসা আসে এবং বরদাচরণ রায়কে নিজ বাড়িতে গুলি করে হত্যা করে। হরিদাসকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় সিংড়া থানার হাতিয়ানদহে। সেখানে তাঁকে হত্যা করে। এরপর হালসার বহু বাড়ি ঘর লুটপাট করে অগ্নিসংযোগ করে।[৪৬]

ছাতনী ইউনিয়নে ৩রা/৪ঠা জুন (১৯ জৈষ্ঠ্য বঙ্গাব্দ), নাটোর শহরের সবচেয়ে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা। এ ইউনিয়নের প্রায় ৪৫০ মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে এরসংখ্যা ৪৮০ এর উপরে বলে দাবি করা হয়। এছাড়া এ এলাকার বহু নারী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার দোসরদের হিংসা লালসার শিকার হয়েছিল বলে জানা যায়। ৩রা জুনের আগেও বহু দালাল রাজাকার এ এলাকায় আক্রমণ করার চেষ্টা করলেও স্থানীয় লোকজন প্রতিরোধ গড়ে তোলার কারণে তা ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে তারা আরও ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে। ৩রা জুন ভোর রাতে পুরো ছাতনী ইউনিয়ন ঘিরে ফেলে হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা। সকাল প্রায় ১১টা পর্যন্ত তারা পুরো ছাতনী ইউনিয়নে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করে। ছাতনী, ভাবনী, মাঝদিঘা প্রভৃতিসহ এ ইউনিয়নের প্রায় সব গ্রাম থকে বহু মানুষকে ধরে নিয়ে আসা হয় ছাতনী স্লুইস গেইটে। সেখানে লাইনে দাঁড় করে কাউকে গলায় দা, ছুড়ি প্রভৃতি ধাঁরালো অস্ত্র দিয়ে, কাউকে গুলি করে হত্যা করা হয়। নিকটবর্তী সরকারের পুকুরে প্রায় ৭৮টি মৃতদেহকে এসিড ঢেলে পুরিয়ে দেয়া হয়। ঘরে, জঙ্গলে, ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকা মানুষদের টেনে বাইরে এনে হত্যা করা হয়। বহু মহিলাদের ঘরে দরজা লাগিয়ে, কোন নারীকে ক্ষেতে,

জঙ্গলে নিয়ে নির্যাতন করে। কখনও গণধর্ষণের শিকারও হয় বহু নারী। মোঃ নুরুল ইসলাম জানান, মনির উদ্দিন সরকার ছাতনী গ্রামের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গ্রামের মানুষের জীবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন নিজের জীবনের বিনিময়ে। কিন্তু তাঁর সে আর্তি না শুনে তাঁর গায়ের চামড়া উঠিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে তাঁকে। তাঁর গ্রামের মানুষদেরও রেহাই দেয়া হয়নি।[৪৭]

মোঃ আবুল কাশেম বলেন,

> এ ইউনিয়নে ছিল আওয়ামী লীগ নেতা শঙ্কর গোবিন্দের বাড়ি। এছাড়া বিহারী বাঙালী সংঘর্ষে এ এলাকার মানুষেরও অংশগ্রহণ ছিল। একবার আক্রমণ করতে এসে ব্যর্থ হয়েছে। ফলে ৪ঠা জুন ফজরের আজানের সময় তারা পন্ডিত গ্রাম হাড়িগাছার মধ্য দিয়ে ছাতনী গ্রামে আসে। তারা প্রথমেই আহাদ খামারুকে হত্যা করে। সে ছাতনী স্কুলের পাকিস্তানি দিয়ে বন্ধুর বাড়ি থেকে আসছিল। তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করে। এরপর ছাতনিসহ আশেপাশের গ্রাম থেকে বহু মানুষকে বের করে এনে হত্যা করে। ভাবনী গ্রামের কালা মিয়া, রুহুল আমিন এদের ঘাড়ে কুপিয়ে হত্যা করে।[৪৮]

মোঃ মফিজ উদ্দিন জানান, হোবিয়া নামক এক নারীকে জোরপূর্বক আখ খেতে ধর্ষণ করে হানাদাররা। এত মানুষকে মেরেছিল যে, তাঁদের অনেককে একই কবরে কবরস্থ করতে হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। কোন কোন কবরে ৫জন, কোনটিতে ১০-১১ জন।[৪৯] ছাতনীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন জানান, বটগাছের উপরে উঠে তিনি লুকিয়ে দেখতে পেলেন নিকটবর্তী রাজিব ভাট গ্রামের পশ্চিম দিকের মাঠে ২-৩ জনের গলা কাটা, গুলি খেয়ে মরে আছে। নাটোর তাহের পুর রোডে ৪-৫ জনকে মেরে রেখেছে যেখানে মনির সরকারও ছিল। তাঁর গলা কাটা ছিল।[৫০]

মোঃ মকসেদ আলী মোল্লা জানান, এক দল মিলিটারি অত্যাচার নির্যাতন করে একটি মেয়েকে। কাছেই একটি আখ ক্ষেতে আব্দুল জব্বারকে গলায় ফাঁস দেয়া হয়। পরে তাঁর প্রাণ আছে জানতে পেরে তাঁকে স্থানীয় কয়েকজন তাঁকে মির্জাপুর ডাক্তারের কাছে পাঠালে তিনি বেঁচে যান। ভেটি গাছের উপুর উপর হয়ে পড়ে থাকতে দেখা যায় কেকু প্রামাণিককে। তাঁর মাথায় ইট ঢুকে এর অংশ ঢুকেছিল। মানসিক ভারসাম্যহীন ছাতনির সীতা নাথ ঘোষ সকালে জেলাপরিষদের কাছে এসে "জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু" স্লোগান দিচ্ছিল। তাঁকে সেখানেই ব্রাশ ফায়ার করে হত্যা করে পাকিস্তানি সৈন্যরা।[৫১] আব্দুল গফুর সরকার জানান, ছাতনী স্কুলের পিয়ন লকুব উদ্দিন ও কালা মিয়াকে শ্বাস রুদ্ধ করে হত্যার চেষ্টা করা হয়। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান তিনি অনেক লাশের উপর এসিড ঢেলে দেয়া হয়।[৫২]

আবুল কালাম মাস্টার জানান, ছাতনির পূর্ব দিকের একটি পাটের জমিতে কয়েকজন মহিলা লুকিয়েছিলেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা দেখতে পেয়ে তাঁদের ধরে ফেলে ও ধর্ষণ করে। একটি মহিলার কোলে থাকা বাচ্চাটিকে পানিতে ফেলে দিয়ে মহিলাটিকে ধর্ষণ করে। সৈয়দ আলী মুন্সী (বয়স্ক) আখের ক্ষেতে লুকিয়ে ছিলেন। তাঁকেও রামদা দিয়ে হত্যা করে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও বিহারীরা দুইবার এসেছে এবং নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।[৫৩]

নুরুল আমিন ভূঁইয়া বলেন, রুহুলআমীনকে হানাদার বাহিনী স্লুইচগেইটে যেতে বললে তিনি রাজি হলেন না। তখন তারা তাঁর হাত বেঁধে বাড়ি থেকে বের করে আনে। বলে "স্লুইচগেইটে অফিসার এসেছে, আপনাদের যেতে হবে।"[৫৪] পাকিস্তানি সৈন্যরা এক মহিলার গহনা লুট করে তাঁকে ধর্ষণ করে। আরেক মহিলা

মিলিটারিরা যাতে তাঁকে না ধরে সেজন্য নিজের গায়ে শরীরে মলমূত্র মাখলেও তারা তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।

ভাবনী গ্রামের আবু তাহের জানান,

> তাঁর পিতা চান মিয়াকে পাকিস্তানি সৈন্য ও বিহারীরা আক্রমণ করলে তিনি অন্ধ বলে নিজের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। শুকবাস মন্ডলকে গুলি করলে তাঁর মগজ বের হয়ে গিয়েছিল। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো মুগুর দিয়ে থেতো করে দিয়েছিল।ছাতনীর উত্তর পাড়ার কালা পালকে ছুরি দিয়ে হত্যা করে।আয়ুব আলীকে রড দিয়ে বাড়ি দিয়ে হত্যা করে এবং তাঁর স্ত্রীকে নির্যাতন করে ফেলে রেখে যায়। আবু তাহের জানান, সবের নামক এক ব্যক্তিকে ইসলাম বিহারী ধরে। পরে পরিচিত বলে সে প্রাণে বেঁচে যায়। আবু তাহেরের পিতা বিহারীদের আম খাইয়ে খাতির করলে তাঁকে ছেড়ে দেয়। এভাবে ভোর ৪টা থেকে সকাল ৯টা পর্যন্ত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও বিহারীরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে ছাতনীকে। হত্যা, নির্যাতন লুটপাট করতে থাকে। এরপর থেকে দিনে পালিয়ে থেকে ও রাতে বাড়ি এসে থাকত এলাকার বহু মানুষ। সকলের মনে আতঙ্ক বিরাজ করছিল।[৫৫]

গোবিন্দ চরণ সাক্ষাৎকারে বলেন, তেবাড়িয়া মহাসড়কে অবস্থিত ব্রিজ (নারোদ নদীর উপর)-এ এনে বহু লোককে হত্যা করত পাকিস্তানি হানাদার ও বিহারীরা। দিঘাপতিয়া ক্যাম্প নিকটবর্তী হওয়ায় মাঝে মাঝেই এ এলাকায় আক্রমণ করত। রইছ উদ্দিন সরকার ও রজব আলী নামক স্থানীয় দুইজন ব্যক্তি বাধা দিলে তাঁদের গুলি করে হত্যা করে সেখানেই।[৫৬]

ঢাকা-নাটোর সড়কের নিকটবর্তী লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া ইউনিয়নে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করেছিল বেশ কয়েকবার। যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম ছিল আহমেদপুর ব্রিজ যেটি লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া পার্শ্ববতী সংলগ্ন এলাকা। লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়ার অন্যতম এলাকা কাদিম সাতুরিয়ার বহু মানুষকে হত্যা করেছিল হানাদার বাহিনী। মোঃ মজিবর রহমান ভূইয়া জানান, মুক্তিযোদ্ধা আক্তারুজ্জামান বাড়ির সবার খোঁজ নিতে বাড়ি এলে নিকটবর্তী ক্যাম্পে থাকা রাজাকাররা খবর পেয়ে যান। হানাদার বাহিনী নিয়ে এসে আক্তারুজ্জামানকে বাড়ি থেকে বের করে রাস্তায় নিয়ে এসে অত্যাচার পূর্বক গুলি করে হত্যা করে। ছেলে আক্তারুজ্জামান মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল, সেই অপরাধে বৃদ্ধ পিতা নাছির উদ্দিন ভূঁইয়াকেও বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ২৭শে এপ্রিল। পরে তাঁর আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। বাড়িঘর লুটপাট করে পুঁড়িয়ে দিয়েছিল তাঁরা।[৫৭]

মোঃ ইছহাক আলী জানান,

> মোঃ হায়দার আলী প্রাংকে স্থানীয় রাজাকার নীল মিয়া ও মিয়া পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে এসে ধরে নিয়ে গিয়েছিল (CNB)ডাকবাংলোতে। তাঁর পরিবারকে জানিয়েছিল এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সই নিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনতে। কিন্তু কোন সই-এর ব্যবস্থা না হওয়ার তাঁকে আর ফেরত দেয়া হয়নি। জানা যায়, আত্রাই নিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।[৫৮]

শহীদ আমীর আলীর পুত্র মোঃ ইব্রাহিম মিয়া মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল বলে তাকে গুলি করে হত্যা করে রাজাকার ও পাকিস্তানি হানাদাররা। তাঁর সাথে খোলাবাড়িয়ার আব্দুল আজীজকেও হত্যা করা হয়। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধা শহিদ মিয়া ও মুক্তিযোদ্ধা রইচ উদ্দিনকেও রাজাকার আলবদর তুলে নিয়ে গিয়ে ক্যাম্পে অত্যাচার করে হত্যা করে।

মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী শামসুদ্দিনকেও একই ভাবে হত্যা করা হয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আসার সময় আহমেদপুর ব্রিজের পূর্বপাড় কেটে দিল সাহসী পুলিশ, ই.পি.আর ও জনগণ। বাধা পেয়ে তারা কাদিম সাতুরিয়ার পাল পাড়ায় (হিন্দু পাড়া) প্রবেশ করে। সেখানে গ্রামের ব্যবসায়ী সুকুমারকে ধরে। খবর শুনে স্থানীয় ক্ষীতেন, ধীরেন্দ্র মন্ডল সহ অনেকেই আসেন ছাড়াতে। কিন্তু তাঁরা নিজেরাও বিপদে পড়ে। এঁদের সকলকে নির্যাতন করে আহমেদপুর ব্রিজের উত্তর পাশে গুলি করে হত্যা করে বলে জানান সুধাংশু কুমার সরকার। আহমেদপুর ব্রিজের নিচে প্রবহমান নদীর তীরে প্রায়ই বহু মানুষকে মেরে ফেলে রাখা হত বলে স্থানটি দুর্গন্ধময় হয়ে উঠেছিল সে সময়।[৫৯]

৩রা মে ১৯৭১, বড়াইগ্রাম থানার বনপাড়া মিশন থেকে ফতেঙ্গাপাড়া গ্রামে প্রায় ১০০ জনকে ধরে নিয়ে এসে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বনপাড়া মিশন খ্রিস্টানদের বলে নিরাপদ মনে করেছিল লালপুর সহ অন্যান্য থানার মানুষেরা। লালপুর থেকে প্রায় দুই তিনশত লোক আশ্রয় নিয়েছিল সেখানে। লালপুর থানার ধলা ও সেকচিলান গ্রামের বহু মানুষ ছিল আশ্রিত। রাজাকার ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এসব আশ্রিত নারী পুরুষদের ৩রা মে বনপাড়া মিশন থেকে ধরে নিয়ে এসে প্রায় ১৫০ থেকে ২০০ মানুষকে হত্যা করে।

শ্রীমতি বুলু বালা দাসী জানান,

> লালপুরে পাকিস্তানি হানাদাররা এসেছে শুনে ধলা ও সেকচিলান গ্রামের মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল বনপাড়া মিশনে। রাজাকারদের পরামর্শে হানাদার বাহিনী সেখানে আক্রমণ করে এ দুই গ্রাম সহ বহু মানুষকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তবে ধলা গ্রামের বৃদ্ধ, শিশু ছাড়া সকল পুরুষ লোককে হানাদাররা হত্যা করে ফতেঙ্গাপাড়া নিয়ে গিয়ে। এ গ্রামকে বিধবাদের গ্রাম বলা হয়।
>
> হালাসা ইউনিয়নের নিরাপদ দাস ও হরিপদ দাসকেও বনপাড়া মিশন থেকে ধরে এনে হত্যা করা হয়। হরিশপুরের আওয়ামী লীগ সদস্য কাশেম মিয়াকে কাপড়ের দোকান থেকে তুলে নিয়ে এসে ফতেঙ্গাপাড়ায় হত্যা করা হয়। তাঁর কাছে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা পেয়েছিল এবং তাঁর সাথে আরও পাঁচজন লোককে হত্যা করে যাদের পরিচয় জানা যায়নি।[৬০]

ঢাকা মহাসড়কের পাশে অবস্থিত মিঠাপুকুর ব্রিজের কাছে গুলি করে হত্যা করে মাহবুব আলী সেলিমকে।

মল্লিকহাটিতে অবস্থিত লিয়াকত আলী ব্রিজের নিচে (পশ্চিম পাশে) হানাদার বাহিনী আতাউর রহমান আতা, অবিনাশ ও শামসুল হুদা হ্যাপীকে নারোদ নদীর তীরে অত্যাচার করে, গুলি করে হত্যা করে। নাটোর পাওয়ার হাউজের এলাকাতেও অনেক মানুষকে হত্যা করে ফেলে রাখা হত বলে জানা যায়। মোঃ আব্দুর রহিম জানান, হাজী আব্দুল করিম ও সেনাবাহিনীর জমসেদকে হত্যা করে ফেলে রাখা হয় এখানে। এছাড়া অজ্ঞাত অনেকের লাশ সেখানে রয়েছে বলে জানা যায়। ছাত্রলীগ কর্মী বাবুল ও তাঁর বাবা আ: রশিদ খানকে অবাঙ্গালী রাজাকাররা ধরে নিয়ে যায় দিঘাপতিয়া ক্যাম্পে। তারা আর ফিরে আসেনি। রেজাউল নবীকে ১৫ই মে রাজাকাররা গুলি করে হত্যা করে। তিনি এন এস কলেজের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন।[৬১] নাটোর সদর-এ যুদ্ধচলাকালীন প্রায় পুরো সময়টাতে রাজাকার আলবদর ও হানাদার বাহিনী বিভিন্নভাবে বহু মানুষকে হত্যা, নির্যাতন করে। বাড়িঘর লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করেছিল। পুরো নাটোর শহর যেন মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়েছিল।

## নাটোর সদর থানায় নারী নির্যাতন

সমাজে নির্যাতিত নারীদের দুঃসহ, নানা যন্ত্রণা, নানা সমালোচনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। ১৯৭১ সালে নির্যাতিত বহু নারীই তাদের জীবন নতুনভাবে শুরু করেছেন। ফলে সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার্থে নিজেদের সেই দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা বলতে চাননি অনেকেই। আর একারণেই এই অভিসন্দর্ভে তাদের মূল ঘটনা ঠিক রেখে নামের ক্ষেত্রে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে।

**১. হাছিনা আখতার :** নাটোর সদর থানার ৭নং ওয়ার্ডের উত্তর বরগাছায় বাড়ি আখতারের। বাবার বাড়ি ছিল নাটোরের দিঘাপতিয়ার ঠাকোপাড়ায়। বিয়ে হয়েছিল নাটোরে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে নাটোরে মুক্তিকামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার দিয়ে সহযোগীতা করতেন। ফলে একদিন তাঁর স্বামীকে রাজাকাররা ধরে, এবং বলে স্ত্রীকে নিয়ে আসতে। কিন্তু স্ত্রীকে না নিয়ে আসায় তাকে সে যাত্রায় মারধর করে ছেড়ে দেয়। মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করা স্বামীর পছন্দ ছিল না। তারপরও হাছিনা আখতার তিন ছেলে মেয়েকে বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তেবাড়িয়া ইউনিয়নের বালিয়াডাঙ্গা ক্যাম্পে যায় সহযোগিতা করতে। সেখানে এক পর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে এবং তাকে নাটোর ফুলবাগান (বর্তমানে উপজেলা পরিষদ) ক্যাম্পে নিয়ে যায়। সেখানে ৩-৪ দিন রেখে ধর্ষণ করে তার সাথে বিভিন্ন স্থান থেকে আনা আরও ৫-৭ জন নারী ছিল। তাদেরও অত্যাচার করত। ১৬ই ডিসেম্বর সবাই যখন ব্যস্ত পাকিস্তানিরা আত্মরক্ষায় তখন পালিয়ে নিজের জীবন বাঁচান। কিন্তু বাবার বাড়িতে ঠাঁই হল না তার। ৬-৭ বছর অন্যের বাড়ি কাজ করে চলত। ছেলে মেয়ে পরে চলে আসে। সমবায় এ চাকুরী গ্রহণ করে বয়স্ক শিক্ষা নিয়ে। অকর্ম স্বামীর মৃত্য হলে সন্তানদের নিয়ে সংগ্রাম করতে থাকেন।

**২. শাহীনা খাতুন :**বড় হরিশপুর ইউনিয়নের গোয়ালডাঙ্গা গ্রামে বাস করতেন শাহীনা খাতুন । তখনও বিয়ে হয়নি। বড় বোনের স্বামী জাফর ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। যুদ্ধ শুরু হলে জাফরের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে লক্ষীপুর ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের খাবার, ঔষুধ দিয়ে সেবা করতে থাকেন। বাবার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সেখানে গিয়েছিলেন। তাই পিতার সাথে দেখা করতে বাড়ি এলে রাজাকার ও পাকিস্তানি সৈন্যরা ধরে নিয়ে ফুলবাগান (দিঘাপতিয়া) ক্যাম্পে ধরে নিয়ে যায়। ৩-৪দিন ধরে তাকে অমানুষিক ভাবে ধর্ষণ করা হয়। পরে একদিন যন্ত্রনায় পালিয়ে চাচাত বোনের বাড়ি এলে পিতা তাকে বাড়ি নিয়ে আসে। বিয়ে হলে ৬ মাস পর প্রথম স্বামী ছেড়ে দেয়। এরপর বাবার বাড়ি ফিরে এলে পুনরায় বিয়ে হয় সতীন আছে এমন ঘরে। দুটো মেয়ে হলে সেও ছেড়ে দেয় ঘটনা জানারপর। বর্তমানে সমিতি করে জীবন চলে।

**৩. আশা বেগম :** বড় হরিশপুর ইউনিয়নে বিয়ে হয়েছিল আশা বেগমের। নবম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর আনসার প্রশিক্ষণ নিয়ে ছিলেন। স্বামীর বন্ধু মুক্তিযোদ্ধা বাবর আলীর তাদের সহযোগিতা করতেন। পাকিস্তানি বাহিনী তা জানতে পারলে তাকে তিনি পালিয়ে যান বালিয়াডাঙ্গা (তেবারিয়া ইউনিয়ন) মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে। সেখান থেকে পাকিস্তানিরা তাকে ধরে নিয়ে ফুলবাগান ক্যাম্পে যায় ও সেখানে ধর্ষণ করে। পরে সেখান থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। কিন্তু ফিরে এলেও স্বামী গ্রহণ করল না। সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করে। শাশুড়ীর কাছে সন্তানরা ছিল। খালার ভাসুরের কথায় শাশুড়ী মেনে নিয়োছিল। স্বামী আলাদা থাকত। সেলাইয়ের কাজ করে সন্তানদের মানুষ করেছেন এই বীরাঙ্গনা নারী।

**৪. রেবা বগম :** নাটোর পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের কান্দিভটা গ্রামে বাস করতেন গোলজান বেওয়া। একদিন হঠাৎ পাকিস্তানি বাহিনী আসো বাড়িতে। আশে পাশের কয়েকজন মহিলা সহ নিকটবর্তী খায়েজ মিয়ার শূন্যবাড়িতে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে এবং সেখানে ধর্ষণ করে সকলের উপর। স্বামী নজর উদ্দিন মৃধা গ্রহণ করেছিল তাকে।

**৫. গোলাপজান :** মৃত আয়ুব আলীর স্ত্রী গোলাপজান বাড়ি ছাতনী ইউনিয়নে। পাকিস্তানি সোনারা বাড়ি থেকে তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে একটি আখের ক্ষেতে ধর্ষণ করে ফেলে রেখে যায়।

**৬. জোহরা বেগম :** ছাতনী ইউনিয়নের দত্তের বাগানে জোহরা বেগমের বাড়ি ছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্থানীয় সহযোগীদের নিয়ে আক্রমণ করে বাড়ি। গ্রামের কয়েকজন মহিলা সহ একটি ঘরে তারা আশ্রয় নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। কিন্তু পাকিস্তানিরা তা টের পেয়ে ঐঘরের মধ্যেই একে একে জোহরা বেগম সহ সকলকে ধর্ষণ করে। পুনরায় বিয়ে হয়েছে তার। পূর্বের স্বামীকে মেরে ফেলেছিল পাকিস্তানি বাহিনী।[৬২]

**৭. শহীদ বাদলের স্ত্রী: ১**নং ওয়ার্ডের উত্তর চৌকির পাড়ে এ শহীদ বাদলের স্ত্রীকে পাকিস্তানি বাহিনী ধরে নিয়ে যায় ও ধর্ষণ করে। পরবর্তীতে পাকিস্তানি ঔরসে তার একটি মেয়ে হলে ভারতে চলে যায়।

## নাটোর সদর উপজেলার নির্যাতন ও গণহত্যা

নাটোর সদর উপজেলার নির্যাতন ও **১৫**টি গণহত্যা সহ অন্যান্য গণহত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

### ফতেঙ্গাপাড়া গণহত্যা

নাটোর জেলা সদর থেকে ৫ কিলোমিটার দক্ষিণ পূর্বে অবস্থিত বড় হরিশপুর ইউনিয়ন। **১২**ই এপ্রিল পাকিস্তানি বাহিনী নগর বাড়ীঘাট থেকে পাবনা হয়ে নাটোরে প্রবেশ করে। সে সময় নাটোর আল-মাদ্রাসাতুল জামহুরীয়ার অধ্যক্ষ ছিলেন পশ্চিমা অবাঙালি হাফেজ আব্দুর রহমান (রাজাকার বাহিনীর প্রধান) তার নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনী ৩-৪ বার বহু স্থান থেকে লোকজন নিয়ে এসে ফতেঙ্গাপাড়া গ্রামে তাদের নির্যাতন ও হত্যা করে খালে ভাসিয়ে দিত। আবার অনেককে মাটিতে গর্ত করে ফেলে রাখত। মূলত এ স্থানটি ছিল নীরব ও জনশূন্য। বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া ক্যাথলিক মিশন থেকেও বহু লোককে (প্রায় ১৫০জন) যারা আশ্রিত ছিল) ধরে নিয়ে আসা হয় ৩রা মের দিকে। এক্ষেত্রে সাহায্য করে ঘাতক হাফেজ আব্দুরের ছাত্র মোঃ আব্দুর রহমান। সে পাশের মোকরামপুর গ্রামের লোকদের জোর করে ধরে নিয়ে আসত লাশ কবরস্থ করবার জন্য। যারা তার আদেশ অমান্য করত, তাদের কে অত্যাচার করত। ফলে প্রাণভয়ে বাধ্য হয়ে আসত অনেকে। কোন লোক বেঁচে আছে দেখলেও তাকে জীবন্ত কবর দিতে বলত। পাশের খাল দিয়ে বয়ে যেত রক্তের স্রোত। এরপর পুনরায় ৭-৮ই মে এর দিকে পুনরায় কোথা থেকে যেন ৭-৮ জনকে ধরে নিয়ে এসে গুলি করে হত্যা করা হয়। কত মানুষকে যে হত্যা করা হয়েছে এখানে তার সঠিক হিসাব জানা যায় না। তবে তা অবশ্য ২০০'শ-এর উপরে।

মে মাসের মাঝামাঝি একদিন দুপুর বেলা প্রায় ৭জনকে ধরে নিয়ে আসে। সেখানে আব্দুস সালাম সরকার নামক একজন সমাজসেবক ছিলেন। তাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। স্থানীয় জনগণ গিয়ে তার

বুকের উপর একটি কোরান শরীফ পেয়েছিল। এছাড়া হরিশপুরের আওয়ামীলীগ সদস্য কাশেম মিয়ার ভাইকে ধরে নিয়ে আসে দোকান থেকে। তার কাছে বাংলাদেশের মানচিত্র থাকত পতাকা ছিল, তা দেখে তাকে ধরে নিয়ে আসে ও ফতেঙ্গাপাড়াতে হত্যা করে। এছাড়া হালসা ইউনিয়নের হরিপদ দাস ও তাঁর ছেলে নিরাপদ দাস কেও ধরে আনে বনপাড়া থেকে। তাদেরকেও গুলি করে হত্যা করে এখানে। যারা মারা যেত, তাদের পকেট হাতিয়ে টাকা-পয়সা, সোনা যা পেত নিয়ে নিত দালালরা এছাড়া অগ্নি সংযোগ, লুটপাট ছিল গণহত্যা নির্যাতনের মত নিত্য সঙ্গী।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে হানাদার বাহিনী লালপুরে প্রবেশ করলে কদমচিলান ও সেকচিলান ইউনিয়নের বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল বড়াই গ্রাম থানার বনপাড়া মিশনে। পথে তারা বড়াই গ্রাম থানার মাঝগ্রাম ইউনিয়নের প্রভাবশালী ময়েজুদ্দিন এর বাড়ি (মানিকপুরে) আশ্রয় নিয়েছিল। গ্রামের সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নেয় বনপাড়া মিশনে আশ্রয় নেয়ার। সবাই সেটাকে নিরাপদ মনে করছিল। কারণ তখন হিন্দু মুসলিমদের উপরই বেশি নির্যাতন হচ্ছিল। সবাই মিলে ২রা মে বনপাড়া মিশনে আশ্রয় নিয়েছিল। তারপরও শেষ রক্ষা হয়নি। ৩রা মে বনপাড়া মিশনে বিভিন্ন স্থান থেকে আশ্রয় নিয়েছে বহু মানুষ। খবরটি পৌঁছে দেয় ঘাতক দালালরা। হানাদার বাহিনী পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কুখ্যাত মেজর শেরওয়ানীর নেতৃত্বে হাজির হলো এই মিশনে। তার সঙ্গে ছিল কুখ্যাত জল্লাদ হাফেজ আবদুর রহমান। হানাদাররা বনপাড়া মিশনে আশ্রিতদের টেনে বের করে আনল। সেখানকার ফাদার পিনস তাঁদের জন্য প্রাণ ভিক্ষা চাইলে। কিন্তু তাঁর কোনও অনুরোধ রাখা হল না। অনেকে পালাতে চেষ্টা করলে তাঁদের উপর অত্যাচার করে ঘাতকরা। এরপর তাদের নিয়ে যায় নাটোর শহরের দোয়াতপাড়া (নাটোর শহর থেকে তিন মাইল পশ্চিমে) থেকে অর্ধ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ফতেঙ্গাপাড়া গ্রামে। অপর আরেকজন ক্যাপ্টেন নলবাতা ও গকুলনগর থেকে ৬০ জন বাঙালিকে ধরে নিয়ে আসে এই গ্রামে। এই মর্মান্তিক হত্যাযজ্ঞের সাক্ষী জমির উদ্দিনকে উদ্ধৃত করে 'পূর্বদেশ' প্রতিনিধি লিখেছেন:

> সময় ৮টা। চারিদিক নিস্তব্ধ। পার্শ্বস্থ গ্রামগুলোর নরনারী ও শিশু সেনাবাহিনীর ৬-৭টি গাড়ি একত্রে দেখে আতঙ্কে ঘর-বাড়ি ফেলে ঝোঁপঝাড় ও পানির খালে আশ্রয় নেন। এজিদ আবদুর রহমান নিকটবর্তী গ্রামে প্রবেশ করে জমির উদ্দিনসহ ৮ ব্যক্তিকে কোদাল এবং মাটিকাটা ডালি (ঝুঁড়ি) নিয়ে আসতে বাধ্য করে। জমির উদ্দিন (৩৩) বেঁচে আছেন। গ্রাম্য কৃষক। প্রত্যক্ষ করেছেন কি করে ঐ রাতে খান সেনারা নির্দয়ভাবে ১৫৭ জন নরনারীকে হত্যা করেছে। দোয়াতপাড়ার অর্ধমাইল দক্ষিণে বড়াই গ্রামে সড়কের দুধারে দুটি খেজুর গাছ দাঁড়িয়ে আছে। অদূরে একটি ছাইতন গাছ। গাছটিকে বাঁয়ে ফেলে প্রবাহিত হয়েছে রামপুরা খাল। এই খালেই বহু নরনারীকে হত্যা করেছে।[৬৩]

তিনি লিখেছেন,

> ...প্রথমে তিজন লোককে ট্রাক থেকে নামানো হলো। ওদের হাত পরস্পরে বাঁধা। বাঁধন খুলে দিলো। মৃত্যু ভয়ে তিন জন একত্রে সড়কের বাঁ দিকে লাফিয়ে নেমে দৌড়াতে থাকে। পূর্বে বৃষ্টি হওয়ায় চারদিকে পানি কিংবা কাদায় পরিপূর্ণ ছিল। জমির উদ্দিন ও অপর দুই ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয় পলাতকদের ধরে আনতে। জমির উদ্দিন ও অপর দুই ব্যক্তিকে নির্দেশ দেওয়া হয় পলাতকদের ধরে আনতে। জমির উদ্দিন বাধ্য হয়ে পিছু নেয়। ততক্ষণে বনের পাখি খাঁচার বাইরে, মুক্ত। ট্রাক থেকে নামিয়ে আর কাউকেই বাঁধন মুক্ত করা হয়নি। ট্রাক থেকে দু এক জন করে একত্রে নামানো হলো। অর্ধ মৃতাবস্থায় এবার খালের দিকে নিয়ে যায় অপর দু'জন খানসেনা।

> দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় খালের ভেতর। একজন জল্লাদ টর্চের কৃত্রিম আলো নিক্ষেপ করে ওদের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে সঙ্গে পিছন থেকে গুলি চালায় দুজন খানসেনা। নিস্তব্ধ তাদের কণ্ঠ। চিরতরে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে খালে। এমনি নৃশংসভাবে সবাইকে হত্যা করা হয়েছে। অপর সাত জন সহ জমির উদ্দিন মাটি কেটে মৃতদেহগুলো ঢেকে দিতে উদ্যত হয়। কিন্তু একি। পানি চাইছে আহত কয়েকজন হতভাগ্য আদম সন্তান। ওরা মরেনি রক্তাক্ত দেহ। জমির উদ্দিন কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। হাফেজ রহমান ও শেরওয়ানী বাধ্য করে জীবন্ত মুমূর্ষু মানুষগুলোকে মাটি চাপা দিতে।[৬৪]

তিনি আরও লিখেছেন,

> ... অত্যন্ত পৈশাচিক। মাটিচাপা পড়ে জীবন্ত আহত ব্যক্তিগণ বাঁচার চেষ্টা চালায়। হাত দিয়ে মাটি সরাতে থাকে। মাটির ওপর কম্পন অনুভূত হয়। দুর্ভাগ্য। পুনরায় মাটি চাপা দেয়। জীবন্ত ব্যক্তিদের বাঁচার আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ করে দেওয়া হয়।... ৩রা মে-র পরও আরও বহুলোক এই খালে প্রাণ হারিয়েছেন। সমগ্র খালে বহু নর-নারীর হাড় হাড্ডি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে আছে। জমির উদ্দিন আমার অনুরোধে পুনরায় কোদাল ধরে মাটি কাটতে। মৃত ব্যক্তিদের গলিত ও পঁচা মাংস আজও খালের পানি ও মাটিতে মেশেনি। ভয়ানক দুর্গন্ধ। পরনের শাড়ি, লুঙ্গি ও জামা আজো মাটি চাপা পড়ে আছে।.... একদা কাক, চিল ও শকুনের দৌরাত্ম্যে খালের পার্শ্বস্থ গ্রামগুলোর জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। দিনে-দুপুরে কুকুরের মুখে মানুষের মৃতদেহ দেখেনি, এমন লোক এখানে নেই।[৬৫]

সাংবাদিক স্বপন দাস *মুক্তিযুদ্ধে নাটোর* নিবন্ধে লেখায় নলডাঙ্গা ও গোকুলনগর গ্রাম থেকে দত্ত পাড়ায় (ফতেঙ্গাপাড়া)ধরে আনা ত্রিশ জন বাঙালির কথা উল্লেখ করেছেন।তাদের হত্যার পর কবর দেয়ার জন্য প্রতিবেশী গ্রাম থেকে জমির উদ্দিনসহ আরো সাত জনকে জোর পূর্বক ধরে আনে। তাদেরকে গর্ত খোঁড়ার কাজ বুঝিয়ে দেয় 'বাইনচোৎ বাঙালি' গালি দিয়ে। অসহায় জমির উদ্দিন ও অন্যরা বাধ্য হয়ে মৃতদেহগুলো গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দিয়েছিল। সেখানে ১৫৭ জনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের নির্মমভাবে অত্যাচারের পর হত্যা করা হয়েছে। এরপর জমির ও তার সঙ্গীদের গর্তে ফেলে দিয়ে জীবন্ত কবর দেয়ার চেষ্টা করে। ঘাতকরা চলে গেলে জমির উদ্দিন ধীরে ধীরে ওঠে এসে জীবন রক্ষা করে। এরকমভাবে বহু মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল ফতেঙ্গাপাড়ায়।

### হালসা গণহত্যা

নাটোর শহর থেকে ১২ কি.মি. দূরে পূর্ব দিকে অবস্থিত এ ইউনিয়ন। শহর থেকে ছয় সাত কিলোমিটার পূর্বে বিপ্রহালসা গ্রাম।[৬৬]

নাটোর প্রবেশের ৩দিন পর অর্থাৎ ১৬ই এপ্রিলের দিকে পাকিস্তানি বাহিনী শান্তি কমিটির প্রধান কচিম উদ্দিন পোস্ট মাস্টার (ভারতে থাকা নিজের জমি এক হিন্দু ব্যক্তিকে দিয়ে ঐ ব্যক্তির হালসায় থাকা জমি নিয়ে সে বাড়ি করেছিল) ও আরেকজন রাজাকার মিয়ার উদ্দিন (তার বাড়ি ঢাকা জেলায় ছিল। পরে হালসায় বাড়ি করে) এবং বিপ্রহালসার শামসুদ্দিনের ছেলে ও শান্তিকমিটির রিয়াজউদ্দিন মিয়ারুদ্দিন, শান্তি কমিটির লাঠিয়াল গিয়াসউদ্দিন প্রমুখদের সহযোগিতায় হালসা আসে। বিপ্রহালসা গ্রামের হরিদাস রায় ও বরদাচরণ রায় অন্যতম বিশিষ্ট হিন্দু ব্যক্তিত্ব। তারা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করত। এটা জানতে পারে ঘাতক-দালালরা। প্রথম যাত্রায় পাকিস্তানি বাহিনী এলে তারা স্থানীয় শমসের আলীর বাড়ি লুকায়। সে যাত্রায় প্রাণে রক্ষা পেলেও পরে আবার আসে (৯ বৈশাখ, ১৯৭১ সালের ২৩/২৪শে এপ্রিলের দিকে) পাকিস্তানি বাহিনী।

বরদাচরণকে নিজ বাড়িতে হত্যা করে। হরিদাসকে ধরে নিয়ে সিংড়ার হাতিয়ানদহে হত্যা করে। এছাড়া হিন্দু, মুসলিম, রাজনৈতিক বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের বাড়িতে লুটপাট ও অগ্নি সংযোগ করে।

রায় হালসার ওলিমুদ্দি সরকার আওয়ামী লীগ সমর্থক। তার বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল। এছাড়াহালসা থেকে সিংড়ার কলম ইউনিয়নে আশ্রিত সুবল যাহা যিনি আওয়ামী লীগ করত, তাকেও হত্যা করে কলমে। শহীদ বরদাচরণের পুত্র অধ্যাপক ঘণেন্দ্রনাথ রায় সাক্ষাৎকারে উল্লেখ করেছেন, হত্যার বেশ ক'দিন আগে থেকে হাফেজ আব্দুর রহমানকে হালসা, রায় হালসা প্রভৃতি গ্রামে যাতায়াত করতে দেখা গেছে। তার তৎপরতা এবং পরামর্শেই বরাদাচরণের মতো ধনী গৃহস্থকে হত্যা করা হয়। উল্লেখ্য শহীদ বরদাচরণ রায় ছিলেন নাটোর সদর হাসপাতালের কর্মচারী ও গণহত্যার শিকার শহীদ জীবন কৃষ্ণ মানির শ্বশুর। মাত্র ছয় দিনের ব্যবধানে শ্বশুর আর জামাই ঘাতকদের হাতে নিজের বাসভবনে শহীদ হন।[৬৭]

### তেবাড়িয়া গণহত্যা

এটি নাটোর সদর উপজেলার অন্যতম একটি ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নের উত্তরে রয়েছে ছাতনী ইউ.পি., দক্ষিণে বাগাতিপাড়া উপজেলা, পূর্বে বড় হরিশপুর ইউ.পি এবং পশ্চিমে কাফুরিয়া ইউনিয়ন অবস্থিত। এই ইউনিয়ন নাটোর সদর উপজেলা হতে ৬ কি.মি. দূরে অবস্থিত। নারদ নদী এই ইউনিয়নের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নাটোর শহর অতিক্রম করে আহম্মদপুর নন্দকুজা নদীতে মিলিত হয়েছে। আহম্মদপুরের পশ্চিমে তেবাড়িয়া গ্রামের অবস্থান। এই গ্রামের পূর্ব দিক দিয়ে বয়ে গেছে নন্দকুজা নদী। নদীটি খানিকটা উত্তর দিক দিয়ে পূর্বে বাঁক নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে চাঁচকৈড়ের পাকিস্তানি দিয়ে। এই গ্রামে রোডস্ অ্যান্ড হাইওয়েজের একটি পুরাতন দালান বাঙালি হত্যা ও নিপীড়নের নীরব সাক্ষী হয়ে আছে।[৬৮] নন্দকুজা নদীর উপরে বিরাজমান ব্রিজটিতে বিভিন্ন স্থান থেকে বহু মানুষকে ধরে আনা হত। তাদেরকে অত্যাচার, নির্যাতনের পর হানাদার বাহিনীর সৈন্য ও তাদের সহযোগীরা হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দিত লাশ গুলো, নতুবা তেবাড়িয়া মহাসড়কে ফেলে রাখত, কখনও কখনও গর্ত করে মাটি চাপা দিত। তেবাড়িয়ার স্থানীয় দুই সাহসী ব্যক্তি রইছ উদ্দিন সরকার ও রজব আলী বাধা দিলে তাঁদেরকে হত্যা করে সেখানে।বিজয় অর্জনের পর এখানে শত শত মানুষের কঙ্কাল পাওয়া যায়। জায়গাটি গণকবর হিসেবে চিহ্নিত করেন মুক্তিযোদ্ধারা। উল্লেখ্য, নাটোর দখলের আগে এই গ্রামের ওপর হেলিকপ্টার থেকে সেল নিক্ষেপ করে গ্রামটি পুড়িয়ে দেয়।[৬৯]

### লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া গণহত্যা

নাটোর সদর থেকে প্রায় ৯ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত আহমেদপুর ব্রিজ। ঢাকা-নাটোর মহাসড়কে অবস্থিত এ ব্রিজটি হেলেঞ্চা নদীর উপর নির্মিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগীরা এই ব্রিজের নিচে বহু মানুষকে হত্যা করে ফেলে রেখেছিল। পার্শ্ববর্তী লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া ইউনিয়নের কাদিম সাতুরিয়া, বড় বাড়িয়া, খোলাবাড়িয়া গ্রামের বহু মানুষকে হত্যা করেছিল এখানে। নগরবাড়ি হয়ে আসার পথে হানাদার বাহিনী আক্রমণ করত বিভিন্ন সময়। এ এলাকাগুলো থেকে যেসব যুবক, পুরুষ মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল, স্থানীয় দালালদের নির্দেশে সেসব পরিবারের মানুষদের অনেককেই হত্যা করেছিল এখানে। অনেককে আবার অন্যত্র নিয়ে গিয়েও হত্যা করেছে।

### লিয়াকত আলী ব্রিজ গণহত্যা

১৯৭১ সালে নাটোর শহরের মল্লিকহাটি এলাকার ঘোষপাড়া মহল্লায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তিনজন ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে রেখে যায়। মল্লিকহাটি নাটোর পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। আর এ

এলাকার লিয়াকত আলী ব্রিজটি বর্তমান ডায়াবেটিস হাসপাতালের পিছন দিকে অবস্থিত নারোদ নদীর উপর নির্মিত। ১৯৭১ সালে আতাউর রহমান আতা, সামসুল হুদা হ্যাপী ও অবিনাশ নামক তিন ব্যক্তিকে হত্যা করে এই ব্রিজের, নিচে ফেলে রেখেছিল হানাদার বাহিনী, পরে তাদের সেখানেই কবরস্থ করা হয় একসাথে।

**নাটোর সদর হাসপাতাল গণহত্যা**

নাটোর সদর হাসপাতাল নাটোর শহরে অবস্থিত। ১৯৭১ সালের ১৬ই এপ্রিল নাটোর সদর হাসপাতালের কর্মচারী জীবনকৃষ্ণ মানিকে হত্যা করে হানাদার বাহিনী। জীবনকৃষ্ণ মানি কাজ শেষে বাড়ি ফিরে আসেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৩ই এপ্রিল নাটোরে প্রবেশ করলে পালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্থানীয় আঁকি চৌধুরী, জীবনকৃষ্ণর বাড়িওয়ালা মধু মিয়া ও দুদু মিয়া তাঁকে আশ্বাস দিয়েছিল যে, চিকিৎসার সাথে যুক্তদের কোন ক্ষতি হবে না। ফলে কোথাও যাননি তিনি। কিন্তু তাঁর ও তাঁর বাড়ির দিকে নজরদারি করছিল দালালরা। এক পর্যায়ে তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে তাঁর উপর অত্যাচার, নির্যাতন করা শুরু করে হানাদাররা। মারাত্মক আহত অবস্থায় তিনি ভর্তি হন সদর হাসপাতালে।[৭০] সেখানে তাকে পুরুষ ওয়ার্ডের পিছনের দিকে একটি রুমে লুকিয়ে চিকিৎসার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দালালরা টের পেয়ে যায়। তারা সেখানে আক্রমণ করে এবং জীবন কৃষ্ণকে পরপর ৩ রাউন্ড গুলি করে হত্যা করে।

**শুকলপট্টি গণহত্যা**

নাটোর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডে অবস্থিত শকুলপট্টি এলাকার একটি পুরনো মন্দিরের পিছন দিকে (বর্তমান গ্রীণ একাডেমীর পিছনে) বহু মানুষকে হত্যা করে গর্ত করে মাটি চাপা দিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দালালরা। গ্রীণ একাডেমীর অভ্যন্তরে বহু মেয়ে ধরে এনে নির্যাতন করে হত্যা করা হত। এছাড়া অনেক মানুষকে বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে এনে হত্যা করা হল অত্যাচারের পর।[৭১] পরে স্থানীয় লোকদের দিয়ে তাদের মাটি দেয়ার ব্যবস্থা করত।

**কাপুড়িয়াপট্টি গণহত্যা**

নাটোর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডে অবস্থিত কাপুড়িয়াপট্টি মহলার কালীবাড়ি হলে অনেক বাঙালিকে হত্যা করে পুঁতে রাখা হত। স্বাধীনতার পর ঐ দেয়ালে দেয়ালে রক্তের প্রচুর দাগ দেখতে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এর সংস্কার করতে গিয়ে অনেক মানুষের কঙ্কাল, হাড় এবং মাথার খুলি ও পাওয়া যায়।[৭২] কাপুড়িয়াপট্টির বাসিন্দা ডাঃ বলাই চন্দ্র বসাক বাড়িতেই ছিলেন। হঠাৎ করে কয়েকজন মহিলা (বিহারী) এসে তাকে বলে যে, এক মহিলার বাচ্চা হবে, তিনি যেন তাদের সাথে যান। এর পর তিনি রাজি না হলেও জোরপূর্বক তাকে নিয়ে যায় পৌরসভার ভেতরে। সেখানে তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। রবি বসাকের স্ত্রীর শরীরে পাকিস্তানি সৈন্যদের নিক্ষিপ্ত শেল লেগে তিনি মারা যান। তিনি যদিও তাদের কাছে অনেক কাকুতি মিনতি করেছিলেন। তবুও প্রাণভিক্ষা দেয়া হয়নি তাঁকে। এছাড়াও কল্যাণচন্দ্র বসাকের ভাইদের আগুনে পুঁড়িয়ে হত্যা করা হয়।[৭৩]

**পাওয়ার হাউজ গণহত্যা**

নাটোর উপশহরে অবস্থিত পাওয়ার হাউজ-এ ১৯৭১ সালে আব্দুল করিম ও সেনাবাহিনীর জমশেদ সহ বহু মানুষকে হত্যা করে এখানে পুঁতে রাখা হয়েছিল।

### দিঘাপতিয়া গণহত্যা

১৯৭১ সালে দিঘাপতিয়ায় ক্যাম্প করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। ছাত্রলীগের কর্মী আমিরুল ইসলাম বাবুল। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মা'র কাছে এসেছিলেন বিদায় নিতে। খবর পেয়ে ক'জন অবাঙালি এসে ধরে নিয়ে যায় বাবুলকে। সংবাদ পেয়ে তাঁর পিতা আব্দুর রশীদ সাহেবও ছুটে যান। তখন পিতা ও পুত্র দু'জনকেই নাটোরের ক্যান্টনমেন্ট দিঘাপতিয়ায় নিয়ে যায়। তাঁরা আর ফিরে আসেনি। সেখানে তাদের হত্যা করা হয় বলে জানা যায়।[৭৪]

### মোকরামপুর গণহত্যা

বড় হরিশপুর ইউনিয়নের মোকরামপুর মৌজাতে হানাদার বাহিনী দু'জনকে হত্যা করে। স্বাধীনতাকামী মাহবুব আলী সেলিম মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। শহীদ মাহবুব আলী সেলিম পিছিয়ে না গিয়ে বলেছিলেন, "মিছিলের দিন শেষ হয়ে গেছে এখন দরকার সশস্ত্র সংগ্রাম। সশস্ত্র সংগ্রামের সময় আমি নিশ্চয়ই এগিয়ে আসব।" সেলিম সশস্ত্র সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিলেন। ১২ই এপ্রিল নাটোরে এলো জল্লাদ খান সেনারা। মেতে উঠলো হত্যাযজ্ঞে। ২৭শে এপ্রিল কুখ্যাত মেজর শেরোয়ানী সেলিমকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। কয়েকদিন পরে মোকরামপুর কালভার্টের কাছে পাওয়া যায় সেলিমের লাশ।[৭৫] অমানুষিক অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত, বুলেটে ঝাঁঝরা সেলিমের লাশ কবরস্থ করার অনুমতি মেলেনি। তবুও সন্ধ্যার অন্ধকারে গোপনে মিঠাপুকুর ব্রিজের কাছে (কালর্ভাট) সেলিমকে সমাধিস্থ করা হয়। কান্দিভিটার কাদের নামকব্যক্তিকেও হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছিল।

### কালীবাড়ি গণহত্যা

নাটোর সদর থানার লালবাজার এলাকায় অবস্থিত পুরাতন কালী বাড়ি মন্দির। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এখানে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। ফলে আশে পাশের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক নারী-পুরুষকে এখানে ধরে এনে নির্যাতন, ধর্ষণ এবং অবশেষে হত্যা করা হত। পরবর্তীতে মন্দিরটিতে ভাঙ্গুচর করেছিল তারা।

### অন্যান্য গণহত্যা

ছাত্র-যুবক আর সাধারণ মানুষ রাজপথ দিবারাত্রি পাহারা দিয়ে রেখেছিল ১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চের পর। সিনেমা হল থেকে সামান্য পশ্চিমে অনুকূল দধি ভান্ডার। এই দোকানের সেই সময়ের মালিক অধীরচন্দ্র ঘোষকে দোকানেই গুলি করে হত্যা করে।[৭৬] পুরাতন বাস স্ট্যান্ডের নিকটবর্তী কানাইখালী এলাকার মোস্তাক হোসেন উলফাত এবং তার মামা মোসলেম উদ্দিন (ন্যাপ সদস্য) দোকানে যাবার উদ্দেশ্যে মোটর সাইকেল নিয়ে বের হয়েছেন। উলফাতের ভাই আহমদ হোসেন চম্পার নাটোর বোর্ডিং এ আওয়ামী লীগ নেতারা নাটোর এলে অবস্থান করতেন।[৭৭] উলফাত ও মোসলেম পৌরসভা পার্কের সামনে (কেন্দ্রীয় মসজিদ) এলে বিহারী দালাল ও হানাদার সৈন্যরা বাধা দেয়। তাঁরা মুসলিম কিনা জিজ্ঞাসা করে। মুসলিম জানার পরও এক পর্যায়ে তাদের গুলি করে। উলফাত উঠতে চেষ্টা করলে পুনরায় গুলি করে তারা। উলফাত সেখানেই মারা যান। মোসলেমের গুলি লাগলেও তিনি সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান।

নাটোর দখলের দিন দুপুরে মন্মথ প্রামাণিককে তাঁর উপর বাজারস্থ বাড়ির সম্মুখে চৌমাথায় হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী। মন্মথ প্রামাণিক শহরে হানাদার দখল নেয়ার আগেই পরিবারের সবাইকে নিয়ে গ্রামে

গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৩ই এপ্রিল শূন্য ঘর দোর দেখার জন্য গ্রামের আত্মীয় বাড়ি থেকে শহরে এসেছিলেন। এসেই উদ্যত অসিধারী ঘাতকবাহিনীর সম্মুখে পড়েছিলেন। সারাদিন তাঁর লাশ রাস্তায় পড়েছিল। সবাই জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত। উল্লেখ্য, মন্মথ প্রামাণিক ছিলেন ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত মধ্য বয়সী ব্যক্তি। তাঁর পোশাক দেখিয়ে নাটোরের দালালের মালউনদের চেহারা আর পোশাক কেমন, সে বিষয়ে উপদেশ দিয়েছিলো। তাঁকে দেখামাত্রই কিছু জিজ্ঞেস না করেই গুলি করে হত্যা করা হয়।[৭৮] ১৫ই মে রাজাকারেরা ছাত্র সংসদের সহ সভাপতি রেজাউন নবীকে হত্যা করে।

নাটোর সদরের পটুয়াপাড়ার কুর্মির মাঠে ৩রা এপ্রিল, ২০০০ সালে একটি বাড়ির ভিত খনন করার সময় ১০ টি মাথার খুলি ও কিছু হাড় পাওয়া গিয়েছে। এই স্থান থেকে ৫০০ গজ দূরেই মহারাজা হাইস্কুলের অবস্থান যেখানে পাকিস্থানি বাহিনীর ক্যাম্প ছিল। ধারণা করা হয়, পাকিস্থানি বাহিনী নিরীহ মানুষদের হত্যা করে এখানে মাটি চাপা দিয়েছে।[৭৯]

এভাবে পুরো নয় মাস ধরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে ছিল পুরো নাটোর শহরে। এরকম পরিস্থিতিতে কত মানুষ শহীদ হয়েছে তার সঠিক হিসাব রাখা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া প্রত্যক্ষদর্শীদের অনেকে মারা গিয়েছে।

### নাটোর উপজেলায় বড় দুইটি গণহত্যা

#### ছাতনী গণহত্যা

হাজার মাইলাইয়ের এক ছাতনী। বঙ্গবন্ধুর আহবানে সমগ্র বাংলার মানুষ যেমন সাড়া দিয়েছিল তেমনি ছাতনীর মানুষ ও সমস্বরে স্লোগান দিয়েছিল 'শোষকের মুখে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' আর এটাতেই সমগ্র বাংলার ধ্বংসের মতো ছাতনীর ধ্বংসও অনিবার্য হয়ে পড়ে।[৮০]

নাটোর সদর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে ছাতনী ইউনিয়ন। ১৯৭১ সালের ৩রা/৪ঠা জুন (১৯ জৈষ্ঠ্য, ১৩৭৮ বঙ্গাব্দ) তারিখে এ ইউনিয়নের প্রায় প্রতিটি গ্রামে আক্রমণ করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগিতা করেছিল নাটোরের কুখ্যাত ঘাতক দালাল হাফেজ আব্দুর রহমান। আরও সহযোগিতা করেছিল মোঃ সাজ্জাদ হোসেন, শাহজাহান আলী, আসকান আলী, ইশহাক আলী, মোঃ ওমর আলী, কোচের মোলা প্রমুখ। আওয়ামী লীগ নেতা শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরীর বাড়ি ছিল এ ইউনিয়নে। তাঁরা প্রভাবশালী হিন্দু পরিবার ছিল। শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী একজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তাঁর প্রতি ক্ষোভ এবং স্বাধীনতাকামী জনতার উপর আক্রোশ বশত হানাদার বাহিনী ও বিহারীরা আক্রমণ করেছিল ছাতনীতে। এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে বিহারীদের সাথে বাঙালির সংঘর্ষের পর থেকেই তারা বিভিন্ন সময় আক্রমণ করার চেষ্টা করেছে বাঙালিদের। ফলে হিন্দু মুসলিম উভয়কেই সজাগ থাকতে হত। তারা পাহারা দিত লাঠি-সোটা নিয়ে প্রতিরোধ করার জন্য। অবাঙালী জল্লাদরা প্রায় তিনবারের মত যুদ্ধ করতে এসেছিল। কিন্তু বাঙালির প্রতিরোধে তারা সুবিধা করতে পারেনি। ফলে অপমান বোধ করে প্রতিশোধ নেবার জন্যই মূলত বিহারীরা পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ে আসে।

বনবেলঘরিয়ার মসজিদ থেকে টেনে বের করলো ১০৫ বছর বয়স্ক আওয়ামী লীগ সমর্থক বৃদ্ধ সৈয়দ আলী মুন্সীকে। ১৫ই জৈষ্ঠ্য সৈয়দ আলী মুন্সীর লাশ দেখলো ছাতনীর মানুষ। এরপরে ১৯শে জৈষ্ঠ্য পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ করে হানাদাররা। ছাতনীর সবচেয়ে বয়োবৃদ্ধ ৮২ বছরের নলীনিকান্ত জানান, ওরা

রাত থেকে ছাতনী দিঘীর পাড়ে জমা হতে থাকে। ভোর চারটার মধ্যে পুরো ছাতনীকে ঘিরে ফেলে।[৮১] হত্যা, ধ্বংস, নির্যাতন, লুটপাট-সবকিছু মিলে পুরো ছাতনী যেন সেই ভোর থেকে সকাল নয়টা পর্যন্ত বিভীষিকাময় রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

নাটোর-তাহিরপুর পাকিস্তানিা সড়কের পাশে ছাতনী স্লুইচ গেইট। ঘুমন্ত নিরীহ মানুষগুলোকে তারা ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে আসে ছাতনী স্লুইচ গেইটে। ছাতনী, ভাবনী, দিয়ার, মাঝদিয়া, পণ্ডিত গ্রাম, শিবপুর, আমহাটি, ভাটপাড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রায় সাড়ে চারশ আবালবৃদ্ধ বণিতাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তার দোসররা ধরে, এনে তাদেরই পরনের কাপড় দিয়ে বেঁধে ঐদিন ভোর ৪টার দিকে ছাতনী স্লুইচ গেইটেএনে লাইনে দাঁড় করে গুলি করে হত্যা করে। এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। গুলির পরও যারা জীবিত ছিল, তাদের অবাঙালী হাফেজ আব্দুর রহমান নিজ হাতে জবাই করে হত্যা করে। নারী শিশুরাও এই নরপিশাচদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এই নৃশংস হত্যাকান্ড ও নারী নির্যাতনের প্রত্যক্ষদর্শী ভাবনী গ্রামের কালা মিয়া, লুকুবউদ্দিন, জব্বার শাহ, আবু সিদ্দিক, শুটকা, ওয়াহেদ আলী, কালীপদ এবং ছাতনী গ্রামের সুলতান এর সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়।[৮২]

“আমাকে তোমরা খুন করো, তার বিনিময়ে আমার গ্রামের মানুষকে বাঁচাও। তোমাদের খোদার কসম, তোমরা আমার মানুষদের মেরোনা।” মৃত্যু পথযাত্রী ভাবনী গ্রামের মনি সরকার আর্তি করেছিলেন হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সৈন্যদের নিকট। হানাদার বাহিনী তাঁকে হত্যা করেছে। নির্মমভাবে গায়ের চামড়া উঠিয়ে হত্যা করেছে। ডাক্তার মণিরুদ্দিনের তিনটি যুবক ছেলেকেও হত্যা করে হানাদাররা। মেয়েদের অত্যাচার, নির্যাতনের পাশাপাশি কারও কারও শিশু সন্তানকেও মাটিতে ফেলে গুলি করে হত্যা করতে তাদের হৃদয় কাঁপেনি। পাকিস্তানি সৈন্যদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ জন এবং বাকী প্রায় ২০০ ছিল অবাঙালি পিশাচরা। হত্যা ও নির্যাতনের পর লুট-পাট করে বাড়িঘর ভাঙ্গচুর ও অগ্নিসংযোগ করেছে। অনেকে পাশে কোন জঙ্গলে, ঝোপঝাড়, খালে, নালায় প্রভৃতি স্থানে লুকিয়ে জীবন রক্ষা করেছে। যাঁরা পারেনি তাঁদেরকে জীবন দিতে হয়েছে। হাইসা, দা, ছুড়ি দিয়ে গলার ফাঁস দিয়েছে অনেককে। যাঁদের মধ্যে লকুব উদ্দিন, জব্বার প্রমুখ সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন।[৮৩]

প্রায় ৪৪১ জন, মতান্তরে ৪৮৬ জনের মত হত্যার সংখ্যা জানা যায় বিভিন্ন সূত্রে। রক্তে মাটি আর খালের পানি একাকার হয়ে পড়েছিল সেদিন। সেদিনের হত্যাযজ্ঞের ভয়াবহতার কথা মনে করতে গিয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।“ছাতনী বধ্যভূমিতে রক্ত-মাংসের স্তুপ আর আহতদের চিৎকার আর স্বজন হারানোর আহাজারি শুনে হাজারো জনতার দীপ্তকণ্ঠের মিছিল থেমে গেল। মৃত্যুর বিভীষিকা ক্ষণিকের জন্য তাদের বাকরুদ্ধ করে দেয়।”[৮৪] ছাতনী গণহত্যায় আহতদের অনেকেই এখন আর জীবিত নেই। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায় সেই দিনে তারা যে নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করেছেন তার অনেকটা তাঁদের মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত বয়ে চলতে হয়েছে।

**ফুলবাগান গণহত্যা**

নাটোর সদর থেকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ফুলবাগান এলাকাটি। ৩নং দিঘাপতিয়া ইউনিয়নে উত্তরা গণভবন এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। এছাড়া বর্তমান উপজেলা পরিষদটিতেও ক্যাম্প স্থাপন করেছিল হানাদার বাহিনী। ফলে উক্ত দুটি ক্যাম্প এ অবস্থানের কারণে

ফুলবাগান এলাকাটিকে ভাগাড়ে পরিণত করেছিল তারা। ফুলবাগানে নয়মাসে অন্তত ১৫ থেকে ১৬ হাজার লোককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে এনে অত্যাচার নির্যাতন করে বহু মানুষকে হত্যা করে এখানে ফেলে রাখা হত।[৮৫] রাস্তায় পড়ে দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয় লোকরা তাঁদের মাটি চাপা দিয়ে রাখত। রাজাকার খলিল ভূইয়া, নওয়াব আলী, কাদের, গাজী প্রমুখদের সহযোগিতায় এ এলাকায় হত্যাযজ্ঞ চলত।

১৯৭১ সালে নাটোর হানাদার বাহিনীর দুই নম্বর সামরিক সেক্টরের হেড কোয়াটার ছিল। ফলে নাটোর সদর থানার অন্যান্য এলাকার মত ফুলবাগানের গণহত্যার হাত থেকে নিস্কৃতি পায়নি। নিকটবর্তী ক্যাম্পগুলোতে বিভিন্ন স্থান থেকে বহু নারীকে ধরে এনে নির্যাতন করে হত্যা করার ফলে যখন তারা মারা যেত, তখন তাদের লাশ ও বর্তমান বধ্যভূমিতে ফেলে রাখা হত।

নাটোর শহরের কালী কর্মকার, ছোবহান, হেম ঠাকুর, ফুড কন্ট্রোলার হাবিবুর রহমান, সন্তোষ বাদ্যকর, দিঘাপতিয়ার হরিবাদ্যকর প্রমুখ সহ নাম না জানা বহু মানুষকে হত্যা করে ফেলে রাখা হয়েছিল ফুলবাগান-এর জেলা পরিষদের নিকটবর্তী নর্দমায়। শেয়াল, কুকুরে ছিঁড়ে খেয়েছে তাদের মৃতদেহ গুলো।পুরো নয় মাস এভাবেই চলতে থাকে ফুলবাগান এলাকায়।

**চৌকিরপাড় গণহত্যা**

নাটোর সদর থানার ১নং ওয়ার্ডে চৌকিরপাড়ের অবস্থান। রানী ভবানীর বাড়ির নিকটবর্তী এলাকাটিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা হামলা করেছিল প্রথম ১৬ই এপ্রিলের দিকে। নাটোর প্রবেশের পর পাকিস্তানি বাহিনী শহরে যে ত্রাসের সৃষ্টি করেছিল তাতে ভয় পেয়ে অনেকেই চলে গিয়েছিল নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। এসময় স্থানীয় দালালরা এলাকার মানুষদের বুঝিয়েছিল-যেন তাদের পরিবারের সবাই ফিরে আসে। আশ্বাস দিয়েছিল যে, তাদের কোন ক্ষতি হবে না। নির্ভয়ে সবাই যেন ফিরে আসে। সেটা বিশ্বাস করে অনেকে ছিল সেখানে। ১৬ই এপ্রিল চৌকিরপাড়ে অবস্থিত নারী পুর্নবাসন কেন্দ্রের পিয়ন হাফিজুর রহমানকে হত্যা করে ঘাতকরা। হাফিজ অফিসের অবস্থা দেখতে এসেছিল। কিন্তু সেই অফিসেই তাকে প্রাণ দিতে হল।

এরপর সেই ঘাতক রাতে আসে  ১৯শে এপ্রিল আজিজ সরকার, মতি ভূইয়া, চান্দ গাজী নামক দালালরা হাফেজ আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে পুরো চৌকিরপাড় নিজের অধীনে এনেছিল। তাদের সহযোগিতায় নিকটবর্তী লালবাজার কালীবাড়িতে পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্প করেছিল। ঘাতক, দালালরা পাকিস্তানি বাহিনী নিয়ে রাত ১২টার পর চৌকিরপাড় আক্রমণ করে। দালালরা পাকিস্তানি সৈন্যদের জানিয়েছিল। মালাউন (হিন্দু)রা ফিরে এসেছে। এবং তাদের অনেকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করছে। এ সংবাদ পেয়েই হানাদার বাহিনী এসেছিল। ঘুম থেকে তুলে বাড়ির বাইরে উত্তর চৌকির পাড়ে (কালুর মোড় সড়কের পাশে) রাস্তার পাশে (খালের নিকটবর্তী) দাঁড় করায়। সেখানে কালীচন্দ্র বাগচীদের বাড়িতে হামলা করে পাকিস্তানি বাহিনী। এখানে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা লুকিয়ে ছিল অস্ত্রসহ। বাগচীবাড়ির ১জন মহিলাসহ সকলেই ছিল তখন বাড়িতে। কালী বাগচী ও তাঁর ভাইদের ঘুম থেকে তুলে বাড়ির বাইরে উত্তর চৌকির পাড় (কালুর মোড় সড়কের পাশে) এ রাস্তার পাশে (খালের নিকটবর্তী) দাঁড় করায়। সেখানে কালীচন্দ্র বাগচীদের বাড়িতে হামলা করে পাকিস্তানি বাহিনী। এখানে কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা লুকিয়ে ছিল অস্ত্রসহ। বাগচীবাড়ির ১জন

মহিলাসহ সকলেই ছিল তখন বাড়িতে। কালী বাগচী ও তাঁর ভাইদের কর্মচারী সহ সকলকে লাইন করে দাঁড় করায় ও বেয়নেট চার্জ ও গুলি করে। কালী বাগচীর ভাইয়ের স্ত্রীকে পাকিস্তানি বাহিনী ধরে নিয়ে যায় ও অত্যাচার করে। এভাবে গণহত্যা চলতে থাকে উত্তর চৌকিরপাড়ে। এ এলাকার প্রায় ২০ জনের মত হত্যা করা হয়। অন্যদিকে দক্ষিণ চৌকির পাড় দিঘির পাড়ে (বর্তমান নাটোর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ) অবস্থিত ঘর গুলো থেকে বের করে আনে আরও ১৮-২০ জন লোককে। তাদেরকেও বেয়নেট চার্জ করে। গুলি করে হত্যা করে। এরপর লুটপাট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ করে। এভাবে পুরো চৌকিরপাড়ের শান্তি পরিবেশকে মৃত্যুপুরীতে পরিণত করে ঘাতক দালাল ও পাকিস্তানি বাহিনী।

## নতুন বধ্যভূমি ও গণকবরের সন্ধান লাভ

ফতেঙ্গাপাড়া, পাওয়ার হাউজ, আহমেপুর ব্রিজ/লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া, মিটাপুকুর, মোকরামপুর, ফুলবাগান ও লিয়াকত আলী ব্রিজ গণহত্যা সম্পর্কে তথ্য অন্য কোন গ্রন্থে তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। উল্লেখ্য ফতেঙ্গাপাড়া গণহত্যা অনেক গ্রন্থে দত্তপাড়া হত্যাযজ্ঞ নামে উল্লেখ রয়েছে। তবে সেখানেও তথ্য আংশিক। লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া (আহমেদপুর ব্রিজ), মোকরামপুর। ফুলবাগান ও লিয়াকত আলী ব্রিজ গণহত্যা সম্পর্কে তথ্যগুলো গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে পাওয়া গিয়েছে।

## বধ্যভূমি ও গণকবর

১৯৭১ সালে নাটোর সদরের প্রায় এলাকাতেই হত্যা, নির্যাতন হয়েছে। তবে সময়ের বিস্মৃতিতে অনেক তথ্যই হারিয়ে গিয়েছে। তবু যেগুলো সম্পর্কে তথ্য জানা গিয়েছে সেসব গণকবর ও বধ্যভূমি উল্লেখ করা হলো :

### ছাতনী বধ্যভূমি ও গণকবর

নাটোর সদর থেকে প্রায় ৪ কিলোমিটার পশ্চিমে ছাতনী ইউনিয়নের স্লুইস গেইটে ও বধ্যভূমিটি অবস্থিত। ছাতনী ইউনিয়নের প্রায় সাড়ে চারশ মানুষকে হানাদার বাহিনী ও দালালরা ১৯৭১ সালে নির্মমভাবে হত্যা করে। তাদের অধিকাংশের লাশ সেখানে মাটি চাপা দেয়া হয়। আরও কিছু লাশ যেগুলো বিক্ষিপ্তভাবে ছিল সেগুলো নিকটস্থ ছাতনী মসজিদের কাছে গণকবর দেয়া হয়। কোন কবরে তিন জন, কোনটিতে ১৩-১৪ জনের লাশ রয়েছে।

### ফতেঙ্গাপাড়া বধ্যভূমি

১৯৭১ সালে বড় হরিশপুর ইউনিয়নের ফতেঙ্গাপাড়া গ্রামে বনপাড়া, নলডাঙ্গা প্রভৃতি স্থান থেকে ধরে এনে প্রায়, ১৫-১৬ শত মানুষকে হত্যা করে একই গর্তে ফেলে মাটি চাপা দিয়েছিল স্থানীয় জনগণ দিয়ে। কোনটি আবার পার্শ্ববর্তী খালে ভাসিয়ে দিয়েছে। এখানে বধ্যভূমির উপর স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের উদ্যোগে একটি ছোট স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে।

### ফুলবাগান বধ্যভূমি

নাটোর উপজেলা পরিষদের বিপরীত পার্শ্বে অবস্থিত এ বধ্যভূমিটি। ১৯৭১ সালে হানাদার বাহিনী ও দালালরা বহু মানুষকে বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে এনে হত্যা করে এখানে গর্তে ফেলেছে, কোনটি ড্রেনে ফেলেছে। দুর্গন্ধ ছড়ালে স্থানীয়রাই তাদের একসাথে মাটি চাপা দিয়েছে।

**চৌকিরপাড় বধ্যভূমি**

নাটোর সদর থানার ১নং ওয়ার্ডে চৌকিরপাড়ে এর অবস্থান।দক্ষিণ চৌকির পাড় দিঘীর পাড়ে (বর্তমান নাটোর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ) অবস্থিত ঘর গুলো থেকে বের করে আনে ১৮-২০ জন লোককে। তাদেরকে বেয়নেট চার্জ করে ও গুলি করে হত্যা করে এখানে।

**আহমেদপুর ব্রিজ গণকবর**

এটি ঢাকা-নাটোর মহাসড়কের পার্শ্বে অবস্থিত। নিকটবর্তী লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া ইউনিয়ন এর বহু মানুষ ও আহমেদপুরের অনেক মানুষকে হত্যা করে হানাদার ঘাতকবাহিনী। তাদের অনেককে এক সাথে এখানে কবর দেয়া হয়েছে।

**লিয়াকত আলী ব্রিজ গণকবর**

১৯৭১ সালে মল্লিকহাটির তিনজন ব্যক্তি হ্যাপী, আতা ও অবিনাশকে পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা করে নারোদ নদীর উপরস্থ লিয়াকত আলী ব্রিজের নিচে ফেলে রেখে যায়। পরে তাদের সেখানেই একসাথে কবরস্থ করা হয়।

**শকুলপট্টি বধ্যভূমি**

নাটোর পৌরসভার ২নং ওয়ার্ডে অবস্থিত শকুলপট্টি পুরাতন মন্দিরের পিছনে বহু মানুষকে হত্যা করে গর্তে পুঁতে রাখা হয়েছে।

**মোকরামপুর কবর**

বড় হরিশপুর ইউনিয়নের মোকরামপুর মৌজাতে মিঠাপুকুর কালভার্টের পাশে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদারদের দ্বারা শহীদ মাহবুব আলীর কবর রয়েছে। সড়কের অপর পার্শ্বে কাদের নামক এক ব্যক্তির কবর রয়েছে।

**পটুয়াপাড়া কুর্মির মাঠ গণকবর**

২৬শে মার্চ ২০০০ সালে সদর থানার পটুয়াপাড়ার কুর্মির মাঠে একটি বাড়ির ভিত খনন করার সময় পাওয়া যায় ১০টি মাথার খুলি ও বেশ কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়গোড়।[৮৬] ঐ সময় সেখানে গণকবর ছিল। বর্তমনে সেখানে কোন গণকবর নেই। স্থানীয় লোকজন এ বিষয়ে কিছু বলতে পারেনি।

## নাটোর সদরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও স্মারক

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে নাটোর জেলার যথেষ্ট অবদান থাকা সত্ত্বেও স্মৃতি ও স্মারক সংখ্যা খুব বেশি নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্মৃতিসৌধও গড়ে ওঠেনি গণহত্যা বা গণকবরের স্থানে। বরং দখলও হয়েছে ক্ষমতাশীল লোকদের দ্বারা। স্বাধীনতার ৪৫ বছরে বেশির ভাগ স্মৃতি সৌধই ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে উঠেছে।

**ছাতনী শহীদ মিনার/কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার ছাতনী**

৬নং ছাতনী ইউনিয়নের স্লুইচ গেইটে অবস্থিত এ শহীদ মিনারটি ১৯৭১ সালে ৪টা জুন ছাতনী গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সযোগীদের দ্বারা নৃশংস ভাবে যাঁরা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের গণকবর স্থলে নির্মিত হয়েছে। ছাতনীর বধ্যভূমির ওপর শহীদ মুনিরুদ্দিনের জমিতে আওয়ামীলীগ নেতা শংকর

গোবিন্দ চৌধুরীর উদ্যোগে গ্রামবাসী সহযোগিতায় ১৯৭২ সালে একটি স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলা হয়। সেটি দীর্ঘদিন অবহেলায় পড়েছিল। তবে ২০১৫ সালে এটিকে পুনরায় সংস্কার করা হয়।

**শহীদ বাবুল পার্ক**

স্বাধীনতার পর মুক্তিযোদ্ধা শহীদ বাবুলের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে নাটোর শহরের টাউন পার্কের নাম 'শহীদ বাবুল পার্ক' নামকরণ করা হয়। কিন্তু এ পার্কের নাম পরিবর্তন করে বর্তমানে সেখানে স্থাপিত হয়েছে হকার্স মার্কেট।[৮৭]

**নারোদ নদী স্মৃতিস্তম্ভ**

মল্লিকহাটিতে নারোদ নদীর নিকটে অবস্থিত নাটোর শহরের ঘোষপাড়া মহল্লায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যা করে হ্যাপি, আতা ও অবিনাশকে। পরে তাঁদের নারোদ নদীর ব্রিজের নিচে পুঁতে রাখা হয়। স্বাধীনতার পর নাটোরের তৎকালীন পৌর চেয়ারম্যান শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরীর সহযোগিতায় তাঁদের কবরে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হয়। নারোদ নদীর ভাঙনে বর্তমানে এই স্মৃতি স্মারকটির জীর্ণদর্শা।

**স্বাধীনতা সংগ্রামের শহীদ স্মৃতিসৌধ**

নাটোরের চার মুক্তিযোদ্ধা রেজা, রঞ্জু, বাবুল ও আফাজের স্মরণে সিরাজ উদ্দৌলা কলেজে ১৯৭২ সালে তৎকালীন ভিপি ও মুক্তিযোদ্ধা মজিবুর রহমান সেন্টু এই স্মৃতিসৌধটি স্থাপন করেন।[৮৮]

**শহীদ সেলিম চৌধুরী ক্লাব**

বীর মুক্তিযোদ্ধা সেলিমের স্মৃতিতে তাঁর আত্মীয় স্বজন ১৯৭২ সালে নাটোরে তাদের নিজস্ব জায়গায় 'শহীদ সেলিম চৌধুরী ক্লাব' নামে একটি শরীর চর্চা ক্লাব গড়ে তোলেন।[৮৯]

**কানাইখালী শহীদ স্মৃতিসৌধ**

নাটোর শহরের কানাই খালী মাঠে মুক্তিযুদ্ধে শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়েছে।

**মাদ্রাসা মোড় স্মৃতিস্তম্ভ**

ঢাকা-নাটোর সড়কের মাদ্রাসা মোড়ে অবস্থিত এ স্মৃতিস্তম্ভটি নাটোর জেলার শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়েছে। এ স্মৃতিস্তম্ভে নাটোর সদর, লালপুর, বড়াইগ্রাম, সিংড়া ও সেনাবাহিনীর শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের নামের তালিকা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

**শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী চত্বর**

নাটোর জেলার অন্যতম আওয়ামী লীগ নেতা এবং মুক্তিযুদ্ধে নাটোর জেলার যার অবদান ছিল অনেক বেশি সেই শংকর গোবিন্দ চৌধুরীর স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়েছে।

**আহমেদপুর ব্রিজ স্মৃতিস্তম্ভ**

ঢাকা-নাটোর মহাসড়কের আহমেদপুর ব্রিজের পার্শে অবস্থিত এ স্মৃতিস্তম্ভটি। লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া ইউনিয়ন ও আহমেদপুর ব্রিজের নিচে যাদের নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দালালরা, তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়েছে।

**ফতেঙ্গাপাড়া শহীদ স্মৃতিসৌধ**

বড় হরিশপুর ইউনিয়নের ফতেঙ্গাপাড়া এলাকায় অবস্থিত এ স্মৃতিসৌধটি। ফতেঙ্গাপাড়া বধ্যভূমি থেকে প্রায় অর্ধ কিলোমিটার পূর্বে এটি নির্মিত হয়েছে। উপজেলা চেয়ারম্যান শরীফুল ইসলামের উদ্যোগে ফতেঙ্গাপাড়ায় গণহত্যার শিকার শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয়েছে।

**ফুলবাগান শহীদ স্মৃতিমিনার**

নাটোর পৌরসভার ফুলবাগান নামক স্থানে (বর্তমান উপজেলা পরিষদের বিপরীত পার্শ্বে) এ স্মৃতিসৌধটি অবস্থিত। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে এটি নির্মিত হয়েছে। ১৯৭১ সালে এখানে গণহত্যার শিকার প্রায় ১৫ থেকে ১৬ হাজার মানুষের স্মৃতি রক্ষার্থে এটি নির্মিত হয়েছে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাতে ঢাকায় ইতিহাসের জঘন্যতম অধ্যায়ের সূচনা হয়। ২৫শে মার্চের পর থেকে নাটোর সদর থানাতেও বিভিন্নভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এক পর্যায়ে ১লা এপ্রিল অবাঙালি বিহারীদের সাথে মুক্তিকামী বাঙালিদের সংঘর্ষ বাঁধে। এ সংঘর্ষে বিহারী কয়েকজন মারা যায়। পরবর্তীতে পাকিস্তানি সেনাদের সাথেও সংঘর্ষ হয়। ১২ই এপ্রিলের দিকে নগর বাড়ী হয়ে নাটোর শহরে প্রবেশ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। অবাঙালি বিহারী, রাজাকার, আলবদর, আলশামস, শান্তিকমিটি সহ তাদের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে সহযোগিতায় পুরো নাটোর জুড়ে হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, নির্যাতন, লুটপাট সব মিলে ধ্বংসের তান্ডব লীলা শুরু করে। নয় মাস জুড়ে চলে তাদের এই ধ্বংসলীলা যজ্ঞ। ১৯৭১ সালে নাটোর সদর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানিদের সহযোগী হিসেবে যারা কাজ করেন (রাজাকার আলবদর আলশামস-শান্তিকমিটি) তাদের অধিকাংশের সম্পর্কে সুজিত সরকারের *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থ থেকে জানা যায়। এগ্রন্থে নাটোর সদর উপজেলার শান্তি কমিটির ৩৩ জন ও রাজাকারদের ৬২ জনের তালিকা রয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে আরো অনেক দালালদের নাম জানা গিয়েছে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নাটোরে তাদের ২নং হেডকোয়ার্টার স্থাপন করেছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার কারণে। ফলে উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার মিলিটারী সাজোয়া গাড়ি নাটোর শহরে প্রবেশ করে। তাঁরা নাটোর সদরের ফুলবাগান, দিঘাপতিয়া, কালীবাড়ি, শকুলপট্টি (বর্তমান গ্রীণ একাডেমী), দিঘাপতিয়া (উত্তরা গণভবন), পিটিআই প্রভৃতি স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে নারী-পুরুষদের বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে এনে নির্যাতন, ধর্ষণ করে হত্যা করে ফেলে রাখত। নাটোর সদর উপজেলার নিরীহ মানষের উপর হঠাৎ আক্রমণ করে, কখনও লাইনে দাঁড় করিয়ে, হাত ও চোখ বেঁধে গুলি করে, বেয়নেট চার্জ করে বা ছুরি, চাপাতি প্রভৃতি দিয়ে আঘাত করে হত্যা করত। বহু নারীকে বাড়িতে, কখনও ক্যাম্পে ধরে নিয়ে গিয়ে দিনের পর দিন ধর্ষণ করত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকার আলবদর। শুধু তাই নয়, তারা কখনও একাকী বা কখনও গণহারে ধর্ষণও করত নারীদেরকে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের গণহত্যা ও ধর্ষণের প্রভাব শুধু এই নয় মাসই ছিল তা নয়। আহত ও নির্যাতিত নারীদের সেই দুর্বিসহ স্মৃতি ও যন্ত্রণা আজও বয়ে চলতে হচ্ছে। অনেকে আহত হয়ে সেই শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা নিয়েই মারা গিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শী মাধব চন্দ্র দাস তেমনই একজন। চৌকিরপাড় গণহত্যার সময় বেয়নেট দিয়ে তাঁর পেটে আঘাত করে ঘাতক বাহিনী। সেই যন্ত্রণা নিয়েই তিনি মারা গিয়েছেন স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করলে মুক্তিকামী বাঙালিও থেমে থাকেনি। তাঁদের দুঃসাহসিক প্রতিরোধের মুখে এক পর্যায়ে হানাদার বাহিনী পরাস্ত হয়। ১৫ই ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনতার প্রচেষ্টায় এ উপজেলা হানাদার মুক্ত হয়। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রায় আট হাজার সদস্য নাটোর শহরের ফুলবাগান, দিঘাপতিয়ার উত্তরা গণভবন, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলেজ সহ বিভিন্ন স্থানে জমায়েত হয়। ১৯শে ডিসেম্বর মিত্র বাহিনী নাটোরে আসে। মিত্রবাহিনী না আসা পর্যন্ত হানাদার বাহিনী ও দালালরা নিজেদের আত্মরক্ষার চেষ্টা করে। মিত্রবাহিনীর কাছে হানাদার বাহিনী ২১শে ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পণ  করে প্রায় আট হাজার সদস্য নিয়ে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অধিনায়ক মেজর জেনারেল নজর হোসেন শাহ ও ব্রিগেডিয়ার নওয়াব আহমেদ আশরাফ নাটোরে মিত্রবাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল লছমন সিং ও ব্রিগেডিয়ার রঘুবীর সিং পান্নুর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের পর মুক্তিযোদ্ধারা দলে দলে মিছিল সহকারে আনন্দ উল্লাস করে শহরে। হানাদার বাহিনীর সহযোগী অনেক দালাল, রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনীর অনেকেই পালিয়ে যায় নাটোর ছেড়ে। দীর্ঘ নয় মাস পরে নাটোর সদর ও নাটোর সদর এর অধিবাসীরা যেন শান্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছিল, ফিরে পেয়েছিল জীবনী শক্তি।

তথ্য নির্দেশ

---

[১] সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া-ষষ্ঠ খন্ড, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১, পৃ. ৩৭৮-৩৮১

[২] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পৃ. ১৩৯-১৪১

[৩] সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮-৩৮১

[৪] নাটোর জেলা বাতায়ন, (http://natoresadar.natore.gov.bd)

[৫] জেলা বাতায়ন (http://chhatniup.natore.gov.bd.)

[৬] প্রাগুক্ত

[৭] প্রাগুক্ত

[৮] প্রাগুক্ত

[৯] জেলা বাতায়ন (http://dighapatiaup.natore.gov.bd)

[১০] সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮-৩৮১

[১১] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪১

[১২] জেলা বাতায়ন (http://dighapatiaup.natore.gov.bd)

[১৩] স্মরণিকা, *মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস* ২০০২, জেলা প্রশাসন, নাটোর, ২৬ মার্চ ২০০২, পৃ. ৩৫

[১৪] জেলা বাতায়ন (http://dighapatiaup.natore.gov.bd)

[১৫] জেলা বাতায়ন, (http://baraharishpurup.natore.gov.bd)

[১৬] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪১

[১৭] সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮-৩৮১

[১৮] জেলা বাতায়ন, (http://baraharishpurup.natore.gov.bd)

[১৯] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪১

[২০] সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৮-৩৮১

[২১] প্রাগুক্ত

[২২] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪১

[২৩] প্রাগুক্ত

[২৪] সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩০

[২৫] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩০-১৩১

[২৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮-১৫৯

[২৭] মুনতাসীর মামুন, *শান্তিকমিটি ১৯৭১*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৬

[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩-২২৪

[২৯] *দৈনিক মুক্তকণ্ঠ*, ১৩ এপ্রিল, ১৯৯৮

[৩০] মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ-দ্বিতীয় খন্ড*, সময়, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৮৯-৯০

[৩১] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৫

[৩২] আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস দ্বিতীয় খন্ড*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৫৩

[৩৩] আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩

[৩৪] বীর মুক্তিযোদ্ধা হুজুর আলী খান, পিতাঃ রশিক আলী খান, মৌজাঃ মোকরামপুর, ইউনিয়নঃ বড় হরিশপুর, উপজেলা : নাটোর সদর জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : নিজবাড়ি, ১৬ জানুয়ারী, ২০১৬

[৩৫] মাসুদ আহমেদ ও মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, উপজেলাঃ নাটোর সদর জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ ২৪ নভেম্বর, ২০১৪

[৩৬] শ্রী আনন্দ জমাদার (৬৭), পিতাঃ ভিখু জমাদার, নাটোর সদর হাসপাতাল। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নাটোর সদর হাসপাতাল, ১৬ জানুয়ারী ২০১৬

[৩৭] তপন কুমার সিংহ (৬০), এলাকাঃ কালীবাড়ি, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নাটোর কালীবাড়ি, ২৪ নভেম্বর, ২০১৪

[৩৮] নিতাই চন্দ্র বাগচী (৬০), পিতাঃ শহীদ কানাইলাল বাগচী, মহল্লাঃ উত্তর চৌকির পাড়, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি, ২৩ নভেম্বর, ২০১৪

[৩৯] সমীপ বাগচী, পিতাঃ কালী চন্দ্র বাগচী, বাড়িঃ দক্ষিণ চৌকির পাড়, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ২৬ নভেম্বর, ২০১৪

[৪০] সাবিত্রী বিশ্বাস (৬৫), পিতাঃ রাধা চরণ দাস, মহল্লাঃ উত্তর চৌকির পাড়, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ২৩ নভেম্বর, ২০১৪

[৪১] প্রদীপ কুমার দাস (৫৬), পিতাঃ শহীদ ভাদু চন্দ্র দাস বাড়িঃ দক্ষিণ চৌকির পাড়,উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ২০ জুলাই, ২০১৫

[৪২] হরিদাসী মোহন্ত, বাড়িঃ দক্ষিণ চৌকির পাড়, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি, ২৩ নভেম্বর, ২০১৪

[৪৩] প্রদীপ কুমার দাস, প্রাগুক্ত

[৪৪] মাধব চন্দ্র দাস (৭০), বাড়িঃ দক্ষিণ চৌকির পাড়, থানাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি ২৩ নভেম্বর, ২০১৪

[৪৫] দিপালী রায় (৭০), বাড়িঃ দক্ষিণ চৌকির পাড়, থানাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি, ২৩ নভেম্বর ২০১৪

[৪৬] মোহাম্মদ ওসমান আলী প্রামাণিক (৭০), পিতাঃ ফয়েজুদ্দিন প্রমাণিক, বাড়িঃ হালসা। ইউনিয়ন হালসা, সভাপতি, নাটোর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ। জেলাঃ নাটোর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ। জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ হালসা বাজার, ১৯ জানুয়ারি ২০১৬

[৪৭] আলহাজ্ব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম (৭২), বাড়িঃ ছাতনী স্লুইচ গেইট, ইউনিয়নঃ ছাতনী, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ ২৬ নভেম্বর, ২০১৪

[৪৮] মোহাম্মদ আবুল কাশেম (৫৮), পিতাঃ ফজলুর রহমান ভূইয়া, বাড়িঃ ছাতনী। জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ ছাতনী স্লুইচ গেইট, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬

[৪৯] মোহাম্মদ মফিজ উদ্দিন (৮১), পিতাঃ আসাদুল্লাহ মিয়া, বাড়িঃ ছাতনী ইউনিয়ন পরিষদ। জেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ ছাতনী স্লুইচ গেইট, ১৯ জানয়ারি, ২০১৬

[৫০] মোহাম্মদ তোফাজ্জেল হোসেন সরকার (৬৪), পিতাঃ ছিট সরকার, গ্রামঃ মাঝদিঘা, ইউনিয়নঃ ছাতনী, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ ছাতনী স্লুইচ গেইট, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬

[৫১] মোঃ মকসেদ আলী মোল্লা (৬৭), বাড়িঃ ছাতনী, ইউনিয়নঃ ছাতনী, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নাটোর মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ, ২৫ নভেম্বর ২০১৪

[৫২] আব্দুল গফুর সরকার (৬০) , গ্রামঃ ছাতনী, ইউনিয়নঃ ছাতনী, উপজেলাঃ নাটার সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ ছাতনী স্লুইচ গেইট, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬

[৫৩] আবুল কালাম মাস্টার (৭৬), পিতাঃ ফজলুর রহমান, গ্রামঃ ছাতনী, ইউনিয়নঃ ছাতনী, উপজেলাঃ নাটার সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ ছাতনী স্লুইচ গেইট, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬

[৫৪] নুরুল আমিন ভূঁইয়া, পিতা; কালা মিয়া হাজী। গ্রামঃ ভাবনী, ইউনিয়নঃ ছাতনী উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬

[৫৫] আবু তাহের (৬৫), পিতাঃ চান মিয়া, গ্রামঃ ভাবনী, ইউনিয়নঃ ছাতনী, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬

[৫৬] গোবিন্দ চরণ পাল (৭০), পিতা: চন্দ্রনাথ পাল, বাড়ি: তেবাড়িয়া হাট, ইউনিয়ন: তেবাড়িয়া উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ: তেবাড়িয়া হাট, ১৯ জানুয়ারি ২০১৬

[৫৭] মোহাম্মদ মজিবর রহমান ভূইয়া, পিতা: আক্তারুজ্জামান ভূইয়া, গ্রাম: চর তেবাড়িয়া, ইউনিয়ন: লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া, উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ: চর তেবাড়িয়া, ১৯ জানুয়ারি ২০১৬

[৫৮] মোহাম্মদ ইছহাক আলী (৫৬), পিতা: মোহাম্মদ হায়দার আলী প্রাং, বাড়ি: লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া, উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ: ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬

[৫৯] বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ইব্রাহিম মিয়া (৭০), পিতা: শহীদ আমীর আলী। গ্রাম: বড় বাড়ীয়া, ইউনিয়ন: লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া, উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ: চর তেবাড়িয়া, ১৯ জানুয়ারি ২০১৬

[৬০] শ্রীমতি বুলু বালা দাসী (৭০), স্বামী: শচীন্দ্রনাথ। গ্রাম: ধলা, ইউনিয়ন: কদিমচিলান, উপজেলা: লালপুর, জেলা: নাটোর সদর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি। ১৫ জানুয়ারি ২০১৬

[৬১] মোহাম্মদ আব্দুর রহিম (৬৩), গ্রাম: কান্দিপিটুয়া, উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ নাটোর মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ, ২৫ নভেম্বর ২০১৪

[৬২] এম এ হাসান, *যুদ্ধ ও নারী*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৭৭

[৬৩] সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, অনুপম, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৩৮

[৬৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

[৬৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

[৬৬] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫

[৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬

[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

[৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

[৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২

[৭১] আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[৭২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[৭৩] সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী , অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, পৃ. ৩০

[৭৪] স্মরণিকা, *মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস* ২০০২, জেলা প্রশাসন, নাটোর, ২৬ মার্চ ২০০২, পৃ. ৩৫

[৭৫] স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃ .৪৫

[৭৬] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

[৭৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬

[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮২

[৭৯] দৈনিক মাতৃভূমি, ৩ এপ্রিল, ২০০০

[৮০] স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪। *দৈনিক পূর্বদেশ*, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২, স্বপন দাস

[৮১] স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[৮২] স্বপন দাস, *দৈনিক সংবাদ*, ৬ জুন ১৯৯৫। সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

[৮৩] স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪

[৮৪] মুনতাসীর মামুন, *মুক্তিযুদ্ধ কোষ দ্বিতীয় খন্ড*,প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭০-১৭১

[৮৫] স্মরণিকা, *মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস* ২০০৩, জেলা প্রশাসন, নাটোর, ২৬ মার্চ ২০০৩, পৃ. ২৩

[৮৬] *দৈনিক মাতৃভূমি*, ৩ এপ্রিল, ২০০০

[৮৭] আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

[৮৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১

[৮৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

# চতুর্থ অধ্যায়

## লালপুর উপজেলা

নাটোর জেলার তৃতীয় বৃহত্তম উপজেলা লালপুর। সংগ্রাম, প্রতিবাদ, স্বাধীনতা অর্জন প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে এ উপজেলার রয়েছে স্মৃতি, গৌরব। ২৫শে মার্চের কালরাত্রিতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ঢাকা আক্রমণের মধ্য দিয়ে এদেশের নিরীহ বাঙালি জনতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এই হত্যাযজ্ঞ ও ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে তাদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের শোষণের শাসনকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছিল।

২৫শে মার্চের পর ধীরে ধীরে বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়তে থাকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। পাবনাতে ২৫ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট অব পাকিস্তানের সাথে স্বাধীনতাকামীদের সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে পাকিস্তান রেজিমেন্ট ব্যর্থ হয় এবং রাজশাহী হেড কোর্য়াটার-এ অতিরিক্ত সৈন্য চেয়ে পাঠায়। মেজর রাজা আসলাম সৈন্যও রসদ নিয়ে পাবনা যাওয়ার চেষ্টা করেও রাজশাহীতে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হন। কয়েকদিন পর ৩০শে মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কমান্ডার মেজর আসলাম রাজার নেতৃত্বে পাবনা থেকে রাজশাহী ফেরার পথে মূলাডুলি ও ধানাইদহে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে লালপুর উপজেলার গোপালপুরে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। ইতোমধ্যে অন্যান্য উপজেলা থেকেও পাকিস্তানি বাহিনীর প্রবেশের কথা শুনে স্বাধীনতাকামী জনতা (ইপিআর, আনসার, সাধারণ জনতা) নিজেদের যা কিছু অস্ত্র আছে, সব নিয়ে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে। লালপুর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকেও সকলে জড়ো হতে থাকে। ৩০শে মার্চ প্রথমবারের মত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী লালপুর উপজেলায় প্রবেশ করে। কিন্তু মুক্তিকামী জনতার প্রতিরোধের মুখে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রায় ২১ জন নিহত হয়। ফলে তাদের স্থানীয় জনগণ ও প্রতিরোধ করতে আসা জনতার উপর আক্রোশ বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রতিরোধ করতে আসা মুক্তিকামী জনতাসহ বহু নিরীহ সাধারণ জনগণ ও তাদের রোষানলে পড়ে। ওয়ালিয়া ইউনিয়নের ময়না গ্রামে প্রথম গণহত্যার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানি হানদার বাহিনী গণহত্যা, নির্যাতন ধ্বংসের যে অধ্যায় সূচনা করেছিল, তা পুরো নয় মাস ধরে চলে। লালপুর উপজেলার গোপালপুর, ওয়ালিয়া, দুয়ারিয়া, বিলমাড়িয়া প্রভৃতি স্থানে যুদ্ধকালীন পুরো সময়টা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে। আর তাদের সহযোগী হিসেবে লালপুরের স্থানীয় দালালরা ছাড়াও ছিল নাটোরের ঘাতক দালাল হাফেজ আবদুর রহমান। এসবের মধ্য দিয়েও এ অঞ্চলের মানুষও তাদের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল।

**অবস্থান :**

আয়তনের দিক থেকে নাটোর জেলার তৃতীয় বৃহত্তম উপজেলা লালপুর। থানা হিসেবে এটি ১৮৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের মাধ্যমে ১৯৮৩ সালে লালপুর থানা উপজেলায় উন্নীত হয়। লালপুর নামকরণের কোন সুনির্দিষ্ট ইতিহাস জানা যায় না, তবে এখানে মুঘল আমলে লালখান নামে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বাস করতেন। জনসাধারণের মতানুসারে তারই নামে এই উপজেলার নাম লালপুর হয়েছে। ২৪°০৭ থেকে ২৪°১৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫২ থেকে ৮৯°০৮ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

**সীমানা :** উত্তরে বাগাতিপাড়া ও বড়াইগ্রাম উপজেলা, দক্ষিণে ঈশ্বরদী, ভেড়ামারা এবং দৌলতপুর (কুষ্টিয়া) উপজেলা, পশ্চিমে বাঘা উপজেলা, পূর্বে পাবনার ঈশ্বরদী উপজেলা।

আয়তন : এ উপজেলার আয়তন ৩২৭.৯২ বর্গ কি. মি.।

এ উপজেলার দুটি নদী পদ্মা ও খলিশাডাঙ্গা প্রবহমান।[১] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ছিল ১৪৩৬৫৬ জন।[২] বর্তমানে জনসংখ্যা ২৪২৬৪৫ জন(২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। গ্রামের সংখ্যা ২১৭টি এবং পৌরসভা ১টি। এ উপজেলায় কিছু আদিবাসী যেমন - ওরাও, বুনো, পাহাড়ী ইত্যাদি বাস করে।[৩] প্রাচীনকালে এখানে মাটির বিভিন্ন তৈজসপত্র তৈরী হত। শাঁখার ব্যবসাও রয়েছে। ঘরবাড়ি কাঠ, বাঁশ, ইট-সিমেন্ট, মাটি প্রভৃতি দিয়ে তৈরি। গ্রামগুলোর কোনটি উন্নত, কোন স্থানে উন্নয়নের ছোঁয়া সেরকম নয়। প্রাচীনকাল থেকেই নাটোরের লালপুর এলাকা বসবাসের উপযোগী ছিল। আর্য সভ্যতা এখানে বিস্তার লাভ করেছিল। লালপুর উপজেলার ইউনিয়ন সংখ্যা ১০টি।[৪]

এ উপজেলায় যেসব ইউনিয়ন, গ্রাম ও এলাকাতে গণহত্যা ও নির্যাতন অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর বর্ণনা উল্লেখ করা হল:

**গোপালপুর পৌরসভা:**

লালপুর উপজেলার একটি মাত্র পৌরসভা গোপালপুর। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী গোপালপুর লালপুর থানার একটি ইউনিয়ন ছিল।[৫] পরবর্তীতে ১৯৯৯ সালে গোপালপুর লালপুর থানার পৌরসভায় পরিণত হয়। বর্তমানে এর আয়তন ১৫.১৭ বর্গ কি.মি.ও ওয়ার্ড সংখ্যা ৯টি।[৬] ইউনিয়ন থাকাকালীন ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ছিল ১৮৪৭৪ জন।[৭] পৌরসভা হিসেবে বর্তমানে জনসংখ্যা ১৯৯২০ জন(২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। রাস্তাঘাট উন্নত। বিখ্যাত নর্থবেঙ্গল সুগার মিল এখানে অবস্থিত।[৮]

**গোপালপুর:**

গোপালপুর পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড এ অবস্থিত এ মহল্লা। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ১৬৬২ জন ও আয়তন ছিল ২৯৮ একর।[৯] ১৯৭১ সালে এ এলাকার বাজারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিত আসে ও হত্যা করে বিভিন্ন স্থানের বহু মানুষকে। এছাড়া অগ্নিসংযোগ, লুটপাট করে। বাজারে কুজিপুকুরের একজনকে জীবন্তাবস্থায় কবর দিয়েছিল।

**মিল কলোনী :**

৭নং ওয়ার্ড এ অবস্থিত। এখানে নর্থ বেঙ্গল সুপার মিল রয়েছে। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী  এখানে বহু লোককে হত্যা করে।[১০]

**চংধুপইল ইউনিয়ন :**

উপজেলার উত্তর দিকে অবস্থিত। ৩নং চংধুপইল ইউনিয়নের আয়তন ৮৬০৬ একর। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ছিল ১৬৪৪২ জন।[১১] বর্তমানে জনসংখ্যা ৩২৬১ জন(২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী) ও গ্রামের সংখ্যা ২৭টি।[১২] নদী রয়েছে ১টি বড়াল নদী ও খাল ১টি ময়না খাল। ইউনিয়ন থেকে ১.৫ কি:মি: দূরে এই নদী ও খাল অবস্থিত। চংধুপাইল নামকরণের তেমন কোন ইতিহাস নেই।[১৩] তবে চংধুপাইল গ্রামের নাম অনুসারে চংধুপইল ইউপির নামকরণ করা হয়। কাঁচা রাস্তার পরিমাণ বেশি। গাছপালায় আচ্ছাদিত পরিবেশ।

**বাওড়া :**

এ গ্রামটি বাঁশবাড়িয়ার নিকটবর্তী। বাওড়া ৮নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। এ গ্রামে নারী ২৮৭ জন ও পুরুষ ২৮৩ জন।[১৪] এ গ্রামে আব্দুল্লাহপুর গামী একটি রেলপথ রয়েছে যেটি খলিশাডাঙ্গা নদীর একটি অংশের উপর বাওড়া ব্রিজে অবস্থিত। এ ব্রিজটির উপর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিভিন্ন স্থান থেকে লোক ধরে নিয়ে এসে হত্যা করে নদীতে ফেলে দিত।

**বিলমারিয়া ইউনিয়ন :**

লালপুর উপজেলার দক্ষিণে অবস্থিত বিলমারিয়া ইউনিয়ন এর আয়তন ৪২.৭৯ বর্গ কি.মি.।[১৫] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ছিল ১২১৫৭ জন।[১৬] বর্তমানে জনসংখ্যা ২৯১৫৯ জন(২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)।[১৭] পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এক ছিল বৃটিশ শাসনামলে। ৫নং বিলমারিয়া ইউনিয়ন একটি থানা ছিল। পরে বিভিন্ন জেলায় বিভক্ত এখান থেকে উপজেলা উঠে লালপুর উপজেলা হলো। গ্রামের সংখ্যা ২৫টি। এখানে কাঁচা রাস্তার পরিমাণ বেশি। এ ইউনিয়নের ভিতর দিয়ে একটি খাল প্রবাহিত। পদ্মা নদীর একটি শাখা এ ইউনিয়নের ভেতরে রয়েছে।[১৮]

**বিলমারিয়া গ্রাম :**

১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এ গ্রামের আয়তন ছিল ৩৪ একর ও জনসংখ্যা ছিল ২৪০ জন।[১৯] বর্তমানে জনসংখ্যা ১৫৮৫ জন(২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)।[২০] ১৯৭১ সালে বিলমারিয়া হাটে বহু লোককে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। এছাড়া বিলমারিয়ার বহু নারী নির্যাতিত হয় তাদের দ্বারা। বিলমারিয়াতে সাহেবদের নীলকুঠি ছিল যেখানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ক্যাম্প করেছিল। সেখানে বহু নর-নারী হয়েছে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও নিহত। বর্তমানে সেই কুঠিটি আর নেই। সেখানে এখন ফাঁকা মাঠ ও প্রাইমারি স্কুল রয়েছে।

**দুয়ারিয়া ইউনিয়ন :**

৬নং দুয়ারিয়া ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৬৭ সালে। এর আগে এ ইউনিয়ন বর্তমান ২নং ঈশ্বরদী ইউনিয়নের অংশ ছিল। দুয়ারিয়া ইউনিয়নের একটি বৃহৎ অংশ নিয়ে পরবর্তীতে বর্তমান ১০নং কদিমচিলান ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হয়।

সীমানা : উত্তরে অত্র উপজেলার কদিমচিলান ও ওয়ালিয়া ইউনিয়ন, পূর্বে বড়াইগ্রাম উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়ন, পশ্চিমে এ.বি. ইউনিয়ন ও ওয়ালিয়া ইউনিয়ন, দক্ষিণে এ.বি. ইউনিয়ন ও পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার মূলাডুলি ইউনিয়ন।[২১] এর আয়তন ৭৫৮৪ একর। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ১১৮৬২ জন।[২২] বর্তমানে ২০৭৯৪ জন (প্রায়) (২০০১ সালের আদমশুমারী) ও গ্রামের সংখ্যা ১৯টি।[২৩] এখানে পালাডাঙ্গা নামক খাল রয়েছে। খলিশাডাঙ্গা নদী (প্রায় ২.৫ কি.মি. দীর্ঘ) ইউনিয়নের একেবারে উত্তরের গ্রাম হোসেনপুরের মধ্য দিয়ে প্রবহমান।[২৪]

**রামকান্তপুর :**

ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রায় ৫ কি.মি. দক্ষিণে এ গ্রামটি অবস্থিত। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর আয়তন ছিল ৪১৩ একর ও জনসংখ্যা ৬৩৪ জন।[২৫] বর্তমানে জনসংখ্যা ২১২৪ জন(২০১১

সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। ১৯৭১ সালে এ গ্রামের বহুলোকসহ মহেশ্বর, রাকসা, কাশিমপুর, গ্রাম এছাড়া গোপালপুর পৌরসভার অর্ন্তগত ডহরশৈল গ্রামের লোকজন ধরে নিয়ে আসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং রামকান্তপুর গ্রামে হত্যা করে। রাকসা গ্রামের আয়তন ছিল তখন ২৮৭ একর ও জনসংখ্যা ১৯৭৪ সালে ৩৬২ জন ছিল। বর্তমানে জনসংখ্যা ১২৪০ জন।[২৬]

**ওয়ালিয়া ইউনিয়ন :**

লালপুর উপজেলার উত্তর দিকে অবস্থিত এ ইউনিয়ন আয়তন ৬৮৪০ একর।[২৭] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ছিল ১৫৭৯৯ জন।[২৮] বর্তমানে জনসংখ্যা ২৬১১৩ জন (২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। গ্রামের সংখ্যা ২৫টি। এ ইউনিয়নে বড়াল নদী ও খালিশাডাঙ্গা নদী প্রবহমান। এছাড়া চন্দনা খাল রয়েছে।[২৯]

**ময়না গ্রাম :**

ওয়ালিয়া বাজার থেকে পশ্চিম দিকে ২ কি.মি. দূরত্বে এ গ্রামের অবস্থান। গ্রামটি ৭নং ওয়ার্ডে অবস্থিত। ১৯৭৪ সালে এর আয়তন ছিল ৪৬৩ একর ও জনসংখ্যা ছিল ৯৩০ জন।[৩০] বর্তমানে জনসংখ্যা ১৮৮০ জন (২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। এ গ্রামের অধিকাংশ রাস্তাই কাঁচা (প্রায় ৭ কি.মি.)।[৩১] চারিপাশ গাছ-পালা দ্বারা আচ্ছাদিত। ১৯৭১ সালে নাটোর জেলায় সর্বপ্রথম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ গ্রামে প্রবেশ করে ও জনগণের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এ সময় স্থানীয় বহু মানুষসহ বিভিন্ন স্থান থেকে আসা মানুষদের হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর একজন মেজর ও এখানে নিহত হয়।

**ধুপইল :**

এ গ্রামটি ওয়ালিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ড-এ অবস্থিত। ১৯৭৪ সালে আয়তন ছিল ১২১১ একর ও জনসংখ্যা ছিল ৩৫৫৬ জন।[৩২] বর্তমান জনসংখ্যা ৫১৭৮ জন।[৩৩] রাস্তাঘাট উন্নত। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ গ্রামের বহুলোককে হত্যা করে।

## স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর থেকেই দেশে এক ধরনের যুদ্ধ প্রস্তুতি চলছিল। ২৬শে মার্চ সকাল থেকে সারা দেশের বেতার কেন্দ্রগুলি বন্ধ দেখে সবার মনে উৎকণ্ঠা বিরাজ করছিল। একটি বিদেশী রেডিও মারফত জানা গেল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকার পিলখানায় হামলা করে বহু পুলিশ হত্যা করেছে। ২৬শে মার্চ বিকালে কলকাতা বেতার থেকে জানা গেল পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে। এছাড়া ছোট বড় শহরগুলোতে ভীষণ গোলাগুলি চলছে (পাকিস্তানি বাহিনী এবং পুলিশ, ই.পি.আর ও আনসার বাহিনীর সঙ্গে)। সেই সঙ্গে “আমার সোনার বাংলা” গানটিও কলকাতা বেতার থেকে মাঝে মাঝেই প্রচার করা হচ্ছিল। ২৬শে মার্চের রাতে জানা গেল, বঙ্গবন্ধুকে পাওয়া যাচ্ছে না, সম্ভবত তাঁকে হত্যা কিংবা গ্রেফতার করা হয়েছে। এই সংকটময় মূহূর্তে লালপুরে জনাব ওমর ফারুক সরকার, ডা: খলিলুর রহমান, চেয়ারম্যান হাজির উদ্দীন, ডাঃ আবুল কাশেম (কর্ণেল অব:), বলাই চন্দ্র সাহা, চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান এবং আরও নেতৃস্থানীয় গণ্যমাণ্যের এক জরুরি বৈঠকে প্রাক্তন সৈনিক ও আনসার

দের নিয়ে একটি প্রতিরক্ষা বাহিনী গঠন করা হল। মসলেম দফাদার, হামিদুল হক (পোড়াবাবু), ওয়াহেদ, অজিত, রামচন্দ্র, আ: সাত্তার লেড়ু, মাহবুর রহমান সেন্টু সহ ১৬ জনের এই বাহিনী কিছুদিনের মধ্যেই ৩০ জনে উন্নীত হল। গোপালপুর সুগার মিল ও সরদহ পিটিসি থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি (থ্রি নট থ্রি) রাইফেল, কয়েকটা দেশী বন্দুক দিয়ে সজ্জিত করা হলো এই বাহিনীকে। সেই সময় চারঘাটে ও রাজশাহী শহর মুক্ত করার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের দায়িত্বে ছিলেন ক্যাপ্টেন গিয়াস, তার সঙ্গে ছিলেন ক্যাপ্টেন রশিদ ও মীরগঞ্জ ইপিআর প্লাটুন হেড কোর্য়াটারের নায়েব সুবেদার সিরাজুদ্দিন লস্কর। এদের সহযোগিতা ও অস্ত্র সাহায্য পেয়ে লালপুর মুক্তিবাহিনী আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে হাজার হাজার মুক্তিপাগল জনতা লাঠি-সোটা তীর ধনুক নিয়ে এই বাহিনীর সাথে যোগ দিল। লালপুর প্রতিরক্ষা বাহিনী এভাবেই স্থানীয়দের নিয়ে প্রতিরোধ সৃষ্টি করল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে।[৩৪]

## সংগাম কমিটি গঠন

পূর্ব পাকিস্তানকে দীর্ঘ দিনের শোষণ, বঞ্চনার পরও ১৯৭০-এর নির্বাচনে জয়ী হলেও পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি করতে থাকে। এই পরিস্থিতি বাংলাদেশের মানুষকে অধিকার আদায়ে আরও সংগ্রামী করে তুলেছিল। এ সময় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ৭ই মার্চের ভাষণের পরপর লালপুর থানা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন জিল্লুর রহমান, আমজাদ হোসেন, রুস্তম আলী সরকার, বাছের উদ্দিন, মকবুল হোসেন, নিজাম উদ্দিন, ডা. আবুল কাশেম, আব্দুর রহমান প্রমুখ। এরা মুক্তিযুদ্ধের সময় স্থানীয়দের সংগঠিত করে দেশকে রক্ষার ক্ষেত্রে।

ইউনিয়ন পর্যায়েও সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়েছিল লালপুর উপজেলায়২নং ঈশ্বরদী ইউনিয়নের সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন আরশেদ আলী মোল্লা, ৩নং চংধুপইল ইউনিয়নে আমজাদ হোসেন, ৪নং আড়বার ইউনিয়নে বাছের আলী খান, ৫নং বিলমারিয়া ইউয়িনে আবু তাহের, ৬নং দুয়ারিয়া ইউনিয়নে মকবুল হোসেন, ৭নং ওয়ালিয়া ইউনিয়নে রুস্তম আলী সরকার, ৮নং দুরদুরিয়া ইউনিয়নে ডা. আবুল কাশেম, ৯নং অর্জুনপুর বরমহাটী ইউনিয়নে ফজলুল হক ও গোলাম সরওয়ার, ১০নং কদমচিলান ইউনিয়নে কে.এম নিজাম উদ্দিন খান ও বিশ্বনাথ সরকার প্রমুখ ভূমিকা রাখেন লালপুর উপজেলার ইউনিয়নে সংগ্রাম কমিটি গঠনে। পরবর্তীতে এলাকায় জনগণকে প্রেরণা দিয়েছেন তারা স্বাধীনতা রক্ষায়।

## শান্তি কমিটি গঠন

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী লালপুরে প্রবেশ করলে জুলাই-আগস্ট মাসের দিকে শান্তিকমিটি গঠিত হয় লালপুর উপজেলায়। এর নেতৃত্বে ছিলেন হাজী শাহাদাৎ আলী। এছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়েও শান্তিকমিটি গঠিত হয়। ওয়ালিয়া ইউনিয়নে শান্তি কমিটি গঠিত হয় ডা. আব্দুল আজীজ সরকার ও কদমচিলানের আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বে দুয়ারিয়া ইউনিয়নে কাজী আবেদ আলী, জসিম উদ্দিন (এ.বি ইউনিয়ন) ও জামাল উদ্দিন মৌলভীর নেতৃত্বে, গোপালপুর এ সাহাবুদ্দিন, আব্দুস সোবহান চৌধুরীর নেতৃত্বে বিলমারিয়া ইউনিয়নে আয়েজ উদ্দিন মোল্লা, সোনা মিয়া (রাজাকার), হবিল প্রামাণিক (পিতা-যদু প্রামানিকের (মোহরাম) নেতৃত্বে, আড়বার ইউনিয়নে রাহাত মৃধার, শামসেদ দিলারের নেতৃত্বে, চংধুপইল ইউনিয়নে মজির উদ্দিন সরকারের নেতৃত্বে, দুরদুরিয়া ইউনিয়নের মহাসিনের নেতৃত্বে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। পাকিস্তানি

হানাদার বাহিনী উক্ত শান্তি কমিটির সহযোগীতায় উক্ত এলাকাগুলো আক্রমণ করে সেখানে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করে।

## পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের ক্যাম্প সমূহ

১৯৭১ সালে মে থেকে জুলাই মাসের দিকে লালপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার আলবদর বাহিনী। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্থান হল :

১. জুলাই মাসে, পাকিস্তানি লেফটেন্যান্ট সাওলাত আব্বাসের অধীনে লালপুর শ্রী সুন্দরী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি স্থায়ী সেনা ক্যাম্প স্থাপন করা হয় ও লালপুর থানায় পাঞ্জাব পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

২. **নীলকুঠি ক্যাম্প :** এটি বিলমারিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। ব্রিটিশ শাসনামলে নীলকুটি ছিল ব্রিটিশ নীল ব্যবসায়ীদের আস্তানা। এখানে তারা সেসময় বহু মানুষকে এনে নির্যাতন করত। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী এস্থানটিতে ক্যাম্প স্থাপন করে প্রচুর মানুষকে নির্যাতন, নারী ধর্ষণ করে হত্যা করেছে। এছাড়াও ইউনিয়নগুলিতে রাজাকার ক্যাম্প বসানো হয়। গোপালপুর বাজারেও ক্যাম্প ছিল বলে জানা যায়।

## লালপুর উপজেলায় গণহত্যা ও নির্যাতনে সূচনা

১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চে রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর নিষ্ঠুরতা বর্বরতায় রূপ নিল এবং লালপুরে আওয়ামী লীগ নেতা এম এন এ  নাজমুল হক সরকার, অবাঙালি হাফিজ সাত্তার, বীরেন সরকার উকিল, শিল্প ব্যাংকের ম্যানেজার সাইদুর রহমান সহ আরও অনেকে নিহত হলেন এই খান সেনাদের হাতে। ঐদিন পাবনাতেও হত্যাযজ্ঞ চালায়। তবে পাকিস্তানি বাহিনী ওখানে পরাস্ত হয়ে রাজশাহীর দিকে রওয়ানা দিলেও প্রতিরোধের মুখে পড়ে। এরপর ঈশ্বরদী ও গোপালপুর ও তারা বাধাগ্রস্থ হয়। গোপালপুরে রেলক্রসিংয়ের কাছে ওয়াগন দিয়ে ব্যারিকেডে বাধাগ্রস্থ হয়। স্টেশন মাস্টার ওয়াগনটি সরাতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে তাঁর এক পুত্রকে গুলি করে হত্যা করা হয়। এদিকে হাজার হাজার জনতা লাঠি-সোটা, বল্লম এবং সাঁওতাল শ্রমিকরা তীর-ধনুক নিয়ে ওদের ঘিরে ফেলে। কিছুক্ষণ পর অবস্থা বেগতিক দেখে খান সেনারা তাদের একখানা জিপ ও ছয়খানা ট্রাক নিয়ে পূর্ব দিকে সরে গিয়ে ওয়ালিয়ার ময়না গ্রামে নৈমুদ্দিনের বাড়িতে ঘাঁটি স্থাপন করে গোলাগুলি বর্ষণ করতে শুরু করল। কিন্তু মুক্তিপাগল স্থানীয় জনতার সাথে যুক্ত হয় নাটোর জেলার বিভিন্ন থানার মুক্তিকামী জনতা। এ প্রতিরোধ যুদ্ধে সাঁওতাল একজন সহ স্থানীয় অনেক জনতা নিহত হয়। পাকিস্তানি বাহিনী ক্ষোভে বহু জনতাকে হত্যা করে সেখানে। একপর্যায়ে স্থানীয় জনতার হাতে ধরা পরে মেজর রাজা আসলাম সহ আরও তিনজন পাকিস্তানি সৈন্য (গম ক্ষেতে)। এদেরকে হত্যা করে স্থানীয় জনগণ। এভাবে মেজর সহ পাকিস্তানি সৈন্য হত্যায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে পাকিস্তানি বাহিনী। ১৫ই এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পুনরায় এক বিরাট কনভয়, ৫৮ খানা বাস ট্রাক সহ লালপুরে প্রবেশ করে। লালপুর উপজেলা গোপালপুর, ওয়ালিয়া, বিলমারিয়া সহ প্রায় এলাকায় নির্যাতন, লুটপাট, হত্যা ধ্বংসযজ্ঞের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

## লালপুর উপজেলায় গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

২৯শে মার্চ ১৯৭১, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পাবনাতে পরাস্ত হয়। রাজশাহী থেকে নাটোরের মধ্য দিয়ে সাহায্য দেয়ার জন্য পাকিস্তানি সৈন্যের একটি বহর ২৫ রেজিমেন্ট অব পাকিস্তান। যাচ্ছিল কিন্তু তারা বাধা প্রাপ্ত হয়। এ বাহিনী মেজর রাজা আসলামের নেতৃত্বে ছিল। শংকর গোবিন্দ চৌধুরী রাত আড়াইটার দিকে গোপালপুর চিনিকলের ম্যানেজার লেঃ আনোয়ারুল আজিমকে জানালেন এই পাকিস্তানি সৈন্যের কনভয়টি সুগার মিল বা ঐ পথে বিমান বন্দরে যাবে। ভোরের দিকে কনভয়টি এসে পৌঁছালো গোপালপুর রেল গেটের সামনে। কনভয়ে ছিল ২টি পিকআপ, ২টি জিপ ও ৩টি ট্রাক। শতাধিক সৈন্য আর রসদসপত্র সহ ২ জন অফিসার নিয়ে মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা বা আসলাম রাজা যাচ্ছিলেন। শঙ্কর গোবিন্দর সংবাদ পেয়ে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে। স্থানীয় প্রতিরোধ বাহিনীর মুখে পাকিস্তানি বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয়। পাকিস্তানি বাহিনীর বোমার আঘাতে স্থানীয় প্রায় ১৭জন শহীদ হয়। এরপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর কনভয় ৩০শে মার্চ মেজর আসলাম রাজার নেতৃত্বে পাবনা থেকে রাজশাহী যাবার পথে মুলাডুলিতে রাস্তায় ব্যারিকেড থাকায় মনির উদ্দিন আকন্দ রোড ধরে গোপালপুর সুগার মিলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। বিজয়পুর বামন গ্রাম সীমান্তে ইছামতি খালের উপর ব্রিজের (সিঙ্গি ব্রিজ হিসেবে পরিচিত) পশ্চিম পাড়ের পার্শ্বে ইতোমধ্যেই রাস্তাকে আড়াআড়িভাবে কেটে প্রতিরোধ গড়ে তুলে পিছু নেওয়া জনতা। উল্লেখ্য, হানাদার বাহিনী আসছে শুনতে পেরে নাটোরের বিভিন্ন এলাকা থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের প্রতিরোধ করার জন্য মুক্তিকামী জনতা আসতে থাকে। আর স্থানীয় জনগণও নিজেদের দেশি বন্দুক, তীর, ধনুক, বাঁশের নলা, বর্ষা, ফলা ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুতি নিচ্ছিল প্রতিরোধ গড়তে। পাকিস্তানি বাহিনী প্রতিরোধের মুখে পড়ে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ফলে গোলা ফেলতে শুরু করে। এতে প্রতিরোধ করতে আসা অনেকেই আহত হয়। প্রতিরোধ করতে আসা অনেককেই ধরে ফেলে এবং খলিশাডাঙ্গা নদীর দিকে নিয়ে যায়। কিন্তু নদীতে নামার পর আর কোন রাস্তা না পেয়ে নদীর ওপারে (উত্তর পাড়ে) গোপালপুরের ৪ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত ময়না গ্রামে সৈয়দ আলী মোল্লা ও নওয়াব আলী মোল্লার বাড়ি দখল করে সকাল ১০টায়। নইম উদ্দিনের বাড়িতেও তারা ক্যাম্প করে।

হারুন অর রশিদ জানান, ঐ ধৃত কয়েক জনকে ঘাটির পাশে আম গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখে দিনভর নির্যাতন চালানো হয়। এপর্যায়ে জনতা, ই.পি.আর, আনসার বাহিনীর লোকেরা ধৃত ব্যক্তিদের উদ্ধার করার জন্য পাকিস্তানি সেনাদের ঘিরে ফেলে। পাকিস্তানি সেনাদের উদ্ধারের জন্য কয়েকটি হেলিকপ্টার গুলি বর্ষণ করে। উভয় পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ চলতে থাকে মধ্যরাত পর্যন্ত। পাকিস্তানি সৈন্যরা ধৃত ব্যক্তিদের গাছে ঝুলিয়ে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে শেষে গুলি করে হত্যা করে এবং শেষ পর্যন্ত রকেটশেল বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ছদ্মবেশে পালিয়ে যাবার পরিকল্পনা করে। আহতাবস্থায় গুলিবিদ্ধ মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ প্রাং পাকিস্তানি বাহিনীর গোলা-বারুদ শেষ বলে খবর দিলে বীর জনতা আরও কঠোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে। পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয় শেষ রাত্রের দিকে। ফলে পাকিস্তানি ২৫ রেজিমেন্ট বাহিনী পরাজিত হয়। হানাদার বাহিনীর কয়েকজন সদস্য সহ বাহিনীর নেতৃত্ব দানকারী মেজর রাজা আসলাম খান ছদ্মবেশে (শাড়ি পড়ে) পালানোর চেষ্টা করলে বাঙ্গালীদের সম্মিলিত বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে ও রুষ্ঠ জনতার হাতেই তাদের মৃত্যু ঘটে। ৩০ ও ৩১ মার্চ শুধুমাত্র প্রতিরোধকারীদের কয়েকজনই শহীদ হয়নি, বরং ঘাতক হানাদার বাহিনীর নির্মম ধ্বংসযজ্ঞের সম্মুখীন

হয়েছিল। ফসলের জমিতে, ঘরের অভ্যন্তরে, বাড়ির আঙ্গিনায় এবং ঝোপঝাড়ে প্রাণভয়ে লুকিয়ে থাকা সাধারণ বহু নিরীহ মানুষের অনেকের লাশ পড়ে থাকতে দেখা যায়। এছাড়া ময়না প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে যাওয়ার পথে পাকিস্তানি সেনা (গোপালপুর থেকে ফেরার পথে) দের গুলিতে সাহেব উল্ল্যাহ, মোঃ আব্দুল গফুর সহ প্রায় ১৩-১৪ জন শহীদ হন। পাকিস্তানি সৈন্যদের বহর যাবার পথে প্রচুর গুলি বর্ষণ করতে থাকে। এসময় গর্তে লুকানো অবস্থায় ঐ ১৩-১৪ জন ব্যক্তি গুলি লেগে নিহত হন। ময়না যুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আসা নুর-নবী মন্টু (রাঙ্গা ভাই) ও গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন। মঙ্গল নামক এক যুবক খেজুর গাছে উঠে পাকিস্তানিদের অবস্থান দেখছিল। এমতাবস্থায় তাকে লক্ষ করে পাকিস্তানি সৈন্যরা গুলি করে। ঐ অবস্থায় তাকে হাসপাতালে নিলেও তার মৃত্যু ঘটে।[৩৫]

মোসাঃ ছানোয়ারা জানান,

> মোসলেম উদ্দিন মোল্লা ও আবুল কাশেমকে মাইটালে লুকানো অবস্থায় সেখান থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। মোসলেম উদ্দিন হানাদার বাহিনী এলে তাদের অবস্থান জেনে বাড়ি আসেন সকলকে সাবধান করতে। তার ভাই আবুল কাশেমও বাড়িতেই ছিলেন সে সময়। মোসলেম উদ্দিন তাঁর মা, ভাই ভাবী, বোন ও চাচীকে নিয়ে মাইটালে লুকায়। ঘাতকরা তাদের দেখে ফেলে। সেখান থেকে পরিবারের সকলকে ধরে নিয়ে আসে। মোসলেম উদ্দিন ও আবুল কাশেমকে গাছের সাথে বাঁধে ও পরিবারের অন্য সদস্যদের ঘরে বন্দী করে রাখে। সেই গাছেই বাঁধা অবস্থায় তাদের গুলি করে হত্যা করে।[৩৬]

আব্দুল কুদ্দুস মোল্লা জানান, বামন গ্রামের সেকেন্দ তাঁদের সাথে লুকিয়েছিল মাইটালে। আব্দুল কুদ্দুস নিজের একটি হাগড়া গাছ (স্থানীয় নাম)-এ লুকিয়েছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা তাঁদের দেখে ফেলে এবং গুলি ছুঁড়তে লাগলে সেকেন্দের শরীরে গুলি লেগে সে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। কুদ্দুস মোল্লাও গুলির বারুদ লেগে আহত হন। গুলি লাগার পর সেকেন্দ বলছিল- 'ও মারে আমাকে বাঁচা'। আব্দুল কুদ্দুসের বাবা, চাচা, ভাই, চাচাত ভাইকেও গুলি করে হত্যা করে হানাদাররা।[৩৭]

এভাবে ৩০শে মার্চ ও ৩১শে মার্চ ওয়ালিয়া ইউনিয়নের ময়না গ্রামে পরপর দু'দিন পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রতিরোধ যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে নিরীহ বহু মানুষকেও হত্যা করেছিল। শুধু তাই নয়। বাড়ি-ঘর লুটপাট, পুড়িয়ে ফেলা এগুলোও চলছিল পাশাপাশি। শুধু এ দুদিনই নয়। এরপরও ঘাতক বাহিনী এসেছে এই গ্রামে। লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করেছে মানুষকে না পেয়ে। ততদিনে অনেকেই অন্যত্র লুকিয়েছিল দেশের পরিস্থিতি লক্ষ করে। ময়না প্রতিরোধ যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর মেজর রাজা আসলাম সহ প্রায় ২১ জন মারা যায় এবং প্রতিরোধকারী মুক্তিকামী প্রায় ২৪ জন ও নিরীহ সাধারণ মানুষও প্রায় ১০ জন মারা যান। পাকিস্তানি সৈন্য হত্যার প্রতিশোধ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বার বার নিয়েছে লালপুরের বহু নিরীহ মানুষকে হত্যা করে, নির্যাতন করে লুটপাট সহ বিভিন্ন ধ্বংসযজ্ঞ করে।

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দুয়ারিয়া ইউনিয়নের রামকান্তপুর গ্রামে আক্রমণ করে। বিহারি আব্দুল মজিদ, ওয়ালিয়ার এলাহী ডাক্তার, মোহরকয়ার তসিকুল ইসলাম প্রমুখ ঘাতক পাকিস্তানি হানাদারদের জানায় যে, এই গ্রামে মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান করছে। এ তথ্যের ভিত্তিতে আব্দুল মজিদ, জসীম উদ্দিন, আনোয়ারুল প্রমুখর নেতৃত্বে পাকিস্তানি ঘাতকরা রামকান্তপুরে আসে ও এ গ্রামে ৩৫-

৪০ জনকে বাড়ি থেকে বের করে আনে এলাকার একটি আম বাগানে। সেখানে তাঁদের গুলি করে হত্যা করে মাটি চাপা দিয়ে যায়।

মোঃ তইজউদ্দিন মন্ডল জানান,

> পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৭ই এপ্রিল ঈশ্বরদী বিমান বন্দর ক্যাম্প থেকে রওনা হয়ে রামকান্তপুর আসে। অনেকে নিরাপদ আশ্রয়ে গেলেও অনেকে আবার থেকে গিয়েছেন জমির ফসল ও বাড়িঘরের মায়ায়। দালালদের সাথে হানাদার বাহিনী আসে এবং গ্রামের নিরীহ মানুষদের আম বাগানে এনে ফেলে ও একসাথে সকলকে গুলি করে। অনেকেই তখনই মারা যায়। তিন জন ব্যক্তির মাঝে প্রাণ তখনও ছিল। একটু কেঁপে কেঁপে উঠছিল। তখন ঘাতকরা তাদের উপর বেয়নেট চার্জ করে। আবুল হোসেনের পিঠে গুলি লেগে তা সামনের বুক দিয়ে বের হয়ে গেলেও তিনি প্রাণে বেঁচে যান। তইজ উদ্দিনের নিজের হাতেও গুলি লাগে ও রগ (শিরা) ছিঁড়ে যাওয়ায় তা আর ঠিক হয়নি। এরপর পুরো গ্রামে লুটপাট করে অগ্নিসংযোগ করে।[৩৮]

মোঃ মতিউর রহমান সাক্ষাৎকারে জানান, ২৫শে এপ্রিল ১৯৭১, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী খলিশাডাঙ্গা ব্রিজে ই.পি.আর বাহিনীর সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। সে সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ছুঁড়ে দেয়া রকেট ল্যান্সারের আঘাতে পার্শ্ববর্তী ডাঙ্গাপাড়া ঘাটচিলানের বাসিন্দা আয়েশা খাতুন ও আশরাফ নিহত হন।[৩৯]

৫ই মে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঈশ্বরদী বিমান বন্দর থেকে বিহারী ইদুয়ার নেতৃত্বে গোপালপুর বাজারে আসে। বাঙালির প্রতিরোধ করলে গুলি ছুঁড়তে থাকে ঘাতকরা। ফলে প্রতিরোধকারীরা পিছু হটে। এতে পাকিস্তানি দালালও সৈন্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে গোপালপুর বাজারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। এসময় ১১জন নিরীহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করে ঘাতক সৈন্য ও দালালরা। শুধু তাই নয়, গোপালপুর বাজার লুটপাট করে ও আশেপাশের ঘর বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিল।

জোৎস্না বেওয়া জানান,

> শহীদ তোফাজ্জল গোপালপুর বাজারে দোকানে এ গিয়েছিলেন। তাঁকে সেই দোকানেই গুলি করে। পাশের দোকানের সাজদার রহমানকেও গুলি করে হত্যা করে। অনেকদিন দোকান বন্ধ রেখেছিলেন দেশের পরিস্থিতি বিবেচনা করে। স্থানীয় বিহারীরা তাঁদের পরামর্শ দিয়েছিল কোন সমস্যা হবে না, দোকান খুলতে। তাই আশরাফ, তোফাজ্জল, সাজদার প্রমুখ ব্যবসায়ী দোকান খুলেছিল। কিন্তু তাঁদের প্রাণ রক্ষা হয়নি সেদিন।[৪০]

বাবুল আক্তার জানান, ডা. শাহদাত হোসেন মানুষের চিকিৎসার জন্যই বাজারে গিয়েছিলেন প্রতিদিনের মত। কিন্তু কিছু জিনিস কিনতে একটু বের হলেন রাস্তায়। আর তখন তাঁকেও গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী।[৪১]

এরপর গোপালপুর বাজার থেকে বের হয়ে পাকিস্তানি ঘাতক বাহিনী চলে যান গোপালপুর চিনিকলে। লালপুরের অন্যতম হত্যাযজ্ঞটি তাঁরা সেখানে চালায় ঐ দিন অর্থাৎ ৫ই মে, ২১শে বৈশাখ ১৯৭১। চিনি কলে পৌঁছে মিলের তৎকালীন প্রশাসক লেঃ আনোয়ারুল আজীম কে নির্দেশ দেয় সকল শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে এক জায়গায় সমবেত করতে। মিল তখন চালু অবস্থায় ছিল। পাকিস্তানি সৈন্য আসছে দেখে অনেক শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা মিল ছেড়ে পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী প্রায় ৫০ জন শ্রমিক কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে নিয়ে মিলের অতিথি ভবন সংলগ্ন গোপাল সাগর নামক পুকুর পাড়ে নিয়ে যায় এবং

সান বাঁধানো স্থানে সকলকে বসে পড়তে বলে। সকলকে লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করে। এসময় মিলের প্রায় ৪১-৪৩ জন নিহত হন। কয়েকজন গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বেঁচে যায়। এছাড়া আরও প্রায় ৪০-৫০ জন আখচাষী ও অন্যান্যদের হত্যা করে পুকুরে নিক্ষেপ করা হয়। গোপাল সাগরে ভাসমান অবস্থায় খন্দকার এমাদ হোসেন, খন্দকার জালাল উদ্দিন ছিলেন গুলিবিদ্ধ হয়ে। পাকিস্তানি বাহিনী চলে গেলে লোকজন তাদের উদ্ধার করেন ও তাঁরা বেঁচে যান। হানাদাররা যাদের বেঁচে থাকতে দেখেছেন কাঁতরাচ্ছে, তাঁদের পুনরায় বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করেছে। গোপালপুর চিনিকলের সি আই সি মোঃ নজরুল ইসলাম জানান, ৫ই মে, সকাল ১১.৩০ মিনিটের দিকে সুগার মিলে প্রবেশ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গাড়ি। কিছু বিহারী এসে হঠাৎ সুগার মিলের গেইট বন্ধ করে দেয়। মিলের মহাব্যবস্থাপক আনোয়ারুল আজিমকে নির্দেশ দেয়া হয়, যেন মিলে কর্মরত সকল কর্মচারীদের ডেকে আনা হয়। মিটিং হবে। সকলে এসে একত্র হয় মহাব্যবস্থাপকের বাসার সামনে। কিন্তু কোন মিটিং হয়নি। সেখান থেকে সকলকে নিয়ে যাওয়া হয় গোপাল সাগর পুকুরে (বর্তমান শহীদ সাগর)। সকলকে অজু করতে বলে। আজিম সাহেব পাকিস্তানি সৈন্যদের কে বলেন, ‘এরা নিরীহ শ্রমিক, এদের ছেড়ে দেন। দোষ করলে কিছু আমি করেছি, যা করার আমাকে করেন।’ আজিম সাহেবের কোন অনুরোধ রাখা হয় নি। মেজর আসলাম রাজার হত্যাকারীরা এখানেই আছে বলে হানাদার বাহিনী সন্দেহ করছিল। উল্লেখ্য, ময়না যুদ্ধে মিলের বহু কর্মচারী সহ আজিম সাহেবও প্রতিরোধ করতে গিয়েছিলেন। এ সংবাদটি বিহারী বা অবাঙালি দোসররা জানিয়েছিল পাকিস্তানি বাহিনীদের। তাই প্রায় ২৭ জন সৈন্য সহ দালালদের নির্দেশে তারা পরিকল্পনা করেই মিলে প্রবেশ করেছিল।

আজিম সাহেবকে পায়ে আঘাত করে ও পরে গুলি করে। এরপর একে একে সকলকে গুলি করে হত্যা করে। যাদের মধ্যে মিল কর্মচারী ছাড়াও অনেক আখচাষী ছিল।[৪২]

খন্দকার জালাল আহমেদ জানান,

> গুলি করার পর অনেকে মাথা উঁচু করার চেষ্টা করলে তাঁদের পুনরায় অত্যাচার করা হয়। প্রায় ১২ জন সৈন্য গুলি শুরু করে ৫০-৫১ জনের উপর। তাঁর ছোট ভাইকে, বাবা সহ জালাল সাহেবকেও গুলি করা হয়। ছোট ভাই মারা যান। গুলি লেগে খন্দকার জালাল পড়েছিলেন। মাথা উঁচু করলে পুনরায় তাঁকে বেয়নেট চার্জ করে পুকুরে ফেলে দেয়। নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না তিনি। বিকেলের দিকে নওশেদ নামক গার্ড সহ কয়েকজন তাঁকে সহ যারা বেঁচে ছিলেন তাঁদের উদ্ধার করে। সেদিন পুরো পুকুর এর পানি রক্তে লাল হয়েছিল।[৪৩]

দুয়ারিয়া ইউনিয়নের বাওড়া ব্রিজ (বর্তমান আজীমনগর ও আব্দুলপুর রেলওয়ে জনসনের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত) এ মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে বহু মানুষকে বিভিন্নস্থান থেকে ধরে নিয়ে আসা হত ও হত্যা করা হত।

রেজাউল করিম জানান, তাঁকে হানাদার বাহিনী পাহারাদার নিযুক্ত করেছিল জোর করে। প্রায় প্রতি রাত্রে একটি সার্টল ট্রেন আসত রাত ১১/১২টার দিকে এই ব্রিজে উপর দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হত বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা লোকজনকে। এলাকাবাসী প্রায়ই গুলির শব্দ শুনতে পেত। বহমান চন্দন নদীতে সেই সব গুলিবিদ্ধ মানুষদের ফেলে দেয়া হত বাওড়া ব্রিজ থেকে।[৪৪]

২৯শে মে, ১৯৭১, ওয়ালিয়া ইউনিয়নের ধুপইল পঁয়তারপাড়া গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে। ধুপইল, পঁয়তাপাড়া ও দিলালপুর গ্রামগুলোতে মুক্তিযোদ্ধারা আশ্রয় নিত বলে পাকিস্তানি

বাহিনীকে খবরদেয় দালালরা। ময়েজ সরকার মোঃ গোলজার হোসেন, ইয়াদ আলী গলেহার লেহার মুন্সি (জামায়াত সদস্য) ও মজের উদ্দিন সরকার নামক রাজাকারের সাহায্যে তারা ধুপইল-এ এসেছিল। এছাড়া নাটোর জেলা রাজাকারদের প্রধান হাফেজ আবদুর রহমান নিজে উপস্থিত ছিলেন এ সময়। ওয়ালিয়া পুলিশ ফাঁড়ির নিকটে তারা ক্যাম্প করেছিল। ২৯শে মে রাত আনুমানিক ১২ টার পর ফুলবাড়ি প্রাইমারি স্কুল থেকে বাগাতিপাড়ার দয়রামপুর পর্যন্ত ঘেরাও করে। উল্লেখ্য, বাগাতিপাড়ার সীমান্তে ধুপইল, পঁয়তার পাড়া, দিলালপুর অবস্থিত। এ এলাকাগুলোর বিভিন্ন বাড়ি থেকে বহু মানুষকে ধরে নিয়ে ধুপইল স্কুলে নিয়ে যায়। পরে বড়াল নদীর পাশে প্রায় ৪০০ মত মানুষকে দাঁড় করে গুলি করে। কোন কোন ক্ষেত্রে অবাঙালি দালালরা ছুরিকাঘাত করেও হত্যাযজ্ঞ চালায়। এছাড়া বেয়নেট চার্জ করে ২৯ জনকে হত্যা করে। প্রায় ২৫-৩০ জন মহিলাকে নির্যাতন করে এ গ্রামগুলোর।

মোঃ আব্দুল গফুর জানান,

> গভীর রাত। সবাই ঘুমিয়েছিল। এমন সময় পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ে আসে রাজাকাররা। তখন অনেকেই আখের জমিতে, বা আশেপাশে জঙ্গলে লুকিয়েছিল। বহু লোককে বড়াল নদীর ধারে নামিয়ে নিয়ে হত্যা করে। আব্দুল গফুর আখের জমিতে লুকালে তাঁকে ধরে ফেলে পাকিস্তানি সৈন্যরা। জিজ্ঞেস করে 'তুম কেয়্যা করতাহু? মুসল্যাম হ্যায়? কলমা জানতে হ্যো?' তখন আব্দুল গফুর জবাব দেন 'মুদারেস আমি'। তখন এক বেলুচি অফিসারের কথায় ছেড়ে দিলে দৌড়ে প্রাণে বেঁচে যান তিনি। হিন্দু-মুসলিম কাউকেই ছেড়ে দেয়নি। মফি নামক এক ব্যক্তি বড়াল নদী পাড় হওয়ার চেষ্টা করলে তাকে গুলি করে হত্যা করে।[৪৫]

মোঃ আমীর হোসেন জানান, বাদল প্রামাণিক ও লকিম উদ্দিনকে জোর করে বেঁধে নিয়ে নদীর পাড়ে জবাই করে এবং তাঁদের শরীরে এসিড ঢেলে পুড়িয়ে দেয়।[৪৬] সন্তোষ কুমার মন্ডল জানান, একই পরিবারের সুরেন মন্ডল, রুহিনী মন্ডল, রসিক মন্ডল ও ধনেশ্বর মন্ডলকে ধরে পাকিস্তানি বাহিনী। ধনেশ্বর মন্ডল সেনাদের সাথে লড়াই করে বন্দুক কেড়ে নেয়। কিন্তু ফায়ার করতে না জানায় বাঁচতে পারেনি। দৌড়ে পালাতে গেলে তাঁকে গুলি করেন। তাঁর পরিবারের অন্যদেরও গুলি করে হত্যা করে।[৪৭] হত্যা ও নির্যাতন শেষে ধুপইল ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। লুটপাটের ঘটনা যুদ্ধকালীন বিভিন্ন সময়ে ঘটেছে এ এলাকাগুলোতে। নির্যাতিত নারীদের কেউ আর সেই দুঃসহ স্মৃতি মনে করতে চাননা। সামাজিকতা রক্ষার্থে তা গোপন রাখাই যথাযথ মনে করে তাঁরা।

১৫ই জুন ১৯৭১ বিলমাড়িয়া ইউনিয়নে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে। ঐদিন ছিল মঙ্গলবার। বেলা ২.৩০ মিনিটের দিকে তারা আসে হাটের সময়। বিভিন্ন স্থান থেকে বহু মানুষ এসেছিল বাজার করতে। সেদিন অসংখ্য মানুষের উপর নির্বিচারে গুলি বর্ষণ শুরু করে ঘাতক বাহিনী। অনেককে লাইনে বেঁধে দাঁড় করে গুলি করে খেলার মাঠে উত্তর পূর্ব কোণে ড্রেনের মধ্যে। শহীদদের একসাথে কবর দেয়া হয়। নির্যাতন করে আশেপাশের গ্রামগুলোর নারীদের উপর। বিলমাড়িয়ার সাহেবদের নীলকুঠিতে(বর্তমান বিলমাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়) ক্যাম্প স্থাপন করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী। সেখানে বহু মানুষকে নিয়ে হত্যা ও বহু নারীকে এনে নির্যাতন করত।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক  জানান, বিলবাড়িয়ার জামের আলীর বাড়িতে মিলিটারি প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রীকে ধরে। তখন জামের আলী লুকানো থাকা অবস্থায় তা জানতে পেরে স্ত্রীকে বাঁচাতে যান। তখন স্বামী ও স্ত্রী

উভয়কেই হত্যা করে পাকিস্তানি সৈন্যরা।[৪৮] হারান হালদার জানান, ৬ জন মুসলিমকে ধরে এনেছিল রাজাকাররা। মহরকয়া গ্রামের ভান্টু, মেম্বার তফিল সরকার রাজাকারদের অনুরোধ করলেও ছাড়েনি। তাঁদের গুলি করে সেখানে। হরিনারায়ণ সহ ৫ জন সেখানেই মারা যান। জয়নাল আবেদীন জানান, ৩১শে মে দুপুরবেলাতেও হানাদাররা কজিপুর মাঠে ভারতে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়ার সময় কয়েকজনকে গুলি করে হত্যা করে।[৪৯] ১৭ই জুন ২২ জন মুক্তিযোদ্ধাকে জীবন্ত কবর দেয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নীলকুঠিতে ডিসেম্বর মাসে বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বহু নারী পুরুষ এই নীলকুঠিতে নির্যাতন ও গণহত্যার শিকার হয়েছিল। ২৫শে জুলাই পুনরায় গোপালপুর বাজারে হত্যাকান্ড চালায় ঘাতক বাহিনী। লালপুর উপজেলার কুজিপুকুর নিবাসী জমসেদ প্রাং-এর নেতৃত্বে পাবনা জেলার বিভিন্ন স্থানের ১৭ জন মুক্তিযোদ্ধা ভারতে যাবার সময় গোপন খবরের ভিত্তিতে এ/বি ইউনিয়নের (অর্ন্তগত ফরিদপুর গ্রামের অর্জুনপুর বরমহাটি) কুখ্যাত রাজাকার পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগী ও শান্তি কমিটির সদস্য জসিম উদ্দীন লালপুর থানা পুলিশের সহযোগিতায় পথিমধ্যে ধরে ফেলে। গোপালপুর বাজারের হিটুর বাসার সামনে বটগাছের নিচে পিঠমোড়া দিয়ে ১৭জনকে বেঁধে অমানুষিক ভাবে নির্যাতন চালায়। প্রায় মৃত অবস্থায় ১৭ জনকে নিয়ে লালপুর কলোনি নামে পরিচিত স্থানে হাত-পা বেঁধে জীবন্ত অবস্থায় মাটি চাপা দেয়।

১৩শে ডিসেম্বর, বিজয়ের মাত্র কয়েকটি দিন পূর্বে পাকিস্তানি বাহিনী বালিতিতা মহেশপুরে গণহত্যা চালায়। এসময় প্রায় ৬৪জন যুবক-বৃদ্ধকে হত্যা করে পাকিস্তানি সৈন্যরা।

এছাড়া লালপুরের ডেবরপাড়া নামক স্থানেও গণহত্যা চালায় ঘাতক বাহিনী। ডেবরপাড়ার নুরুল ইসলাম মেম্বারকে শান্তি কমিটির বিরোধিতা করার কারণে লালপুর হাইস্কুল মাঠে গুলি করে হত্যা করা হয়। সেখানে একটি শহীদ মিনার তৈরি করা হয় পরে। জুলাই মাসে পাকিস্তানি লেফটেন্যান্ট সাওলাত আব্বাসের অধীনে লালপুর শ্রী সুন্দরী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি স্থায়ী সেনা ক্যাম্প স্থাপন করা হয় ও লালপুর থানায় পাঞ্জাব পুলিশ মোতায়েন করা হয। ইউনিয়নগুলিতে রাজাকার ক্যাম্প বসানো হয়। ২০শে জুলাই রামকৃষ্ণপুর গ্রামে অগ্নিসংযোগ ও আব্দুল মন্ডল, বক্স, তাছের মোল্লা, কলি এবং মোজাম্মেল নামক ব্যক্তিদের হত্যা করে পাকিস্তানি ঘাতক বাহিনী।

লালপুর উপজেলায় এভাবেই স্থানীয় প্রতিরোধে কয়েকবার বাধাগ্রস্থ হয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিভিন্ন এলাকায় হত্যা, নির্যাতন, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ সহ বিভিন্ন ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। আর তাদের সহযোগিতা করে দালাল রাজাকার, যাদের অনেকে বাঙালি ও অনেকে অবাঙালি।

## নারী নির্যাতন

লালপুর উপজেলার বেশ কয়েকটি অঞ্চলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকার আলবদর বাহিনী নারীদের ধর্ষণ ও নির্যাতন করলেও অনেকেই সামাজিক লোক-লজ্জার ভয়ে বলতে চাননি। বিলমারিয়া ইউনিয়নে প্রায় ১৭-১৮ জন মহিলা ধর্ষিত হলেও তাদের অনেকেই যুদ্ধের পর নতুন সংসার গড়েছেন। কারও বিয়ে হয়েছে সম্ভ্রান্ত পরিবারে। দুঃসহ স্মৃতি ভোলার চেষ্টাতেই কেউ আর তাদের সম্পর্কে জানাতে চাননি।

## লালপুর উপজেলায় গণহত্যা ও নির্যাতন

নিম্নে লালপুর উপজেলার নির্যাতন ও ১২ টি গণহত্যা সহ অন্যান্য গণহত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

## ময়না প্রতিরোধ যুদ্ধ ও গণহত্যা

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালরাত্রি বাঙালির জীবনে নিয়ে আসে আরেক আলোর ভোর। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে আনসার, ভিডিপি, পুলিশ প্রত্যেকেই দৃঢ়বদ্ধ হয়ে ওঠেন স্বাধীনতার সঙ্কল্পে। ২৬শে মার্চ সকাল ১০টায় জানা যায়, (নওগাঁর ই.পি.আর উইং কমান্ডার মেজর নজমুল হক টেলিফোনে জানান আনসারের ডেপুটি ডাইরেক্টরকে) একদল পাকিস্তানি সৈন্য নগরবাড়ি ঘাট থেকে রাজশাহীর দিকে এগিয়ে আসছে। এই সৈন্যরা নিরাপদে রাজশাহী পৌঁছুতে পারলে ফলাফল হবে ভয়াবহ। বিষয়টি অবহিত হওয়ার পরে উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশে ঐ দিনই সন্ধ্যায় পাবনা অভিমুখে রওয়ানা হয় আনসাররা। শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরী, মহকুমা কর্মকর্তা কামাল হোসেন, মেজর আনোয়ারুল আজিম প্রমুখরাও বিষয়টি অবহিত হওয়ার পর বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। মুলাডুলি নামক স্থানে প্রথম আনসাররা পাকিস্তানি সৈন্যদের মুখোমুখি হয়। এই আচমকা আক্রমণ পাকিস্তানি বাহিনী আশা করেনি। তাই আনসারদের গুলির সামনে টিকতে না পেরে তারা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং অন্যপথে রাজশাহীর দিকে এগোতে থাকে। এই সময় আনসার কমান্ডার মোঃ ইউসুফের নির্দেশে হানাদারদের প্রতিহত করার জন্য একটি সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান নেয়ার জন্য দ্রুত সকলে বনপাড়ার দিকে অগ্রসর হয়।

রাত ১০ টায় আনসার বাহিনী বনপাড়ায় পৌঁছে যায় এবং সাথে সাথেই খবর পাওয়া যায় পাকিস্তানি বাহিনী গোপালপুর হয়ে রাজশাহীর দিকে এগোচ্ছে। আর কালক্ষেপন না করে আনসারদের গোপালপুরের দিকে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ৫/৬ মাইল যাওয়ার পরে ওয়ালিয়া ময়না গ্রামে আনসাররা পুনরায় দ্বিতীয় দফায় পাকিস্তানি বাহিনীর মুখোমুখি হয় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচন্ড গোলাগুলি শুরু হয়। সমস্ত রাত এবং পরের দিন এক নাগাড়ে যুদ্ধ চলে।[৫০] স্থায়ী জনগণ, ই,পি,আর ও বিভিন্ন স্থান থেকে আসা প্রতিরোধ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানিরা টিকতে পারছিল না। ৩০শে ও ৩১শে মার্চ পাকিস্তানি বাহিনী শুধু প্রতিরোধ বাহিনীর সাথে যুদ্ধই করেনি বরং ওয়ালিয়ার ময়না নামক স্থানে প্রচুর নিরীহ মানুষ যারা প্রাণভয়ে ঘরে, জঙ্গলে লুকিয়েছিল তাদের অনেককেই হত্যা করে। লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞও চালায়। পরিবারের মা-বোনদের বাঁচাতে গিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে বহু মানুষ প্রাণ হারায়। নির্যাতনের পর গাছের সাথে বেঁধে বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে গুলি করে হত্যা করে মোসলেম আলী মোল্লা, সৈয়দ আলী মোল্লা ও আব্দুস সাত্তারকে। আহত হয় বহু মানুষ। এ সময় প্রতিরোধ যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীর মেজর আসলাম রাজা ও তাদের অনেক সৈন্য মারা যায়।

নির্মম গণহত্যার পর বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয় পাকিস্তানিরা। মেজর আসলাম রাজা পালিয়ে যেতে চেষ্টা করলে জনগণ তাঁকে হত্যা করে। এরফলে পরবর্তীতে তার প্রতিশোধ নিতে লালপুর উপজেলার বহুস্থানে হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতন অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

## চামটিয়া গণহত্যা

৩১শে মার্চ ১৯৭১ সকালে পাকিস্তানিদের নিক্ষিপ্ত একটি শেল গিয়ে ময়না প্রান্ত থেকে আনুমানিক তিন কিলোমিটার দক্ষিণে চামটিয়া গ্রামের আফসার আলীর বাড়িতে পাড়ে। তখন সবে সকাল। বাড়ি প্রায় পুরুষ শূন্য। কারণ সবাই সে সময় ময়না প্রান্তরে হানাদার প্রতিরোধে ছিলেন। সেই সময় আফসার আলির বাড়িতে শেল বিস্ফোরিত হলে ঘটনাস্থলে তাঁর স্ত্রী জামেলা খাতুন আর সাত বছর বয়সী নিষ্পাপ শিশু বাজলু প্রামাণিক শহীদ হন। আহত হন বেলো বেওয়া, ফুলজান বেওয়া, মনোয়ারা খাতুন, রাজেনা খাতুন ও জামাল উদ্দিন।[৫১]

### রামকান্তপুর গণহত্যা

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল। সেদিনই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের এদেশীয় দালালদের পরামর্শে রামকান্তপুর আক্রমণ করে। রাতের অন্ধকারে তারা নিরীহ মানুষদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন করে। ঘুমন্ত মানুষগুলোকে বাড়ি থেকে বের করে রামকান্তপুরের একটি আম বাগানে এনে হত্যা করে। মূলত বিহারি আব্দুল মজিদ, ওয়ালিয়ার এলাহী ডাক্তার, মোহরকয়ার তসিকুল ইসলাম, জসীম উদ্দিন, আনোয়ারুল, আব্দুলপুরের আবুল কাশেম, শেখচিলানের হাবিবুর রহমান, বিলমাড়িয়ার আব্দুর রহিম, হাঁসমারিয়ার সেলিম উদ্দিন প্রমুখ রাজাকার ও শান্তিকমিটির সদস্যদের নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনী এসেছিল। তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে বলেছিল এ গ্রামে মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের সহযোগীরা রয়েছে।[৫২]

পাকিস্তানি বাহিনী সেই কথায় বিশ্বাস করে ঈশ্বরদি বিমানবন্দর থেকে লালপুর থানার রামকান্তপুরে এসেছিল। রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করায় অনেকেই যারা বাড়িতেই ঘুমিয়েছিল। তারা পালাতে পারেনি। ঘুমন্ত অবস্থায় বাড়ি থেকে তুলে আনে আমবাগানে এবং সেখানেই তাঁদের হত্যা করে।তাঁদের পরনের কাপড় খুলে সেই কাপড় দিয়েই বেঁধে রাখে। এরপর নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে।[৫৩]

গুলি করেই শেষ হয়নি দুবৃত্তদের অত্যাচার। আবুল হোসেন, দুখু মিয়া, তইজ উদ্দিন প্রমুখ আহত অবস্থায় কাঁতরাচ্ছিলেন। ফলে তাঁদের উপর পুনরায় বেয়নেট চার্জ করা হয়। এত নির্যাতনের পরও তাঁরা সৌভাগ্রক্রমে বেঁচে গিয়েছিলেন। আবুল হোসেন ও দুখু মিয়া প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। তইজ উদ্দিনের হাতের শিরায় (রগ) গুলি লাগায় তা ঠিক হয়নি। ফলে প্রাণে বাঁচলেও তাঁর হাতটি পঙ্গুত্ব লাভ করেছিল, ছামছের আলী প্রামাণিকের গুলি লেগেছিল। তিনি ১০বছর পর মারা যান যন্ত্রণা ভোগ করে। শুধু হত্যা নয়। বরং লুটপাট তো অব্যাহতভাবেই চলছিল। টাকা পয়সা, মালামাল, গবাদি-পশু প্রভৃতি লুট করে, বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে রামকান্তপুরকে একটি ধ্বংসস্তূপ-এ পরিণত করেছিল পাকিস্তানি ঘাতক বাহিনী ও তাদের দোসররা। সেদিন রাতে রামকান্তপুরের প্রায় ৩৫-৪০ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করেছিল পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা।

### গোপালপুর বাজার গণহত্যা

১৯৭১ সালে ৫ই মে, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ঈশ্বরদী বিমান বন্দর থেকে তাদের এদেশীয় দালাল ইদুয়ার নেতৃত্বে গোপালপুর বাজারে আসে। মূলত তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল গোপালপুর সুগার মিলে যাওয়া। গোপালপুরের দিকে পাকিস্তানি সৈন্যদের গাড়ি আসছে শুনে স্থানীয় বাঙালিরা লালপুরের আওয়ামী লীগ নেতা মমতাজ উদ্দিনের নেতৃত্বে প্রতিরোধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফলে পাকিস্তানি বহর গোপালপুর বাজারে বাঙালিদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হলে তারা এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে। প্রতিরোধ কারীরা টিকতে পারছিল না অবিরাম গুলির মুখে। ফলে পিছু হটতে তারা বাধ্য হয়।[৫৪] এসময় রোগী দেখতে বাজারে আসা ডা. শাহাদাৎ হোসেন গুলিবিদ্ধ হয়। এরপর শুরু হয় লুটপাট। দোকানের ব্যবসায়ী তোফাজ্জল, সাজদার প্রমুখদের গুলি করে হত্যা করে তাঁদের দোকান লুটপাট করা হয় এবং পরে অগ্নিসংযোগ করা হয়। উল্লেখ্য, যুদ্ধময় পরিস্থিতি বিবেচনা করে অনেকেই পালিয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু এলাকায় কিছু অবাঙালি তাদের আশ্বাস দিয়েছিল, কোন ক্ষতি হবে না। ফলে অনেকেই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু সেই অবাঙালি দালালরাই পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ে এসেছিল। সেদিন গোপালপুর বাজারে প্রায় ১১জন মানুষ পাকিস্তানি ঘাতক ও দালালদের অমানুষিক অত্যাচারের শিকার হয়েছিল। এরপর এই ১১ জনের মধ্যে ২ জন ছাত্র, ৫ জন ব্যবসায়ী, ১ জন

স্টেশন মাস্টার, ১ জন সাধারণ মানুষ ও ১ জন ডাক্তার ছিলেন।[৫৫] পাকিস্তানি সৈন্যদের বহর গোপালপুর চিনি কলের দিকে রওয়ানা দেয়। এছাড়া গোপালপুর-লালপুরে রাস্তায় আরও ৫জন টমটম আরোহীকে গুলি করে হত্যা করে। এলাহী দর্জিকেও হত্যা করে ৫ই মে।[৫৬]

## গোপালপুর চিনিকল গণহত্যা

নাটোর থানা থেকে ৩৫ কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে গোপালপুর। ১৯৭১ সালের ৫ই মে (বুধবার) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গোপালপুর চিনিকলে আক্রমণ করে সেই মিলে কর্মরত প্রায় ৪২-৪৫ জন কর্মচারীসহ আখচাষী ও অন্যান্য প্রায় ২০০ জন মানুষকে হত্যা করে। আর এখানে তাদের সহযোগিতা করেছিল অবাঙালি বিহারী সহ কয়েকজন বাঙালি। এসব অবাঙালিরা মূলত মিলে বিভিন্ন কর্মে নিয়োজিত ছিল। পাকিস্তানি হানাদারেরা তাদের বাংলাদেশের দালাল ঈদু মোহাম্মদ ঈদুর সহযোগিতা এবং প্রেরিত তথ্য থেকে অবহিত হয়েছিলো যে, মিলে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ আর সহযোগিতা দেয়া হয় এবং তারা দিনের বেলায় মিলে শ্রমিক-কর্মচারী হিসেবে কাজ করে আর রাতের বেলায় সুযোগ মতো পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং তাদের সমর্থকদের বিরুদ্ধে অপারেশন চালায়। মিলের প্রশাসক সব জানেন। তিনিই প্রশ্রয় ও পরামর্শদাতা পাকিস্তানিদের ধারণা যে, মিলের প্রশাসক যেহেতু সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং বাঙালি, সেহেতু যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়। সর্বোপরি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্য যেহেতু তিনি, তাই তাঁর পাকিস্তানিদের যুদ্ধরীতি এবং যুদ্ধকৌশল জানা। সে কারণে পাকিস্তানিদের দুর্বলতার স্থানে আঘাত করে বেকায়দায় ফেলার মতো কৌশল তিনি প্রশিক্ষণ দেবেন। তাই তাঁকে আর তাঁর দলবলকে আকস্মিক আঘাত করে বিপর্যস্ত করাই ছিলো তাদের লক্ষ্য। সেই অলীক তথ্যের ভিত্তিতে পাকিস্তানি বর্বর সেনা সদস্যরা অতর্কিতে গোপালপুর চিনি কলে আক্রমণ করে ও গণহত্যা চালায়। প্রশাসক লেফটেনেন্ট (অব.) আজিমের বাসভবন তল্লাশি করেও যখন কিছু পায়নি, তখন আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ আর আশ্রয় দেয়ার অভিযোগ জনাব আজিমের বিরুদ্ধে উথাপন করে। তিনি অস্বীকার করলে মিলের কর্মচারীদের ধরে এনে আজিম সাহেবকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করেন এরা মুক্তিযোদ্ধা কিনা। তিনি বলেন, সবাই মিলের শ্রমিক-কর্মচারী। এঁরা সিফট ডিউটিতে এসেছেন, কেউ মুক্তিযোদ্ধা নন। কিন্তু তবু তাঁর কথা বিশ্বাস না করে দাঁড় করানো সকলকে মিলস্থ পুকুর পাড়ে হত্যা করে। প্রশাসক আজিমের স্ত্রী নুরুন নাহার আজিম সেদিন ছদ্মবেশ ধরে রক্ষা পেয়েছিলেন ধর্ষণ ও মৃত্যুর হাত থেকে।[৫৭]

গোপালপুর চিনি কলে যে হত্যাযজ্ঞ একাত্তরের ৫ই মে পাকিস্তানিরা ঘটিয়েছিলো, সে সম্পর্কে এবং চিনি কলের পাশে রেল ক্রসিংয়ে তার আগে পাকিস্তানিদের কনভয়কে কিভাবে প্রতিরোধ করা হয়েছিলো সে ইতিহাস মিলের সেই সময়ের সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর খায়ের আলীর মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী গবেষণা কেন্দ্র থেকে মাহাতাব উদ্দিন সম্পাদিত 'একুশ থেকে একাত্তর'-এর জুলাই ১৯৮৬ সংখ্যায় প্রকাশিত স্মৃতিচারণমূলক লেখা এখানে প্রায় হুবহু উপস্থাপিত হলো :

> ১৯৭১। আমি তখন উত্তরবঙ্গ চিনি কলে সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর। ২৭ শে মার্চ। আনুমানিক বিকেল চারটা সাড়ে চারটা হবে। তখন উত্তরবঙ্গ চিনি কলের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তিকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বলা হতো। জনাব আনোয়ারুল আজিম (লে.অব.)সাহেব ওই পদে আসীন ছিলেন। তাঁর বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠলো। তিনি বাড়িতে ছিলেন না। টেলিফোন ধরলেন তাঁর স্ত্রী নুরুন নাহার আজিম। নাটোরের এস.ডি.ও জনাব কামাল উদ্দিন আহম্মদ টেলিফোন করেছেন। বিশ্বাসঘাতক পাক সেনারা ২৫শে মার্চ রাত থেকে বাঙালির উপর সশস্ত্র

আক্রমণ করার পর দেশের আনাচে কানাচে প্রতিরোধ গড়ে ওঠে। প্রতিরোধ যুদ্ধের জন্য গঠিত হয় সংগ্রাম পরিষদ। নাটোরেও সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।'

টেলিফোনে এস.ডি.ও আজিম সাহেবকে না পেয়ে তার স্ত্রীকে জানান যে, 'যশোর থেকে একদল পাক আর্মি এসেছে। তারা রাতে নদী পার হয়েছে পাক্সীর কাছে। ওরা ঈশ্বরদি বিমান বন্দরে যেতে চায়। কিন্তু দাসুরিয়াতে তারা আমাদের বাহিনীর কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। তারা গোপালপুর হয়ে লালপুরের ওপর দিয়ে ঈশ্বরদি যাবার চেষ্টা করছে। তাদের বাধা দিতে হবে। ইতোমধ্যেই একদল আনসার পায়ে হেঁটে বনপাড়া অভিমুখে রওনা দিয়েছে। ওদিক থেকে সরদহ পিটিসির পুলিশ বাহিনী গোপালপুর এসে পৌঁছবে। মিলের ট্রাকে করে বনপাড়ায় অপেক্ষমান আনসারদের গোপালপুর নিয়ে যেতে হবে। গোপালপুর রেলগেটে ওদের বাধা দিতে চাই। আপনার স্বামীকে বলবেন...' এই সহযোগিতা চেয়ে টেলিফোন করেছিলেন নাটোর সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের পরামর্শে এস.ডি.ও কামাল উদ্দিন আহমেদ। মিলের এ্যাডমিনিস্ট্রেটর আজিম উদ্দিন বাসভবনে ফিরে এলে তাঁকে স্ত্রী এবং সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর খায়ের আলী জানালে তিনি মিলের সিকিউরিটি বিভাগের সকল সদস্যকে এবং যারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হানাদার বাহিনীকে বাধা দিতে চান, তাঁদের দ্রুত প্রতিরোধ গড়ার কাজে লাগার নির্দেশ দেন। মিলের সিকিউরিটি ইন্সপেক্টর খায়ের আলী জানালে তিনি মিলের সিকিউরিটি বিভাগের সকল সদস্যকে এবং যাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হানাদার বাহিনীকে বাধা দিতে চান, তাঁদের দ্রুত প্রতিরোধ গড়ার কাজে লাগার নির্দেশ দেন। মিলের সিকিউরিটি সদস্যদের সঙ্গে কর্মকর্তা কর্মচারি এবং স্থানীয় জনসাধারণ রাতভর প্রতিরোধ গড়ার কাজে যোগ দেন। মিল থেকে কোদাল-বেলচা, শাবল-ডালি প্রভৃতি সরবরাহ করা হলো। রেল গেটের পশ্চিম পাশে ট্রেঞ্চ কাটা হলো। কাঠের স্লিপার দিয়ে ট্রেঞ্চের সামনে তৈরি করা হলো আড়াল। স্টেশনের খালি প্যাসেঞ্জার বগি ছিলো। বগিগুলো ঠেলে রেল ক্রসিং-এর রাস্তার ওপর দাঁড় করানো হলো। সে সময় লালপুর থানার ও.সি ছিল অবাঙালি। স্থানীয় যুবকেরা চাহিবামাত্র সে থানার সমস্ত রাইফেল সরবরাহ করে। 'পোড়াবাবু' বলে পরিচিত হামিদুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে স্থানীয় যুবকেরাও থানা থেকে সরবরাহ করা রাইফেল নিয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধে অংশ নিলেন। হামিদুল হক তখন মিলের গোবিন্দপুর খামারের নিরাপত্তা কর্মীর চাকরি করতেন। যা হোক পরবর্তীতে ওই অবাঙালি ও.সি. মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য সম্মান পেয়েছেন।[৫৮]

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ২৯শে মার্চ পাবনার দাশুড়িয়াতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে নাটোরের দিকে রওয়ানা দেয়। গোপালপুর বনপাড়া রোড হয়ে অগ্রসর হতে থাকে। পুলিশ, ই.পি.আর, আনসার, মিলের কর্মচারীসহ স্থানীয় প্রতিরোধকারীদের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় গোপালপুর রেলক্রসিংয়ে। এখানে স্থানীয় অনেকে শহীদ হন। এরপর পাকিস্তানি বাহিনী ৩০শে মার্চ সকালে রাজশাহী যাওয়ার পথে ওয়ালিয়ার ময়না গ্রামে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। সেখানে ৩০শে ও ৩১শে মার্চ স্থানীয় জনগণ, ই.পি.আর, আনসার, পুলিশ, প্রভৃতি প্রতিরোধকারীদের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়। উল্লেখ্য এখানে গোপালপুর চিনিকলের অনেক কর্মচারীও ছিল এবং লেঃ আজিমও এই প্রতিরোধ বাহিনীর সাথে যুক্তছিল। পাকিস্তানি বাহিনী এসময় পরাজিত হয়। এদের কয়েকজন ছদ্মবেশে পালানোর চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যায়। এদের মধ্যে মেজর রাজা আসলাম ও তাদের কয়েকজন সেনা ছিল। তাদের গোপালপুর মিলে আটকে রাখা হয়। তখন বিক্ষোভকারী জনতা ধৃতদের তাদের হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করলেও প্রশাসক আজিম সাহেব কর্মকর্তা ও সিকিউরিটি অফিসার সুশীলকুমার পাল প্রমুখের সাথে সিদ্ধান্ত নেন যে ধৃতদের মহকুমা কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেবেন। এসময় ধৃত মেজর আসলামকে পাকিস্তানিদের পরিকল্পনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি হুমকি দিতে থাকে বলেন- 'হাম ওয়্যারলেস কর দিয়া। হামকো ছোড়দো। নেহিতো ইহা বোম গিরেগা।' একথা দ্রুত ছড়িয়ে

পড়ে। বিক্ষোভকারীরা আজিম সাহেবকে চাপ দিতে থাকলে তিনি বন্দিদের ট্রাকে তুলে লালপুর থানার দিকে রওয়ানা দেন। বিক্ষোভকারীরা সেদিন ময়না ও গোপালপুর রেলগেইটে স্বজন হারানোর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। ১লা এপ্রিল মেজর রাজা আসলাম ও বন্দীদের ট্রাকটি ঘিরে ফেলে তারা। এ সময় বিক্ষোভকারীদের আক্রমণে মারা যায় রাজা আসলাম ও তার সদস্যরা। ৫ই এপ্রিল ঈশ্বরদী বিমানবন্দর দখল করে হানাদার বাহিনী সেখানে স্থায়ী শক্তিশালী ঘাঁটি স্থাপন করে। এদিকে ৬ই এপ্রিল ঢাকা রোড ধানাইদহে নগরবাড়ী থেকে আগত অপর একটি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ হয় প্রতিরোধ বাহিনীর। এতে নেতৃত্ব দেন গোপালপুর চিনিকলের ম্যানেজার লেঃ আনোয়ারুল আজীম। এই যুদ্ধে ২ জন পাকি সৈন্য নিহত ও একটি ট্রাক ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[৫৯]

৫ মে সকালে গোপালপুর বাজার আক্রমণ করে ১১জন মানুষকে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। এরপর  দ্রুত তারা গোপালপুর মিলে প্রবেশ করে মেজর উইলিয়ামের নেতৃত্বে। সেদিন অবাঙালি কর্মকর্তা কর্মচারী মাথায় সাদা পট্টি ও হাতে লাল সালু কাপড়ের ব্যাজ পড়ে প্রবেশ করেছিল মিলে যাতে বাঙালি আর অবাঙালি চেনা যায়। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ৫ই মে গোপালপুর মিলের আক্রমণ ছিলো পূর্ব পরিকল্পিত। হানাদার বাহিনী তড়িৎ বেগে মিলে প্রবেশ করে এবং গেইটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। মিসেস আজিম জানান, হানাদার বাহিনী দুটি দলে দলে বিভক্ত হয়ে ঢুকেছিল গোপালপুরে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলে। তাদের দোসর ছিল স্থানীয় অবাঙালিরা। প্রথম দলটি ঢুকেছিল মূল মিলের অভ্যন্তরে, অপর দলটি একই সঙ্গে প্রবেশ করে মিলের পাশে কলোনিতে। প্রথম দলটি মিলে ঢুকে মিলের প্রশাসক জনাব আজিম, প্রশাসনিক অফিসার জনাব শহিদুল্লা, একাউন্ট্যান্ট জনাব সাইফুদ্দীন আহমদ, ইক্ষু সুপারিনটেনডেন্ট জনাব গুলজার হোসেন তালুকদার, সহকারী একাউন্ট্যান্ট জনাব মান্নান ভূঁইয়া, কৃষি অফিসার জনাব কিবরিয়া, সহকারী ইক্ষু উন্নয়ন অফিসার জনাব হাসেম ও ষ্টেনোগ্রাকার জনাব রউফ সহ তিনশরও বেশী কর্মচারী ও শ্রমিককে মিলের পুকুরের পাশে লাইন করে দাঁড় করায়। তারপর তাদের গুলি করে হত্যা করে। মিসেস আজিম জানালেন, গোপালপুরে এই হত্যালীলার সঙ্গে যে সমস্ত পাকিস্তানি সামরিক অফিসার প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল তারা হচ্ছে। মেজর শেরওয়ানী, ক্যাপ্টেন মোখতার ও মেজর উইলিয়াম। এদের মধ্যে প্রথমোক্ত দু'জন থাকতো নাটোরে আর তৃতীয়জন থাকতো ঈশ্বরদীতে।[৬০]

উল্লেখ্য, ময়না যুদ্ধের পর অবস্থা ভিন্নরকম বুঝে গোপালপুরের অনেকেই আশ্রয় নিয়েছিল বিভিন্ন স্থানে। লে: আজিমও পাশ্ববর্তী গ্রামে আশ্রয় নিলে সেখান থেকে নাটোর পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্পের মেজর শেরওয়ানী ক্যাম্পের সেনা দিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসে নাটোরে। সেখানে তিনি লে: আজিম সাহেবকে মিল পরিচালনার জন্য পবিত্র কোরআন শরীফ হাতে রেখে সকল প্রকার সহায়তা ও নিরাপত্তা প্রদানের অঙ্গীকার করেছিলেন। সেটাও ছিল দুরভিসন্ধি।[৬১]

পাকিস্তানি বাহিনী মিলে প্রবেশ করলে অবস্থা ভিন্নরকম বুঝে ফ্যাক্টরির অনেকে আত্মগোপনের চেষ্ঠা করলেন। আবার কেউ কেউ সুযোগমত জীবন বাজী রেখে প্রাচীর টপকালেন। আর যাঁরা তাদের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেননি তারা কাজের মধ্যে ডুবে থাকার ভান করে চিন্তিত হয়ে পড়লেন জীবন রক্ষার ভাবনায়।[৬২] মুনছুর ইমামের মত কয়েকজন অবাঙালিদের ইঙ্গিতে শ্রমিক ও কর্মচারীদের একত্র করা হয়েছিল সেদিন হত্যার উদ্দেশ্যে। মিসেস আজিম জানান, ২৫ মার্চের রাতের পর থেকেই এখানে অবাঙালিদের

উৎপাত বেড়ে গিয়েছিল। তাঁরা হিন্দুদের আর দেশপ্রেমিক অধিকার সচেতন মানুষের বাড়ীঘর দখল করতো, লুটপাট করতো বিষয় সম্পত্তি। বাধা দিলে বা কিছু বললে বলতো, 'ইয়ে চীজ কো উপর হামলোগকা হক হ্যায়।'

হানাদার সৈন্যরা গুলি করে তিনশ বাঙালিকে হত্যা করার পর মিল ছেড়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু এসব দালাল মৃত জনদের আত্মীয় স্বজনদের লাশের কাছে যেতে দেয়নি। পুকুরে এসব হতভাগ্যের লাশ পঁচে যখন দুর্গন্ধ ছুটছিল তখন তারা গর্ত করে সেগুলোকে সুইপার ভিখু রাম ও তাঁর স্ত্রীকে মাটি চাপা দিয়ে রাখে। এর আগে লাশের মধ্যে থেকেও ঘড়ি, আঙটি, কলম ও মূল্যবান দ্রব্য লুটপাট করে।[৬৩]

প্রশাসক লেঃ আনোয়ারুল আজীমকে ক্যাপ্টেনমেজর শেরওয়ানী জিজ্ঞাসা করে, মেজর জেনারেল খাদেম হোসেন রাজা (ওরফে আসলাম রাজা) কে কারা মেরেছে? উত্তরে তিনি বলেন, তাদের কেউ এখানে উপস্থিত নেই। তারা পালিয়ে গেছে ভারতে। এরপর গোপাল সাগর পুকুরে দাঁড় করানো সকলের উপর গুলির নির্দেশ হয়। সকাতরে সবার প্রাণ ভিক্ষা চান আজিম সাহেব। বলেন এরা সবাই নির্দোষ লোক। দোষ কিছু করলে আমিই করেছি। আমাকে মারো, আর এদের ছেড়ে দাও। ক্যাপ্টেন দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগলেও অবাঙালিদের রায়ই বহাল থাকে। ব্রাশ ফায়ারের মাধ্যমে সৃষ্টি করে এক বেদনাময় ইতিহাস। তিনদিক থেকে এক সাথে গর্জে উঠে অনেকগুলো ষ্টেনগান। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়লো অনেকগুলো আশাবাদী প্রাণ। যাদের গুলি লাগেনি কিংবা আহত হয়ে ছিটকে পড়েছিল পানিতে, ডুব সাঁতারের ভেতরেও তাদের ওপর চালানো হয় গুলি। আর যারা আহত অবস্থায় পড়েছিলেন পানির ধারে বা সিড়িতে তাদের প্রতি চলে বেয়নেট চার্জ। এই গণহত্যায় গুরুতর আহত অবস্থায় ৭জন এবং অক্ষত দেহে ২জন বেঁচে যান।[৬৪] এই গণহত্যার পর দীর্ঘদিন পুকুরের জল রক্তাক্ত হয়ে ছিল। ঐদিন পুকুরে প্রায় তিন-চারশো  কোন কোন ক্ষেত্রে জানা যায় প্রায় ২০০ জন মানুষকে হত্যা করা হয়েছে।[৬৫]

এই হত্যাকাণ্ডের আরো একটি জীবন্ত বর্ণনা দিয়েছেন সেদিন ধরা পড়ে গুলিবিদ্ধ হয়ে অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়া মিলের কর্মচারি আব্দুল জলিল শিকদার। তাঁর এই বর্ণনা তিনি 'মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী গবেষণা কেন্দ্র' প্রকাশিত মাহতাব উদ্দিন সম্পাদিত *'রণাঙ্গন একাত্তর'* নামে পত্রিকায় আগস্ট ১৯৮৬ সংখ্যার এক লেখায় বর্ণনা করেছেন। এখানে তার সেই অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনা হুবহু তুলে ধরা হলো। আব্দুল জলিল শিকদার বলেন,

> ৫ই মে ১৯৭১। আনুমানিক সকাল সাড়ে দশটা।.....তিনজন পাকসেনা ওয়ার্কসপের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দু'জন পাকসেনা আমার দু'পাশে এসে দাঁড়াল। অপরজন পিঠে রাইফেল ঠেকিয়ে বললো...ইয়ে বাঙালি চলো, মিটিং হোগা, মিটিংমে চলো।' .....মঞ্জুর ইমাম একজন অবাঙালি ওয়ার্কসপে কাজ করতো। সে উপস্থিত ছিল। সে দ্রুত আমার সামনে এসে দাঁড়ালো এবং মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো-ইয়ে হামারা দোস্ত আদমি হ্যায়।' সে একটু থেমে পুনরায় বললো, 'ঠিক হ্যায়, মিটিংমে চলো। কুচ ডর নেহি।' তার মাথায় একটা বড় সাদা রুমাল বাঁধা দেখলাম।[৬৬]

অবাঙালিদের সর্ম্পকে তিনি বলেন,

> এই 'দোস্ত' শব্দটির অর্থ বন্ধু নয়, দুষমণ। সেদিন অবাঙালিরা এই সাংকেতিক শব্দ দ্বারা বাঙালিদের সনাক্ত করে দিয়েছিল। মিলে দু'চার জন যে মানবতাবাদী অবাঙালি ছিল না, তা নয়। তবে এটা ঠিক যে, সেদিন অধিকাংশ

অবাঙালি কর্মচারি বাঙালি কর্মচারিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল।..... মিলের যাবতীয় গোপন তথ্য তারা পাকিস্তানিদের কাছে পাচার করত। তাদের মিল আক্রমণের জন্য প্ররোচিতও তারাই করেছিল।[৬৭]

মিল আক্রমণের কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন,

ময়না প্রতিরোধে মিলের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা মিলের অস্ত্র নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিল, এসব বানোয়াট তথ্য তারা পাকিস্তানি আর্মিদের দিয়েছিল বলেই হয়ত পাকিস্তানি আর্মিরা মিল আক্রমণে পরিকল্পনা করে। সেই পরিকল্পনার বেদনাদায়ক পরিণতিই হচ্ছে ৫ই মে নর্থবেঙ্গল সুপার মিল আক্রমণ এবং নির্বিচারে হত্যা ও বাঙালিদের ঘর-বাড়ি লুটপাট। এই লুটপাট অবাঙালিরাই করেছে।[৬৮]

তিনি মিলের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর লেফ. (অব.) আনোয়ারুল আজিমের সাথে পাকিস্তানি আর্মী অফিসারের কথোপকথন উল্লেখ করে বলেন,

......একজন পাকিস্তানি আর্মী অফিসার আনোয়ারুল আজিম সাহেবকে লক্ষ্য করে বলল-'কিস্‌নে মেজর আসলাম কো মারা হ্যায়?' আজিম সাহেব বাংলাতেই জবাব দিলেন, 'আমার জানি না। তবে যারা মেরেছে তারা ওপারে চলে গেছে (ওপার বলতে তিনি 'ভারত' বুঝিয়েছিলেন)। আমরা এ সম্বন্ধে কিছু জানি না। আমরা কিছু বলতে পারব না। আমরা নির্দোষ।' এরপর পাকিস্তানি আমি অফিসার বলল-ঠিক হ্যায়, ওঠো, উধার চলো।' হাত উঁচিয়ে কলোনির দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত করলো সে।[৬৯]

এরপর তিনি বলেন,

সিকিউরিটি অফিসের পশ্চিমে নতুন বি-টাইপ কোয়ার্টারের সামনাসামনি আসতেই পাকিস্তানি আর্মি অফিসারটি কি মনে করে পিছন থেকে বলে উঠলো- 'তোম লোগ লেট যাও'। 'লেট যাও'-অর্থাৎ শুয়ে পড়ো। আমরা সবাই উপড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। এ সময় ইক্ষু বিভাগের সহকারি হিসাব রক্ষক আবদুল মান্নান ভূঁইয়া (শহীদ) সাহেব এলেন। তিনি পরহেজগার মানুষ। নামাজী। .....তিনি বলেন, 'স্যার, আমি কোরআন তেলোয়াৎ করতে চাই।' পাকিস্তান অফিসারের ভ্রু কুঁচকে উঠে মান্নান সাহেবের কথা শুনে। সে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। তারপর হুকুম দিল, 'আচ্ছা ঠিক হ্যায়, পড়হো।' ...... যাকে তারা হাত ও পায়ের কাছে যে ভাবে পেল চোখ-মুখ, কোন কিছু না দেখে এলোপাথাড়ি লাথি মারল এবং রাইফেলের বাট-কুঁদো দিয়ে নির্মমভাবে মারতে শুরু করল। পাকিস্তানি অফিসারটি যখন জিজ্ঞেস করল, 'বাতাও কিসনে মেজর আসলামকো মারা হ্যায়, বাতাও বাঞ্চোৎ।' এ কথার জবাবে মিলের এ্যাডমিনিস্ট্রেটর আজিম সাহেব বলেন, 'আমার মিলের লোকজন এখানে যারা আছেন, তারা কিছুই জানেন না। আমিও জানি না। তবু যদি তোমরা অবিশ্বাস করো আর আমাদের মারো, তাহলে কেবল আমাকেই মারো। এরা সবাই নির্দোষ, এদের ছেড়ে দাও।'[৭০]

তিনি আরও বলেন,

'গোপাল সাগর' ওই পুকুরটার নাম। বায়াত্তরে পর তার নাম রাখা হয়েছে 'শহীদ সাগর'। যাহোক, আমরা সবাই সেই পুকুরের ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং বুঝাতে পারলাম, এখানে আর কিছুক্ষণের মধ্যে বিনা অপরাধে গুলি করে হত্যা করা হবে। ..........এইসব এলোমেলো ভাবনার মধ্যে যখন আমরা মৃত্যুর অপেক্ষা করছি, ঠিক সেই সময় হঠাৎ গর্জে উঠল মৃত্যুদূত।........খুব বেশিক্ষণ পাকিস্তানিদের গুলি খরচ দেননি বাঙালিরা। অতিরিক্ত হলে সাত মিনিট। এরই মধ্যে মিল চত্বরে এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেললো কুখ্যাত খুনিরা। কিন্তু ঘাতক পাকিস্তানিরা খানিক পরেই লক্ষ্য করেন দুইজন বাঙালি তখনো বেঁচে আছে। তারা পুকুরের পানিতে নেমেছিলেন। ডুব সাঁতার দিয়ে ছিলেন। নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য মাথা তুলতেই তারা টের পান সেটা। মিনিট তিনেক সৈন্যরা সন্ত্রস্ত দুইজনের সাথে তামাশা করল। তারপর তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি করল। দুইজনের নশ্বর দেহ পানিতে

তলিয়ে গেল। আমাদের সবাইকে গুলি করার পর মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য ওরা আবার গুলি বর্ষণ করে। ....... সব লাশ পানিতে ফেলে দিলে আমার শরীরটাও পানিতে পড়ল। কিন্তু মাথাটা পড়ল উপরে। এতে আমার মৃত্যুবৎ পড়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছিল না। ভালভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম।[৭১] (সম্পূর্ণ বর্ণনা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য)

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও অবাঙালিদের গুলিতে শহীদদের স্মরণে পরবর্তীতে ১৯৭২ সালে 'গোপাল পুকুরকে' 'শহীদ সাগর' নামকরণ করা হয় এবং সেখানে একটি শহীদ মিনার নির্মিত হয়। এই শহীদ মিনারের ফলকে মিলের শহীদ কর্মচারীদের নাম অঙ্কিত রয়েছে।

**ধুপইল-পঁয়তার পাড়া গণহত্যা**

১৯৭১ সালে ২৯ মে লালপুর উপজেলার চংধুপইল ওয়ালিয়া ইউনিয়নের হিন্দু অধ্যুষিত ধুপইল-পঁয়তার পাড়া, দিলালপুর এলাকাগুলোতে আক্রমণ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। নাটোরের কুখ্যাত রাজাকার হাফেজ আবদুর রহমান এর নেতৃত্বে হানাদার বাহিনী এসেছিল এ গ্রাম গুলোতে। এছাড়াও স্থানীয় সহযোগী রূপে যারা ছিল, তারা হল- মোঃ গোলজার হোসেন, বাঁশবাড়িয়ার ইয়াদ আলী (জামায়াত সদস্য), ময়েজ সরকার, গলেহার মুক্তি (জামায়াত সদস্য), মজের উদ্দিন সরকার (শান্তি কমিটি) প্রমুখ। গভীর রাতে (ফজরের আজানের কিছুক্ষণপূর্বে) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দালালদের সহযোগিতায় পুরো গ্রাম গুলো ঘিরে ফেলে। এই গ্রাম গুলো  মূলত লালপুর-বাগাতিপাড়া সীমান্তে অবস্থিত। মাঝখানে কেবল বড়াল নদীর কুলধ্বনির সীমানা।সেদিন রাতে ফুলবাড়ি প্রাইমারি স্কুল থেকে দয়রামপুর পর্যন্ত অর্জুনতলা গ্রামসহ ধুপইল পঁয়তারপাড়া, চাঁইপাড়া, দিলালপুর ঘিরে ফেলে হানাদার বাহিনী। দালালেরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে পরামর্শ দিয়েছিলো এই সব গ্রামে ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা এসে আশ্রয় নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ শেষে কৃষকদের বাড়িতে লুকিয়ে থাকে। পাকিস্তানিরা তাদের দালালদের কথামতো গভীর রাতে ধুপইল, পঁয়তারপাড়া ও প্রতিবেশী দিলালপুর ঘিরে নিরস্ত্রঘুমন্ত মানুষদের জোর করে তুলে।[৭২] হানাদার বাহিনীর আক্রমণে লোকজন ছত্রভঙ্গ হলে মাঠ, বাড়ি বা রাস্তায় যাদেরকে পাওয়া যায় ধরে নিয়ে আসে বধ্যভূমিতে। বড়াল নদীর তীরে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে।[৭৩]

২৯শে মে ১৯৭১ এখানে যারা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁরা ছিলেন গ্রামের খেটে খাওয়া অতি সাধারণ মানুষ। তাঁদের সঙ্গে রাজনীতি আর যুদ্ধের কোনো সংযোগ ছিলো না। লালপুরে বারবার আক্রমণের পেছনে পাকিস্তানিদের মূল ক্ষোভ হচ্ছে ময়নার প্রতিরোধে তাদের শোচনীয় পরাজয়। সেই কারণে সামান্য ছুতো পেলেই তারা নির্বিচারে হত্যায় মেতে উঠতো। সে রাতে বড়াল নদীর শান্তি-স্নিগ্ধ জল রক্তে রঞ্জিত হয়েছিলো।[৭৪]সেদিন এ গ্রাম গুলোর প্রায় ২০০-৩০০ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল এবং বেশিরভাগ লাশ গুলোকেই বড়াল নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল ঘাতক বাহিনী ও দালালরা। সকলের পরিচয় জানা যায়নি। বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৩৪ জনের নাম জানা যায়।

এই আক্রমণ থেকে রক্ষাপ্রাপ্ত দিন মজুর শ্রেণীর মানুষ আব্দুল আজিজ আজো বেঁচে আছেন। তাঁর ভাষ্য মতে, সবাইকে উলঙ্গ করে পরিধানের কাপড় দিয়ে হাত বেঁধে নদীর ধারে দাঁড় করিয়ে গুলি করলে প্রায় সবাই ঘটনাস্থলে নিহত হন। যাঁরা গুলি বিদ্ধ হয়ে নদীর তীরে পড়েছিলেন, এ দেশীয় দালালেরা তাদের পা দিয়ে গড়িয়ে নদীর মধ্যে ফেলে দেয়। আব্দুল আজিজকেও তারা পা দিয়ে গড়িয়ে নদীর মধ্যে ফেলে দেয়। তাতে তাঁর আহত স্থান ঠান্ডা জলের স্পর্শ লেগে অনেকটা আরাম বোধ করে। যাঁরা আহত হয়ে তখন 'জল'-

'পানি' বলে আর্তনাদ করছিলেন, তাঁদের ওপর হানাদারেরা পুনরায় গুলিবর্ষণ করে। আব্দুল আজিজ দ্বিতীয় বার গুলি বর্ষণ হলে পুনরায় খানিকটা আহত হন। তবু তিনি দাঁতে দাঁত চেপে কষ্ট সহ্য করে পড়েছিলেন। হানাদারেরা চলে গেলে তিনি অতি কষ্টে নদীর তীরে উঠে এলে গ্রামের লোকজন এসে তাঁকে উদ্ধার করেন। বনপাড়া খ্রিষ্টান মিশনে দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর তিনি সুস্থ হন।[৭৫]

২৯শে মে লাইনে দাঁড় করে হত্যার সময় ধনেশ্বর মন্ডল পাকিস্তানি সেনার কাছ থেকে বন্দুক কেড়ে নেয়। কিন্তু ফায়ার করতে না জানায় বাঁচতে পারেনি, দৌড়ে পালাতে গেলে তাঁকে প্রথমে পায়ে গুলি করে। পর পর কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়লে তার আঘাতে ধনেশ্বর মন্ডল মারা যান। সেদিন লাশগুলোর অনেক গুলোতেই এসিড ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছিল ঘাতক-দালালরা। কোন কোন মানুষকে গলা কেটে, বেয়নেট চার্জ করেও হত্যা করেছে তারা। বেশিরভাগ লাশ নদীর পানিতে ভেসেগিয়েছিল। বাকীদের তাদের আত্মীয় স্বজন ও স্থানীয়রা কবরস্থ করেছিল। ঐদিন শুধু গণহত্যাই হয়নি বরং ২৫-৩০ জন মহিলা নির্যাতিত ও হয়েছে পাকিস্তানি সৈন্য ও দালালদের দ্বারা। এভাবে গভীর রাত থেকে সকাল পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড, নির্যাতন, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দালালরা। বর্তমানে সেখানকার শহীদ মিনারে ২৫ জনের নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছে।

### বিলমাড়িয়া হাট গণহত্যা

লালপুর থানার বিলমাড়িয়া ইউনিয়নে মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে গোটা জুন মাস পর্যন্ত এখানে ৩ বার গণহত্যা সংঘটিত হয়। কত লোক মারা যায় এর সঠিক হিসাব কারো জানা নেই। কারণ তখন এলাকাটি ছিল নির্জন। গণহত্যার মুহূর্ত থেকে এলাকার মানুষ নিভৃত পল্লীতে গিয়ে আত্মগোপন করে ছিল। গণসাক্ষাৎকারে জানা যায়, ১৫ জুন হাটের দিন (মঙ্গলবার) হাটের মসজিদ সংলগ্ন মাঠে লাশের স্তূপ পড়ে থাকতে দেখা যায়। ৮/১০দিন ধরে লাশগুলো টানাটানি করে শেয়াল কুকুরে। গ্রামবাসীদের মধ্যে যারা ছিল সাহসী, অকুতোভয়, দুর্জয় তারাই প্রথম গণহত্যার শেষ গোধুলী বেলায় নিজেদের ২১টি লাশ সনাক্ত করে নিতে সমর্থ হয়। বেওয়ারিশ লাশগুলো পড়ে থাকে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।[৭৬]

১৫ই জুন পদ্মা নদীর তীর ঘেঁষে লালপুর উপজেলার বিলমাড়িয়া বাজার অবস্থিত। ১৫ই জুন সাপ্তাহিক হাটের দিন মৌলভী জামাল উদ্দিন রাজাকারদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ডেকে আনে। তারা পাকিস্তানি বাহিনীকে গিয়ে বলে, বিলমাড়িয়া একটি সীমান্ত এলাকার গ্রাম। এই গ্রামে ভারত থেকে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা এসে নিয়মিত আশ্রয় নেন। গ্রামবাসি মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য আর আশ্রয় দিয়ে সহযোগিতা করে। এই কথায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সেজে গুজে মৌলভী জামাল উদ্দিনের পথ প্রদর্শনে বিলমাড়িয়া হাটের দিন এসে সমস্ত হাট ঘিরে ফেলে। প্রথমে তারা বেছে বেছে কিছু লোককে ধরে এনে একস্থানে রাজাকার আর পাকিস্তানি সেপাইদের কড়া পাহারায় রেখে হাট লুট করে। তারপর সমগ্র হাটের দোকানে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। এই ঘটনায় অনেক মানুষ প্রাণভয়ে পালাতে থাকে। পাকিস্তানিরা পলায়নরত মানুষের ওপর নির্বিচারে মেশিনগান দিয়ে গুলি বর্ষণ করে। তারপর ধৃতদের গুলি করে হত্যা করে। ধৃত ব্যক্তিরা না মরা পর্যন্ত তারা গুলি বর্ষণ অব্যাহত রাখে। চিকিৎসা দিলে সুস্থ হতেন এমন গুলিবিদ্ধদের বেয়োনেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করে।[৭৭] এছাড়া হাটের নিকটস্থ খেলার মাঠে উত্তর পূর্ব কোনো

ড্রেনের মধ্যে নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে অনেককে। ঐদিন শুধু গণহত্যাই হয়নি বিলমারিয়া বাজারে, বরং অনেক নারীই নির্যাতিত হয়েছে পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলোতে, হয়েছে লুটপাট আগুনে পুড়েছে শত শত ঘর-বাড়ি।

### নীলকুঠি গণহত্যা

বিলমাড়িয়া ইউনিয়নের বিলবাড়িয়াতে অবস্থিত নীলকুঠি। ব্রিটিশ নীলকর সাহেবদের কুঠী ছিল এই বিলবাড়িয়া বাজারে (বর্তমানে সেখানে বিলমারিয়া উচ্চ বিদালয় অবস্থিত)। এই কুঠি বাড়িতে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দালালরা। জসিম উদ্দিন, আনোয়ারুল প্রমুখর মত দালাল রাজাকাররা বাঙালি নারীদের অপহরণ করে তাঁদের ওপর অত্যাচার ও নির্যাতন করতো। পরে তারা সে সব মহিলাদের পাকিস্তানি হানাদারদের হাতে তুলে দিতো। যে সব মহিলা বাধা দিত, তাঁদের উপর নেমে আসত অমানবিক নির্যাতন। এই অত্যাচারে যাঁরা মারা যেতেন, তাঁদের হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দিতো নতুবা গর্ত করে কবরস্থ করতো।[৭৮] নীলকুঠির নিকটস্থ জামের আলীর বাড়িতে পাকিস্তানি সৈন্যরা প্রবেশ করে তাঁর স্ত্রীকে ধরে। তখন জামের আলী লুকানো থাকা অবস্থায় তা জানতে পেরে স্ত্রীকে বাঁচাতে গেলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কেই হত্যা করে। ২৫শে জুলাই লালপুর থানার একজন দারোগার সহযোগিতায় বেশ কয়েকজন মহিলাকে অপহরণ করে এনে রাজাকার ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ধর্ষণ করে। এই মহিলাদের ধর্ষণ শেষে অজ্ঞাত স্থানে রেখে আসে।[৭৯] জানা যায়, বহু মানুষকে ধরে এনে এখানে আটকে রেখে নির্যাতন ও হত্যা করত পাকিস্তানি সৈন্য ও দালালরা।

১৭ই জুন ২২ জন মুক্তিযোদ্ধাকে জীবন্ত কবর দেয় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নীলকুঠিতে। ডিসেম্বর মাসে বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত এই হত্যা ও নির্যাতন চলে নীলকুঠিতে।[৮০] গুরুদাসপুর উপজেলার ধারাবারিষা ইউনিয়নের পশ্চিম দিকে অবস্থিত পোয়ালশুড়া পাটপাড়া গ্রাম। ১৫ই জুলাই ১৯৭১,এই গ্রামের গোসাইপদ সরকার, বানেশ্বর, দীনেশ ও তারাপদ একসাথে বাড়ি যাচ্ছিলেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাবে। পথে তাঁরা ধরা পড়েন এবং তাঁদের লালপুরে নীলকুঠিতে হত্যা করা হয়।

### রামকৃষ্ণপুর গণহত্যা

লালপুর থানার রামকৃষ্ণপুর গ্রামে ২০শে জুলাই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় রাতের অন্ধকারে আক্রমণ করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী ও আশ্রয়দাতা সন্দেহে আক্রমণ করে এ গ্রামে এবং হত্যা করে আব্দুল মন্ডল, বক্স, তাছের মোল্লা, কলি এবং মোজাম্মেল নামক ব্যক্তিদের।[৮১]

### বাওড়া ব্রিজ গণহত্যা

বর্তমান আজিমনগর ও আব্দুলপুর রেলওয়ে জংশনের মাঝামাঝি স্থানে বাওড়া রেলওয়ে ব্রিজ অবস্থিত। উক্ত ব্রিজে কত জানা-অজানা লোক প্রাণ দিয়েছেন তার পরিসংখ্যান কারো জানা নেই। প্রায় রাতে একটি সার্টল ট্রেন এসে রাত ১১/১২ টার দিকে ব্রিজের উপর দাঁড় করিয়ে গুলি করে লোকজনকে হত্যা করা হতো। এলাকাবাসী প্রায়ই গুলির শব্দ শুনতে অভ্যস্থ হয়েছিল এবং সমস্ত রাত্রী লোকজন আতংকিত থাকতো।[৮২]

বহমান নদীর পাড়ে গুলি খেয়ে আহত অবস্থায় একটি যুবককে দেখতে পান ইসলামপুর গ্রামের জনাব ডাঃ আমান উল্লা। যিনি নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলে চিকিৎসা বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি যুবকটিকে

কাঁধে করে নিজ গ্রাম ইসলাম পুরে যান এবং চিকিৎসা সেবার মাধ্যমে তাকে সুস্থ করে তুলেন। বর্তমানে ঐ যুবক রাজশাহী শহরে একজন বড় কাপড় ব্যবসায়ী।

**মহেশপুর গণহত্যা**

লালপুর থানার বালিতিতা মহেশপুর গ্রাম। ১৩ই ডিসেম্বর। সামরিক কমান্ড কাউন্সিল থেকে ক্লোজ হবার নির্দেশ হয়ে গেছে পাকিস্তানি বাহিনীর। সেদিন প্রায় আড়াইশ' পাকিস্তানি সেনা পায়ে হেঁটে রওয়ানা হয়েছিল ঈশ্বরদী বিমানবন্দরে পথে। সকাল বেলা সদরের মুক্তিযোদ্ধা গ্রুপ-কমান্ডার ফারুক এ সময় মারাত্মক একটা ভুল করে বসেন। যার খেসারৎ দিতে হয় এলাকাবাসীকে প্রাণ দিয়ে। নির্লিপ্ত পথচারী পাকিস্তানি সেনাদের তিনি অকস্মাৎ হিট দিয়ে বসেন। সাথে সাথে হানাদার বাহিনী অঞ্চলটিকে ঘিরে ফেলে। এতে প্রথম পর্যায়ে ২৬ জন জোয়ান ছেলে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো ৩৮ নির্দোষ ব্যক্তি পাকিস্তানি সেনাদের দ্বারা নিহত হয়।[৮৩]

**লালপুর কলোনী গণহত্যা**

লালপুর উপজেলার কুজিপুকুর নিবাসী জমসেদ প্রাং নেতৃত্বে ১৭ই জুন দালাল জসিম উদ্দিন একটি নৌকা আটক করে অপরিচিত ১৭ জন যুবককে দেখে মুক্তিযোদ্ধা বলে সন্দেহ করে। তাঁরা পাবনা জেলা থেকে এসেছিল, তাই তাঁরা জসিম উদ্দিন যে পাকিস্তানি দালাল, তা জানত না। তাঁদের আপ্যায়ন শেষে বাড়িতেই ঘুমানোর ব্যবস্থা করে জসিম উদ্দিন। এরপর সেই রাতেই গোপালপুর রাজাকার ক্যাম্পে খবর দেয়।[৮৪] (এ/বি ইউনিয়নের অন্তর্গত ফরিদপুর গ্রামের কুখ্যাত রাজাকার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী র সহযোগি ও শান্তি কমিটির সদস্য জসিম উদ্দিন)। পরের দিন সকালে ঘুম থেকে জেগে মুক্তিযোদ্ধারা যখন সকালের খাবার খাচ্ছিলেন, তখন রাজাকারেরা খুব সংগোপনে এসে খাদ্যগ্রহণরত নিরস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাদের গ্রেফতার করে। তাঁদের গ্রেফতার করে শারীরিক নির্যাতন করতে করতে প্রথমে গোপালপুর রাজাকার ক্যাম্পের কমান্ডার আনোয়ারুলের কাছে হস্তান্তর করে। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে আরেক দফা শারীরিক নির্যাতন করে রাজাকারেরা।[৮৫]এরপর গোপালপুর বাজারের হিমুর দোকানের সামনে বটগাছের নীচে পিঠ মোড়া দিয়ে বেঁধে অমানুষিকভাবে নির্যাতন চালায়। মৃত প্রায় ১৭ জনকে নিয়ে লালপুর কলোনী নামে পরিচিত স্থানে হাত পা বেঁধে নিয়ে যায়।[৮৬]এরপর সেখানে নিকটস্থ নদীর ধারে ওই আহত আর মৃত প্রায় মুক্তিযোদ্ধাদের গর্ত খুঁড়তে বাধ্য করে। পরে সেই গর্তে তাদের লাথি মেরে ফেলে দিয়ে মেশিনগানের গুলি বর্ষণ করে। তাঁদের মৃত প্রায় অবস্থায় জীবন্ত কবর দেয়া হয় সেখানে হাত-পা বেঁধে।[৮৭]

**অন্যান্য গণহত্যা**

লালপুর থানার ডেবর পাড়া, ডাঙাপাড়া ঘাটচিলান, ওয়ালিয়া প্রভৃতি স্থানেও হত্যাযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ সংঘটিত করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দালালরা। ডেবর পাড়ার নুরুল ইসলাম মেম্বারকে শান্তি কমিটির বিরোধিতা করার কারণে লালপুর হাইস্কুল মাঠে গুলি করে হত্যা করে ঘাতক-দালালরা। বর্তমানে সেখানে একটি শহীদ মিনার রয়েছে। ৩১শে মে দুপুরবেলা হানাদাররা কজিপুর মাঠে ভারতে মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে যাওয়ার সময় অনেককে গুলি করে হত্যা করে। ২৫শে এপ্রিল ১৯৭১, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী খলিশাডাঙ্গা ব্রিজে ই.পি.আর বাহিনীর সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধের সম্মুখীন হয়। সে সময় পাকিস্তানি

হানাদার বাহিনীর ছুঁড়ে দেয়া রকেট ল্যান্সারের আঘাতে পার্শ্ববর্তী ডাঙ্গাপাড়া ঘাটচিলানের বাসিন্দা আয়েশা খাতুন ও আশরাফ নিহত হন।

ওয়ালিয়া ইউনিয়নেও গণহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট প্রভৃতি সংঘটিত করেছিল ঘাতক বাহিনী ও দালালরা। পুরো লালপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মার্চ মাসের শেষ দিক থেকে ১৩ই ডিসেম্বর পর্যন্ত হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ অব্যাহতভাবে চালিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী দালালরা।

## লালপুর উপজেলায় বধ্যভূমি ও গণকবর

১৯৭১ সালে লালপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী দালালরা বহু মানুষকে হত্যা করে ফেলে রেখেছিল। কখনও একসাথে সেসব লাশ মাটি চাপা দেয়া হয়েছিল, কখনও গর্তে বা রাস্তায়, ড্রেনে প্রভৃতি স্থানে ফেলা হয়েছিল। মাঠ পর্যায়ে যেসব গণকবর ও বধ্যভূমির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

### ময়না গণকবর

গোপালপুরের ৪ কিলোমিটার উত্তরে ওয়ালিয়া ইউনিয়নের অর্ন্তগত ময়না গ্রামটি অবস্থিত। ১৯৭১ সালে ৩০শে ও ৩১শে  মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও প্রতিরোধকারী, স্থানীয় জনগণ, ইপিআর, পুলিশ, আনসারের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে শহীদ হয় প্রায় ৪২ জন মানুষ। এছাড়াও এ গ্রামের বহু নিরীহ মানুষ ঘাতক বাহিনীর শিকারে পরিণত হয়ে শহীদ হয়। এদের একত্রে কবর দেয়া হয় ময়না গ্রামে। বর্তমানে সেখানে একটি স্মৃতিসৌধ রয়েছে।

### রামকান্তপুর বধ্যভূমি

দুয়ারিয়া ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দক্ষিণে রামকান্তপুর গ্রামে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দালাল রাজাকার ৩৫-৪০ জন নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। তাঁদের লাশ একত্রে রামকান্তপুর আম বাগানে একত্রে ফেলে রাখা হয় এই বধ্যভূমিতে।

### শহীদ সাগর বধ্যভূমি

১৯৭১ সালের ৫ই মে গোপালপুর চিনি কলের গোপাল পুকরে (বর্তমানে শহীদ সাগর) হত্যা করে সেই মিলের প্রায় ৪০-৪৫ জন শ্রমিক ও ১৫০-২০০ জন (আখচাষী ও অন্যান্য) মানুষকে। সেই পুকুরের পাড়েই গর্ত করে মাটি চাপা দিতে বাধ্য করে ঘাতক-দালালরা। সেখানে একটি স্মৃতিসৌধ স্থাপিত হয়েছে।

### ধুপইল বধ্যভূমি ও গণকবর

ওয়ালিয়া ইউনিয়নের অর্ন্তগত ধুঁপইল গ্রামে ২৯শে মে ১৯৭১, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দালালরা হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করে। বড়াল নদীর ধারে ধুপইল, পঁয়তারপাড়া দিলালপুরের অসংখ্য মানুষকে দাঁড় করে গুলি করে হত্যা করে। অনেক লাশ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল তারা। আর অনেককে গর্ত করে সেখানে কবরস্থ করেছিল স্থানীয়রা (দালাল-ঘাতকরা চলে যাওয়ার পর)। সেখানে স্থানীয়রা একটি স্মৃতিসৌধ তৈরি করে যেখানে এই গণহত্যার ২৫ জন শহীদের নামাঙ্কিত রয়েছে।

**লালপুর কলোনী গণকবর**

১৯৭১ সালে ১৭ই জুন গোপালপুর বাজারে পাবনা জেলার ১৭জনকে নির্যাতন করে ও গুলি করার পর অর্ধমৃতাবস্থায় লালপুর কলোনীতে জীবন্ত অবস্থায় কবর দেয় হানাদার বাহিনী ও দালালরা।

**বিলমাড়িয়া গণকবর**

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দালালরা বিলমাড়িয়া ইউনিয়নের বিলমাড়িয়া হাট সংলগ্ন খেলার মাঠে উত্তর পূর্ব কোনে ড্রেনের মধ্যে ১৫ই জুন, ১৯৭১ নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করে অসংখ্য মানুষকে। তাঁদের সবাইকে সেখানে গণকবর দেয়া হয়। বর্তমানে বিলমাড়িয়া মাঠে শহীদদের স্মৃতির রক্ষার্থে মসজিদ সংলগ্ন একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে।

## মুক্তিযুদ্ধ ও শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত স্মারক ও স্মৃতি স্তম্ভ

মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ মানুষের আত্নত্যাগ বাঙালি জাতি কোনদিন ভুলেনি, আর কোনদিন ভুলবেও না। আর এত মানুষের আত্নত্যাগকে স্মরণ রাখতেই লালপুর উপজেলাতে নির্মিত হয়েছে নানা রকম স্মৃতিচিহ্ন। নিম্নে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো :

**শহীদ সাগর স্মৃতিস্তম্ভ ও শহীদ সাগর**

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীদের দ্বারা গণহত্যার শিকার শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে গোপালপুর সুগার মিলে অবস্থিত 'গোপাল সাগর' নামক পুকুরটির নামকরণ করা হয় 'শহীদ সাগর'। এটি মিলের অতিথি ভবন সংলগ্ন পুকুর যেখানে ১৯৭১ সালের ৫ই মে মিলের ৫০ জন কর্মকর্তা সহ আখচাষী ও অন্যান্য প্রায় ৩০০-৪০০ জন লোককে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭৩, ৫ই মে গোপালপুর সুগারমিলের ব্যবস্থাপনায় শহীদ আনোয়ারুল আজিমের স্ত্রী শামসুন্নাহার আজিম কর্তৃক 'শহীদ সাগর' নামে একটি শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

**আজিমনগর স্টেশন**

গোপালপুর সুগার মিলের মহাব্যবস্থাপক শহীদ আনোয়ারুল আজিমের স্মরণে বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালে ১লা ফেব্রুয়ারি স্থানীয় গোপালপুর রেলওয়ে স্টেশনের নতুন নামকরণ করেন 'আজিম নগর স্টেশন'।

**মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুর রহমান গেইট সড়ক**

গোপালপুর বাজার থেকে গৌরীপুর রোড পর্যন্ত (ঈশ্বরদী) সড়কটি মুক্তিযোদ্ধা মাহবুবুর রহমানের নামে নামকরণ করা হয়েছে।

**শহীদ জননেতা মমতাজ উদ্দিন সড়ক**

৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এ সড়কটি রায়পুর অর্জুনপাড়া থেকে ফুলবাড়ী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত অবস্থিত। এটি মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মমতাজ উদ্দিনের নামে নামকরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, তিনি লালপুর উপজেলার এম.পি ছিলেন।

### শহীদ জামসেদ আলী সড়ক

৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এ সড়কটি কামারহাটি লালপুর রোড থেকে লোকমানপুর পর্যন্ত (আব্দুলপুর স্টেশন পার হয়ে) বিস্তৃত। এটি মুক্তিযোদ্ধা জামসেদ আলীর স্মৃতি রক্ষার্থে নামকরণ করা হয়েছে।

### ময়না শহীদ স্মৃতিসৌধ

গোপালপুরের ৪ কিলোমিটার উত্তরে ওয়ালিয়া ইউনিয়নের অর্ন্তগত ময়না গ্রামে এই স্মৃতিসৌধটি অবস্থিত। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ ও ৩১ মার্চ ময়না নামক স্থানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধে নিহত ও গণহত্যার শিকার শহীদদের বধ্যভূমির উপর নির্মিত হয়েছে ময়না শহীদ স্মৃতিসৌধ।

### বিলমাড়িয়া শহীদ স্মৃতিসৌধ

লালপুর উপজেলার বিলমাড়িয়া ইউনিয়নে ১৯৭১ সালের ১৫ জুন (হাটের দিন) মঙ্গলবার পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা যে গণহত্যা সংঘটিত করে তার স্মৃতি রক্ষার্থে বিলমাড়িয়া শহীদ স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে বিলমাড়িয়া হাট মসজিদ সংলগ্ন স্থানে।

১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আল শামস, শান্তি কমিটি প্রভৃতি সংগঠনগুলো পুরো লালপুর উপজেলায় গণহত্যা সহ বিভিন্ন প্রকার মানবতাবিরোধী কার্যক্রম সংঘটিত করে। ৩০শে মার্চ ওয়ালিয়ার ময়না গ্রামে হানাদার বাহিনী বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধকালীন পুরো সময় বাঙালিদের কাছে পরাজয়ের শোধ নিতে বারবার লালপুরে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে।

৮ই ডিসেম্বর পাঞ্জাব পুলিশ ও খান সেনারা থানা ত্যাগ করে। ৯ তারিখে অধিকাংশ রাজাকারও থানা ত্যাগ করে। ১০ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী থানা দখল করে। জনতা সেদিন উল্লাসে ফেটে পড়ে কিন্তু এরপরেও একটি বড় আঘাত অপেক্ষা করছিল। হঠাৎ ১৩ই ডিসেম্বর বর্বর খান সেনারা ঝটিকা আক্রমণ করে মহেশপুর গ্রামে গণহত্যা চালায়। ১৪ই ডিসেম্বর ভেড়ামারা ও পাকশীতে সারাদিন ধরে বিমান যুদ্ধ ও বিমান বিধ্বংসী কামানের শব্দে আশে পাশের এলাকা প্রকম্পিত হয়ে উঠে। লালপুরের হাজার হাজার জনতা এ দৃশ্য অবলোকনের জন্য পদ্মার তীরে জড়ো হতে থাকে। ভারতের দু'খানা বিমান সারাদিন ধরে আক্রমণ চালাতে থাকে এবং পাকশি হার্ডিঞ্জ ব্রিজটি ঐদিনই বিকট শব্দে ভেঙ্গে পড়ে এবং শেষ বারের মত খান সেনারা এ অঞ্চল ত্যাগ করে।[৮৮] ১৫ই ডিসেম্বর নাটোরের লালপুর উপজেলা পুরোপুরি শত্রুমুক্ত হয়। সেদিনই বিজয়ের আনন্দে মোঃ আব্দুর রউফ ও মমতাজ উদ্দিনের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা লালপুর থানা ও ওয়ালিয়া পুলিশ ফাঁড়িতে উড়ানো হয়।

১৮ই ডিসেম্বর নাটোরে মিত্রবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ কমান্ডের নিকট খান সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে। চারিদিকে খান সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে। চারদিকে জয়বাংলা ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠে এবং ২৪শে ডিসেম্বর লালপুর শ্রী সুন্দরী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক বিজয় উৎসব, আলোচনা সভা ও শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পর আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয়।

১৯৭১ সালে লালপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী (রাজাকার-আলবদর-আলশামস শান্তিকমিটি) যারা ছিল তাদের অধিকাংশের সম্পর্কে সুজিত সরকার *নাটোর জেলার*

*মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এ গ্রন্থে লালপুর উপজেলার শান্তি কমিটির ৩০ জন ও রাজাকার-আলবদর বাহিনীর ৬৭ জনের নামের তালিকা উল্লেখ করেছেন।

তথ্য নির্দেশ

[১] সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া- দ্বাদশ খন্ড*, *বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১, পৃ. ২৯৭-২৯৮

[২] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পৃ. ১৪৮-১৫১

[৩] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৯৭-২৯৮*

[৪] জেলা বাতায়ন (http://lalpur.nator.gov.bd)

[৫] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫১

[৬] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৯৭-২৯৮*

[৭] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫১

[৮] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৯৭-২৯৮*

[৯] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫১

[১০] জেলা বাতায়ন (http://lalpur.nator.gov.bd)

[১১] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫১

[১২] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৯৭-২৯৮*

[১৩] জেলা বাতায়ন (http://chongdhupailup.natore.gov.bd)

[১৪] *প্রাগুক্ত*

[১৫] জেলা বাতায়ন (http://bilmariaup.natore.gov.bd)

[১৬] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫১

[১৭] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৯৭-২৯৮*

[১৮] জেলা বাতায়ন (http://bilmariaup.natore.gov.bd)

[১৯] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫১

[২০] জেলা বাতায়ন (http://bilmariaup.natore.gov.bd)

[২১] জেলা বাতায়ন (http://duariaup.natore.gov.bd)

[২২] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫১

[২৩] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৯৭-২৯৮*

[২৪] জেলা বাতায়ন (http://duariaup.natore.gov.bd)

[২৫] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫১

[২৬] জেলা বাতায়ন (http://duariaup.natore.gov.bd)

[২৭] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৯৭-২৯৮*

[২৮] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫১

[২৯] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৯৭-২৯৮*

[৩০] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫১

[৩১] জেলা বাতায়ন (http://oaliaup.natore.gov.bd)

[৩২] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫১

[৩৩] জেলা বাতায়ন (http://oaliaup.natore.gov.bd)

[৩৪] জেলা বাতায়ন (http://lalpur.nator.gov.bd)

[৩৫] মোঃ হারুন অর রশীদ (ইউপি সদস্য (৫২), পিতাঃ আরব আলী শেখ, গ্রামঃ ময়না, ইউনিয়ন, ওয়ালিয়া, উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ ময়না, ১৭ জুলাই ২০১৫

[৩৬] মোসাম্মত ছানোয়ার (৫১), স্বামী: আব্দুর রহমান, গ্রাম: ময়না, ইউনিয়ন: ওয়ালিয়া, উপজেলা: লালপুর, জেরা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ময়না বধ্যভূমি, ১৭ জুলাই ২০১৫

[৩৭] আব্দুল কুদ্দুস মোল্লা (৬০), পিতা: সৈয়দ আলী মোল্লা, ঠিকানা: ঐ। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ময়না বধ্যভূমি, ১৭ জুলাই ২০১৫

[৩৮] মোঃ তইজ উদ্দিন মন্ডল, (৬৫), পিতা: তফেজ উদ্দিন। গ্রাম: রামকান্তপুর, ইউনিয়ন: দুয়ারিয়া, উপজেলা: লালপুর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: রামকান্তপুর বধ্যভূমি, ১৬ জুলাই ২০১৫

[৩৯] মোঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মতিউর রহমান (৬২), পিতা: আব্দুল মজিদ সরকার। গ্রাম: কদিমচিলান, ইউনিয়ন: কদিমচিলান, উপজেলা: লালপুর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ময়না, ১৭ জুলাই ২০১৫

[৪০] জোৎস্না বেওয়া, স্বামী: শহীদ তোফাজ্জল, ঠিকানা: গোপালপুর বাজার, লালপুর, নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ১৬ জুলাই ২০১৫। নিজবাড়ি

[৪১] বাবুল আক্তার (৫০), পিতা: শহীদ ডা. শাহাদাত হোসেন। ঠিকানা: গোপালপুর বাজার, লালপুর, নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: গোপালপুর বাজার, ১৬ জুলাই ২০১৫

[৪২] মোঃ নজরুল ইসলাম (৫৫), পিতা: আছির উদ্দিন আমীন। ঠিকানা: গোপালপুর পৌরসভা, গোপালপুর সুগার মিল, লালপুর, নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: গোপালপুর সুগারমিল, ১৬ জুলাই ২০১৫

[৪৩] খন্দকার জালাল আহমেদ (৭০), পিতা: খন্দকার হীমাদ উদ্দিন আহমেদ। ঠিকানা: ঐ। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: গোপালপুর সুগার মিল, ১৬ জুলাই ২০১৫

[৪৪] রেজাউল করিম (৫৫), পিতা: হাসান আলী। গ্রাম: বাওড়া, ইউনিয়ন: রেধুপইল, উপজেলা: লালপুর জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ১৬ জুলাই ২০১৫ বাওড়া ব্রিজ

[৪৫] মোঃ আব্দুল গফুর (৭২), গ্রাম: ধুপইল পঁয়তার পাড়া, ইউনিয়ন: ওয়ালিয়া, উপজেলা: লালপুর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ধুপইল গণকবর, ১৬ জুলাই ২০১৫

[৪৬] মোঃ আমীর হোসেন (৬০)। ঠিকানা: ঐ। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ঐ

[৪৭] সন্তোষ কুমার মন্ডল (৫৫), গ্রাম: দিলালপুর, ইউনিয়ন: ওয়ালিয়া, উপজেলা: লালপুর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: দিলালপুর, ১৬ জুলাই ২০১৫

[৪৮] মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (৬৪) (অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট), ঠিকানা: বিলমারিয়া, লালপুর, নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ১৬ জুলাই ২০১৫, বিলমারিয়া হাট

[৪৯] হারান হালদার (৯২), পিতা: রামেশ্বর হালদার, ঠিকানা: ঐ। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: বিলমারিয়া, ১৬ জুলাই ২০১৫

[৫০] স্মরণিকা, *মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০০২*; জেলা প্রশাসন, নাটোর, পৃ. ২৯। ২৬ মার্চ ২০০২

[৫১] সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ২০০৯, ঢাকা. পৃ. ১৪৭

[৫২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

[৫৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

[৫৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

[৫৫] স্মরণিকা, স্বাধীনতা রজত জয়ন্তী ১৯৯৮, নাটোর জেলা, ১৯৯৮, পৃ. ২৪

[৫৬] জেলা বাতায়ন (http://lalpur.nator.gov.bd)

[৫৭] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত পৃ. ১৯৬

[৫৮] মাহতাব উদ্দিন (সম্পা.), *একুশ থেকে একাত্তর*, মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী গবেষণা কেন্দ্র, রাজশাহী, জুলাই ১৯৯৬। সুজিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৬-১৯৭

[৫৯] স্মরণিকা, ১৯৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩-২৪

[৬০] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: অষ্টম খন্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ. ৪৫৬-৪৫৭

[৬১] স্মরণিকা, ২০০২, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১

[৬২] স্মরণিকা, ১৯৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[৬৩] হাসান হাফিজুর, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫৭

[৬৪] স্মরণিকা, ১৯৯৮, পৃ. ২৪

[৬৫] স্মরণিকা, ২০০২, পৃ. ৩০

[৬৬] সুজিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০৬। মাহতাব উদ্দিন (সম্পা.), *রণাঙ্গন একাত্তর*, মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী গবেষণা কেন্দ্র রাজশাহী, ১৯৮৬

[৬৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০৬

[৬৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০৬

[৬৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০৬

[৭০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০৬

[৭১] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০৬

[৭২] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

[৭৩] স্মরণিকা, *১৪তম লালপুর উপজেলা স্কাউটস সমাবেশ*, ২০১৪, বাংলাদেশ স্কাউটস লালপুর উপজেলা লালপুর, নাটোর, পৃ. ২৫

[৭৪] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯

[৭৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০

[৭৬] স্মরণিকা, ১৯৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

[৭৭] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত পৃ. ২১৩

[৭৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

[৭৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

[৮০] জেলা বাতায়ন (http://lalpur.nator.gov.bd)

[৮১] প্রাগুক্ত

[৮২] স্মরণিকা, ২০১৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭

[৮৩] স্মরণিকা, ১৯৯৮, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪-২৫

[৮৪] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১-১২

[৮৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১২

[৮৬] স্মরণিকা, ২০১৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮

[৮৭] সুজিত সরকার, পৃ. ২১২

[৮৮] জেলা বাতায়ন (http://lalpur.nator.gov.bd)

## পঞ্চম অধ্যায়

## গুরুদাসপুর উপজেলা

নাটোর জেলার দক্ষিণপূর্ব দিকে অবস্থিত গুরুদাসপুর উপজেলা। এই উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের সময় অনেক রাজাকার ছিল। শুধুমাত্র এ উপজেলার মহারাজপুর গ্রামেই ছিল ৯৯% রাজাকার। বাংলাদেশের অন্য কোথাও এরকমটা দেখা যায় না। ফলে এ উপজেলাতে রাজাকার, আলবদর, আল শামস বাহিনীর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সাথে মিলিত হয়ে এ এলাকাতেও ধ্বংস, হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ অব্যাহত থাকে। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব গুরুদাসপুরে গিয়েছিলেন। সে সময় জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ছিলেন ডাঃ মোবারক হোসেন এবং প্রাদেশিক পরিষদে মনোনীত প্রার্থী ছিলেন আব্দুস সালাম সাহেব। উভয়ই জয়ী হয়েছিলেন ভোটে। বঙ্গবন্ধুর আগমনে এ এলাকার মানুষ আরও অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। তারা ওয়ালিং পোষ্টারিং করেছিল। গুরুদাসপুর মাছ বাজারে টিনের সঙ্গে চাটাইয়ে লেখা ছিল—"বাংলায় আনবে নতুন দিন। শেখ মুজিব আর তাজউদ্দিন"।[১]

এরকম আরও বহু শ্লোগান ছিল। ফলে এ উপজেলার মানুষও প্রতিবাদ করেছিল হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের দিনগুলি গুরুদাসপুর ছিল সংগ্রামময়। মার্চ মাস থেকেই প্রায় প্রতিদিনই গুরুদাসপুর হাইস্কুলে গিয়ে সংগ্রাম মিছিল হয়েছে। জনগণ শ্লোগান দিয়েছে। ৩রা মার্চ মিছিল হয়েছিল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে মুক্তিকামী ছাত্র জনতা লাঠি মিছিল নিয়ে চাঁচকৈড় গুরুদাসপুরে প্রদক্ষিণ করেছিল যাতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ছাত্রনেতা মোবারক, তোফজ্জল হোসেন, মহসিন আলী, মতিন প্রমুখ।

৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের পর গুরুদাসপুরের জনগণ আরও অনুপ্রেরণা লাভ করল দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য। ফলে ছাত্র নেতাদের উদ্যোগে সাধারণ জনগণও বিশাল ছাত্র সভায় যোগ দিতে থাকে। "বীর বাঙালী অস্ত্র ধর" "বাংলাদেশ স্বাধীন কর"। "জাগো জাগো বাঙালী জাগো"।[২] এভাবেই গুরুদাসপুরে নারী-পুরুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে স্বাধীনতার শ্লোগান। এপ্রিল মাসের মধ্যেই পুরো নাটোর দখল করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। আর তাদের সহযোগী ছিল গুরুদাসপুর উপজেলার রাজাকার আলবদর, আলশামস প্রভৃতি সংগঠনের দালালরা।

**অবস্থান :**

নাটোর জেলার দক্ষিণ পূর্ব দিকে ১৯৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত এ উপজেলা অবস্থিত। ১৯১৭ সালে গুরুদাসপুর থানা গঠিত হয়। এ উপজেলার উত্তরে সিংড়া উপজেলা, দক্ষিণে পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলা ও বড়াইগ্রাম উপজেলা, পূর্বে সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলা, পশ্চিমে নাটোর সদর উপজেলা অবস্থিত। এ উপজেলার আয়তন ১৯৯.৪০ বর্গ কি.মি.। এর অবস্থান ২৪°১৮´ থেকে ২৪°২৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০৪ থেকে ৮৯°১৯ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।[৩] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ছিল ১,১১,২৩৩ জন।[৪] বর্তমানে জনসংখ্যা ১৯৪২২৮ জন(২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)।[৫]

প্রাচীন আমলে গুরুদাসপুর উপজেলার নামকরণ করা হয়েছে। এখানে গুরু গোবিন্দ নামে এক মাঝি ছিলেন। যিনি খেয়ানৌকা পারাপার করতেন। নন্দকুমা নদীতে কালক্রমে সেই মাঝির নামানুসারে এ উপজেলার নাম হয় বলে জানা যায়। এ উপজেলার মধ্য দিয়ে চাঁচকৈড় বাজার সংলগ্ন নন্দকুজা ও আত্রাই নদী যেগুলোর অধিকাংশই চলনবিলে মিলিত হয়েছে। এ উপজেলায় গ্রামের সংখ্যা ১২টি। বর্ষাকালে এলাকার

বিভিন্ন স্থানে পানি জমে। রাস্তাঘাটের অধিকাংশ পানি জমে। রাস্তাঘাটের চলার অনুপযুক্ত। পুরো নাটোর জেলার মধ্যে এ উপজেলার মহারাজপুর গ্রামে ১৯৭১ সালে রাজাকার এর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। এ উপজেলায় কৈরত, সাঁওতাল, ওরাঁও, পাহান, তুরী ও বাঁশফোড় প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বাস রয়েছে।[৬]

গুরুদাসপুর উপজেলার যেসব ইউনিয়ন, গ্রাম ও এলাকাতে গণহত্যা ও নির্যাতন অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর বর্ণনা উল্লেখ করা হল :

**গুরুদাসপুর পৌরসভা :**

এটি গুরুদাসপুর থানার দক্ষিণে অবস্থিত। গুরুদাসপুর উপজেলা সদর থেকে দূরত্ব কোয়ার্টার মাইল। এ পৌরসভার আয়তন ১৩.৬০ বর্গ কি.মি.। এর লোকসংখ্যা ২৯১১০ জন(২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী) ও ওয়ার্ড সংখ্যা ৯টি।[৭] ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত নারিবাড়ী ও চাঁচকৈড় বাজার এ গণহত্যা চালায়।

**নারিবাড়ী :**

গুরুদাসপুর পৌরসভার আওতাভূক্ত ১নং ওয়ার্ডে এ মহল্লার অবস্থান। বসতির সংখ্যা বর্তমানে কিছু পরিমাণ থাকলেও ১৯৭১ সালে বেশিরভাগ জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। উত্তর নারিবাড়ী ও দক্ষিণ নারিবাড়ী দুটি অংশ। তবে উত্তর নারিবাড়ী পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত হলেও, দক্ষিণ নারীবাড়ী ধারাবরিষা ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। পূর্বে উত্তর নারিবাড়ী গুরুদাসপুর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর আয়তন ছিল ৪১৩ একর, জনসংখ্যা ১,১৩৯ জন।[৮]

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকাররা এ মহল্লায় বহু লোককে হত্যা করে। তবে নির্যাতন বিষয়ে তেমন কিছু জানা যায়নি।

**বিয়াঘাট ইউনিয়ন :**

নাটোর জেলার গুরুদাসপুর থানার আত্রাই নদীর তীরে চলনবিলের প্রাণকেন্দ্রে বিয়াঘাট ইউনিয়ন পরিষদ অবস্থিত। ১৯৬৫ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। গুরুদাসপুর থানা হতে ৫ কি.মি. ভিতরে এটি অবস্থিত।[৯] সীমানা : উত্তরে সিংড়া উপজেলার চামারী ইউনিয়ন এবং ডাহিয়া ইউনিয়ন, পূর্বে অত্র উপজেলার খুবজীপুর ইউনিয়ন, পশ্চিমে নাজিরপুর ইউনিয়ন, দক্ষিণে নাজিরপুর ইউনিয়ন ও গুরুদাসপুর পৌরসভা। বর্তমানে এর আয়তন ১০৯৮৪ একর।[১০] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী লোকসংখ্যা ছিল ২০,২৫৪ জন।[১১] বর্তমানে ২১০৬৫ জন (২০০১সালের আদমশুমারি অনুযায়ী) ও গ্রামের সংখ্যা ১০টি।[১২] আত্রাই নদী (৮ কি.মি.) এবং নন্দকুজা (৬ কি.মি.) এ ২টি নদী এ ইউনিয়নে রয়েছে। চলন বিল এখানে অনেকটা জুড়ে রয়েছে, যা এ অঞ্চলের একটি দর্শনীয় স্থান।[১৩]

**বিয়াঘাট গ্রাম :**

এ গ্রামটি বিয়াঘাট ইউনিয়নে অবস্থিত। নন্দকুজা নদী বয়ে গেছে এর পাশ দিয়ে। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এ গ্রামের আয়তন ১,১৩৫ একর ও জনসংখ্যা ছিল ২,২৪২ জন।[১৪] বর্তমানে এ গ্রামের জনসংখ্যা ৪৮৭৭ জন(২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)।[১৫] গ্রামটিতে অনেক শান্ত নিরিবিল পরিবেশ, গাছ পালা রয়েছে। আর নদীর পাড়ে বলেই হয়তো মানুষগুলোর জীবন প্রবাহ সরল। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি

ও তাদের সহযোগীরা এখানে হত্যাযজ্ঞ অগ্নিসংযোগ করে। বিয়াঘাটের চরপাড়া নামক স্থানেও পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা চালায়।

**ধারাবারিষা ইউনিয়ন :**

এই ইউনিয়নটি চলনবিলের মাঝে অবস্থিত। এই ইউনিয়নের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে তুলসী নদী। ১৯৬২ সালে এই ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হয়।[১৬] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এ ইউনিয়নের লোকসংখ্যা ছিল ১৫,৭২৬ জন।[১৭] বর্তমান এর জনসংখ্যা ২৯৩৯৪ জন ও আয়তন ৭৮৯৪ একর(২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। এই ইউনিয়নের ওয়ার্ড সংখ্যা ৯টি এবং ১৬টি মহল্লা রয়েছে।[১৮] এই ইউনিয়নের পোঁয়ালশুড়া পাটপাড়া গ্রামে একটি প্রায় ৪০০ বছর পুরানো মসজিদ আছে। মসজিদের দক্ষিণ দিক হতে যে নদী প্রবাহিত তার নাম তুলসি নদী। এ নদীটি পদ্মা হতে উৎপন্ন হয়ে সোনাবাজুর উত্তর দিক ও পোঁয়ালশুড়া পাটপাড়ার দক্ষিণ দিয়ে এবং শিধুলী ও আইড়মাড়ী বিলের মধ্যে দিয়ে চেচুঁয়া নদী ও কিনু সরকারের ধর হয়ে বড়াল নদীতে পড়েছে। চেঁচুয়া নদী হল ধারাবারিষা গ্রামের দক্ষিণ পাশ দিয়ে কৈ-খোলার বিল, চাতরার বিল ও জরদার জোলা হয়ে আফবার বিলের মধ্যে দিয়ে খলিশাগাড়ী বিলে গেছে। সেখান থেকে কিনু সরকারের ধর হয়ে বওসা নদীতে মিশে পরে বড়াল নদীর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। তুলসী নদীর উপর নির্মিত নাটোর হতে গুরুদাসপুর সংযোগ ব্রিজ ছিল সেটি পাকিস্তানির গুরুদাসপুরে আসা রোধ করবার জন্য ভেঙ্গে ফেলে স্থানীয়রা।[১৯]

**পোঁয়ালশুড়া পাটপাড়া :**

এ গ্রামটি ধারাবরিষা ইউনিয়নের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এর উত্তরে বিন্যাবাড়ি, দক্ষিণ দড়িপাড়া, পূর্ব দিকে ৩নং ওয়ার্ড, পশ্চিমে ঝাউপাড়া। বর্তমানে এর জনসংখ্যা ১৬০২ জন। এই গ্রামের পাশ দিয়ে তুলসী নদী বয়ে গেছে। এই গ্রামে গণহত্যা সংঘটিত করে। এ গ্রামটিতে বাড়িঘর খুব বেশি নয়। বর্ষাকালে চলাচল একটু কষ্টদায়ক।[২০]

**মশিন্দা ইউনিয়ন :**

গুরুদাসপুর উপজেলায় অবস্থিত এ ইউনিয়নটি ১৯৬২ সালে স্থাপিত হয়। এই ইউনিয়নের উত্তরে সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ উপজেলা, দক্ষিণে বড়াইগ্রাম উপজেলা, পূর্বে গুরুদাসপুর পৌরসভা।[২১] এই ইউনিয়নের আয়তন ৫৭৬৯ একর ও বর্তমানে জনসংখ্যা ২৯১৩৩ জন। গ্রামের সংখ্যা ১৭টি।[২২] এ ইউনিয়নটি চলনবিলের মধ্যস্থিত একটি ইউনিয়ন। এই ইউনিয়নে মহুয়াবৃক্ষ অনেক বিখ্যাত যা জনগণের মধ্যে কৌতূহল সৃষ্টি করে। এই ইউনিয়নের উত্তর পূর্বে সিরাজগঞ্জের সগুনা ইউনিয়ন, পূর্ব-দক্ষিণে পাবনার ছাইকোলা ইউনিয়ন নাটোর জেলার অন্তর্গত ধারাবারিষা ইউনিয়ন, উত্তর-পশ্চিমে যথাক্রমে খুবজিপুর ইউনিয়ন ও চাঁচকৈড় পৌরসভা। মশিন্দা ইউনিয়নের প্রায় উত্তর দিক দিয়ে আত্রাই নামক নদী বয়ে চলেছে।[২৩]

**কাছিকাটা :**

এটি মশিন্দা ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড এ অবস্থিত। ১৯৭৪ সালে এ গ্রামের লোকসংখ্যা ছিল ৭০৯ জন। আয়তন ছিল ৩৫৩ একর। বর্তমানে এর জনসংখ্যা ১৫৫২ জন। ১৯৭১ সালে এই কাছিকাটা বাজারে পাকিস্তানি ও রাজাকাররা হত্যা, লুট, ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। রাস্তাঘাট খুব ভাল তা বলা যাবে না।[২৪]

## স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি

শেখ মুজিবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে গুরুদাসপুর থানায় মার্চের শুরু থেকে নাটোর ও রাজশাহীর অনুকরণে রাজশাহী শহরে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছাত্র মহসিন আলী ও আব্দুল কুদ্দুসের (সাবেক পশুসম্পদ প্রতিমন্ত্রী) উদ্যোগে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। শহর থেকে তারা প্রশিক্ষক নিয়ে গিয়ে নিজেরা যেমন প্রশিক্ষিত হন, তেমনি এলাকার যুবকদের সংগঠিত করে, এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তারা প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখেন। এই সময় সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকায় স্বাধীনতার ঘোষণা দেবেন শুনে গুরুদাসপুরের আব্দুল হাকিম সরকার ও ইন্তাজ আলি মোল্লার প্রস্তাবে ওই দিনই হরিপদ কুন্ডু নামে জনৈক ব্যবসায়ী ব্যক্তি তার বাসাভবনে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেরা সবরকম সাহায্য, প্রয়োজনে আত্মদানের শপথ করেন। পরে তারা প্রশিক্ষণরত যুবকদের পতাকা উত্তোলনের স্থানে ডেকে এনে অনুরূপভাবে শপথ করান সেদিনের এই শপথ অনুষ্ঠানে অনেক সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অথচ এই মানুষগুলো কেউ কখনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেনি। কিন্তু দেশের সংকট মূহূর্তে এরা প্রাণের তাগিদে রাজনৈতিক কর্মকান্ডে  অংশগ্রহণ করেছে। তাদের অনেকে ১৭ই এপ্রিল জীবন দিয়ে সেদিনের সেই শপথ রক্ষা করে রক্তাক্ত ইতিহাস রচনা করে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ঢাকা বেতার থেকে মাঝপথে প্রচার বন্ধ করে দিলে গুরুদাসপুরে সঙ্গে সঙ্গে বিশাল এক প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিলটি যতই চাঁচকৈড় বাজারে দিকে অগ্রসর হতে থাকে জনসংখ্যাও ততোই বৃদ্ধি পেতে থাকে।[২৫] এছাড়া পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে গুরুদাসপুরে লাঠি মিছিলসহ নানা প্রতিবাদ হয়েছিল।[২৬] এভাবেই গুরুদাসপুরের মানুষ মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে প্রশিক্ষণ, প্রতিবাদ মিছিল সহ নানা প্রকার কর্মসূচির মধ্য দিয়ে।

## সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি ও শান্তি কমিটি গঠন

১৯৭১ সালে ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করেছিল। ৭ই মার্চের ভাষণ এ উপজেলার মানুষদের অনুপ্রাণিত করেছিল। তবে উল্লেখ্য যে, এ উপজেলা শহরে যে সংগ্রাম কমিটি প্রথমে গঠিত হয়েছিল, তাদের অনেকেই পরবর্তীতে শান্তি কমিটি গঠন করেছিল। গুরুদাসপুরে ৭ই মার্চের ভাষণের পর সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এর সভাপতি ছিলেন ব্যবসায়ী আব্দুল জলিল। সেক্রেটারি ছিলেন মোঃ আবুল কাশেম, যিনি প্রথমে চাঁচকৈড় হাই স্কুলের এবং পরবর্তীতে ধারাবারিষা হাই স্কুলের শিক্ষক দিলেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গুরুদাসপুরে এলে উল্লিখিত দু'জন ব্যক্তিই পরবর্তীতে শান্তিকমিটি গঠন করেছিল। উল্লেখ্য যে, এ এলাকার অর্থবান বা সম্পদের মালিক ব্যক্তিরাই মূলত পাকিস্তানি বাহিনীর সমর্থক ছিলেন।

ইউনিয়ন পর্যায়েও অনেকক্ষেত্রে সংগ্রাম কমিটি ও শান্তি কমিটি গড়ে উঠেছিল। ৭ই মার্চের ভাষণের পর নাজিরপুর ইউনিয়নে গঠিত সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন আলিমুদ্দিন সরকার, আমির মন্ডল, লুৎফর রহমান, রাজেন্দ্রনাথ সাহা, কানু মোল্লা, জীবন ভৌমিক প্রমুখ। এরাই মূলত মুক্তিযুদ্ধের সময় ভূমিকা রেখেছিল।

নাজিরপুর ইউনিয়নে শান্তিকমিটির নেতৃত্বে ছিলেন রুহুল, নিয়ামত উল্লাহ (১৯৭১ সালে চেয়ারম্যান ছিলেন), রাজ্জাক মাস্টার  প্রমুখ। উল্লেখ্য, রাজ্জাক মাস্টার পুরো ইউনিয়নে ও পার্শ্ববর্তী বহু এলাকায় হত্যা, ধ্বংস নির্যাতন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখেন।

## পাকিস্তানি ও রাজাকার বাহিনীর ক্যাম্প সমূহ

সমগ্র গুরুদাসপুর উপজেলায় এত সংখ্যক রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তিকমিটির লোক ছিল, যা অন্য কোন জেলায় হয়ত ছিল না। ফলে তারা বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। কয়েকটি ক্যাম্প হল—

১. **গুরুদাসপুর পাইলট হাইস্কুল:** এখানে রাজাকার প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপন করেছিল ঘাতক-দালালরা। এছাড়া গুরুদাসপুর থানার বিভিন্ন ক্যাম্পে রাজাকার বাহিনী অবস্থান করেছিল।

২. নাটোর গুরুদাসপুর পাঁকা রাস্তার উপর পাটপাড়া সোনাবাজু ব্রিজটি বেশ বড়। সেখানে কালিচরনের বাড়িতে রাজাকার ক্যাম্প স্থান করা হয়েছিল।

৩. **চাঁকৈড় ক্যাম্প :** গুরুদাসপুর উপজেলার চাঁচকৈড়-এ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকাররা ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। ১৯৭১ সালে এখানে অনেক মানুষ ধরে এনে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়। যুদ্ধের এক পর্যায়ে নাটোর শহরে মুক্তিযোদ্ধা রেজা ও রঞ্জু মসিন্দা ইউনিয়নের মাঝগ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল গোপনে। রাজাকাররা জেনে গেলে তাদের সেখান থেকে চাঁচকৈড় ক্যাম্পে নিয়ে এসে নির্যাতন ও হত্যা করে ১লা সেপ্টেম্বর। মুক্তিযোদ্ধা মহসিনকেও নির্যাতন করে প্রায় চৌদ্দ দিন ধরে এখানে আটক রেখে।

## গুরুদাসপুর উপজেলার গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

১৯৭১ সালের গুরুদাসপুরবাসী যখন সমগ্র দেশের জনগণের মত স্বাধীনতার চিন্তায় উদগ্রীব, যখন দেশকে রক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে, এরকম একটি মুহূর্তে এপ্রিল মাসের ১৭ তারিখে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে গুরুদাসপুরে। উল্লেখ্য, গুরুদাস পুরে যেসব দালালরা ছিল তাদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি বাহিনী এসেছিল। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নাটোর শহরে প্রবেশের মাত্র ৪-৫ দিন পরেই এখানে আসে। প্রথমে উত্তর নারীবাড়ি। এরপর বিয়াঘাট ও পোয়ালশুড়া পাট পাড়া গ্রামে তারা অবর্ণনীয় গণহত্যা, নির্যাতন, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ চালায়। তারা কাছিকাটা বাজারেও চালায় ও লুটপাট করে। ভূমিকা রেখেছিল নাড়ীবাড়ি গণহত্যায় ওয়াজেদ ডাক্তারের ছেলে 'তারা' (প্রধান জল্লাদ)। এছাড়া আব্দুল জলিল আমির হোসেন, চাঁচকেড় উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম মোল্লা, ইয়ার উদ্দিন মিয়া, মোন্তাজ বিহারি, মকছেদ আলী ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য প্রমুখ খুনি ও দালালচক্র জড়িত ছিল। আরও ছিলেন শিকারপুরের মুসলিম লীগ সমর্থক চান্দু মোল্লা।[২৭] উত্তর নারীবাড়িতে এরা হাফেজ আব্দুর রহমানের (কুখ্যাত ঘাতক) সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে নিয়ে আসে। এখানে প্রচুর হিন্দুবাস করত। এই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই মূলত গুরুদাসপুরে ব্যবসা ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল। এছাড়া বহু সংগ্রামী, মুক্তিকামী মানুষ ছিল বলে ঘাতক দালালরা তাদের জানায়। নারীবাড়ির নিরীহ জনসাধারণকে ১৭ই এপ্রিল বাড়ি থেকে বের করে আনে এই বলে যে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কিন্তু তারা তাদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে সেখানে হত্যা করে। ধর্ষণ করে উষা রানী নামক মহিলাকেও।এপ্রিল মাসের ১৯/১৭ তারিখে ৩রা বৈশাখ মাস, দুপুর ১২টার দিকে হানাদার বাহিনী গুরুদাসপুর উত্তর নারিবাড়ী আক্রমণ করে। মনতাজ বিহারী, শাজাহান বিশ্বাস, ফয়েজ উদ্দিন, কাজেম উদ্দিন প্রমুখের সহযোগিতায় হানাদাররা প্রবেশ করে হিন্দু অধ্যুষিত এই এলাকায়। বাবা মনিন্দ্রনাথকে বাঁচাতে গিয়ে ছেলে নীলরতনও বলি হয় হানাদারদের গুলির মুখে।

বিমল চন্দ্র হালদার জানান,

> নীলরতন বাহির ঘরে প্রতিবেশীদের সাথে তাস খেলছিল। মনিন্দ্রনাথ খাবার খেতে রান্না ঘরে ঢুকবে, এমন সময় দালালরা পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ে প্রবেশ করে বাড়িতে। সাথে সাথে ধুতি পরিহিত মণিন্দ্রনাথকে ধরলে ছেলে নীলরতন এগিয়ে আসে বাঁচাতে। আর তখন বাড়ির মধ্যেই বাবা-ছেলেকে গুলি করে হত্যা করে হানাদাররা। এরপর ঘর-বাড়ি লুট করে আগুন ধরিয়ে দিল। আশে পাশে যারা ছিল, তাঁরা পালানোর চেষ্টা করে। তাঁদের অনেককে ধরে ফেলে এবং হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদারা। উত্তর নারীবাড়ির আরেকস্থানে একসাথে প্রায় ১৩-১৪ জনকে হত্যা করেছিল।[২৮]

সাবিত্রী হালদার জানান,

> পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এসেছে শুনে বলরাম ও শীতানাথ হালদার দুই ভাই বাড়ি থেকে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাঁরা শুনেছে যে, হিন্দুদের ধরে ধরে মেরে ফেলছে হানাদাররা। তাই পরিবারের সদস্যরা পারিবারিক বন্ধু মুসলিম দেসেদারের বাড়িতে লুকিয়েছিল। বলরাম হালদারও শীতানাথ হালদার পালাতে গেলে হানাদার বাহিনী তাঁদের ধরে ফেলে রাস্তায়। পাশের বাড়ি থেকে সুরেশ চন্দ্র মালাকার তাঁর পুত্র মানিক, বিষ্টপদ, যদুনাথ, দুখুরাম, দুলাল, গেদু, বাদল সহ প্রায় ১৩-১৪ জনকে একসাথে (বলরাম ও শীতানাথ সহ) লাইনে দাঁড় করে হত্যা করে। বাজার থেকে ফিরবার পথে নদরি ধারে গুলি করে হত্যা করে সুধীর চন্দ্র ও সুবোধ চন্দ্র হালদারকে।[২৯]

এছাড়া বিয়াঘাট ইউনিয়নে নন্দকুজা নদীর তীরে অবস্থিত বিয়াঘাট গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করে। মোস্তাজ বিহারীর নেতৃত্বে বদর খাঁ, মেকসেদ প্রমুখর সহযোগিতায় পাকিস্তানি বাহিনী ১৯ জুলাই সকালে বিয়াঘাটে আসে। গ্রামের নিরীহ মানুষদের যেখানে পেয়েছে সেখানে থেকে তুলে লাইন করে হত্যা করে। অজ্ঞাত দু'জন লোকও ছিল যাদের আগে হত্যা করে। এরপর সেই ৩৩টি লাশ তারা নৌকার মাঝিদের নির্দেশ দেয় নন্দকুজা নদীতে ফেলে দিতে।

বিয়াঘাট গণহত্যা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আক্কাছ আলী জানান,

> ১৫ই জুলাই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এ এলাকায় প্রবেশ করে। স্থানীয় রাজাকার বদর খাঁ, মোকসেদ প্রমুখ দালাল ও তৎকালীন গুরুদাসপুর থানার ওসির সাহায্যে তারা এ এলাকায় গণহত্যা চালায়। গ্রামের লোকজন অনেকেই পালিয়ে গিয়েছিল হানাদার বাহিনী আসছে শুনে। আক্কাছ আলীর ভাই আফাজ উদ্দিন পিতাসহ রয়ে গিয়েছিলেন গ্রামে। হানাদার বাহিনী এলে সাথে আর দুই তিন জন লোককে ধরে এনেছিল অন্য এলাকা থেকে। আফাজ উদ্দিন সহ বিয়াঘাট গ্রামের আরও ৩১ জনকে টেনে বের করে আনে বাড়ি থেকে নন্দকুজা নদীর ধারের। আক্কাছ আলী ও তাঁর পিতা লুকিয়ে ছিলেন জোলায়। কিন্তু দালালদের কয়েকজন তাঁদের দেখতে পেয়ে বের করে আনে। তাঁদের অজ্ঞান করে ফেলে রাখে। এরপর ধৃতদের লাইনে দাঁড় করে গুলি করে হত্যা করে (ছহির উদ্দিনের বাড়িতে) নন্দকুজা নদীতে ফেলে দেয়। আক্কাছ আলী সহ বেশ কয়েকজনকে হত্যার প্রমাণ হিসেবে রেখে দেবার কথা বলে তাদের ধরে নিয়ে যায় থানায়। সেখানে নির্যাতন করে দিন রাত্রি। এরপর নাটোর নিয়েও অত্যাচার করা হয় তাঁদের উপর।[৩০]

মোঃ মুজিবর রহমান জানান, বিয়াঘাটের রিয়াজ উদ্দিন মিলিটারি এসেছে বলে বাড়িতে জানিয়ে তিনি অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করতে যান। গিয়ে বন্ধু কায়েম উদ্দিনকে মিলিটারিরা ধরেছে দেখে বাঁচাতে যান। আর তখন উভয়কেই গুলি করে হত্যা করে সেখানে। বিয়াঘাটে মাটি কাটতে আসা আহমেদ আলী, আসকানকেও

প্রাণ দিতে হয় মিলিটারিদের হাতে। এরপরও বেশ কয়েকবার বিয়াঘাটে আক্রমণ ও হত্যাযজ্ঞ চালার হানাদাররা।

এরপর বেশ কয়েকজনকে ধরে নিয়ে গিয়ে তারা নির্যাতন করে। এরপর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৫ই জুলাই গুরুদাসপুরের কাশেম মাস্টার, জলিল হাজী, শাহজাহান বিশ্বাস, ফয়েজউদ্দিন বিশ্বাস, মোস্তাজ বিহারী প্রমুখের সহযোগিতায় ধারাবারিষা ইউনিয়নের পোয়ালশুড়া পাটপাড়ার কয়েকজন। ব্যক্তি যারা বাঁচার জন্য পালাচ্ছিলেন, তাদের লালপুর থানায় নীলকুঠিরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন করে গুলি করে হত্যা করে।[৩১] ধারাবারিষা ইউনিয়নের পোয়ালশুড়া পাটপাড়া নামক স্থানে ১৫ই জুলাই হানাদার বাহিনী স্থানীয় কাশেম মাস্টার, জলিল হাজী, মমতাজ বিহারী প্রমুখর পরামর্শে পাটপাড়া গ্রামে প্রবেশ করে।

নিখিল চন্দ্র সরকার বলেন,

> এ গ্রামের গোসাই পদ সরকার, বানেশ্বর, দীনেশ, তারাপদ একসাথে বাড়ি ফিরছিলেন। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের নিয়ে একসাথে অন্য কোথাও আশ্রয় নিবে বলে। কিন্তু পথে হানাদার বাহিনী ও দালালরা তাদের ধরে ফেলে। নিয়ে যায় লালপুর থানার নীলকুঠিতে। সেখানে তাঁদের হত্যা করে। পরে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়।
>
> এই গ্রামের মজের উদ্দিন প্রাং, আক্কাছ আলী ও নাছির উদ্দিন ধান ক্ষেতে ধান কাটছিল। মিলিটারি আসতে দেখে তাদের তাঁরা বিলের মাঝে লুকায়। কিন্তু পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁদের দেখে ফেলে এবং গুলি করে হত্যা করে। পরে তাঁদের পাটপাড়া কবরস্থানে কবরস্থ করা হয়।[৩২]

এছাড়া গুরুদাসপুর ও কাছিকাটা বাজারেও পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের সহযোগীরা হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। বিশ্বনাথ ধর সরকার জানান, গুরুদাসপুরের কাছিকাটা বাজার-এও লুটপাট ও হত্যাযজ্ঞ চালায় হানাদার বাহিনী। জুন মাসে অমর কুন্ডকে কাছিকাটা বাজার এ বেয়নেট চার্জ করে এবং পরে গুলি করে হত্যা করে। তাঁর ছেলেকেও অত্যাচার করে এখানে। এবাজারের বহু দোকান লুট করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল দালালরা।

গুরুদাসপুর বাজারেও লুটপাট করা হয়। এছাড়া খেয়াপার হতে গিয়ে বরিশালের মনীন্দ্রনাথ গায়ে গুলি লেগে মারা যায় গুরুদাসপুরে। তিনি বরিশাল থেকে এসেছিলেন গুরুদাসপুরে কর্মসূত্রে। এসময় নাটোর সদরের মোবারক হোসেনও খেয়াপারের সময় গুলি লেগে মারা যায়। মোবারক অন্যদের পাড় করতে সাহায্য করছিল বলে তাঁকে হত্যা করা হয়।[৩৩] অন্যদিকে চাপিলা ইউনিয়নে মহারাজপুর গ্রামেও আদিবাসিদের উপর অত্যাচার করে হানাদাররা। ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করে অনেককে। কেউ রাজি না হলে তাঁর উপর নেমে আসত নির্যাতন, হারাতে হত প্রাণ। এভাবেই যুদ্ধকালীন সময় গুরুদাসপুর উপজেলায় হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট চলতে থাকে। চাঁচকৈড় বাজারে ক্যাম্প স্থাপন করে সেখানেও হত্যাযজ্ঞ চালায় হানাদার দালালরা। নাটোর থেকে গুরুদাসপুরে আসা মুক্তিযোদ্ধা রেজা ও রঞ্জুকে এখানে ধরে এনে নির্যাতন ও পরে হত্যা করা হয়।

## নারী নির্যাতন

নারীদের নির্যাতনের বিষয়ে সামাজিকতার ভয়ে অনেকেই কিছু বলতে চান না। আর তাই এ উপজেলার নারী নির্যাতন বিষয়ে অল্প কিছু তথ্যই পাওয়া যায়। উষা রানীর বাড়ি গুরুদাসপুর উপজেলার উত্তর নারীবাড়ি গ্রামে। এপ্রিল মাসের ১৯ তারিখ, বৈশাখ মাসের ৩ তারিখে  পাকিস্তানি সেনাবাহিনী স্থানীয় রাজাকার আলবদর বাহিনী উত্তর নারীবাড়ি আক্রমণ করে এবং উষা রাণীকে ধরে কয়েকজন পাকিস্তানি ধর্ষণ

করে। এরপর তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে। উল্লেখ্য, এসময় উত্তর নারী বাড়ির বহু মানুষকে হত্যা করা হয়।[৩৪]

## গুরুদাসপুর উপজেলায় গণহত্যা ও নির্যাতন

গুরুদাসপুর উপজেলার নির্যাতন ও ৮ টি গণহত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

### বিয়াঘাট গণহত্যা

গুরুদাসপুর উপজেলার বিয়াঘাট ইউনিয়নে ১৫ই জুলাই প্রথম গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। এরপর ১১ই মে এবং আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময়েও বেশ কয়েকবার আক্রমণ করে। এ ইউনিয়নের পাশ দিয়ে নন্দকুজা নদী বয়ে গেছে। ফলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিভিন্ন সময়ে বহু মানুষকে হত্যা করে এই নদীতে ভাসিয়ে দিত বলে জানা যায়। ফলে এখানে কোন গণকবর বা বধ্যভূমি নেই। এ ইউনিয়নে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে গেছে বা মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে, মূলত এ ধরনের সন্দেহেই হত্যাযজ্ঞ চালানো হত। এছাড়া হাটের দিন চাঁদাবাজি, বা খেয়াপারাপারের ক্ষেত্রে চাঁদা নিত রাজাকার, আলবদর, শান্তি কমিটির লোকেরা। কোন ব্যবসায়ী দিতে না চাইলে তাঁদের উপর নেমে আসত অত্যাচার। এছাড়া হাট-এ বাজার করতে আসাটাও নিরাপদ ছিল না লুট-পাটের ভয়ে। এপ্রিলে নাটোরে হানাদার বাহিনী প্রবেশ করলে বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল বিয়াঘাটে। তাঁদেরকে ভারতের দালাল সন্দেহে জোরপূর্বক ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাঁদের পরিণতি কী হয়েছিল সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ধারণা করা হয়, তাঁদেরকেও হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল।[৩৫] বদর খাঁ, মোস্তাজ, মোকসেদ প্রমুখ বিহারী ও বাঙালি দালালদের সাহায্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী প্রবেশ করেছিল এ এলাকায়। এখানে প্রায় ৫৭ জনকে হত্যার কথা জানা যায়। তবে হত্যা করে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হত বলে সঠিক সংখ্যা বলা সম্ভব নয়। তবে ৫৭ জনকে যে অবশ্যই হত্যা করা হয়, তা সাক্ষাৎকার থেকে জানা যায়।

১৫ই জুলাই ১৯৭১, হানাদার বাহিনী দুপুর ১২টার দিকে আক্রমণ করে বিয়াঘাটে। নন্দকুজা নদীর অপর পাড়ে মিলিটারি এসেছে শুনে গ্রামের অনেকেই পালিয়েছে বিভিন্ন স্থানে। অনেকেই কোন না কোন কারণে থেকে গেছে। যাঁরা আশে পাশের ঝোপ-ঝাড় জঙ্গলে লুকিয়েছে তাদের অনেককেই হত্যা করেছে খুঁজে বের করে। বিয়াঘাট গ্রামের ছহির উদ্দিনকে ধরে এবং তাঁর ছোট ছেলে আফাজ উদ্দিন সহ আরও ৩০ জনকে পাশের বাড়িগুলো থেকে তুলে এনেছিল। এদের মধ্যে মাটি কাটতে আসা (অন্য গ্রাম থেকে) আসকান, আহম্মেদ আলীকেও লাইনে এনে দাঁড় করায়। মিলিটারিরা পূর্বেই তাঁদের সাথে আরও দু'জনকে ধরে এনেছিল, তাঁদের একজন হলেন কার্তিক। নন্দকুজা নদীর অপর পাড় থেকে এনেছিল তাদের। জহির উদ্দিনকে অজ্ঞান করে ফেলে দেয় মাটিতে। পরে ৩৩জনকে একত্রে এই বাড়িতেই লাইন করে গুলি করে হত্যা করে। এরপর লাশগুলো নন্দকুজা নদীতে ভাসিয়ে দেয় তাঁরা।

আফাজ উদ্দিনের বড় ভাইকে (আক্কাছ আলী) ধরে নিয়ে যায় গুরুদাসপুর থানায়। সেখানে তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন করা হয়। তাঁকে তারা জিজ্ঞেস করে, "মুক্তিবাহিনী কাহা, আপ জানতা হ্যায়, আপকা ভাই মুক্তি বাহিনী হ্যায়, ওসসে আপকা লিংক হ্যায়"-এই বলে নির্যাতন করতে থাকে। এরপর নাটোর থানায় নিয়েও নির্যাতন করে। পরে তিনি পালিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। বিয়াঘাট গ্রামের রিয়াজ উদ্দিন ধান কাটছিলেন। মিলিটারি এসেছে শুনে বাড়িতে সবাইকে সাবধান করে তিনি এলাকার অবস্থা দেখতে যান। পথে দেখেন বন্ধু কায়েম উদ্দিনকে হানাদাররা ধরেছে। কায়েমকে ছেড়ে দেয়ার অনুরোধ করলেও ছাড়েনি ঘাতকরা। উপরন্তু

দু'জনকেই হত্যা করে। নিজের পরিবারকে পালাতে বলে নিজে অন্য রাস্তা ধরে পালিয়ে যাচ্ছিলেন হাকিম উদ্দিন। কিন্তু রাস্তায় তিনিও ধরা পড়েন ও শহীদ হন হানাদারদের হাতে।

এছাড়া আরও ২৪ জনকেও হত্যা করে হানাদার বাহিনী। আরও কত নাম না জানা লোকদের এই নন্দকুজা নদীতে হত্যা করে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে। ঐ রকম পরিস্থিতিতে তার হিসাব রাখা কষ্টকর ছিল।

### পোঁয়ালশুড়া পাটপাড়া গণহত্যা

ধারাবারিষা ইউনিয়নের পশ্চিম দিকে অবস্থিত পোয়ালশুড়া পাটপাড়া গ্রাম। ১৫ই জুলাই ১৯৭১ কৃষকরা ধান কাটছিলেন। সকাল ১১ টার সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে গ্রামটি। মাঠে কর্মরত অবস্থায় মজের উদ্দিন, আব্বাস আলী ও নাছির উদ্দিন পরিস্থিতি বুঝতে পেরে নিকটবর্তী একটি বিলে গিয়ে লুকায়। হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা দেখতে পেয়ে তাঁদের সেখান থেকে বের করে আনে এবং গুলি করে হত্যা করে। একই গ্রামের গোসাইপদ সরকার, বানেশ্বর, দীনেশ ও তারাপদ একসাথে বাড়ি যাচ্ছিলেন পরিবারের সবাইকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাবে। পথে তাঁরা ধরা পড়েন এবং তাঁদের লালপুরে নীলকুঠিতে হত্যা করা হয়।

### উত্তর নারিবাড়ী গণহত্যা

গুরুদাসপুর পৌরসভার ১নং ওয়ার্ডে নারীবাড়ী অবস্থিত। ১৭ই এপ্রিল ওয়াজেদ ডাক্তারের ছেলে তারার (গুরুদাসপুর) সহযোগিতায় আব্দুল জলিল, চাঁচকৈড় উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আবুল কাশেম মোল্লা, ইয়ার উদ্দিন, মোস্তাজ বিহারী প্রমুখর পরামর্শে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী উত্তর নারিবাড়ী আক্রমণ করে। এই এলাকাটি হিন্দু অধ্যুষিত ছিল বহু পূর্ব থেকেই এবং ব্যবসা বাণিজ্যেও তাঁরা ভূমিকা রাখত।[৩৬] ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হলে অনেকেই বিভিন্ন এলাকায় বা ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্য ও নাড়ীর টানে অনেকেই থেকে গিয়েছে এখানেই। ৩রা বৈশাখ, ১৭ই এপ্রিল দুপুর ১২টার দিকে হানাদার বাহিনী নিয়ে উত্তর নারিবাড়ী আক্রমণ করে দালাল-রাজাকাররা।

প্রথমেই তারা আক্রমণ করে মনীন্দ্রনাথের বাড়িতে। মনীন্দ্রনাথ তখন দুপুরের খাবার খেতে রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছিলেন। আর তাঁর ছেলে নীল রতন সরকার প্রতিবেশী নবরাম, কালাম, গোপীনাথ, দীলিপ কুমার সহ নিয়ে তাস খেলছিলেন। হানাদাররা প্রথমেই মনীন্দ্রনাথ কে ধরে ফেলে। নীলরতন বাবার চিৎকার শুনতে পেরে তাস খেলা ফেলে বাহির ঘর থেকে বাড়ির ভেতরে আসেন। পিতাকে ছেড়ে দিতে বললে ঘাতকরা নীলরতন ও তাঁর বাবাকে সাথে সাথে গুলি করে হত্যা করে। তাঁদের হত্যার পর বাহির ঘরে থাকা নবরাম, দীলিপ সহ আরও কয়েকজন পালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু তখন হানাদাররা গুলি ছুঁড়লে নবরাম ও দীলিপ ঘটনাস্থলেই মারা যান।

এরপর হানাদাররা আশে পাশের বাড়িগুলো থেকে সকল পুরুষকে একে একে বাইরে বের করে আনে এই বলে যে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তারা উত্তর নারিবাড়ীর ব্যবসায়ী শীতানাথকে ধরে বাইরে নিয়ে আসে। বড় ভাই বলরাম জানতে পেরে ভাইকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে। উল্লেখ্য, শীতানাথ ও বলরাম শুনেছিল যে হানাদার বাহিনী নন্দকুজা নদী পার হয়েছে। তাঁরা পালিয়ে যেতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু তার আগেই ধরা পড়েন পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে। তাঁদের দাড় করিয়ে রেখে পাশের বাড়ি গুলো থেকে একে একে সুরেশ চন্দ্র মালাকার, তাঁর পুত্র মানিক মালাকার, দই ব্যবসায়ী বিষ্টপদ ঘোষ, যদুনাথ কর্মকার, দুখুরাম,

দুলাল, গেদু, বাদল সহ আরও কয়েকজনকে ধরে নিয়ে আসে। প্রায় ১৪-১৭ জনকে এক লাইনে দাড় করে হত্যা করা হয়। বাজার থেকে ফিরবার পথে সুবোধ চন্দ্রকেও গুলি করে হত্যা করা হয়। এসময় উষারানী নামক একজন মহিলাকে হানাদার বাহিনীর কয়েকজন সদস্য ধর্ষণ করে ফেলে রেখে যায় সংজ্ঞাহীন অবস্থায়।[৩৭]

এরপর বাড়িগুলোতে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে ঘাতক দালালরা। শহীদদের কবরের স্মৃতিফলক, সাক্ষাৎকার সুজিত সরকারের বই ও নাটোর মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শহীদদের নাম জানা যায়। এছাড়া দৈনিক সংবাদ-এর নাটোর জেলা প্রতিনিধি স্বপন দাসের ১৯শে ডিসেম্বর ১৯৯৭ তারিখ সংখ্যায় *'মুক্তিযুদ্ধে নাটোর'*লেখা থেকেও উত্তর নারিবাড়ী গণহত্যা সম্পর্কে জানা যায়। শহীদদের মধ্যে রয়েছেন- দিলীপ কুমার সরকার, ডা. মনীন্দ্রনাথ মালাকার, নীলরতন সরকার, নবরাম মজুমদার, সুরেশচন্দ্র মালাকার, মানিকচন্দ্র মালাকার প্রমুখ। উত্তর নারিবাড়ী গণহত্যায় শহীদদের ৩টি স্থানে কবরস্থ করা হয়। এ স্থানে সতেরো জনকে কবরস্থ করা হয়। আরেক স্থানে নয় জন এবং একটু ভেতরে শীতানাথ হালদারসহ এগারো জনকে কবর দেয়া হয়।[৩৮]

**গুরুদাসপুর বাজার গণহত্যা**

খেয়াপাড়াপারের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গুলি ছোঁড়ে দালালদের নির্দেশ। স্থানীয় জনগণ গুরুদাসপুরের নন্দকুজা নদীতে খেয়া দিয়ে এপার থেকে ওপারে যেত। বরিশাল থেকে কর্মসূত্রে আসা মনীন্দ্রনাথ ও নাটোর কলেজের ছাত্র মোবারক হোসেন এসময় গুলিবিদ্ধ হন। উল্লেখ্য, মনীন্দ্রনাথ গুরুদাসপুর হাইস্কুলের শিক্ষক ছিলেন এবং মোবারক সেদিন খেয়াপারা পারে সাহায্য করছিল বহু মানুষকে। আর একারণেই মূলত দালাল ও হানাদাররা ক্ষুব্ধ ছিল তাঁদের উপর। মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের গুলি করে হত্যা করে তাঁরা। মোবারক এই বিপদের দিনে সকলকে পালিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে সাহায্য করতে চেয়েছিল, আর তাঁর নিজের জীবন দিয়ে সেই চেষ্টা সে করেছে। নৌকায় থাকা মানুষগুলো কোনক্রমে সাঁতরে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করলো। হানাদার বাহিনীর গুলি তাঁদের শরীরেও লেগেছিল কিনা তা ঐ পরিস্থিতিতে খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব ছিল না। আসলে ঐ পরিস্থিতিতে কে বাঁচল আর কে মারাগেল তা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব ছিল না।[৩৯]

গুরুদাসপুর বাজারের দিকে যাওয়ার পথে হানাদার বাহিনী এ গণহত্যা দুটি সম্পাদন করে। গুরুদাসপুর বাজার দখল করে সেখানে দোকান-পাট লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করে। সাধারণ মানুষের উপর শারীরিক অত্যাচার এর পাশাপাশি তাঁদের না খাইয়ে মারার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ছিল তখন হানাদার বাহিনী ও দালালদের। গিরিশবাদের ৭ বছরের ছেলের শরীরে ঐসময় গুলি লেগেছিল বলে জানা যায়। ঐ উত্তর নারিবাড়ী ১৭ই এপ্রিল একটি মৃত্যু পুরীতে পরিণত হয়েছিল মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই। আর বাড়িঘরগুলো ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। যাঁরা বেঁচেছিল, তারা পালিয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন পরে এসে শহীদদের কবরস্থ করে।

**কাছিকাটা বাজার গণহত্যা**

গুরুদাসপুরের কাছিকাটা বাজার হত্যা ও লুটপাটে নেতৃত্ব দেয় মোন্তাজ বিহারী। কাছিকাটা বাজারে অবস্থিত কালিমন্দিরের মধ্যে অমরচন্দ্র কুন্ডু নামক এক ব্যবসায়ীকে হত্যা করে ২৩শে মে প্রায় ৫০-৬০জন লোক অস্ত্র নিয়ে হাজির হয় কাছিকাটা বাজারে। তখন জীবন রক্ষার্থে সকলেই ছুটেছেন বিভিন্ন দিকে। যেহেতু

সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর গুরুদাসপুর উপজেলায় বেশি নির্যাতন হচ্ছিল, সেই সূত্র ধরেই অমরচন্দ্রের উপর ঘাতকদের দৃষ্টি পড়ে। অমর চন্দ্র বড় ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের লোক ছিলেন। বৃদ্ধ মা সহ পরিবারের সবাই লুকিয়েছিল বিভিন্ন স্থানে। অমরচন্দ্র নিজেও আশ্রয় নিয়েছিলেন এক মুসলিম পরিবারে। তার ছেলে অর্দ্ধেন্দুকুমারও আশ্রয় নিয়েছিল এক মুসলিম পরিবারে। অর্দ্ধেন্দুকুমার পরিবারের সকলের কথা মনে করে ঐ বাড়ি থেকে বের হওয়া মাত্র হানাদাররা তাঁকে ধরে ফেলে। তারপর, তাঁর উপর চলে নির্যাতন। মন্দির প্রাঙ্গণে ফেলে দেয় তাঁকে। মূর্তি ভাঙ্গচুর করে। তাঁকে বেয়নেই চার্জ করতে গিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় পরে হত্যা করা হবে। মন্দির থেকে টানতে টানতে এক ঔষুধের দোকানের কাছে পাহারায় রাখে। অর্দ্ধেন্দুকুমারকে ধরার পর রটে যায় যে, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। পাহারাদার বছির উদ্দিন অর্দ্ধেন্দুর হাতের বাঁধন আলগা করে দিলে সে পালিয়ে যায়। অর্দ্ধেন্দু বাজারে পশ্চিম দিকে এক গোরস্থানে দৌড়াতে দৌড়াতে অজ্ঞান হয়ে এক কবরের উপর পড়ে যায়। ফলে হানাদাররা তাঁকে আর খুঁজে পায় না। ফলে হানাদাররা এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে। অর্দ্ধেন্দুর বাবা অমরচন্দ্র পুত্র অর্দ্ধেন্দু মারা গেছে শুনতে পারে লোকমুখে। মৃত ছেলের কাছে যাওয়ার জন্য বাজারে আসেন। তখন অমর চন্দ্রকে ধরে ফেলে ঘাতকরা ও কালিমন্দিরে নিয়ে যায়। তার উপর বেয়োনেট চার্জ করা হয়। এরপর তিনি জ্ঞান হারালে তাঁর উপর উপর্যুপরি বেয়োনেট চার্জ করা হয়। ফলে তিনি মারা যান সেই মন্দিরের ভেতর। এরপর সব দোকান লুট-পাট করে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। অমরচন্দ্রের মৃত্যুর পর কাছিকাটা বাজারে আর কাউকে প্রাণ দিতে হয়নি বলে জানা যায়।[৪০]

**চাঁচকৈড় বাজার ক্যাম্প গণহত্যা**

গুরুদাসপুর উপজেলার চাঁচকৈড় বাজারে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। দিনের পর দিন তারা বহু মানুষকে ধরে এনে এখানে হত্যা করেছে ১৯৭১ সালে। এখানে গণহত্যায় যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের কয়েকজন সর্ম্পকে জানা গিয়েছে। নিচে সে সর্ম্পকে বর্ণনা করা হলো :

**রেজা-রঞ্জু গণহত্যা**

১৯৭১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে গুরুদাসপুর উপজেলার মশিন্দা গ্রামে রাত্রিযাপন কালে রাজাকার আলবদর বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন নাটোর শহরের মুক্তিযোদ্ধা শহীদ মজিবুর রহমান (রেজা) ও শহীদ গোলাম রব্বানী রঞ্জু। ১লা সেপ্টেম্বর তাঁদের চাঁচকৈড় রাজাকার ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়।

জুলাই মাসের শেষের দিকে মুক্তিযোদ্ধা মহসিন আলীর সাথে গুরুদাসপুর উপজেলায় দালাল রাজাকার ক্যাম্পে আক্রমণের জন্য মজিবুর রহমান (রেজা) ও গোলাম রব্বানী রঞ্জু আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন মশিন্দা ইউনিয়নের মাঝপাড়া গ্রামে। গ্রামের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ডা. নওশের আলীর বাড়িতে রেখে মহসিন আর কয়েক জনকে অন্যত্র পাঠিয়ে নিজে শিকারপুর ফুপুর বাড়িতে বেশ রাত করে গিয়ে ওঠেন। মহসিন ছিলেন গুরুদাসপুরে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক। তাই তাঁকে ধরার জন্য দালাল-রাজাকাররা এমনিতেই সুযোগ খুঁজছিল। শিকারপুরে থাকাকালীন রাতে পরের দিনের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করার সময় প্রতিবেশী চান্দু মোল্লা (মুসলিম লীগ সদস্য) কথাগুলো শুনে ফেলেন। এরপর চান্দু মোল্লা গুরুদাসপুরের কনভেনশন মুসলিম লীগের নেতা ডা. আমির হোসেনকে গিয়ে খবর পৌঁছে দেয়। রাজাকার আলবদর ক্যাম্পেও খবর পৌঁছে যায়। রাতের অন্ধকারেই রাজাকার-আলবদর আক্রমণ করেডা. নওশের আলীর বাড়ি। রেজা-রঞ্জুকে আত্মসমর্পণ করতে বলে ঘাতকরা। উল্লেখ্য, রেজা ও রঞ্জু তাঁদের অস্ত্র জমা রেখেছিলেন ডা. নওশেরের কাছে। তাই

তাঁদের পক্ষে যুদ্ধ করা বা প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। নওশের আলীকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখায় রাজাকাররা। ফলে নওশের আলী রেজা-রঞ্জুকে অনুরোধ করেন আত্মসমর্পণ করতে। রেজা-রঞ্জু বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। এরপর তাঁদেরকে ধরে নিয়ে যায় চাঁচকৈড় বাজারস্থ ক্যাম্পে। সেখানে তাঁদের উপর অমানবিকভাবে নির্যাতন করা হয়। ফলে এক পর্যায়ে অধিক রক্তপাতে তাঁদের মৃত্যু ঘটে ১লা সেপ্টেম্বর। তাঁদের নাটোর সদরে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেয় পাকিস্তানিরা। কিন্তু রাজাকাররা তাঁদের লাশ ক্যাম্পের একটি ঘরে গলায় দড়ি লাগিয়ে ঝুলিয়ে রাখে এবং প্রচার করে যে তাঁরা আত্মহত্যা করেছে বলে জীবন্ত পাঠানো গেলো না। নিজেদের কাছে অস্ত্র থাকলে হয়ত তাঁরা আত্মরক্ষা করতে পারতেন। মহসিন আলীও রাজাকারদের হাতে ধরা পড়েন এবং কয়েকদিন ধরে তাঁকে চাঁচকৈড় রাজাকার ক্যাম্পে নির্যাতন করে করা হয়। ১৪ দিন অত্যাচার নির্যাতনের পর তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটলে তাঁকে অর্ধমৃত অবস্থায় ছেড়ে দেয়া হয়।[৪১]

**রেকাতুল্লাহ ও আব্দুস সাত্তার গণহত্যা**

গুরুদাসপুরের বিলসা গ্রামের রেকাতুল্লাহ ও আব্দুস সাত্তার স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে ছিলেন। তাঁরা ভারত থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে আসেন ও বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেন। অপারেশনের উদ্দেশ্যে গুরুদাসপুরের মশিন্দা ইউনিয়নে নাজিমউদ্দিনের বাড়ি আশ্রয় নেন তাঁরা। ইতোমধ্যে রাজাকাররা তাঁদের খোঁজ পেয়ে আক্রমণ করে। শত্রুপক্ষ বেশি সংখ্যায় হওয়ায় তাঁরা একপর্যায়ে ধরা পড়েন। এরপর তাঁদের পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয় রাজাকাররা (চাঁচকৈড় বাজারে)। ১৫ই সেপ্টেম্বর তাঁদের নন্দকুজা নদীর ধারে হাত-চোখ বাঁধা অবস্থায় গুলি করে হত্যা করে পাকিস্তানিরা।[৪২]

**লুৎফর রহমান হত্যা**

নাজিরপুর হাইস্কুলের হেডমাস্টার লুৎফুর রহমান ছিলেন আওয়ামী সমর্থক। শান্তি বাহিনীর নাসিরুদ্দিন, পাটুল, আব্দুল ওহাব বিএসসি, ময়েন মাস্টার, আসাদ প্রমুখ তাঁকে বলে, সে যেন আওয়ামী লীগ না করে। কিন্তু তিনি রাজি না হওয়ায় তাকে ধরে নিয়ে যায় হানাদাররা। রাজাকার আলবদর বাহিনীর সদস্য এহসান, আব্দুস সাত্তার, আবু দাউদ, ওছির উদ্দিন, আব্দুল্লাহ, তাহের প্রমুখরা তাঁকে ধরে নিয়ে নাজিরপুর ক্যাম্পে পাকিস্তানিবাহিনীর হাতে ধরিয়ে দেয়। পরে তাঁকে নাটোর ফুলবাগানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

**আব্দুল খালেক হত্যা**

চাঁচকৈড় উচ্চবিদ্যালয়ের সাধারণ সম্পাদক উত্তর নাড়ীবাড়ির বাসিন্দা সাইফুল ইসলামের ছোট ভাই আব্দুল খালেককে ১৯জুনহত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী। মুক্তিযোদ্ধা সাইফুল কোথায় ও তাঁকেআত্মসমর্পণের জন্য তার পরিবারকে রাজাকার আবু দাউদ, আমজাদ হোসেন, নেফাজ, কালাম, মোকা বিশ্বাস, শাহজাহান বিশ্বাস, আলহাজ্ব জীলল, আবুল কাশেম মোল্লা প্রমুখ ঘাতক দালালেরা চাপ দিতে থাকে। পরে মুক্তিযোদ্ধা সাইফুলকে না পেয়ে আব্দুল খালেককে ধরে নিয়ে যায়ও হত্যা করে পাকিস্তানিরা।

**জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ**

গুরুদাসপুর উপজেলার বিয়াঘাট ইউনিয়নের যোগেন্দ্রনগর গ্রামের বৃদ্ধ সুরেন্দ্রনাথকে ধর্মান্তরের চেষ্টা করে জ্ঞানদানগর গ্রামের বাসিন্দা। যোগেন্দ্রনগর মসজিদের ইমাম মতিউর রহমান। সুরেন্দ্রনাথ রাজি না হলে

তাকে অত্যাচারও করে। একপর্যায়ে হত্যা করতে উদ্যত হলে গ্রামের রোয়াজ উল্লাহ ও সাদেক আলী বাধা দেয়। তবে হিন্দু বাড়িঘর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ অব্যাহত ছিল।[৪৩]

### গুরুদাসপুর উপজেলায় বধ্যভূমি ও গণকবর

১৯৭১ সালে গুরুদাসপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা গণহত্যার মাধ্যমে বহু নিরীহ মানুষকে হত্যা করে। এসব লাশ তারা কখনও রাস্তায়, গর্তে প্রভৃতি স্থানে ফেলেছে। অনেক লাশ স্থানীয়রা কবরস্থ করেছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চলে যাওয়ার পর। ফলে এই উপজেলায়ও রয়েছে গণকবর ও বধ্যভুমি। সেগুলোর বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো :

#### উত্তর নারীবাড়ি গণকবর

এখানে ৩টি স্থানে কবর দেয়া হয়েছে। একটিতে ১৭জন, আরেক স্থানে ৯ জন এবং একটু ভেতরে ১১জনকে কবর দেয়া হয়েছে। মূলত ৩৭ জনকে লাইনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করা হলে, অনেকের আত্মীয় স্বজন তাদের নিজের বাড়ির কাছে একত্রে কবরস্থ করেছে।

#### বিয়াঘাট গণকবর

বিয়াঘাট কোন গণকবর নেই। কারণ এখানে হত্যা করে ৩৩ জনকে নন্দকুজা নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছিল। তবে নদীর কাছে অবস্থিত বিয়াঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি স্মৃতি স্মারক নির্মিত হয়েছে স্মৃতি রক্ষার্থে।

#### পোয়ালশুড়া পাটপাড়া গণকবর

গুরুদাসপুর উপজেলার পোয়ালশুড়া পাটপাড়া গ্রামে মাঠে কর্মরত তিনজন কৃষক মজের উদ্দিন, আক্কাস আলী ও নাছির উদ্দিনকে হানাদার বাহিনী গুলি করে হত্যা করলে পাটপাড়া গোরস্থানে তাদের কবরস্থ করা হয়। সেখানে কোন স্মৃতিসৌধ বা সমাধি সৌধ নেই।শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি স্মৃতি স্মারক রয়েছে।

### গুরুদাসপুরে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও স্মারক

গুরুদাসপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস রেখে ও শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে বিভিন্ন কাঠামো গড়ে উঠেছে। সেগুলোর বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

#### শহীদ মোবারক স্মরণী সড়ক

এটি গুরুদাসপুর বাজারে অবস্থিত। নন্দকুজা নদী পার হওয়ার সময় গুরুদাসপুর হাইস্কুলের শ্রদ্ধেয় গুরুদাসপুর হাইস্কুলের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক পন্ডিত মশায় নিহত হন। লোকজনকে পারাপারে সহায়তা করার সময় গুলিতে শহীদ হন খ্যাতিমান ছাত্র নেতা মোবারক হোসেন। তার স্মৃতিরক্ষার্থে এটি নির্মিত হয়েছে।

#### মুক্তিযোদ্ধা ডক্টর মহসিন আলী কলেজ

গুরুদাসপুরে অবস্থিত এ কলেজটি মুক্তিযোদ্ধা ড. মহসিন আলীর নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

#### বিলচলন শহীদ শামসুজ্জোহা কলেজ

এটি গুরুদাসপুর উপজেলার বিলচলনে অবস্থিত। ১৯৭২ সালে এটি নির্মিত হয়েছে। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ ড: শামসুজ্জোহার নামে এটি নির্মিত হয়েছে।

**শহীদ মতিউর রহমান ছাত্রাবাস**

ছাত্র নেতা মতিউর রহমান শহীদ হলে তার নামে ছাত্রাবাস করা হয়।

**বিয়াঘাট উচ্চবিদ্যালয় স্মৃতিস্তম্ভ**

বিয়াঘাট গণহত্যার স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত স্মৃতিস্তম্ভ।বিয়াঘাটে নন্দকুজা নদীর তীরে যাঁদের হত্যা করেছিল হানাদার বাহিনী, তাঁদের স্মৃতি রক্ষার্থে বিয়াঘাট উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে।

**নারীবাড়ি স্মৃতিস্তম্ভ সমূহ**

উত্তর নারিবাড়ী গণহত্যায় শহীদদের ৩টি স্থানে কবরস্থ করা হয়। নারিবাড়ীতে মোট তিনটি স্মারকস্তম্ভ নির্মিত হয়েছে শহীদদের সন্তান ও স্বজনদের উদ্যোগে। তার একটিতে কয়েকজন শহীদদের নামসহ লেখা রয়েছে :

> মাতৃভূমির শৃঙ্খল মোচন পর্বে রক্তাক্ত '৭১ এর ১৭ই এপ্রিল বীর সন্তান দিলীপ কুমার সরকার, ডা. মনীন্দ্রনাথ মালাকার, নীলরতন সরকার, নবরাম মজুমদার, সুরেশচন্দ্র মালাকার, মানিকচন্দ্র মালাকার ও আরো অনেকের বুকের চাপ  চাপ রক্তে বাঙলা মায়ের সবুজ আঁচল লালে লালে হয়ে উঠেছিলো যারা-
>
> বুকের তাজা রক্ত দিয়ে আত্মাকে সঁপে শপথের কোলাহলে রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনলো ফুটন্ডত সকাল তাদেরই তমর স্মৃতি অর্পণে- আমরা তাঁদের উত্তরসুরীরা বাংলাদেশ।[৪৪]

**পোয়ালশুড়া পাটপাড়া স্মৃতিস্তম্ভ**

পোয়ালশুড়া গ্রামের ৭ জনকে নাটোর লালপুর উপজেলায় হত্যা করা হলে পারিবারিক উদ্যোগে তাদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত হয় স্মৃতিস্তম্ভটি।

১৯৭১ সালে গুরুদাসপুর উপজেলা ছিল স্বাধীনতা তথা মুক্তি সংগ্রামে এক উত্তালময় এলাকা। মুক্তিকামী জনতা সর্বতোভাবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ৭ই মার্চের ভাষণকে অন্তরে গেঁথে নিয়ে পথে নেমেছিল সেই দিনগুলোতে। বাঙ্গালীর মুক্তিকে অর্জন করার জন্য মিছিল মিটিং, সভা-সমাবেশ থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে নিজেদের জীবন বিলিয়ে দিতেও সদা প্রস্তুত ছিল এ অঞ্চলের মানুষ। এ অঞ্চলে রাজাকার আলবদর আলশামস বাহিনী অত্যাচার, নির্যাতন, হত্যা, লুটপাট, হত্যা প্রতিটি কর্মকান্ডে হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করেছে। মুক্তিযোদ্ধা মোঃ আবু তালেব জানান, গুরুদাসপুর উপজেলার মহারাজপুর গ্রামে ছিল সবচেয়ে বেশি রাজাকার। এ গ্রামের প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষ ছিল রাজাকার। তারপরও এই গ্রামে বাকী এক শতাংশ মানুষ যোগ দিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে।[৪৫] ১৯৭১ সালে গুরুদাসপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগী হিসেবে যেসব রাজাকাররা কাজ করেন, তাদের অধিকাংশ-এর সম্পর্কে সুজিত সরকারের *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থে আমরা পাই। এখানে শান্তিকমিটির ২৩ জন ও রাজাকার আলবদরদের ২৬ জন এর তালিকা রয়েছে।

গুরুদাসপুরে উপজেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এপ্রিল মাসের ১৯ তারিখের দিকে প্রবেশ করে রাজাকার-আলবদর প্রভৃতি দালালদের সহযোগিতায়। তারপরই শুরু হয় মুক্তিকামী বাঙালিদের হত্যা-নির্যাতন হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের উপর নারকীয় নির্যাতন নেমে আসে। ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা হয় আদিবাসী জনগণ ও হিন্দুদের। অধ্যাপক সুজিত সরকার *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থে গুরুদাসপুর গণহত্যার কথা উল্লেখ করেছেন। অন্য কোন গ্রন্থে এ উপজেলার গণহত্যা সম্পর্কে জানা যায় না। নাটোর জেলার স্থানীয়

স্মরণিকাগুলোতে আংশিক তথ্য জানা যায় এখানকার গণহত্যা সম্পর্কে। ১৫ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী জনতার প্রচেষ্টায় এ উপজেলা হানাদার মুক্ত হয়। পরদিন সকলে বিজয়ের আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে এ উপজেলার মানুষ। ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্থানে থাকা মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধারা একত্র হতে থাকে ১৬ই ডিসেম্বর।

১৯৭১ সালে ১৬ই ডিসেম্বর মহান বিজয় অর্জিত হলে স্বাধীন দেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠে এ এলাকার জনগণ। বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে গুরুদাসপুর থানা ক্যাম্পে মুক্তি বাহিনী বিজয়ের গৌরব নিয়ে ফিরে আসে। এরপর নাটোর সদরে সকলে ২১শে ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিল। অপরিসীম ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে গুরুদাসপুর উপজেলার জনগণ তাদের স্বাধীনতা অর্জন করেছিল।

তথ্য নির্দেশ

[১] স্মরণিকা, *স্বাধীনতা রজত জয়ন্তী ১৯৯৮*, নাটোর জেলা প্রশাসন, পৃ. ১১

[২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[৩] সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া- তৃতীয় খন্ড*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১, পৃ. ৬৮-৭০

[৪] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পৃ. ১৫৬

[৫] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৬৮-৭০*

[৬] জেলা বাতায়ন (http://gurudaspur.natore.gov.bd)

[৭] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৬৮-৭০*

[৮] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[৯] জেলা বাতায়ন (http://biaghatup.natore.gov.bd)

[১০] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৬৮-৭০*

[১১] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত,

[১২] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৬৮-৭০*

[১৩] জেলা বাতায়ন (http://biaghatup.natore.gov.bd)

[১৪] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত,

[১৫] জেলা বাতায়ন (http://biaghatup.natore.gov.bd)

[১৬] জেলা বাতায়ন (http://dharabarishaup.natore.gov.bd)

[১৭] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত,

[১৮] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৬৮-৭০*

[১৯] জেলা বাতায়ন (http://dharabarishaup.natore.gov.bd)

[২০] জেলা বাতায়ন (http://dharabarishaup.natore.gov.bd)

[২১] জেলা বাতায়ন (http://mashindaup.natore.gov.bd)

[২২] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ৬৮-৭০*

[২৩] জেলা বাতায়ন (http://mashindaup.natore.gov.bd)

[২৪] জেলা বাতায়ন (http://mashindaup.natore.gov.bd)

[২৫] সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯,পৃ. ১৩৬

[২৬] স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

[২৭] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪-২১৭

[২৮] বিমল চন্দ্র হালদার (৭৫), পিতাঃ রঘুনাথ চন্দ্র হালদার, গ্রামঃ উত্তর নারিবাড়ী, গুরুদাসপুর পৌরসভা, উপজেলাঃ গুরুদাসপুর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি, ২৩ জুলাই ২০১৫

[২৯] সাবিত্রী সরকার (৭০), স্বামীঃ শহীদ শীতানাথ সরকার, গ্রামঃ উত্তর নারিবাড়ী, গুরুদাসপুর পৌরসভা, উপজেলাঃ গুরুদাসপুর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি, ২৩ জুলাই ২০১৫

[৩০] আক্কাছ আলী (৭৫), পিতাঃ শহীদ ছহির উদ্দিন পরমানিক, গ্রামঃ বিয়াঘাট, ইউনিয়নঃ বিয়াঘাট, উপজেলাঃ গুরুদাসপুর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ বিয়াঘাট উচ্চ বিদ্যালয়, ২৩ জুলাই, ২০১৫

[৩১] মোঃ মুজিবর রহমান (৪৫), পিতাঃ শহীদ রিয়াজ উদ্দিন মুন্সী, গ্রামঃ বিয়াঘাট, ইউনিয়নঃ বিয়াঘাট, উপজেলাঃ গুরুদাসপুর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ বিয়াঘাট উচ্চ বিদ্যালয়, ২৩ জুলাই ২০১৫

[৩২] নিখিল চন্দ্র সরকার (৬২), পিতাঃ হৃদয় নাথ সরকার, গ্রামঃ পোয়ালশুড়া পাটপাড়া, ইউনিয়নঃ ধারাবারিষা, উপজেলাঃ গুরুদাসপুর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ২৩ জুলাই ২০১৫

[৩৩] বিশ্বনাথ ধর সরকার (৬৫), পিতাঃ নিবারণ চন্দ্র ধর সরকার, উপজেলাঃ গুরুদাসপুর, জেলাঃ নাটোর।সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ বিয়াঘাট, ২৩ জুলাই ২০১৫

[৩৪] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

[৩৫] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৩

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৬

[৩৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

[৩৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮

[৪০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৯-২২০

[৪১] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩-২৪৬

[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৭

[৪৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭-২৫৮

[৪৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭

[৪৫] মোঃ আবু তালেব(৬০), পিতাঃ মৃত হাজী কলিম উদ্দিন, গ্রামঃ মহারাজপুর, পোঃ বৃপাথুরিয়া, ইউনিয়নঃ চাপিলা, উপজেলাঃ গুরুদাসপুর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ বিয়াঘাট, ২৩ জুলাই ২০১৫

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## সিংড়া উপজেলা

নাটোর জেলার পশ্চিম দিকে সিংড়া উপজেলার অবস্থান। এ এলাকার মানুষের মাঝে জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে তারা বুঝতে পারে পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী বাঙালিদের ক্ষমতা না দেওয়ার পায়তারা করছে। সমগ্র দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের মতো এ উপজেলার মানুষের মাঝেও দেশকে স্বাধীন করা বা নিরাপদে বসবাসের চিন্তা ছিল। তারাও অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের মতো সংগঠিত হতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ তাদের আরও সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করেছিল। আর তাই থানা, ইউনিয়ন, গ্রাম পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল সংগ্রাম কমিটি। প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তারা পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে। এ প্রতিরোধের মধ্যে নিরীহ বাঙালি জাতি হত্যা, ধ্বংস, লুটপাট, ধর্ষণ থেকে এ এলাকাও মুক্ত ছিল না। ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের সীমান্ত এলাকা বৈদ্যনাথ তলায় স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের দিন গুরুদাসপুর ও সিংড়াতেও সিত্ত রেভিনিউ কার্যালয়ে প্রধান রাস্তার মোড়ে গাছে পতাকা বেঁধে দেয়া হয়।[১]

**অবস্থান :**

সিংড়া উপজেলা নাটোর জেলার অর্ন্তগত এবং জেলার পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এর মোট আয়তন প্রায় ৫২৮.৪৬ বর্গ কি.মি.। উপজেলাটি প্রায় ৩৪°৩০ ও ২৪°৭০ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯°১০ ও ৮৯°৩০ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।[২] এই উপজেলাটি চলনবিলের মানসকন্যা হিসেবে পরিচিত। এ উপজেলার কিছুদিন পূর্বেও জলমগ্ন থাকত, উপজেলার প্রায় তিন চতুর্থাংশ সারা বছর জলমগ্ন থাকত। আব্দুল হামিদ রচিত "চলনবিলের ইতিকথা" নামক গ্রন্থ হতে জানা যায় এখানে জলদস্যুদের আস্তানা ছিল।[৩] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এ উপজেলার জনসংখ্যা ছিল ১৮১১৮০ জন।[৪] বর্তমানে এর জনসংখ্যা ৩২০৮১৮ জন(২০০১সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। এ উপজেলার ১২টি ইউনিয়নে ৪৪৯টি মৌজায় ৪৩৯টি গ্রাম রয়েছে। এ উপজেলার উত্তরে নন্দীগ্রাম উপজেলা (জেলাঃ বগুড়া), দক্ষিণে গুরুদাসপুর উপজেলা (জেলা : নাটোর), পুর্বে তাড়াশ উপজেলা (জেলা : নওগাঁ)।[৫] চলনবিলে প্রাপ্ত পানিফল মুঘল যুগের ঐতিহ্যবাহী খাবার ছিল। এটা দেখতে সিঙ্গারার মত। তাই বিলের যে অংশে এটি পাওয়া যায় সে অংশটি "সিঙ্গার চলনবিল।" কালের বিবর্তনে এর নাম সিংড়ায় রূপান্তরিত হয়। এটি নাটোর জেলার সবচেয়ে বড় উপজেলা। এ উপজেলায় ৫টি নদী রয়েছে - যথা- আত্রাই, নাগর, বারনই, নন্দকুজা, গুড় নদী। আত্রাই নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪০ মাইল, সর্বোচ্চ গভীরতা ৯৯ ফুট। এ নদীতে বার মাস পানি থাকে। বর্ষাকালে এ নদীর জন্যই সিংড়া উপজেলায় বন্যা হয়।[৬৭]

সিংড়া ধান ও মাছ সমৃদ্ধ এলাকা। সিংড়ার প্রকৃতির তিনটি রং- বর্ষায় দিগন্ত বিস্তৃত পানির রূপালী রং, শীতের শেষ হতে চৈত্র পর্যন্ত বোরো ধানের প্রশান্তিময় সবুজ এবং বৈশাখ জুড়ে পাকা ধানের সোনালি রং। এ তিন রং-এ গড়া সিংড়ার মানুষের জীবন, জীবিকা।

সিংড়ার যেসব ইউনিয়ন, গ্রাম ও এলাকাতে গণহত্যা ও নির্যাতন অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর বর্ণনা উল্লেখ করা হল :

**কলম ইউনিয়ন ও কলম গ্রাম :**

কলম গ্রামকে কলম বলে নামকরণের কারণ অনেক দিন আগের কথা। এই জায়গায় এক রাজা ভ্রমণ করতে এসেছিল, ভ্রমণকালে ঐ রাজার কলম হারিয়ে গিয়েছিল,তাই গ্রামের নাম কলম হয়েছে। প্রচলিত আছে -"বিল দেখতো কলম, শিব দেখতো তালম, আর গ্রাম দেখতো কলম"। কলম ইউনিয়ন সিংড়া উপজেলার অন্যতম স্বতন্ত্র ইউনিয়ন।[৮] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ছিল ১৬,৭৫৩ জন। বর্তমানে এ ইউনিয়নের আয়তন ৫৯৬৯ একর ও জনসংখ্যা ২৫১৪৯ জন। এ ইউনিয়নের গ্রামসংখ্যা ২৭টি।[৯] এ ইউনিয়নে ছোট-বড় ৭টি নদী ও বিল রয়েছে - গুরনাই নাই, চকপাড়া বিল, নূরপুর বিল, চান্দপুর বিল, বলিয়াবাড়ী নদী, কালীনগর বিল, হরিনা বিল। কলম গ্রামের কাঁসারীদের কথা জানা যায়। মুর্শিদাবাদের গৌরব অস্তমিত হলে ব্যবসায়ীরা কলম ও বুধপাড়া গ্রাম দুটিতে বসতি স্থাপন করে। প্রায় ১৬০টি পরিবার কাঁসা পিতলের জিনিস তৈরি করে বিক্রি করত। মুসলমান-হিন্দু জিনিস তৈরি করে বিক্রি করত। মুসলমান-হিন্দু উভয় এ ব্যবসা করত। এছাড়া মৃৎশিল্পেও কলম গ্রাম প্রসিদ্ধ ছিল। মাটির চাড়ি, গামলা, কুয়োর বেড় কলম গ্রামের একচেটিয়া শিল্প ছিল। এছাড়া মাটির খেলনা, পুতুল এবং প্রতিমা তৈরীতে নাটোরের মৃৎশিল্পীদের বেশ নাম ছিল। ব্রিটিশ শাসনামলে কলম ইউনিয়নের কলম গ্রামটির অধিবাসীরাও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।[১০]

**পাঁরসাঐল :**

এ গ্রামটি লারকিমারী বিল এর মাধ্যমে একটি অংশ কলম ইউনিয়নে, আরেকটি হাতিয়ানদহ ইউনিয়নে পড়েছে। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী পাঁরসাঐল গ্রামের আয়তন ছিল ৮২৩ একর ও জনসংখ্যা ছিল ২৪৭৯ জন।[১১] ১৯৭১ সালে এ গ্রামের বিভিন্ন স্থান থেকে এনে হত্যা করে, এখানে অবস্থিত বিলে ফেলে দেয়া হত।

**হাতিয়ানদহ ইউনিয়ন :**

সিংড়া উপজেলার অর্ন্তগত হাতিয়ানদহ ইউনিয়নের আয়তন ৩৬.২৫ কি.মি.।[১২] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ১৫২৮২ জন ছিল।[১৩] বর্তমানে জনসংখ্যা ২৫৮৭৭ জন ও গ্রামের সংখ্যা ৩৫টি। এ ইউনিয়নে অনেক খাল ও নদ-নদী রয়েছে। ইউনিয়নের পাশ দিয়েই বিখ্যাত নারদ নদ অতিবাহিত হয়েছে এবং চলনবিলের কিছু অংশ এই ইউনিয়নের ভিতরে রয়েছে।[১৪]

**ছোট হাতিয়ানদহ ও বড় হাতিয়ানদহ :**

এ গ্রাম দু'টি ৬নং হাতিয়ানদহে অবস্থিত। গ্রাম দু'টি হাতিয়ানদহ ইউনিয়নের ১নং ওয়ার্ড এ অবস্থিত। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ছোট হাতিয়ানদহের আয়তন ছিল ৮৭ একর ও জনসংখ্যা ছিল ৩৯৩ জন।

আর ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বড় হাতিয়ানদহের আয়তন ছিল ৩১১ একর ও জনসংখ্যা ছিল ৫৯২ জন।[১৫] গ্রাম দু'টি বর্তমানে বহু লোকসংখ্যা রয়েছে। তবে ১৯৭১ সালে এত বাড়িঘর ছিল না। বেশিরভাগ স্থানই ছিল জঙ্গল ও জলাশয়। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যরা এ দু'টি গ্রামে প্রবেশ করে হত্যা ও নির্যাতন চালায়।

**ডাঙ্গাপাড়া ও মঠগ্রাম :**

গ্রাম দু'টি হাতিয়ানদহ ইউনিয়নের অর্ন্তভুক্ত। উত্তর ডাঙ্গাপাড়া ও দক্ষিণ ডাঙ্গাপাড়া রয়েছে। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী উত্তর ডাঙ্গাপাড়ার আয়তন ছিল ৩৫ একর ও জনসংখ্যা ১৫৪ জন ছিল এবং দক্ষিণ ডাঙ্গা পাড়ার আয়তন ছিল ১৩৫ একর ও জনসংখ্যা ৬৩৬ জন ছিল। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী মঠগ্রামের আয়তন ৪৯৬ একর ও জনসংখ্যা ছিল ১,১৫০ জন।[১৬] ডাঙ্গাপাড়া এই ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড এ অবস্থিত ও মঠগ্রাম ৮৯নং ওয়ার্ড এ অবস্থিত।[১৭] মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি এ দু'টি গ্রামে হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতন চালায়।

## সংগ্রাম কমিটি গঠন

পাকিস্তানিদের প্রতিরোধের জন্য একাত্তরে প্রত্যেক থানায় সংগ্রাম কমিটি গড়ে তোলা হয়। সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সহ বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের নিরাপত্তার লক্ষ্যে এ কমিটিগুলো গড়ে উঠতে থাকে। সিংড়া থানার কলম গ্রামটি ছিল হিন্দু অধ্যুষিত। ফলে সেখানে এই কমিটিগুলোর সাহায্যে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও ২৬শে মার্চ পর্যন্ত এই সংগ্রাম কমিটি যথার্থ ভাবে দায়িত্ব পালন করে অসংখ্য মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় সহযোগিতা করেছে।[১৮]

৭ই মার্চের ভাষণ দ্বারা এ উপজেলার মানুষও অনুপ্রাণিত হয়েছিল। আর তাই পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য এ এলাকার মুক্তিকামী জনতা সংগ্রাম কমিটি গঠন করে । কলম উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বদিউজ্জামান এর নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া এ কমিটির সদস্যরা হলেন চৌগ্রামের তরুণ কুমার চক্রবর্তী, ইটালির গোপালচন্দ্র মৈত্র, বড়িয়ার শাহজাহান আলী, কান্তনগরের মোঃ শাহাদাৎ হোসেন, সিংড়ার ফয়েজ উদ্দিন আহমেদ, কলম উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক আবুল কালাম আজাদ, সিংড়ার সুকাশ ইউনিয়নের মসিন্দা গ্রামের ডা. নবকুমার সরকার, ইটালি ইউনিয়নের কুমগ্রামের নলিনীকান্ত সরকার, শেরকোলের মোঃ শামসুল চেয়ারম্যান, বাহাদুরপুরের লুৎফুল কবির মজনু, গুনাইখাড়ার সোলেমান মৃধা, চৌগ্রামের মোঃ আব্দুল ওদুদ (দুদু), চকগোপালের ভবাণী প্রসাদ দাস, সিংড়ার কালীপদ কুন্ড, আবু জাহেদ মোল্লা জুড়ান, ডা. আবু দাউদ, হামিরঘোষ, নুরুজ্জামান তালুকদার, পাঁচ পাখিয়ার মোঃ তোফাজ্জল হোসেন প্রমুখ। সিংড়া উপজেলায় এদের দ্বারা জনগণ সংগঠিত হয়েছিল। প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং দালাল, রাজাকারদের বিরুদ্ধে।

## শান্তি কমিটি গঠন

পাকিস্তানি বাহিনী এপ্রিল মাসে নাটোরে প্রবেশের পর পুরো জেলা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। আর এসময় তাদের সহযোগিতার জন্য ঢাকার মত এ উপজেলাতেও গঠিত হয় শান্তিকমিটি। সিংড়া থানার হামির ঘোষ এলাকার হাজী মকছেদ আলী (পিতা-মৃত হারান আলী) শান্তিকমিটির নেতৃত্বে ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রামে বিভিন্ন জন শান্তিকমিটির প্রধান ছিলেন। যেমন– ছোট চৌগ্রামে শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ফজলুর রহমান, জোড়মল্লিকাতে আবুল কাশেম মিয়া ভাইস চেয়ারম্যান, সাতপুকুরিয়াতে আজাহার আলী ভাইস চেয়ারম্যান, হাঁস পুকরিয়াতে আব্দুল জলিল মিয়া ছিলেন প্রধান। আব্দুল জলিল মূলত শান্তি কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন। এছাড়াও আরও সদস্য হলেন রওশন আলী, শামসুল ইসলাম, মফিজ উদ্দিন, কফিল উদ্দিন মিয়া, করিম শেখ, আব্দুর রহমান, খালেক মৌলভী প্রমুখ।

## পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ক্যাম্পসমূহ

কলম বাজারে পাকিস্তানি বাহিনী ক্যাম্প করেছিল। এছাড়া হাতিয়ানদহ ইউনিয়ন এও ক্যাম্প ছিল রাজাকার আলবদর বাহিনীর। এ ক্যাম্পগুলো মূলত নাটোর শহর থেকে পরিচালিত হত। বহু নারী-পুরুষকে এসব ক্যাম্পে নির্যাতন করা হত।

### সিংড়া থানা হেড কোয়াটার নির্যাতন কেন্দ্র

নাটোর জেলার সিংড়া থানা হেড কোয়ার্টারের যুদ্ধের সময় ক্যাম্প স্থাপন করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। এখানে যুবতী মেয়েদের ধরে এনে পাশবিক নির্যাতন করত। এ বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী ড. সুজিত সরকার বলেন, তখন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। সে সময় নাটোরের সেন্ট লুইস স্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়তেন তিনি। জুনের প্রথম দিকে, হোস্টেল থেকে পালিয়ে বাড়িতে এসে দেখেন বাবা-মা, ঠাকুরমা কেউ নেই। মাস খানেক বাড়িতে থেকে পরবর্তীতে ভারতে চলে যান। সেখানে পরিবারের সকলের সঙ্গে দেখা হয়। ক্যাম্পে মুক্তিযোদ্ধাদের কার কী প্রয়োজন তার খোঁজখবর নিতে শুরু করেন। পরে ইনফরমার হিসেবে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করেন। এ সময় তিনি গ্রামের নিজস্ব বাড়িতে বসবাস করতে শুরু করেন। একদিন রাজাকাররা তাঁদের পুকুরে মাছ ধরতে এলে তিনি নিষেধ করায় তাঁকে মারতে থাকে এবং গ্রামের মানুষের অনুরোধ সত্ত্বেও রাজাকাররা তাঁকে সিংড়া থানা হেড কোয়াটারে নিয়ে যায়। যেটা বর্তমানে রেজিষ্ট্রি অফিস সেটা তখন পাকিস্তানি সেনাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ছিল। এখানে একটি ঘরে পাকিস্তানি সেনারা বিভিন্ন স্থান থেকে মেয়েদের ধরে এনে আটকে রাখত এবং নির্যাতন করত। ক্যাম্পের মাঠে ঘাস বিচালি পরিষ্কার করা, পানি আনা ছিল তাঁর কাজ। খাবার বরাদ্দ ছিল এক বেলায় জন্য। কোনো কারণে একটু ভুল হলেই রাজাকাররা মারধর করত। এ অবস্থায় একদিন তিনি প্রচণ্ড নির্যাতনে জ্ঞান হারান। জ্ঞান ফিরে দেখেন ঐ মেয়েদের ঘরে তাঁকে রাখা হয়েছে। শুধু পেটিকোট পরা উদভ্রান্ত মেয়েরা তাঁর সেবা করছিলেন। তিনি তাদের নাম জিজ্ঞেস করার অনেকেই বলতে চাননি। তবে হাসিনা ও পারুল দুটি নাম জানতে পেরেছিলেন। সেদিন থেকে মেয়েদের সাথে একটু যোগাযোগ হয় তাঁর। ড. সুজিত দেখেছেন, প্রায় দিন পাকসেনারা এসে এসব মেয়েদের মধ্যে যারা শারীরিকভাবে সুস্থ এবং দেখতে ভালো তাদের দেখিয়ে দিয়ে যেত। সন্ধ্যের দিকে রাজাকাররা এসব মেয়েকে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্পে নিয়ে যেত। এসব রাজাকারের মধ্যে মজিবর রহমান এবং শালমারা গ্রামের জলিলের নাম মনে করতে পারেন তিনি। তাঁকে যখন এ ক্যাম্পে নেয়া হয় তখন তিনি ২১ জন মেয়েকে দেখেছিলেন। পরে দিনে দিনে সংখ্যা কমে যাচ্ছে দেখে তিনি অন্য মেয়েদের জিজ্ঞাস করেন, আপা বাকি মেয়েরা কোথায়? জানতে পারেন যারা অসুস্থ হয়ে যেত তাদের অন্যত্র নিয়ে মেরে ফেলা হতো। ড. সুজিত নিজেই এসব মেয়েকে অসুস্থ হতে দেখেছেন। তাদের শরীরে নির্যাতনের জায়গায় জায়গায় ঘা হয়ে যাচ্ছিল। যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্তপাত হতো, তবুও রেহাই পেত না তাঁরা। দু-একজন পাগল হয়ে ভুল বকতেন। একদিন রাজাকাররা ঘরের ভেতরে মেয়েদের ধর্ষণ করার সময় সুজিতকে ও ধর্ষণে বাধ্য করার চেষ্টা করে। তারা মেয়েদের যৌনাঙ্গে তাঁর মুখ চেপে ধরে ঘষে দেয়। তিনি পানি চাইলে প্রস্রাব করে তাঁর মুখে ঢেলে দেয়। মেয়েদের ওপর হানাদারদের পাশবিক নির্যাতন পরবর্তী সময়ে বীভৎস্য উল্লাসের স্মৃতি আজও চোখ বুজলে দেখতে পান তিনি।[১৯]

## ঘাতক-দালালদের অপরাধের চিত্র

১৯৭১ সালের ১৮ই এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সিংড়া উপজেলায় প্রবেশ করে। এসময় ঘাতক-দালালরা তাদের সহযোগিতা করে। সিংড়া বাজারে প্রথম রাজাকাররা চয়েন নামক এক মুক্তিকামীকে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে তুলে দেয়। পরদিন তাকে নাটোর ক্যাম্পে হত্যা করে তারা। এছাড়া ৮ই মে কলম ও হাতিয়ানদহ ইউনিয়নে রাজাকার আলবদরদের সহযোগিতায় পাকিস্তানিবাহিনী নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায়, নির্যাতন করে বহু নিরীহ বাঙালিদের অনেককে ক্যাম্পে ধরে নিয়ে নির্যাতন করে, আবার অনেককে যেখানে পেয়েছে সেখানেই অত্যাচার করেছে। বহু হিন্দু মানুষকে তারা ধর্মান্তরিত হতে আদেশ দিয়েছে। না শুনলে তাদেরকে অত্যাচার করা হত। ডাঙাপাড়ায় চাঁদ ও মঙ্গলার রাজাকার হত্যাযজ্ঞ চালায়। এছাড়া কলম, হাতিয়ানদহ, উত্তর দমদমা পাঁরসাইল গ্রামেও তারা হত্যাযজ্ঞ চালায়। শুধু তাইনয়, অনেক নিরীহ মানুষ বাঁচার জন্য ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে তাদেরকেও হত্যা করে। এরপর লুটপাট, ধ্বংসযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। এভাবেই দীর্ঘ ৮ মাস তারা হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ চালায়।

## সিংড়া উপজেলার গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ গণহত্যার যে জঘন্যতম অধ্যায়ের সূচনা করেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সেই অধ্যায়টি নাটোর জেলায় ছড়িয়ে পড়েছিল কিছুদিনের মধ্যেই। ১৩ই এপ্রিল নাটোর প্রবেশ করে হানাদাররা। ১৮ই এপ্রিল প্রথম সিংড়া থানার বালুয়া বাসুয়া গ্রামের চয়েন উদ্দিনকে সিংড়া বাজার থেকে তুলে নিয়ে যায় নাটোর সময় থানায় এবং সেখানে হত্যা করে ১৯শে এপ্রিল। এভাবেই সূত্রপাত ঘটে দালাল-রাজাকার ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম। এরপর এই হত্যা ও নির্যাতন কথা ধ্বংসযজ্ঞের অধ্যায় ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। উত্তর দমদমার শিক্ষক রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে হত্যা করা হয় মে মাসে, এর পর কলম, হাতিয়াদহ, ভাঙ্গাপাড়া, কতুয়াবাড়ী, সাঁঐলও হত্যাকাণ্ড চলতে থাকে। শুধু তাই নয়। প্রাণ বাঁচাতে শরণার্থী শিবিরে যাবার পথে এ গ্রামগুলোর বহু মানুষকে ঘাতকদের শিকারে পরিণত হতে হয়েছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে এ উপজেলায় আশ্রিতদের বলি হতে হয়েছিল ঘাতকদের হাতে। মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওদুদ সাক্ষাৎকারে জানান, চয়েন উদ্দিন মোল্লা ছাত্রলীগ সদস্য ছিলেন। তাঁর ভাই ছিলেন একজন মুক্তিযোদ্ধা। এ তথ্য পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দালাল সহযোগী (যারা এখানকার স্থানীয়) তারা জানতেন। ১৮ এপ্রিল সকাল আনুমানিক ১০টার সময় সিংড়া বাজারে বুড়াপীরতলা থেকে সিংড়া থানা পুলিশ চয়েনকে আটক করে নাটোরে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করে। জানা যায় ১৯শে এপ্রিল তাঁকে হত্যা করে হানাদাররা।

উত্তর দমদমার রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যিনি উত্তর দমদমা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। মে মাসের প্রথম দিকে একদিন ভোর বেলা ঘাতক রাজাকাররা তাঁর বাড়িতে আক্রমণ করে। রথীন্দ্রনাথ সকলকে সাহায্য করতেন, সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে হাসুয়া ও চাকু দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। তাঁর পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে এসেছিল। স্থানীয় ভবতোশ ও দুলাল বাঁচাতে এলে তাঁদের ও গলায় আঘাত করে। সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান ভবতোশ ও দুলাল। কিন্তু রথী বাবু সেখানেই মারা যান। এরপর রথীন্দ্রনাথের মন্দির ও বিগ্রহ ভাঙ্গচুর করে তাঁদের বাড়িঘর লুটপাট করে ঘাতকরা।

মে মাসেই (বৈশাখ) লালোর ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের আশুতোষ মৈত্রকে হত্যা করে রাজাকার পাকিস্তানি বাহিনী। রাজাকার চাঁদ ও মঙ্গলার সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী আশুতোষের বাড়ি আসে। হিন্দুদের বাড়িঘর আক্রমণ করছে শুনে আশুতোষ বিভিন্ন স্থানে লুকিয়ে থাকতেন, কিন্তু সেদিন বাড়ি এসেছিলেন তামাক খেতে। এমন সময় ঘাতকরা তাঁর বাড়িতে আক্রমণ করে গুলি করে হত্যা করে।[২০]

৮ইমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কলম ইউনিয়নে আক্রমণ করে স্থানীয় আব্দুল করিম রাজাকারের পরামর্শে। কলম হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। পাবনা, সিরাজগঞ্জ সহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে অনেকেই আত্মীয় বাড়িতে এসেছিল। আব্দুল করিম একথা জানতে পেরে নাটোরের কুখ্যাত ঘাতক হাফেজ আবদুর রহমানকে জানান। এরপর হাতিয়ানদহর মীর সহ আব্দুল করিম ও হাফেজ আব্দুর রহমানের নির্দেশনায় পাকিস্তানিরা আক্রমণ করে কলমে। মুক্তিযোদ্ধারাও আশ্রয় নিয়েছে এখানে। সেকথা জানায় দালালরা। কলম ইউনিয়নের কদমতলী গ্রামে ও কলম বাজারে হানাদাররা হত্যাযজ্ঞ চালায়।

অধ্যাপক আব্দুর রহমান জানান,

> ৮ই মে সকাল ১১টার দিকে পাকিস্তানি বাহিনী আক্রমণ করে কলম-এ। কলম বাজারে প্রায় ৮-১০ জনকে হত্যা করে বলে জানা যায়। সেখানে বিভিন্ন স্থানে অনেককেই হত্যা করা হয়, সবার পরিচয় জানা যায়নি। এরপর লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এরপর কদমতলী কলমে আক্রমণ করে হানাদাররা। নামাজ পড়তে অনেকেই মসজিদে গিয়েছেন। অনেকে মিলিটারি গ্রামে ঢুকেছে শুনে বাড়ি ফিরছেন সাবধান করতে। ঘাতকরা মসজিদে থাকা আব্দুল হামিদকে টেনে বের করে। লুটপাট করতে বাধা দেয়ায় আব্দুল হামিদের ভাই আবুল কালাম আজাদকেও ধরে। এরপর তাঁদের সহ প্রায় ১৫জনকে একসাথে কদমতলী মসজিদের পূর্ব দক্ষিণে একটি মাইটালের পার্শ্বে দাঁড় করায়। এরপর গুলি করে ও বেয়নেট চার্জ করে তাঁদের উপর। এতে ঘটনাস্থলেই মারা যান ৭জন।[২১]

জাহানারা বেগম জানান,

> সিরাজগঞ্জের চৌহালী থেকে আসা তাঁর ননদের স্বামী আব্দুল করিম ও দেবর আব্দুল হালিম (দশম শ্রেণীতে পড়ত), স্বামী আব্দুল আজিজ কেও হত্যা করা হয় এসময়। লাইনে দাঁড় করে তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হয়। 'তোমরা কিসে ভোট দিয়েছ'। তাঁরা বলে নৌকায়। তাঁদের অনেককে জিজ্ঞাসা করা হয়, তাঁরা হিন্দু না মুসলিম। মুসলিম হলে কলমা পড়তে বলে। এরপর তাদের উপর অত্যাচার করা হয়। অনেকে বেঁচে যায় সেই ভাগ্যক্রমে, কিন্তু ৭ জন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এরপর লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করে দালালরা।[২২]

কলম গ্রামের কাঁসারী পাড়ায় ১২টার দিকে আক্রমণ করে মতিলাল কাঁসারি ও ধর্ম কাসারিকেও গুলি করে হত্যা করে। তাঁদের লাশ রাস্তায় পড়েছিল, শিয়াল-কুকুরে খেয়েছে। কদমতলী গ্রামের বিশু শেখ ডোল-এ (ধানের তালাই বোনা গোলা) লুকিয়ে ছিল, তাঁকে টেনে বের করে এনে হত্যা করে। কলমের হাছেন ব্যাপারী শ্যালক তোরাব আলীর বাড়ি সিরাজগঞ্জের চৌহালীতে হলেও বোনের বাড়ির কাছে এসে বাড়ি করেন। তাঁকেও ধরে এনে হত্যা করে। এরপরও কদমতলী কলমে ৭জনকে কবরস্থ করার সময় আবার এসেছিল হানাদাররা। ভয়ে এলাকার মানুষ সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল।[২৩] এরপর একইদিন অর্থাৎ ৮ই মে হাতিয়ানদহ ইউনিয়নে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ চালায়। হাতিয়ানদহের ময়েন উদ্দিন মীরের পরামর্শে এ এলাকায় আসে তারা। এখানেও বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। ময়েন উদ্দিন তাদের জানিয়েছিল- এখানে হিন্দু ও মুক্তিবাহিনী আশ্রয় নিয়েছে। গ্রামে ঢুকে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করতে থাকে।

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পাঁচটি গাড়ি প্রবেশ করে সিংড়া থানায়। একটি কলমে গিয়ে ফিরে আসে কাউন্সিল এক-এ দুইটি গাড়ি হিন্দুপাড়া মোড় ও কালিতলায় যায় এবং আরেকটি গাড়ি শিথলীতলায় (হাতিয়ানদহ) যায়। ময়েন উদ্দিন হানাদার বাহিনীকে হাতিয়ানদহে এনে ডাব, কলা প্রভৃতি দিয়ে তাদের সেবা করতে শুরু করে। বগুড়া পাড়া ও শিথলীতলা দুই স্থানে গণহত্যাসহ বিভিন্ন স্থানে হত্যা, ধর্ষণ, লুণ্ঠন ও অগ্নিসংযোগ চালায় হানাদার-দালাল বাহিনী।

নাটোরে হানাদার বাহিনী এসেছে শুনে অনেকেই যেমন বিভিন্ন স্থানে চলে গিয়েছিল, তেমনি অনেকেই অন্যান্য অনেকে এ জেলাতেও আশ্রয় নিয়েছিল। ৮ই মে সকালে কলম আক্রমণ করেছে শুনে হাতিয়ানদহের অনেকে জঙ্গলে বা আশে পাশে লুকিয়েছিল। পাকিস্তানি সৈন্যরা হিন্দু ও মুসলিমদের বিভিন্ন স্থান থেকে টেনে বের করে এবং আলাদা লাইনে দাঁড় করায়। মুসলিমদের অনেককেই ছেড়ে দেয়া হয়।

প্রত্যক্ষদর্শী বিনয় কৃষ্ণ কুন্ডু সাক্ষাৎকারে জানান,

> ঐ সময় অনেক মানুষ বলরাম চন্দ্রের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে তাঁর উপর আক্রোশ বৃদ্ধি পায় ঘাতকদের। বলরাম চন্দ্রের বাড়িতে থাকা তাঁর ভাই হরিদাস, ব্রাহ্মণ শশাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী ও বলরামকে গুলি করে। তখন হরিদাস ও শশাঙ্ক মারা যান কিন্তু বলরামের গুলি লাগার পরও অনেকক্ষণ বেঁচে ছিলেন। পরে রাতে মারা যান। বিনয় কৃষ্ণর শরীরেও গুলি লাগে। তিনি মাটিতে পড়েছিল। হানাদাররা তাঁর নাকে হাত দিয়ে পরীক্ষা করে মরেছে কিনা। তিনি তখন নিঃশ্বাস কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে রেখে জীবন বাঁচান।
>
> শশীভূষণ নামক একজনকে গুলি করলে, তিনি আধমরা অবস্থায় ছিলেন, তখন তিনি ঘাতকদের আবার গুলি করতে বলেন। আরেকটা গুলি করলে তিনি মারা যান। সুশিলা নামক এক বিধবা মহিলাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছিল হানাদাররা। এলাকার মোঃআব্দুল নামক এক মুসলিম ব্যক্তি সকলকে নিরাপত্তা দিত বলে তাকেও গুলি করে। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে ছিলেন ৫-৬ মাসের মত। এদের সকলকেই লাইনে দাঁড় করিয়েছিল। প্রায় ২২ জনের মধ্যে ১৭-১৮ জনকে হত্যা করে। বাকীরা সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যান।[২৪]

বিজয় কর্মকার জানান, ভোলানাথ কর্মকার তাঁর পুত্রকে বাঁচাতে গিয়ে ঘাতকদের হাতে নিজেই বলি হয়েছিলেন। জঙ্গলে ভোলানাথ পুত্র বিজয় সহ অন্যদের নিয়ে লুকিয়েছিলেন। গুলির শব্দ শুনে বিজয় বের হয়ে বাবার কাছে যান। তখন হানাদাররা তাঁদের উভয়কেই ধরে ফেলে। লাইনে ভোলানাথ প্রথমে ছিলেন, এরপর তাঁর ছেলে। ফলে তাঁর ছেলেকে গুলি করলেও তিনি ছেলেকে জাপটে ধরে যেন ছেলের গায়ে গুলি না লাগে। এক পর্যায়ে ভোলানাথ গুলি লেগে মারা যান। এরপর তাঁদের বাড়িঘরে লুটপাট করে রাজাকাররা।[২৫]

প্রত্যক্ষদর্শী বিনয়কৃষ্ণ জানান, নরেশ কুন্ডু গান বাজনা করতেন। ইন্দু শেখরের বাসায় থাকতেন। তাঁদেরও গুলি করে হত্যা করে। মাদার দাস নামক এক ব্যবসায়ীকে পেটে গুলি লেগে কাতরাচ্ছিল, পরে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। আওয়ামী লীগ সদস্য শশধর সরকার মনে করে শশধর প্রাংকে হত্যা করে দালালরা। একটি যুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে দেখে নিজের কথা চিন্তা না করে বাঁচাতে যান রতিকান্ত সাহা। তাঁকে ডাণ্ডা দিয়ে (লাঠি) পেটাতে পেটাতে দীঘলগ্রাম গামী রোডে এনে হত্যা করে ঘাতকরা।

দীঘল গ্রামের হারানচন্দ্র প্রাং মেয়ের বাড়ি হাতিয়ানদহে বেড়াতে এসে প্রাণ হারান । মেশিন গানের গুলি লেগে তিনি মারা যান। বিষ্ণুপদের গুলি লেগেছিল ডান পাঁজরে। সেসব দিক দিয়ে মল বের হত।

ভারতে গিয়ে তার মৃত্যু ঘটে। দীঘল গ্রামের নিয়োতী রাণীকে হানাদাররা রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, পরে আর তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। এভাবে ঘাতকরা যাকে যেখানে পেয়েছে হত্যা করে। অনেক নারীকে ধর্ষণ করে। পুরো এলাকায় হত্যা, ধর্ষণ লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী দালালরা।[২৬]

কলম, সাঁঐল এবং আশেপাশের গ্রামে ১৯৭১ সালে ৮ই মে পাকিস্তানি বাহিনী যখন নিরীহ মানুষদের গুলি করে হত্যা করে তাদের বাড়িঘর-এ লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করছিল, তখন অনেক মানুষ প্রাণভয়ে পালাতে থাকে। অনেকে লারকিমারী বিলের ধান ও তিল ক্ষেতের মাঝ দিয়ে কতুয়াবাড়ীর দিকে আসতে থাকে। ঐ অবস্থায় পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে গুলি করে দুই শত লোককে হত্যা করে। এই লাশগুলি স্থানীয় কতুয়াবাড়ী গ্রামের বাসিন্দারা মহিষের গাড়িতে করে আত্রাই নদীতে ভাসিয়ে দেয়। এছাড়া তাজপুর, খড়মকুড়ি, হুলহুলিয়া, ভুলবাড়িয়া, পালশা, সৈয়দপুর, মানিকচাপড় প্রভৃতি স্থানের বহু লোক ভারতে শরণার্থী শিবিরে যাওয়ার পথে জয়পুর হাট এর পাঁচবিবিতে হানাদারদের গুলিতে মারা যায়।

১৯৭১ সালে ভাদ্র মাসের প্রথম দিকে (২তারিখ আনুমানিক) শুক্রবার নৌকা নিয়ে ধানের ব্যবসা করতে গিয়ে কয়েকজন ব্যবসায়ী আত্রাই এ পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে ধরা পড়ে এবং আত্রাই ব্রিজের উপরে তাঁদেরকে গুলি করে হত্যা করে নদীতে ফেলে দেয়া হয়। এসময় খড়মকুড়ির কয়েকজন ব্যবসায়ী আজিজুল, কাতেব আলী ও নূরা শহীদ হন। ৮ই মে লারকিমারী বিলে পাকিস্তানি বাহিনী গুলি করে অনেককে হত্যা করে। খাদেম আলী নামক এক ব্যক্তি মাছ ধরার সময় তাদের গুলিতে মারা যায় এবং পরে তাঁর লাশ আত্রাই নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। আরেকটি অজ্ঞাত লোককে হত্যা করা হয় কতুয়াবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে এবং আত্রাই নদীতে লাশ ভাসিয়ে দেয়া হয়।

গোপাল বিহারী দাস সাক্ষাৎকারে জানান,

> হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী যখন আক্রমণ করেছে, তখন পালাতে গিয়ে কতুয়াবাড়ি ঘাট দিয়ে পালানোর সময় মফিজ সরদার নামক এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করতে দেখেন। পাকিস্তানি বাহিনী চার ভাগে বিভক্ত হয়ে তখন লারকিমারী বিলে দুই শত লোককে হত্যা করে ও লুটপাট করে পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলোতে। নালোর গ্রামের আগস্ট মাসের দিকে হানাদার বাহিনী অবাঙালিদের সাথে নিয়ে প্রায় ২৪ জন মানুষকে হত্যা করে। হত্যার দু'দিন পরে স্থানীয়রা তাঁদের গর্ত করে মাটিচাপা দেয়।[২৭]

## নারী নির্যাতন

সিংড়া উপজেলায় নারী নির্যাতনের কথা শোনা যায়। তবে জানাতে চায়নি কেউ সমাজ, পরিবারের ভয়ে। একটি নির্যাতনের কথা জানা যায় হাতিয়ানদহে। যাকে বাঁচাতে গিয়ে রতিকান্ত সাহা শহীদ হয়েছিলেন। পরবর্তীতে মহিলাটিকেও রক্ষা করা যায়নি।

## সিংড়া উপজেলায় গণহত্যা ও নির্যাতন

সিংড়া উপজেলার নির্যাতন ও ৯ টি গণহত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

### রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গণহত্যা

সিংড়া থানা সদরের একমাত্র উচ্চবিদ্যালয় দমদমা উচ্চবিদ্যালয়ের সংস্কৃতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যিনি 'পন্ডিত স্যার' হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এপ্রিল-মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে

হানাদার বাহিনী দালালদের সহযোগিতায় তাঁকে হত্যা করে। তিনি জনপ্রিয় ব্যক্তি ছিলেন। বিভিন্ন সময় মানুষদের সাহায্য করতেন। সৎ ও নিষ্ঠাবান রথীন্দ্রনাথের বাড়িতে আক্রমণ করে তাঁকে হাসুরা ও চাকু দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে। এরপর তাদের বাড়ি ১০মন ওজনের পিতলে নির্মিত দশভূজার মূতি (পূর্বপুরুষ স্থাপিত) ভেঙে নিয়ে যায় এবং লুটপাট করে বাড়িটি নিজেদের দখলে আনে।[২৮] প্রতিবেশী ভবতোশ ও দুলাল রথীন্দ্রনাথকে বাঁচানোর জন্য গেলে তাঁদেরকেও ঘাতকরা আঘাত করে ।

**চয়েন গণহত্যা**

চয়েন উদ্দিন মোল্লাকে ১৮ই এপ্রিল ১৯৭১ সালে সকালের দিকে সিংড়া বাজারে বুড়াপীর তলা থেকে সিংড়া থানা পুলিশ আটক করে নাটোরে পাকিস্তানি বাহিনীর কাছে ধরিয়ে দেয়। জানা যায় ১৯শে এপ্রিল তাঁকে হত্যা করা হয়। শহীদ চয়েনের ভাই একজন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি ও তাঁর পরিবারের সবাই আওয়ামীলীগের রাজনীতির সমর্থক ছিলেন। তাই মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়ার অভিযোগে তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। কেউ বলেছেন, পারিবারিক প্রতিযোগিতার ও প্রতিহিংসার রেশ ধরে এই হত্যাকান্ড ঘটানো হয়েছিল।

**কলম গণহত্যা**

১৯৭১ সালের ৮ই মে নাটোর থেকে আব্দুল করিম রাজাকারের পরামর্শে হাফেজ আব্দুর রহমান পাকিস্তানি বাহিনীকে নিয়ে সকাল ১১টায় কলমে আসে। কলম হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বহু মানুষ এখানে এসেও আশ্রয় নিয়েছিল প্রাণ বাঁচাতে। এই আশ্রিতদের কাছে অনেক ধন-সম্পদ আছে এবং মুক্তিযোদ্ধারাও হয়ত লুকিয়ে আছে, এই সন্দেহে হানাদাররা আসে এখানে। কলম বাজার, কদমতলী কলম গ্রাম ও কাঁসারিপাড়াতে রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী প্রায় ১৮-২০জনকে হত্যা করে। সেদিন ২৪শে বৈশাখ, ১৩৭৮/৮মে ১৯৭১/১২ রবিউল আউয়াল। গ্রীষ্মকাল। হযরত মোহাম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে অনেকে রোজা রয়েছে। বাড়িতে অনেক গৃহিনী বাহারী রান্নার আয়োজন করেছে। বাজারেও গিয়েছে বহু মানুষ। এমন সময় কলম বাজারে আক্রমণ করে গুলি করতে থাকে পাকিস্তানি বাহিনী। সেখানে ঘটনাস্থলেই শহীদ হন হরেরাম সাহা, বঙ্কুবিহারী সাহা, রঞ্জিতকুমার সাহা, নিমাইচন্দ্র পাল, বলরাম পাল, গোবিন্দ প্রামানিক, আশুতোষ শীল, অমলকুমার প্রমুখ।[২৯] এরপর ১২টার দিকে কলম কাঁসারি পাড়া গ্রামে কাজ করছিলেন মতিলাল ও ধর্মচরণ কাঁসারি। তাঁদেরকেও গুলি করে হত্যা করে ফেলে রেখে যায় ঘাতকরা।

এরপর বেলা প্রায় ১টার দিকে কদমতলী কলমে আসে হানাদাররা। নামাজ পড়তে অনেকেই মসজিদে ঢুকেছেন। এমনিতেই গ্রামে মিলিটারি এসেছে শুনে অনেকেই ভীত ছিলেন। আবুল হামিদকে টেনে বের করে আনে মসজিদ থেকে। এরপর লুটপাট শুরু করলে হামিদের ভাই আব্দুল কালাম আজাদ বাধা দেন। ফলে তাঁকেও ধরে এনে বাইরে দাঁড় করায়। প্রতিবেশী আব্দুর রহমানের ছেলে আব্দুল আজিজ ও মেয়ের জামাই আব্দুল করিম (যিনি সিরাজগঞ্জ থেকে এসেছিলেন) কেও ধরে এনে লাইনে দাঁড় করায়। আব্দুল আজিজ ভাত নিয়ে যাচ্ছিলেন ক্ষেতে কর্মরত কামলাদের (কৃষক) জন্য। পথে তাঁকে ধরে ফেলে। আব্দুল করিম ঘরেই ছিল লুকিয়ে। আব্দুর রহমানের ছোট ছেলে আব্দুল হালিম রাস্তায় বসেছিল। সেখান থেকে তাঁকে ধরে আনে। প্রতিবেশী বিশু শেখ আব্দুর রহমানের বাড়িতে ধানের গোলায় লুকিয়েছিল। মিলিটারিরা ঘরে ঢুকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে –"তুম ইয়াহা ক্যায়া করতে হ্যো?" তাঁকেও ধরে এনে দাঁড় করায়। হাছেন ব্যাপারীর শ্যালক তোরাব আলী বোনের শ্বশুর বাড়ির দিকে বাড়ি করে থাকতেন। তাঁকেও ধরে আনে। এছাড়া আবুল

কাশেম সহ প্রায় ৭-৮ জনকে লাইনে দাঁড় করে জিজ্ঞেস করে তারা কিসে ভোট দিয়েছে। তারা সত্যি কথা বলে, নৌকায়। তখন আব্দুল হামিদের এহেন উত্তরে মেজর শেরওয়ানী চিৎকার করে বলেছিলো, কলমা পড়হো, কুত্তে ক্যাঁহিকা। আব্দুল হামিদ তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, মহানবীর জন্মদিনের কথা। তখন মেজর জবাব দিয়েছিলো-ঠিক হ্যায়, তো গোল্লী খাও বাঞ্চোৎ।" [৩০] এরপর গুলি, লুট পাট ও অগ্নিসংযোগ করে পুরো গ্রামে। আব্দুল হালিম বুকে গুলি লেগে পড়েছিল। তাঁর বাবা হানাদার বাহিনী চলে যাওয়ার পর তাঁকে ঘরে নিয়ে আসে। যন্ত্রণায় কাতর হালিম তাঁর বাবাকে বলেন "আমাকে আরেক দোড়া মারেক বাপ, জান বারাক"। এরপর মাগরিবের সময় মারা যান।

হানাদার বাহিনী সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে চলে যায়। মৃতদের লাশ আত্মীয় প্রতিবেশীরা একত্রে কদমতলীতেই কবরস্থ করেছেন। কলম গ্রামে এই হত্যাযজ্ঞ সহ লুটপাটে এবং ধর্ষণ আর অগ্নিসংযোগে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী ব্যতীত আর যারা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করেছিলো তারা হচ্ছে, নজরপুরের আব্দুল করিম, শাওইলের সেরাজুল ইসলাম, আব্দুল আজিজ, আমজাদ হোসেন, নাটোর মাদ্রাসার হাফেজ শের মাহমুদ, হাফেজ আব্দুর রহমান। এইদিন অসংখ্য মা-বোনেরও সম্ভম হানি করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের দোসররা। তারা শহীদ আব্দুল হামিদের বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছিলো।[৩১]

উল্লেখ্য, এ্যাডভোকেট শীতল চক্রবর্তীর বাড়ি কলম গ্রামে। তাঁর বাড়িতে অনেক হিন্দু আশ্রিত ছিল। তাঁরা হয়ত ধন সম্পদ এনেছে। অমল কুমারের বাড়িতেও ধনসম্পদ আছে বলে সন্দেহ করে ঘাতক-দালালরা। পরে তাঁদের বাড়িতেও লুটপাট হয়।

**হাতিয়ানদহ গণহত্যা**

কলম হত্যাযজ্ঞ শেষ করে ফিরছিল হানাদার বাহিনী নাটোরের দিকে। হাতিয়ানদহ নাটোর থেকে মাত্র ৭ মাইল দূরে কলম যাওয়ার পথেই হাতিয়ানদহ গ্রাম। মিলিটারি আসছে দেখে হাতিয়ানদহ গ্রামবাসী স্বভাবতই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে এবং গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। কিন্তু কিছু বাঙালি দালালের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রামেই থেকে যায়। পাকিস্তানি ট্রাকে করে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত হয়ে হাতিয়ান্দহ গ্রামের ওপর দিয়ে কলম গ্রামে যাওয়ার পথে গ্রামের কিছু লোক তাদের ট্রাকের সামনে পড়ে যায়। এতে তারা ট্রাক থামিয়ে 'ডর মাত কর' বলে সান্ত্বনা দিয়ে কলম চলে যায়। হয়তো তখনও তাদের জানা ছিল না, এটাও একটা হিন্দু প্রধান গ্রাম। কলম গ্রামের গোলাগুলির শব্দে হাতিয়ান্দহ গ্রামের লোকেরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে।[৩২] বিকেল ৩.৩০-৪টার দিকে পাকিস্তানি বাহিনীর ট্রাক নাটোরে না গিয়ে হাতিয়ানদহ গ্রামে ঢুকে পড়ে। হাতিয়ানদহ মীর পরিবারের সদস্য দালাল ময়েন উদ্দিন মীর পাকিস্তানিদের ছোট্ট ব্রিজের কাছ থেকে হাতিয়ানদহ গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। তাদের তখন বলা হয়, এই গ্রামে মালাউন এবং মুক্তি বাহিনী লুকিয়ে আছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে অনেকে এখানে আশ্রয় নিয়েছে।[৩৩]

ঘাতক বাহিনী গ্রামে ঢুকেছে দেখে অনেকে সড়ে পড়ার উপায় না থাকায় তাঁরা গ্রামের উল্টোদিকে একটি জঙ্গলে আশ্রয় নেন। সেখানে মেশিন গান দিয়ে গুলি করতে থাকে। তখন জঙ্গলে অবস্থানকারী মানুষজন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে গিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের হাতে ধরা পড়ে যায়। এদের মধ্যে প্রায় ২০-২২ জনকে সারিবদ্ধভাবে বাছাই করে লাইনে দাঁড় করানো হয়। হিন্দু ও মুসলিম ভিত্তিতে দুটি লাইনে দাঁড় করায় বগুড়াপাড়া গ্রামে (শিতলীতলা)। এরপর গুলি করতে থাকে লাইনে। একই পরিবারের বলরাম

চন্দ্র, হরিদাস মারা যায়। তাঁদের বাড়ির আশ্রিত ব্রাহ্মণ শশাঙ্ক শেখর চক্রবর্তীকে গুলি করতে চাইলে শশাঙ্কের স্ত্রী অনুরোধ করে, সে অন্ধ, যেন ছেড়ে দেয়, তখন তাঁকে ছেড়ে দেয়। বিনয় কৃষ্ণ কুন্ডুকে গুলি করতে লাগলে তিনি টান হয়ে শুয়ে পড়েন। তাঁর নাকের উপর রক্ত দেখে নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা পরীক্ষা করে ঘাতকরা। তখন নিঃশ্বাস কিছুসময়ের জন্য বন্ধ রেখে বেঁচে যান তিনি। শশীভূষণ গুলি লেগে কাতরাচ্ছিলেন। রাগে ঘাতকদের আরেকটি গুলি করতে বলে। তখন আরেকটি গুলি করলে তিনি মারা যান। গ্রামের বিধবা সুশিলা ও নিয়োতী রানীকে ধরে নিয়ে যায় ঘাতকবাহিনী। মোঃ আব্দুলকেও গুলি করে। তিনি ৫-৬ মাস বেঁচেছিলেন।

ভোলানাথ কর্মকার ছেলে বিজয় কর্মকারকে বাঁচাতে গুলি করবার সময় জাপটে ধরে। ফলে গুলি লেগে ভোলানাথ মারা যান। ঈশ্বরদির নরেশ কুন্ডু ইন্দু শেখরের বাসায় থাকতেন। উভয়কেই গুলি করে হত্যা করে। আওয়ামী লীগ সদস্য শশধর সরকার মনে করে শশধর প্রাংকে হত্যা করে ঘাতক দালালরা।

রতিকান্ত সাহা বাড়িতে ছিলেন। জানালা দিয়ে দেখতে পান একটি মেয়েকে পাকিস্তানি বাহিনী ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি বসে থাকতে পারেননি। তাই বাঁচাতে এগিয়ে এলে হানাদাররা লাঠি দিয়ে পিটিয়ে দীর্ঘল গ্রাম গামী রোডে হত্যা করে। গ্রামের রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের শরীরে গুলি লাগে। তাঁকে তাঁর বাড়ি মঠগ্রামে নিয়ে গেলে রাতে মারা যান। মেয়ের বাড়ি বেড়াতে এসে প্রাণ হারান হারান চন্দ্র প্রাং। মেশিনগানের গুলি লেগে তিনি মারা যান। শশী প্রামাণিক নামক রাজমিস্ত্রী পাকিস্তানি বাহিনী চলে গিয়েছে ভেবে বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে দীঘলগ্রাম রোডে হত্যা করে গুলি করে। এভাবে বগুড়া পাড়া গ্রামে ২২ জনের মধ্যে প্রায় ১৭-১৮ জন শহীদ হন। লাইনে থাকা অনেকে বেঁচে যান। আবার কেউ কেউ জঙ্গলে গুলি চলা কালীন সময়ে আহত হন। বিনয় কৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথ, সতীশ চন্দ্র, বিষ্ণুপদ সহ প্রায় ১৩ জনের মত আহত হন এসময়। দীঘল গ্রাম রোডেও বহু মানুষ মারা যান।

নিরঞ্জন মানি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, পাকিস্তানিরা যাঁদের হত্যা করেছে, এমন অনেক ব্যক্তির লাশ গ্রামের মধ্যে বিনয় কুন্ডুর বাড়ির উত্তর পাশে যে পাকা ইন্দারা রয়েছে সেখানে ফেলে দেয়া হয়েছে। তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি। কারণ তাঁরা বিভিন্ন স্থান থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছিল।[৩৪] হাতিয়ানদহে বিকাল থেকে মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে বহু মানুষ হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে ঘাতক পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা।

**লারকিমারী বিল গণহত্যা**

১৯৭১ সালে ৮ই মে সকালের দিকে লারকিমারী বিলে মাছ ধরছিলেন সাঁঐল গ্রামের খাদেম আলী। তাঁকে সেখানেই হত্যা করে ও লাশ আত্রাই নদীতে ভাসিয়ে দেয়। একইদিন কলম ও হাতিয়ানদহ সহ বিভিন্ন গ্রামে হত্যাযজ্ঞ চালালে বহু মানুষ প্রাণভয়ে লারকিমারী বিলের ধান ও তিল ক্ষেতের মাঝ দিয়ে কতুয়াবাড়ীর দিকে যেতে থাকে। ঐ অবস্থায় পাকিস্তানি বাহিনী নির্বিচারে গুলি করে প্রায় দুই শত লোককে হত্যা করে। পরে স্থানীয় কতুয়াবাড়ী গ্রামের অনেক মিলে মহিষের গাড়িতে করে আত্রাই নদীতে ভাসিয়ে দেয়। কতুয়াবাড়ির মফিজ সরদার লারকিমাড়ি বিল হয়ে হাল নিয়ে মাঠে যাচ্ছিল। মিলিটারিরা রাস্তায় তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

### আশুতোষ মৈত্র গণহত্যা

ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের কৈলাশ মৈত্রেরপুত্র আশুতোষ জঙ্গলে লুকিয়েছিল। পরিবারের সবাই অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল। রাজাকার চাঁদ ও মঙ্গলার সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী যে মাসে তাকে বাড়িতে গুলি করে হত্যো করে।

### আত্রাই গণহত্যা

কলম গ্রামের করিম রাজাকারের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী ৮ই মে পুন্ডরী কলমের বাসিন্দা মোয়াজ্জেম হোসেনকে হত্যা করে আত্রাই নদীর ধারে। পরে তাঁকে নদীতে ফেলে দেয়। ভাদ্র মাসের ২ তারিখ রোজ শুক্রবার নৌকা নিয়ে আত্রাই ধানের ব্যবসা করতে গিয়েছিলেন খড়মকুড়ির আজিজুল প্রাং, কাতেব আলী ও নূরা। তখন পাকিস্তানি বাহিনী তাঁদের ধরে এবং গুলি করে হত্যা করে আত্রাই ব্রিজের উপরে। পরে নদীতে ফেলে দেয়া হয়।

### কতুয়াবাড়ি হত্যা

কতুয়াবাড়ি প্রাথমিক স্কুলের পাশে নদীর পাড়ে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ধারী হিন্দু লোককে পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করে ফেলে রেখেছিল। পরে তাঁকে আত্রাই নদীতে ভাসিয়ে দেয় স্থানীয়রা।

### লালোর গণহত্যা

পাকিস্তানি বাহিনী সিংড়া থানার লালোর গ্রামে এসে উপস্থিত হয়ে ২৪ জন নিরস্ত্র নিরীহ মানুষকে হত্যা করে আগস্ট মাসে। সে সময় লালোর বাজারে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক দোকান খুলে বসেছিলেন। অতর্কিতে পাকিস্তানিদের আগমনে তিনি দোকান ফেলে পালাতে না পেরে হানাদারদের হাতে ধরা পড়েন। সবাইকে সারিবদ্ধ করা হয়েছে। হঠাৎ উক্ত হোমিও চিকিৎসক ইংরেজিতে বলেন, 'স্যার আই অ্যাম ব্লাইন্ড'। তিনি সত্যিকারে অন্ধ কিনা পরীক্ষা করে, হত্যার উদ্দেশ্যে দাঁড় করানো সারি থেকে লাথি মেরে বের করে দেয়। তারপরে মেশিনগান দিয়ে গুলি করে ২৪ জনকে হত্যা করে। এই গণহত্যায় নিহতদের সবার নাম সাক্ষাৎকারদাতারা বলতে পারেননি। সে সময় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জীবন রক্ষার জন্য আত্মীয় বন্ধু এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন লালোর।[৩৫]

এছাড়া সিংড়া থানার হুলহুলিয়ার শহীদ রফিকুল ইসলাম, ইটালীর তায়জুল ইসলাম, ভুলবাড়িয়ার সৈয়দ আলী, সৈয়দপুরের মোহাম্মদ আলী, পালশার ফটিক খন্দকার প্রমুখ ভারতের শরণার্থী শিবিরে যাওয়ার পথে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর গুলিতে জয়পুরহাটের পাঁচবিবি নামক স্থানে প্রাণ হারান। এছাড়া যশোর সরকারি হাসপাতালে কর্মরত থাকা অবস্থায় মানিক চাপারের সিরাজুল ইসলাম পাকিস্তানি সৈন্যের গুলিতে প্রাণ হারান।

## সিংড়া উপজেলায় বধ্যভূমি ও গণকবর

১৯৭১ সালে সিংড়া উপজেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দালালরা যেসব নিরীহ মানুষদের হত্যা করেছিল তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে একসাথে গর্তে, রাস্তায়, নর্দমায় প্রভৃতি স্থানে ফেলা হয়েছিল। অনেক নারীকে ক্যাম্পে নিয়ে নির্যাতনের পর হত্যা করে ফেলা দেয়া হত বিভিন্ন স্থানে। ফলে এই উপজেলায়ও রয়েছে গণকবর ও বধ্যভূমি। সেগুলোর বর্ণনা নিম্নে দেয়া হলো :

কলম গণকবর

১৯৭১ সালের ৮ই মে কলম ইউনিয়নের কদমতলী গ্রামে ৭জন ব্যক্তিকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দালালরা হত্যা করে। তাঁদের একসাথে স্থানীয়রা একটি গর্ত খুঁজে কবর দেয়। ১৯৯৬ সালে সরকারের পক্ষ থেকে গণকবরের উপর একটি স্মৃতি কাঠামো গড়ে তোলা হয়।

হাতিয়ানদহ গণকবর

১৯৭১ সালে ৮ই মে হাতিয়ানদহে ২২ জনের মধ্যে যে ১৮ জন মারা যান তাঁদেরকে একসাথে গণকবর দেয়া হয়। তৎকালীন চেয়ারম্যান বদিউজ্জামান চৌধুরী সৎ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর উদ্যোগে ঘটনাস্থলে একটি ডোবায় ফেলে মাটি চাপা দেয়া হয়। পরে স্থানীয়দের আগ্রহে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এড. জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি. ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক শহীদদের স্মরণে স্মৃতিফলক নির্মাণ করা হয়েছে।

## নতুন গণহত্যার সন্ধান লাভ

এই গবেষণা কর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে লারকিমারী বিল, আত্রাই, কতুয়াবাড়ী গণহত্যা সম্পর্কে জানা গিয়েছে। এ সম্পর্কে অন্য কোন গ্রন্থ থেকে জানা যায়না।

## সিংড়া উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও স্মারক

সিংড়া উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধ ও গণহত্যায় শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে গণকবর, বধ্যভূমি সহ বিভিন্ন স্থানে স্মৃতিকাঠামো গড়ে উঠেছে। নিম্নে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো :

### কলম স্মৃতি কাঠামো

কলম ইউনিয়নের কদমতলী গ্রামে ১৯৯৬ সালে গণকবরের উপর সরকারি উদ্যোগে এই স্মৃতি কাঠামো নির্মিত হয়েছিল।

### হাতিয়ানদহ স্মৃতিসৌধ

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলকের উদ্যোগে সরকারের পক্ষ থেকে হাতিয়ানদহের বগুড়াপাড়া গ্রামে গণকবরের উপর স্মৃতিসৌধটি গড়ে ওঠে।

এছাড়া কিছু বেইলি ব্রিজ নির্মিত হয়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের নামে:

১) বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফুল ইসলাম এর নামে নির্মিত এ ব্রিজটি ২০১৩ সালে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক উদ্বোধন করেন।
২) আরেকটি ব্রিজ বীর মুক্তিযোদ্ধা সায়বর রহমানের নামে নির্মিত।
৩) বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহাদাত হোসেনের নামে নির্মিত।
৪) বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাকের নামে নির্মিত।

এগুলো সিংড়া হতে বাড়ুহাস রোডে নির্মিত হয়েছে।

৫) বড়িয়া গ্রামে (চৌগ্রাম ইউনিয়ন) নির্মিত হয়েছে বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান আলীর নামে বেইলি ব্রিজ।
৬) সিংড়া থেকে কলম রাস্তার পাটকোল বেইলি ব্রিজ বীর মুক্তিযোদ্ধা বদিউজ্জামান এর নামে ২০০৯ সালে নির্মিত হয়।

৭) সিকিচোড়া (ইটালি ইউনিয়নে) গ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রউফের নামে ২০১৩ সালে নির্মিত হয় বেইলি ব্রিজ।

৮) লালোর ইউনিয়নের ডাঙ্গাপাড়া গ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা নূরুজ্জামান তালুকদারের নামে নির্মিত হয়েছে বেইলি ব্রিজ।

৯) শেরকোল ইউনিয়নের তেলিগ্রামে বীর মুক্তিযোদ্ধা ফয়েজ আহমেদ এর নামে বেইলি ব্রিজ নিমিতি হয়েছে।

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণের দ্বারা অনুপ্রাণিত সিংড়া জেলার জনগণও মুক্তি চেয়েছিল পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর নিষ্পেষণ থেকে। আর তাই তারাও সংঘবদ্ধ হয়েছিল নিজ প্রচেষ্টায়। সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিল জনগণের। কিন্তু সরষের মধ্যেই ভূত থাকার মতো স্থানীয় রাজাকার-আলবদর আলশামস ও শান্তিকমিটির সদস্যদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সিংড়া উপজেলায় এসেছিল। নাটোর, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থান থেকে নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য এসেছিল এ উপজেলায়। হিন্দু অধ্যুষিত কলম ও হাতিয়ানদহ সহ লারকিমারী বিল, সিংড়া বাজার প্রভৃতি স্থানে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় ঘাতক রাজাকারদের সাহায্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। হিন্দু, মুসলিম সকল শ্রেণীর মানুষকেই হত্যা করে লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে। ধর্ষণ করে বহু মেয়েকে। নিয়োতা রানী মানসিক ভারসাম্যহীন হলেও তাঁকেও ছেড়ে দেয়নি হানাদাররা। হাতিয়ানদের মীর ময়েন উদ্দিন নানাভাবে সেবা করেছে পাকিস্তানি হানাদারদের।

১৯৭১ সালের আগস্ট পর্যন্ত সিংড়াতে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে ঘাতক ও রাজাকার দালালরা। ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে এ উপজেলার মুক্তিকামী জনতা হানাদার মুক্ত করে স্বাধীনতা অর্জন করে। দীর্ঘ ৯ মাসের অত্যাচার, নির্যাতন, স্বজন হারানোর বেদনা প্রভৃতি সবকিছুর মধ্যেই বিজয়ের গৌরব অর্জন করেছে এ অঞ্চলের মানুষ। ২১শে ডিসেম্বর নাটোর পরাজিত পাকিস্তানি হানাদারদের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। আব্দুল করিম রাজাকারের জেল হয়। পরে তিনি মারা যান।

সিংড়া উপজেলার কলম ও হাতিয়ানদহ গণহত্যা সম্পর্কে আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেনের *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস(দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থ এবং সুজিত সরকারের নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া চয়েন হত্যা, লালোর গণহত্যা ও রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য হত্যা সম্পর্কে সুজিত সরকারের গ্রন্থ থেকে জানা যায়। কিন্তু লারকিমারী বিল, কতুয়াবাড়ী, আত্রাই গণহত্যা, আশুতোষ মৈত্র হত্যা, সম্পর্কে কোন গ্রন্থে জানা যায়নি। গবেষণাকর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে এগুলোর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ১৯৭১ সালে সিংড়া উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগী হিসেবে যারা কাজ করেন তাদের নাম আমরা পাই সুজিত সরকারের *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থে। এ গ্রন্থে শান্তিকমিটির দালালদের ২১ জন ও রাজাকার আলবদরদের ৪০ জন সদস্যের তালিকা রয়েছে।

**তথ্য নির্দেশ**

---

[১] সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৭৩

[২] সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া- ত্রয়োদশ খন্ড*, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১, পৃ. ৪২৩-৪২৪

[৩] জেলা বাতায়ন (http://singranatore.gov.bd)

[৪] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান* ১৯৭৪, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পৃ. ১৫৮

[৫] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩-৪২৪*

[৬] জেলা বাতায়ন (http://singranatore.gov.bd)

[৭] জেলা বাতায়ন (http://kalamup.natore.gov.bd)

[৮] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৩-৪২৪*

[৯] জেলা বাতায়ন (http://kalamup.natore.gov.bd)

[১০] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান* ১৯৭৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

[১১] জেলা বাতায়ন (http://hatiandahaup.natore.gov.bd)

[১২] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান* ১৯৭৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

[১৩] জেলা বাতায়ন (http://hatiandahaup.natore.gov.bd)

[১৪] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান* ১৯৭৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

[১৫] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান* ১৯৭৪, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

[১৬] জেলা বাতায়ন (http://hatiandahaup.natore.gov.bd)

[১৭] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩

[১৮] মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ-দ্বিতীয় খন্ড*, সময়, ঢাকা ২০১৩, পৃ. ৪৭০-৪৭১

[১৯] মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওদুদ (৬৪), পিতাঃ ওয়াহেদ আলী, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ সিংড়া। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সিংড়া, ১৭ জানুয়ারি ২০১৬

[২০] অধ্যাপক আব্দুর রহমান (৬৪), পিতাঃ মুন্সী ইসলাম উদ্দিন, গ্রামঃ কুমারপাড়া (কদমতলী) ইউনিয়নঃ কলম, উপজেলাঃ সিংড়া, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৬

[২১] জাহানারা বেগম(৭০), স্বামীঃ শহীদ আব্দুল আজিজ, গ্রামঃ কুমারপাড়া (কদমতলী) ইউনিয়নঃ কলম, উপজেলাঃ সিংড়া, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ নিজ বাড়ি, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৬

[২২] অধ্যাপক আব্দুর রহমান (৬৪), প্রাগুক্ত

[২৩] বিনয়কৃষ্ণ কুন্ডু (৮১), পিতাঃ বলরাম চন্দ্র কুন্ডু, গ্রামঃ হাতিয়ানদহ, ইউনিয়নঃ হাতিয়ানদহ, উপজেলাঃ সিংড়া, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ হাতিয়ানদহ বাজার, ১৭ জানুয়ারি ২০১৬

[২৪] বিজয় কর্মকার (৫৮), পিতাঃ শহীদ ভোলানাথ কর্মকার, গ্রাম+ইউনিয়নঃ হাতিয়ানদহ, উপজেলাঃ সিংড়া, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ হাতিয়ানদহ বাজার, ১৭ জানুয়ারি ২০১৬

[২৫] বিনয়কৃষ্ণ কুন্ডু, প্রাগুক্ত

[২৬] গোপাল বিহারী দাস (৫৭), পিতাঃ বনবিহারী দাস, গ্রামঃ সাঁঐল, ইউনিয়নঃ কলম, উপজেলাঃ সিংড়া, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ সিংড়া বাসষ্ট্যান্ড, ২০ জানুয়ারি ২০১৬

[২৭] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৫-২২৬

[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৮

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯

[৩১] আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের* আঞ্চলিক ইতিহাস, দ্বিতীয় খন্ড, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ১৫৫

[৩২] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৫

[৩৩] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১-২৩২

[৩৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩১

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪২

# সপ্তম অধ্যায়

## বড়াইগ্রাম উপজেলা

নাটোর সদর উপজেলার দক্ষিণে অবস্থিত বড়াইগ্রাম উপজেলা। জনসংখ্যার দিক দিয়ে এটি নাটোর জেলার তৃতীয় বৃহত্তম উপজেলা। মুক্তিযুদ্ধের সময় এ অঞ্চলটিও রক্ষা পায়নি। এ উপজেলার মানুষেরা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কখনই বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করবে না। ফলে অন্যান্য অঞ্চলের মত তারাও বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর উপর। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংগঠিত হতে থাকে পাকিস্তানি শাসকদের মোকাবেলা করতে। ফলে তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে স্বাধীনতাবিরোধী পাকিস্তানি বাহিনীর সমর্থক রাজাকার, আলবদর প্রভৃতি ঘাতক দালাল। এ উপজেলার মানুষের উপর তারা চড়াও হয়ে গণহত্যা, নির্যাতন তথা ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। পাকিস্তানিরা ১১ই এপ্রিল বড়াইগ্রামে প্রবেশ করে এবং স্থানীয় দালাল রাজাকার তথা ঘাতক-দালালদের সঙ্গে মিলিত হয়ে হত্যা, নির্যাতনে মেতে উঠে। মূলত পাকিস্তানি মেজর গিয়াসউদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে ক্যাপ্টেন রশিদ, জাহাঙ্গীর পারকোল, নটাবাড়িয়া প্রভৃতি গ্রামসহ পুরো বড়াইগ্রাম দখল করে ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে।

**অবস্থান:**

বড়াইগ্রাম থানা গঠিত হয় ১৮৬৯ সালে এবং উপজেলা হিসেবে রূপান্তর ঘটে ১৯৮৩ সালে। বড়াইগ্রাম উপজেলার নামকরণ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কিছু জানা যায় না। এ উপজেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে বড়াল নদীর দুটি শাখা। উপজেলার অধিকাংশ গ্রামই বড়াল নদীর দুইধারে অবস্থিত। সে কারণে একে বড়ালগ্রাম বলা হত। কালক্রমে বড়াল নদী থেকেই বড়াইগ্রামের উৎপত্তি হয়েছে। এককালের খালে ভরা জঙ্গলাবৃত স্থানটুকুই বর্তমানে বড়াইগ্রাম নামে পরিচিত।[১] এ উপজেলার আয়তন ২৯৯.৬১ বর্গ কি.মি.। এ উপজেলার অবস্থান যথাক্রমে ২৪°১০ এবং ২৪°২১ উত্তর অক্ষাংশ এবং যথাক্রমে ৮৮°০১ এবং ৮৯°১৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। এ উপজেলার উত্তরে গুরুদাসপুর এবং নাটোর সদর উপজেলা। পূর্বে পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলা, দক্ষিণে নাটোর জেলার লালপুর এবং পাবনা জেলার আটঘরিয়া ও ঈশ্বরদী উপজেলা ও পশ্চিমে নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলা।[২] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বড়াইগ্রাম উপজেলার জনসংখ্যা ছিল ১৪০৭৯৮ জন[৩] এবং বর্তমানে ২৪৪৮২১ জন(২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। এই উপজেলায় পৌরসভা রয়েছে ২টি, ইউনিয়ন রয়েছে ৭টি এবং নদী রয়েছে বড়াল ও মরা বড়াল।[৪]

এক সময়ের বড়াইগ্রাম উপজেলা হেড কোয়ার্টার বনজঙ্গলে ভরা ছিল। বনপাড়া-পাবনা মহাসড়ক এবং বনপাড়া- হাটিকুমরুল মহাসড়ক হওয়ার পর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে বড়াইগ্রাম উপজেলার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এ অঞ্চলেপ্রচুর খেঁজুরের গুড় উৎপাদিত হয়। অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী। এ উপজেলায় হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ ছাড়াও পাহাড়ী, মুন্ডা, ওরাঁও, মাহাতো প্রভৃতি আদিবাসী জনগোষ্ঠী রয়েছে।[৫]

বড়াইগ্রাম উপজেলার যেসব ইউনিয়ন, গ্রাম ও এলাকাতে গণহত্যা ও নির্যাতন অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর বর্ণনা উল্লেখ করা হল :

**মাঝগাঁও ইউনিয়ন :**

বড়াইগ্রাম উপজেলা সদর হতে ৪ কি.মি. উত্তরে মধ্যবর্তী সমানে উপজেলার বৃহত্তম, মাঝগাঁও ইউনিয়ন।[৬] এর আয়তন ১২৩২৬ একর।[৭] এর পশ্চিমে কালিকাপুর দক্ষিণে নগর ইউনিয়ন রয়েছে। এর পাশ দিয়ে বয়ে গেছে মরা বড়াল নদী।[৮] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ছিল ২৫৯৪১ জন। বর্তমানে জনসংখ্যা ৪৬৯৬১ জন(২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী )।[৯] এ ইউনিয়নে বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তর হাওর বিল অবস্থিত যেটি বিল 'চিনি ডাঙ্গা' নামে পরিচিত। এখানে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। এখানে গ্রাম রয়েছে ২১টি। নদী ও বিল থাকায় মাছের চাষ হয় প্রচুর। অনেকেই মৎস্যজীবী এখানে। এলাকাটি একটু উঁচু নিচু।[১০]

**নটাবাড়িয়া :**

এটি মাঝগাঁও ইউনিয়নের অর্ন্তগত। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর আয়তন ছিল ৭৯৭ একর ও জনসংখ্যা ছিল ১৫৯৯ জন।[১১] বর্তমানে জনসংখ্যা ৩১৮৬ জন(২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)।[১২] ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি ও তাদের সহযোগীরা গণহত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করে।

**নগর ইউনিয়ন :**

বড়াইগ্রাম উপজেলার মধ্যবর্তী স্থানে উপজেলার অন্যতম নগর ইউনিয়ন অবস্থিত। উত্তর প্রান্তে বড়াইগ্রাম, মাঝগাঁও, পূর্ব প্রান্তে, জোনাইল, চাপাই, দক্ষিণক্রান্তে গোপালপুর ইউনিয়ন এবং পশ্চিম প্রান্তে লালপুর উপজেলার কদিমচিলানি, দোয়ারিয়া, ইউনিয়ন।[১৩] এ ইউনিয়নের আয়তন ১২৪৯৪(প্রায়)।[১৪] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ৪৩৪৫৪ জন।[১৫] এ ইউনিয়নের গ্রাম সংখ্যা ৪২টি ও ওয়ার্ড ৯টি। ইউনিয়নের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে বিশ্বরোড চলে গিয়েছে। উপজেলার বৃহত্তর নদী খলিশাডাঙ্গা প্রায় ১২ কি.মি., পচা বড়াল প্রায় ৩ কি.মি., মরা বড়াল প্রায় ১৫ কি.মি., সাতইল ও চিনিডাঙ্গা বিলের অংশবিশেষ এ ইউনিয়নে অবস্থিত। এছাড়া ঠেঙ্গামারা, বোয়ালিয়া, পাতিয়ার, চাড়ালের বিলসহ আরও কয়েকটি বিল আছে। এখানকার পাটিয়া দিঘী একটি বিশাল দিঘী।[১৬]

**পারকোল :**

নগর ইউনিয়নের অর্ন্তভূক্ত গ্রাম এটি। পূর্বে এটি মাঝগাঁও ইউনিয়নের অর্ন্তগত ছিল। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর আয়তন ৩৯৬৪৬ একর ও জনসংখ্যা ১৮৯০ জন ছিল।[১৭] বর্তমানে এর জনসংখ্যা ৩২২২ জন।[১৮] পারকোল গ্রামের রাস্তাঘাট অধিকাংশই কাঁচা। ফলে বর্ষাকালে চলাচল দুরূহ। বাড়ীঘর বেশিরভাগই মাটি, টিন, খড়, বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত। এ গ্রামে এখনও মহিষের গাড়ি চলে। ১৯৭১ সালে এ গ্রামের স্যান্নালের পুকুর নামক স্থানে আশ্রিত প্রচুর মানুষকে পাকিস্তানি হত্যা করে। এছাড়া লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করে তারা।

**ধানাইদহ :**

১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এ গ্রামটির আয়তন ছিল ১০৩৭ একর ও জনসংখ্যা ছিল ১৭৭২ জন।[১৯] ১৯৭১ সালে ধানাইদহ ব্রিজের দক্ষিণ পার্শ্বে পাকিস্তানি ও রাজাকার বহু মানুষকে হত্যা করে, এছাড়া অগ্নিসংযোগ করে।

**কয়েন :**

১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এ গ্রামটির আয়তন ছিল ৩১০ একর ও জনসংখ্যা ছিল ৭৬৮ জন।[২০] ১৯৭১ সালে কয়েন বাজারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আসে। তারা সেখানে প্রায় ২৫০'শ বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয়। এখানে পাকিস্তানি ক্যাম্প করেছিল।

**গোপালপুর ইউনিয়ন :**

গোপালপুর ইউনিয়ন পরিষদ আস্তিকপাড়া সংলগ্ন নাটোর পাবনা মহাসড়কের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার শেষ প্রান্তে গোপালপুর ইউনিয়ন। দক্ষিণ প্রান্তে বড়াইগ্রাম ও মাঝগ্রাম, উত্তর প্রান্তে জোনাইল ও চান্দাই, দক্ষিণ প্রান্তে পাবনা জেলার মুলাডুলি, পশ্চিমপ্রান্তে নগর এবং লালপুর উপজেলার কদিমচিলান, দোয়ারিয়া ইউনিয়ন। পূর্ব প্রান্তে আটঘরিয়া গ্রাম (জোয়াড়ী ইউনিয়ন)। কমলা নদী পাবনা ও গোপালিপুর ইউনিয়নের মাঝে অবস্থিত (প্রায় ২৫ কি:মি:)।[২১] এ ইউনিয়নের আয়তন ৭০৩৮ একর।[২২] লোকসংখ্যা ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ছিল ১১৭৮০ জন।[২৩] বর্তমানে জনসংখ্যা ২২৯১১ জন ও গ্রাম সংখ্যা ১৪টি।[২৪] খালিশাডাঙ্গা, পচাবড়াল, মরা বড়াল দ্বারা এ এলাকা বেষ্টিত। সাতইল ও চিনিডাঙ্গা বিলের সাথে মিশেছে কমলা নদী। এছাড়া খাল বিল রয়েছে বলে প্রচুর মাছ পাওয়া যায়।[২৫]

**বনপাড়া পৌরসভা :**

এটি বড়াইগ্রাম উপজেলার অর্ন্তগত। ২০০২ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আয়তন ৬.৯২ কি:মি: ও ওয়ার্ড সংখ্যা ৯টি। বর্তমানে জনসংখ্যা ২২৮৬৭ জন। বনপাড়া বাজার থেকে ১ কি:মি: পশ্চিমে একটি খ্রিষ্টান মিশন রয়েছে। এটি বনপাড়া ক্যাথলিক মিশন নামে পরিচিত। নাটোর জেলার দক্ষিণ সীমানায় বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া পৌরসভার ৫টি এবং জোয়াড়ী ও মাঝগ্রাম ইউনিয়নের ২টি সহ ৭টি গ্রাম নিয়ে এই ধর্মপল্লী প্রতিষ্ঠিত। বড়াল নদীর দক্ষিণে এর অবস্থান। ১৯৪০ সালের দিকে প্রথম স্বর্গীয় ফাদার থমাস কাত্তানের (পিমে) একজন ইতালীয় ধর্মযাজক সর্বপ্রথম আসেন। ১৯৭১ সালে বনপাড়া মিশনে আশ্রিত বহুলোক কে ধরে নিয়ে হত্যা করে, নির্যাতন করে বহু মহিলাকে।[২৬]

## স্থানীয় পর্যায়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি

বড়াইগ্রামের মূলাডুলি স্কুল মাঠে আনসার সদস্য হযরত আলী, আলী আযম এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে ছুটি ভোগ করতে আসা বাঙালি সৈনিক আবু মোহাম্মদ প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন রফিকুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন প্রমুখ সংগঠকেরা বিভিন্ন গ্রাম থেকে যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতেন। বড়াইগ্রামের কুজাইল গ্রামের বেলালউদ্দিনের ছেলে সদ্য স্নাতক পাস করা স্কুল শিক্ষক আব্দুল আজিজ, মেরীগাছা  পাঁচবাড়িয়া স্কুলের প্রধান শিক্ষক আব্বাস আলী এবং ওই একই গ্রামের আবু রায়হান-এই ৩জনও সংগঠকের ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া বড়াইগ্রামে পাকিস্তানি দালালদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিরোধে অংশ নিয়ে তারা যোগ্য সংগঠকের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের প্রতি জনগণের সমর্থন আর ভালোবাসা ছিল, সেই সঙ্গে সহযোগিতা আদায় করতে তারা সমর্থ হয়েছিলেন।[২৭] এভাবে বড়াইগ্রামবাসী স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

## সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাষণে অনুপ্রাণিত হয়ে বড়াইগ্রাম উপজেলার জনগণও মুক্তির আদর্শের প্রেরণা লাভ করেছিল। নিজ এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ থানায় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় মার্চ মাসেই। এর নেতৃত্বে ছিলেন–এ্যাডভোকেট খালেক (কুছুয়াকোড়া), মোঃ আত্তাব আলী (পিন্টু) কুমরুল), মোঃ এশারত আলী (কামারদহ), আঃ রাজ্জাক (আওয়ামী লীগ সভাপতি) হারোয়া), ওয়াহেদ আলী সুনার (মহিষ ভাঙ্গা), আয়নুল হক (মহিষভাঙ্গা), আবুল কালাম (রাজাপুর),ডাঃ আবু দাউদ মাহমুদ (গোপালপুর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি),মোঃ আবুল কাশেম (চেয়ারম্যান) (নগর), আবুল কাশেম (চান্দাই ইউনিয়ন সংগ্রাম কিমিটির সভাপতি)। বড়াইগ্রাম থানার উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গ উল্লিখিত এলাকায় সংগ্রাম কমিটি গঠন করে নিজ নিজ এলাকায় প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও ঘাতক দালালদের বিরুদ্ধে।

## শান্তি কমিটি গঠন

১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকার গঠনের কিছুদিন পূর্বে বড়াইগ্রাম উপজেলায় বাংলাদেশের কতিপয় স্বাধীনতা বিরোধী ব্যক্তিবর্গ এলাকায় নিরাপত্তা রক্ষার মুখোশ পড়া একটি কমিটি গঠন করে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে সাহায্য করার জন্য। এটা হল শান্তি কমিটি।প্রায় প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তিকমিটির নেতৃত্বে ছিলেন একেকজন দালাল। সেগুলো হলঃ

১. নইমউদ্দিন- চেয়ারম্যান→শান্তিকমিটি কুমরুল

২. রকুমোদ্দা- চেয়ারম্যান→বনপাড়া পৌরসভা

৩. লোকমান- চেয়ারম্যান→ চৌহন গ্রাম, জোনাইল ইউনিয়ন

৪. আবুল সরকার- চেয়ারম্যান→নগর ইউনিয়ন (দারকোন)

উল্লেখ্য যে, আবুল সরকার ছিলেন বড়াইগ্রাম থানা শান্তিকমিটির প্রধান । ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭১ সালে মুক্তিবাহিনীর হাতে তিনি মারা যায়।

রকুমেদ্দা (বনপাড়া) মিশনে আশ্রিতদের খবর পাকিস্তানি বাহিনীকে দেয় ও পরে পাকিস্তানি বাহিনী এসে নিরীহ আশ্রিতদের ধরে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

## ঘাতক-দালালদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের চিত্র

১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসে স্থানীয় দালালদের সহায়তায় পাকিস্তানি বাহিনী বড়াইগ্রামের প্রায় প্রতিটি এলাকায় আক্রমণ চালায়। পারকোল, নটাবাড়িয়া কালির খুন, কালিকাপুর, বনপাড়া প্রভৃতি স্থানে রাজাকার, আলবদর ও পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করে। এসব স্থান থেকে বহু লোককে ধরে নিয়ে গিয়ে কয়েন বাজার ক্যাম্পে নির্যাতন করে। অনেককে নাটোর ক্যাম্পেও ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে হত্যা করা হয়। বহু নারীকে ধর্ষণ করে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দালালদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি ঘাতক হানাদাররা মহিলাদের ধরে নিয়ে গিয়ে ক্যাম্পে আটক রেখে পাশবিক নির্যাতন করে ছেড়ে দিত, কোন কোন ক্ষেত্রে হত্যা করত। হত্যা, ধর্ষণের পর তারা লুটপাট করত ও অগ্নিসংযোগ করে বাড়িঘর পুড়িয়ে দিত। কোন কোন ক্ষেত্রে গবাদি পশুও নিয়ে যেত। বনপাড়া মিশনে আশ্রয় নিয়েছিল লালপুর

উপজেলার বহু মানুষ। পাকিস্তানি বাহিনীকে সে খবর দেয় রাজাকার আলবদর ও শান্তিকমিটির লোকেরা। ফলে পাকিস্তানি সৈন্যরা এসে বহু নর-নারীকে ধরে নিয়ে গিয়ে নাটোর শহরে হত্যা, নির্যাতন, নারীদের ধর্ষণ করে। এসব নারীদের মধ্যে যাঁরা বেঁচে আছেন তাঁরা এখনও বয়ে চলছে দুর্বিষহ স্মৃতি আর যন্ত্রণাময় জীবন।

## সংঘর্ষের সূত্রপাত

১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী যে নির্মম হত্যা ধ্বংসের ত্রাস সৃষ্টি করেছিল, তা অব্যাহত ছিল ডিসেম্বর ১৯৭১ পর্যন্ত। দীর্ঘ ৯ মাসের নরকযন্ত্রণাময় জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে নাটোরবাসীদের। নাটোরে বিহারী ও বাঙালি সংঘর্ষের প্রভাব বড়াইগ্রাম উপজেলাতেও পড়েছিল। লালপুর থানার ময়না যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করার যুদ্ধে বড়াইগ্রাম বাসীও যোগ দিয়েছিল। ১১ই এপ্রিল পাকিস্তানি  বাহিনী নগর ইউনিয়নের সন্দেহ ব্রিজ দিয়ে প্রবেশের চেষ্টা করলে স্থানীয়রা প্রতিরোধ করে। এখানে কয়েকজন ই.পি.আর বাহিনী লোক ও ছিল। তারাও প্রতিরোধ করে। তবে পাকিস্তানি বাহিনী গুলিতে তাঁরা মারা যান। এছাড়া বড়াইগ্রামের মার্চ এপ্রিল মাসের মধ্যে প্রায় ১০০ জনকে ধরে নিয়ে যায়। তাদের মধ্যে ৯৯ জন শহীদ হন, ১জন বেঁচে যান। এভাবে শুরু হয় হত্যাযজ্ঞ। পরবর্তীতে পারকোল, নটাবাড়িয়া কালির ঘুন কালিকাপুর, বনপাড়া মিশন থেকে নিয়ে হত্যা সহ বহু হত্যা, নির্যাতন, ধর্ষণ করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকার আলবদর, আলশামস ও শান্তিবাহিনী।

## পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প

১৯৭১ সালে অন্যান্য উপজেলার তো প্রায় সব জায়গাইতেই এ উপজেলারও রাজাকার, আলবদর তথা দালাল চক্র ও পাকিস্তানি বাহিনী নিজেদের আস্তানা করেছিল। তবে এ উপজেলার কয়েন বাজার ক্যাম্প উল্লেখযোগ্য। এখানে পাকিস্তানির বহু লোককে ধরে এনে নির্যাতন করত।

## নারী নির্যাতন

এ উপজেলার বহু নারী ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী, রাজাকার, আলবদর প্রভৃতি দ্বারা লাঞ্ছিত, নির্যাতিত, ধর্ষিত হয়েছেন। তাদের মধ্যে সবাই নাম প্রকাশ করতে চায়নি সমাজ, পরিবারের ভয়ে ও সম্মান রক্ষার্থে। সমাজে নির্যাতিত নারীদের দুঃসহ, নানা যন্ত্রণা, নানা সমালোচনার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়। ১৯৭১ সালে নির্যাতিত বহু নারীই তাদের জীবন নতুন ভাবে শুরু করেছেন। ফলে সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার্থে নিজেদের সেই দুর্বিষহ দিনগুলোর কথা বলতে চাননি অনেকেই। আর একারণেই এই অভিসন্দর্ভে তাঁদের মূল ঘটনা ঠিক রেখে নামের ক্ষেত্রে ছদ্মনাম ব্যবহার করা হয়েছে। যথা–

১. **রাহেলা বেওয়া :** বাড়ি জোয়ারি ইউনিয়নের কুমরুল গ্রামে। অক্টোবর মাসে একদিন দুপুরবেলা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আসে বাড়িতে স্থানীয় রাজাকারদের সহযোগিতায়। তাঁকে ধরে নিয়ে যায় নাটোর ক্যাম্পে। সেখানে ৩দিন ৩রাত আটকে রেখে পাশবিক নির্যাতন করে। পরে অজ্ঞাত অবস্থায় গ্রামের এক ব্রিজের কাছে ফেলে রেখে যায়। স্থানীয়রা বাড়ি নিয়ে আসে। স্বামী আর সংসার করতে চাইছিল না। কিন্তু ছেলে, মেয়ে আছে, তাছাড়া রাহেলা বেওয়ারতো কোন দোষ নেই, এই বলে শান্তনা দিয়ে তিনি সংসার করতে রাজি হন। আজও সেই যন্ত্রনা বহন করে চলেছেন রাহেলা বেওয়া।

২. **শালুক বেওয়া :** বাড়িঃ জোয়াড়ী ইউনিয়ন। শালুক বেওয়ার ৩ ছেলের মধ্যে বড় দুই ছেলে নুরুল ইসলাম ও শামসুল আলম মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। এখবর পেয়ে রাজাকাররা খবর দেয় পাকিস্তানি হানাদারদের। শালুক বেওয়াকে তুলে নিয়ে যায় হানাদার বাহিনী নাটোর ক্যাম্পে। তাকেও ৩দিন ধর্ষণের পর ফেলে রেখে যায় ব্রিজের নিচে। স্বামী অবশ্য পরে তাকে মেনে নিয়েছিল।

৩. **হাফেজা বেওয়া :** তাঁর বাড়ি জোয়াড়ী ইউনিয়নে। তাঁর স্বামী মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন। ফলে পাকিস্তানি হানাদাররা স্থানীয় দালালদের নিয়ে আসে তাঁর বাড়িতে। তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। ছোট ছোট ছেলে মেয়ে। বাধ্য হয়ে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে যায়। আর ছেলেটাকে রেখে যায় বাবা মার কাছে। হাফেজা বেওয়াকেও নাটোর ক্যাম্পে নিয়ে ৩দিন পাশবিক নির্যাতনের পরে ফেলে রেখে যায় পাকিস্তানি হানাদাররা। স্বামী পরবর্তীতে যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে তাকে গ্রহণ করে।

৪. **নাজমা বেগম :** নাজমা বেগমের বাড়িও জোয়াড়ী ইউনিয়নে। স্বামী যুদ্ধে গিয়েছিলেন। ফলে তাকেও ধরে নিয়ে যায় পাকিস্তানি বাহিনী। ৩দিন ধর্ষণের পর ফেলে রেখে যায় গ্রামের ব্রিজের স্বামী ফিরে এলে তাকে গ্রহণ করেন।

৫. **সালমা বেওয়া :** জোয়াড়ী ইউনিয়নের কুমরুল গ্রামের বাসিন্দা মেহের আলী সরকার এর দুই স্ত্রী শালুক ও সালমা। উভয়কেই পাকিস্তানিরা ধরে নিয়ে যায়। ৩দিন আটকে নির্যাতন করার পর অজ্ঞাত অবস্থায় গ্রামের ব্রিজে রেখে যায়।

৬. **হাজেরা খাতুন :** হাজেরা খাতুন নামে মশিন্দা গ্রামের ওপর দিয়ে নাটোর আসার পথে তাঁকে ধর্ষণ করে। ধর্ষিতা হওয়ার কারণে হাজেরাকে তাঁর স্বামী এক অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে তালাক দিয়ে অন্যত্র চলে যায়। হাজেরা দেখতে সুন্দরী। ফলে দ্বিতীয় বার বিয়ে হলেও সেই স্বামীও তাঁর কাঁধে তিনটা সন্তান চাপিয়ে রেখে নিরুদ্দেশ হয়। তারপর হাজেরার জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। স্বাধীন দেশে বঙ্গবন্ধু সরকার ব্যতীত আর কোনো সরকারে কাছ থেকে কোনো সহযোগিতা পাননি। বর্তমানে ধনী গৃহস্থের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছেন।[২৮]

৭. বড়াইগ্রাম থানার বনপাড়ার পশ্চিমে কালিকাপুর গ্রামে প্রতিরোধকারীরা আশ্রয় নিয়েছে। এই মিথ্যে তথ্যের ওপর ভিত্তি করে হানাদার বাহিনী ২০শে এপ্রিল কালিকাপুর গ্রাম আক্রমণ করে। নির্বিচারে গ্রামের অধিকাংশ ঘর-বাড়ি লুটপাট করে এবং জ্বালিয়ে দেয়। পাকিস্তানিদের আক্রমণে গ্রামের সবাই পালাতে পারলেও একজন মহিলা পালাতে না পারলে সৈন্যরা তাঁকে ধরে নির্বিচারে ধর্ষণ করে। ফলে তিনি গর্ভবতী হন। স্বামী তাঁকে পরিত্যাগ করেন। বিজয় অর্জনের পর এলাকাবাসী অনেক বুঝিয়ে তাঁকে স্বামীর গৃহে তুলে দিয়ে যান। সেই বীরঙ্গনার অনুরোধে তাঁর নাম প্রকাশ করা হলো না।[২৯]

## বড়াইগ্রাম উপজেলার গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

১০ই এপ্রিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পাবনা দখল শেষ করে মুলাডুলি রেল গেইটের মধ্য দিয়ে নাটোর এর দিকে রওয়ানা দেয়। কিন্তু মুলাডুলিতে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় এবং স্থানীয় অনেক মানুষকে হত্যা করে হানাদাররা। এরপর মুলাডুলি রেল গেইট থেকে আনুমানিক তিন কিলোমিটার উত্তরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ধানাইদহ নামক স্থানে ব্রিজের কাছে এসে পুনরায় প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। উল্লেখ্য, বড়াইগ্রাম লালপুর এবং পাবনার উত্তর সীমান্তের জনগণ ধানাইদহ ব্রিজ ভাঙার কাজে লিপ্ত ছিলেন যেন পাকিস্তানি হানাদাররা নাটোরের দিকে অগ্রসর হতে না পারে। কিন্তু বড়াইগ্রাম উপজেলার রাজাকারদের

সাহায্যে পাকিস্তানি মেজর গিয়াসউদ্দিন চৌধুরী, ক্যাপ্টেন রশীদ ও জাহাঙ্গীর এর নেতৃত্বে হানাদার বাহিনী সরাসরি ব্রিজের রাস্তা ব্যবহার না করে সেটি থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে তাদের কনভয় নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।[৩০] ১০ই এপ্রিল রাতটি অপেক্ষা করে ১১ই এপ্রিল তারা ধানাইদহের পূর্ব দিক দিয়ে বয়ে যাওয়া কাঁচা রাস্তা দিয়ে পারকোল পাঁচবাড়িয়া হয়ে ব্রিজের সমান্তরাল পথ অতিক্রম করে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে নাটোর রোডে উঠে ব্রিজ ভেঙ্গে-যারা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছিল তাদের আক্রমণ করে। এখানে বেশ কয়েকজন স্থানীয় ও ই.পি.আর সদস্য শহীদ হন হানাদারদের গুলিতে। এরপর হানাদার বাহিনী বিকল্প রাস্তা দিয়ে নাটোরের পাকা সড়কে পৌঁছার সময় পারকোল, পাঁচ বাড়িয়া গ্রামে হত্যাযজ্ঞ চালায়। পারকোল গ্রামটি হিন্দু-অধ্যুষিত ছিল। হানাদার বাহিনী গ্রামগুলোর মানুষদের মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী মনে করে তাদের বাড়িঘর এ আগুন ধরিয়ে দেয়।

আব্দুল জলিল সরকার জানান,

> মাগরিবের একটু আগে পারকোল গ্রামের প্রায় সব বাড়িতেই আগুন ধরিয়ে দেয় হানাদাররা। এই গ্রামের ছবির উদ্দিন ও তাঁর আত্মীয় স্বজন সহ একই পরিবারের প্রায় ১০জন সদস্য এর প্রতিবেশী সহ প্রায় ২১ জনকে গুলি করে হত্যা করে। শিশু বৃদ্ধ মহিলা, পুরুষ কেউ বাদ যায়নি। অনেকেই হানাদার বাহিনী গ্রামে ঢুকেছে শুনে পালিয়ে গিয়েছিল। যারা ছিল তাদের অনেকে আশে পাশে জঙ্গলে লুকিয়েছিল। ছবির উদ্দিনের ভাইয়ের স্ত্রী জয়নব বিবি ও তাঁর কোলে থাকা শিশুপুত্র জাহাঙ্গীর আলমকে হানাদাররা গুলি করে হত্যা করে। অনেকে শরীরে গুলি লেগে পঙ্গুত্ব লাভ করেছে। ছবির উদ্দিনের আরেক আত্মীয় ধানাইদহ থেকে আসা রঙ্গলালকে পুড়িয়ে হত্যা করে ঘাতকরা।[৩১]

সাজদার রহমানের ছেলে শাহাদাৎ মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল জানতে পেরে পুরো পরিবারকে হত্যা করে হানাদাররা। প্রায় ৬জন নিরীহ প্রাণ বলি হয় তাদের হাতে। পাঁচবাড়িয়া গ্রামেও হত্যা লুটপাট অগ্নিসংযোগ করে। এ গ্রামেও প্রায় ৯-১০ জন লোককে হত্যা করে ঘাতক বাহিনী। ধানাইদহ, পারকোল, পাঁচবাড়িয়াতে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে তারা লুটপাট করে পুরো বড়াইগ্রাম দখলের চেষ্টা করে। এরপর ২০শে এপ্রিল হানাদার বাহিনী বনপাড়ার আশেপাশে আসে। বিভিন্ন ভাবে গুলি চালালে হারোয়াতে ৪ জন লোক মারা যায়। এরপর মাঝে মাঝেই পাকিস্তানি সৈন্যরা হত্যা নির্যাতন যজ্ঞ শুরু করে। বনপাড়ার মিশন হাসপাতালে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা বহু মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। স্থানীয় রাজাকাররা এবং দালালরা হিন্দুদের ওপর নির্যাতন ও বাড়িঘর লুটপাট শুরু করলে সেসব মানুষ জীবন রক্ষার তাগিদে এই খ্রিষ্টান মিশনারী বা ওপার বাংলাকেই নিরাপদ বলে মনে করেছিল। যারা পালাতে পেরেছিল পালিয়েছে ভারতে, কিন্তু যারা থেকেছে, তাদের অনেকেই আশ্রয় নিয়েছে মিশনে। পাকিস্তানি মেজর শেরওয়ানীর নেতৃত্বে বেশ কয়েকবার বনপাড়া মিশনে আক্রমণ করেছে হানাদার বাহিনী। নাটোরের কুখ্যাত ঘাতক হাফেজ আব্দুর রহমানও সাথে ছিল হানাদারদের। মিশনের ধর্মযাজক ফাদার পিনস ও গ্যাবলিব আশ্রিতদের প্রাণভিক্ষা চাইলেও তা দেয়নি হানাদাররা। মিশনে আশ্রিত বহু নারী পুরুষদের তারা ধরে নিয়ে যায় ও নির্যাতন-হত্যা করে। কেউ পালাতে চেষ্টা করলে সেই মিশনেই নির্যাতন করে, অবশেষে গুলি করে হত্যা করে। কাউকে বেয়োনেট চার্জ করে। মিশন থেকে কয়েকবার (কখনও ৮৬ জন, কখন ৬ জন) ধরে নিয়ে হত্যা করে ঘাতক বাহিনী। ৩রা মে এখান থেকে প্রায় ৮৬ জনকে ধরে নিয়ে নাটোর ফতেঙ্গাপাড়া (দোয়াতপাড়ার অদূরে) নামক স্থানে হত্যা করে। বড়াইগ্রাম থেকে প্রায় ১০০ জনকে কয়েন বাজার ক্যাম্পে নিয়ে হত্যা করে। এটি এপ্রিল মাসের ঘটনা।

বড়াইগ্রাম থানার নটাবাড়ীয়া মৌজার কালির ঘুন নামক স্থানে সুশীল ও বিশ্বনাথ (জোয়ারী ইউনিয়নের) নামক হিন্দু দু'জন ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে এবং ট্রাক চাপা দেয় বলে জানান রহিম বক্স।[৩২]

এছাড়া কালিকাপুর নামক স্থানে (নাটোর বড়াইগ্রাম সড়কের পার্শ্বে) বহু মানুষকে হত্যা করে ফেলে রেখেছিল বলে জানান মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শামসুল হক (বড়াইগ্রাম মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার)। জোয়াড়ী ইউনিয়নে অনেকেই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল। ফলে এ এলাকার কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রীকে হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায় নাটোর ক্যাম্পে। সেখানে নির্যাতন শেষে তাঁদের আহত অবস্থায় পরে ফেলে রেখে যায় গ্রামে।

এছাড়া পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও অত্যাচার করেছে। কৃষক মুনির উদ্দিনকেও ধরে নিয়ে গিয়ে অত্যাচার করেছে বলে জানান তিনি। হাবিবুর রহমানকে ক্যাম্পে নিয়ে বুকে পাথর বেঁধে অত্যাচার করা হয়েছিল প্রায় ৭-৮ দিন ধরে। পুরো বড়াইগ্রামে যুদ্ধকালীন ৮-৯ মাসে হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অব্যাহত ভাবে চলেছে রাজাকার আলবদরদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নেতৃত্বে। তারপরও এলাকার মানুষ মুক্তিযোদ্ধাদের দিকে সহযোগিতার হাত অব্যাহত রেখেছেন। খাদ্য, আশ্রয় সহ বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছে নিজেদের প্রাণ বিপন্ন করে।[৩৩]

## বড়াইগ্রাম উপজেলার গণহত্যা ও নির্যাতন

বড়াইগ্রাম উপজেলার নির্যাতন ও ৭টি গণহত্যা সহ অন্যান্য গণহত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

### ধানাইদহ গণহত্যা

১৯৭১ সালে ১০ই এপ্রিল মুলাডুলি থেকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নাটোরের দিকে রওনা দেয়। এতে স্থানীয় জনগণ ও ই.পি.আর কয়েকজন সদস্য ধানাইদহ ব্রিজ ভেঙ্গে দিয়ে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। ধানাইদহ ব্রিজে এসে হানাদার বাহিনী স্থানীয়দের প্রতিরোধ ভেঙ্গে দেয়। এতে ই.পি.আর সদস্য ও স্থানীয় কয়েকজন শহীদ হয়। এছাড়া স্থানীয় কয়েকজনকেও হত্যা করে হানাদার বাহিনী।

### পারকোল গণহত্যা

১৯৭১ সালের ১১ই এপ্রিল ধানাইদহ ব্রিজ দখল করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ব্রিজের নিকটবর্তী গ্রাম গুলোতে আক্রমণ করে বিহারী দালালদের সহায়তায়। ধানাইদহ ব্রিজ থেকে পূর্ব দিকের কাঁচারাস্তা ধরে পারকোল গ্রামে যাওয়ার রাস্তা। নগর ইউনিয়নের এই গ্রামে হানাদার বাহিনী বিকেলের দিকে আক্রমণ করে। পারকোল গ্রামটি হিন্দু অধ্যুষিত হলেও মুসলিম বেশ কিছু পরিবার ছিল। হানাদার বাহিনী নাটোর প্রবেশ করেছে শুনে বহু পরিবার অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল। যারা থেকে গিয়েছিল তারা ঘাতক বাহিনীর কোপানলে পড়েছিল। দালালদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি বাহিনী পুরো গ্রাম আক্রমণ করে অগ্নিসংযোগ করে। ভয় পেয়ে অনেকেই লুকায় জঙ্গলে। উল্লেখ্য, স্থানীয় দালালরা পাকিস্তানি বাহিনীকে জানিয়েছিল, এ গ্রামের লোকজন মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে। ধানাইদহ প্রতিরোধে তারাও জড়িত। এ কারণেই মূলত হানাদার বাহিনী এসেছিল এ গ্রামে।[৩৪]

পারকোল গ্রামের ছবির উদ্দিন ও তাঁর পরিবারের প্রায় ১০-১১ জন সদস্যকে হত্যা করে গুলি করে। একই গ্রামের সাজদার রহমান ও তাঁর পরিবারের ৬ জন সদস্যকে হত্যা করে। হিন্দু মনোরঞ্জন শীল ও বৈষ্ঠমী সহ এ গ্রামের প্রায় ২০-২৫ জন সদস্যকে হত্যা করে ঘাতক-দালালরা।

### পাঁচবাড়িয়া গণহত্যা

পারকোল গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম পাঁচবাড়িয়া, হানাদার বাহিনী ও ঘাতক-দালালরা এ গ্রামেও লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে এবং হত্যাযজ্ঞ চালায়। এ গ্রামের প্রায় ৯-১০ জন মানুষকে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী। সারাদিন তান্ডব চালায় হানাদাররা।

### কালিকাপুর গণহত্যা

এছাড়া নাটোর-বড়াইগ্রাম রোডের পার্শ্বে অবস্থিত কালিকাপুর-বিভিন্ন সময় বহু মানুষকে হত্যা করে ফেলে রাখা হত।

### নটাবাড়য়া কালির ঘুন গণহত্যা

মাঝগাঁও ইউনিয়নের নটাবাড়িয়া কালির ঘুণ নামক স্থানে (মে মাসের শেষ দিকে) বিশ্বনাথ চাকী ও সুশীল পালকে গুলি করে হত্যা করে। তাদের ঠিকানা জানা যায়নি। তবে জোয়ারি ইউনিয়নের বাড়ি। উল্লেখ্য, মে মাসের শেষ দিকে পাকিস্তানি দালালেরা হানাদার বাহিনীকে জোয়ারি ইউনিয়নে নিয়ে যায় পথ চিনিয়ে। গ্রামে ঢুকেই তারা এলোপাথাড়ি গুলি করতে শুরু করে। গ্রামের লোকজন গুলির শব্দ শুনেই প্রাণভয়ে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে থাকে। এসময় পালাতে গিয়ে সিধু চাকী ও সুশীল পাল প্রাণভয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সামনে পড়ে যান। পাকিস্তানিরা যতোই তাদের নির্দেশ করে, ‘ঠ্যারো, হিঁয়াছে ধারো’, ওঁরা ততোই দ্রুত পালাতে থাকেন। না থামলে পাকিস্তানিরা পেছন থেকে ওঁদের লক্ষ্য করে গুলি করে।[৩৫] তাঁরা মাঁঝগাঁও ইউনিয়নের নটাবাড়িয়া কালির ঘুণ নামক স্থানে তাঁরা গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। এরপর তাঁদের ট্রাক চাপা দিয়ে যায় হানাদাররা। তাঁদের সৎকারে পাকিস্তানি দালালরা বাধা দিয়েছে, তবে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল বলে পরে অনুমতি দিলে সৎকার করা হয় ঘটনাস্থলেই। একসাথে কবর দেয়া হয় তাঁদের দু’জনকে।[৩৬]

### হারোয়া গণহত্যা

২০শে এপ্রিল ১৯৭১ সালে মিলিটারিরা বনপাড়ার আশেপাশে আসে এবং বিক্ষিপ্তভাবে গোলাগুলি চালালে ৪ জন লোক মারা যায়। যতীন্দ্রনাথ পাল, পঞ্চানন দত্ত, রথীকান্ত দাস, দশ-এগারো বছরের বালক হরেন্দ্রনাথ দাস গুলিবিদ্ধ হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান।[৩৭] ফণীভূষণ ভট্টাচার্য নামক একজন ঠাকুর আহত হন। তাঁকে বনপাড়া মিশন হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেও দালালরা খোঁজ খবর নিতে থাকে। তবে প্রাণে বেঁচে যান ফণীভূষণ ঠাকুর।

### বনপাড়া মিশন গণহত্যা

বড়াইগ্রাম উপজেলার বনপাড়া পৌরসভায় অবস্থিত বনপাড়া রোমান ক্যাথলিক মিশন। নাটোর থেকে মিশনের দূরত্ব তেরো মাইল। নাটোর থেকে পাবনা যাওয়ার পথেই এই রোমান ক্যাথলিক মিশন। ১৯৭১ সালের ২রা মে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, নিরাশ্রয় একদল নারী-পুরুষ শিশু এই বনপাড়া রোমান ক্যাথলিক মিশনে আশ্রয় নিয়েছিলো। একরাত এখানে কাটিয়ে পরদিন শুধু প্রাণটুকু বাঁচাতে ভারতের পথে পাড়ি দেবে তারা।[৩৮] উল্লেখ্য, ২রা মে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে তারা ভারতের পথে পাড়ি দিতে পারেনি।[৩৯]

৩রা মে বিকাল সাড়ে তিনটার সময় মিশনের ফাদার লক্ষ্য করলেন যে, মিশন হাসপাতালের চারিদিকে মিলিটারীরা ঘিরে নিয়েছে। তার কিছুক্ষণ আগে বনপাড়া সংলগ্ন অন্যান্য গ্রাম থেকে খৃষ্টান পুরুষদেরকে ধরে নিয়ে এসেছে। অভিযান পরিচালনা করেছিল মেজর শেরওয়ানী। পরে ফাদারের সুপারিশে সমস্ত খৃষ্টানদেরকে নরপশুরা ছেড়ে দেয়।[৪০] পাঞ্জাব রেজিমেন্টের কুখ্যাত মেজর শেরওয়ানী দালালদের মাধ্যমে খবর পেয়েছিলো যে, বনপাড়া খ্রিশ্চিয়ান মিশনে অসংখ্য হিন্দু পরিবারের সদস্য আশ্রয় নিয়েছে। তাদের সঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাও রয়েছেন বলে তাদের ধারনা।[৪১] মাঝপাড়া ইউনিয়নের সে সময়ের চেয়ারম্যান রকিবুল্লাহ মৃধা, আহমেদপুরের আব্দুল মজিদের মাধ্যমে নাটোরের কুখ্যাত জল্লাদ হাফেজ আবদুর রহমান ঐ খবরটি পেয়েছিল এবং মেজর শেরওয়ানীকে জানিয়েছিল।[৪২]

মেজর শেরওয়ানী ও হাফেজ আবদুর রহমান একটি জিপে করে মিশনের গেইটে গিয়ে থামলো। মিশনের ধর্মযাজক ফাদার পিনোস ও গ্যাবলিবের ভেতর থেকে বেরিয়ে মিশন দরজার কাছে গেলেন। এঁদের দু'জনকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রুদ্ধস্বরে মেজর বলে উঠলো, 'তোমরা ভারতের দালালি করছো। পাকিস্তানের শত্রুদের আশ্রয় দিয়েছো। বিনা বাধায় আশ্রিত সবাইকে আমাদের হাতে তুলে না দিলে বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য হবো।' মিশনের ধর্মযাজক অনেক বুঝিয়ে মেজরকে শান্ত করতে চাইলেন। তাঁরা সহায়সম্বলহীন আশ্রিতদের প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। হানাদারদের পায়ে লুটিয়ে পড়লেন, কিন্তু কোনো কথাই তারা শুনলো না। শেষ পর্যন্ত কেবল নারী ও শিশুদের রেহাই দেবার অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তাতেও হায়েনারা রাজি হলো না। শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানি সেনা ও তাঁদের সহযোগীরা গির্জার ভেতর ঢুকে পড়ে। তারা গির্জা অপবিত্র করলো।[৪৩] নরপশুরা মিশনের অফিস, স্কুল ঘর, মহিলা হোস্টেল তল্লাশী করে আওয়ামী সমর্থক ও হিন্দুদেরকে খুঁজতে থাকে।[৪৪]

মিশনের দোতলার দক্ষিণাংশে ছিলো ছাত্রী নিবাস। আশ্রিতরা এই ছাত্রী নিবাসেই ঠাঁই নিয়েছিলো। সর্বস্ব হারিয়ে কেবল প্রাণটুকুর জন্য এখানে এসেছিল। বাঁচতে চেয়েছিলো ওরা। কিন্তু বাঁচতে দেওয়া হয়নি। পাকিস্তানি সেনারা মিশনের ভেতর ঢোকার পর আশ্রিতরা ভয়ে শঙ্কায় ছুটাছুটি করছিলো। কান্নার রোল পড়ে গেল। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য পুরুষদের বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার, শিশুদের, নারীদের অসহনীয় আর্ত চিৎকার সমগ্র মিশন এলাকাকে করে তুলেছিলো যন্ত্রণাকাতর। এই ভয়াল যন্ত্রণাকাতর দৃশ্যে ফাদার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। আবারো মেজর শেরওয়ানীর কাছে নতজানু হয়ে আশ্রিতদের প্রাণভিক্ষা চাইলেন। কিন্তু বৃথা আবেদন। পাকিস্তানি মেজর বা হাফেজ আব্দুর রহমান কেউই ফাদারের কথায় কান দিল না। ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা অসহায় নারী পুরুষ শিশুদের ওপর। বুলেট, লাথি, রাইফেলের বাঁট আর বেয়োনেটের খোঁচায় আশ্রিতদের প্রায় মুমূর্ষু অবস্থায় সবাইকে বেঁধে ফেললো। এ সময় কয়েকজন পুরুষ মিশনের দেয়াল টপকে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু দেয়ালের চারদিকেই ছিলো হানাদাররা প্রস্তুত। ধরে ফেললো তাদের। বেয়োনেটের আঘাতে রক্তাক্ত হলো তাদের দেহ। এভাবে দেয়াল টপকে পালাতে গিয়ে ২০ জন পুরুষ ধরা পড়েছিলো। এদের কয়েকজন বেয়োনেটের আঘাতে তাৎক্ষণিকভাবে মৃত্যুবরণ করে।[৪৫] গুলি লেগে নিহত হন যতীন্দ্রনাথ পাল, অধীরচন্দ্র সাহা ও পঞ্চানন মিত্র। আহতাবস্থায় হানাদারেরা ধরে ফেলে মানিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মদনকুমার পাল আর অক্ষয় কুমার পালকে।[৪৬]

বন্দীদের পরনের কাপড় ছিঁড়েই তাদের হাত ও চোখ বাঁধা হলো। তারপর তাদেরকে তিনটি ট্রাকে তোলা হলো। ট্রাক তিনটি বন্দীদের নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল। এসময়ে মিশনের উত্তরাংশের ছাত্রাবাসে তিন জন শিক্ষক অবস্থান করছিলেন। তাঁরা বেঁচে গেলেন। এদের মধ্যে একজন হলেন গৌরপদ মন্ডল। মিশনের অপর দুই সিস্টারও রান্নাঘরের প্যাকিং বাক্সের মধ্যে নিজেদের লুকিয়ে রেখে প্রাণে বেঁচেছিলেন। এই অমানুষিক পৈশাচিক দৃশ্যে ফাদার গ্যাবলিব মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই ধর্মযাজককে পরবর্তীতে ইটালির একটি মানসিক হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

ফাদার পিনোস গোটা ন'মাসই ছিলেন মিশনে । পাকিস্তানিরা তাঁর ওপর খুবই নাখোশ ছিল। পাঞ্জাব রেজিমেন্টের ব্রিগেডিয়ার নঈম তাঁকে একবার নাটোরে ডেকে পাঠিয়েছিলো। ব্রিগেডিয়ার নঈম সেদিন ফাদারকে বলেছিলেন, 'আপনি মুক্তিবাহিনীকে আমাদের ধ্বংসসাধনে সাহায্য করছেন। ভবিষ্যতে কোনো রাষ্ট্রদ্রোহীকে মিশনে আশ্রয় দিলে আপনাকে হত্যা করা হবে। গোটা মিশন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হবে।' ফাদার চুপ করে সব শুনেছিলেন। এই হুঁশিয়ারির পরও তিনি গোটা মুক্তিযুদ্ধের সময় নির্যাতিত, সহায়-সম্বলহীন অসংখ্য নারী-পুরুষ শিশুকে তার মিশনে আশ্রয় দিয়েছিলেন, নিরাপদে ভারতে চলে যেতে সাহায্য করেছিলেন।[৪৭]

উল্লেখ্য, বনপাড়া মিশন থেকে ৩রা মে ৮৬জনকে ধরে নিয়ে নাটোর সদরের ফতেঙ্গাপাড়া গ্রামে রামপুরা খালের কাছে হত্যা করে হানাদার বাহিনী ও দালালরা। এরপর তাদের লাশগুলো গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দিতে স্থানীয়দের বাধ্য করে। এরপরও ৬ জনকে এ এলাকা থেকে ধরে নিয়ে যায় নাটোরে। তারাও ফিরে আসেনি।

**অন্যান্য গণহত্যা**

এপ্রিলের ২৭ তারিখ মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে বনপাড়া থেকে ইমরান আলী (গ্রাম সভাপতি, আওয়ামী লীগ), শাহ্‌জালাল আলী (কৃষক), আফাজ উদ্দিন (কৃষক), ফকির উদ্দিন মোল্লা (কৃষক) ও আহম্মদপুরের নারায়ণ পালের পুত্রকে ধরে নিয়ে গিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে। অনিল পিউরিফিকেশন নামে আরেকজন ব্যক্তিকে মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর পরই পরাজিত বিহারিরা গোপালপুরে হত্যা করে। এপ্রিলের শেষের দিকে অধীরচন্দ্র সাহা আর আন্তন বিশ্বাসকে পাকিস্তানি বাহিনী হত্যা করে। শহীদ ইয়াদ আলীর বাড়ি দোগাছি গ্রামে। পিতা আব্দুল কাদের প্রামাণিক। ১৯৬৭ সালে জি,আর,পিতে যোগ দেন। ১৯৭১ সালে হাবিলদার পদে পদোন্নতি পেয়ে লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ে অফিসে যোগদান করেন। সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দ্বারা উৎসাহিত হন ও যুবকদের প্রশিক্ষণ দেন। যুদ্ধ শুরু হলে স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠালেও নিজে বাড়িতেই থেকে যান। অবাঙালি খুনিরা তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

এছাড়া আরও বহু স্থানে বহু মানুষ মারা যায়। যেমন: শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আক্কাস আলী, শহীদ আব্দুল আজিজ, শহীদ আবু রায়হান, শহীদ ইয়াদ আলী, শহীদ শাহাদাৎ হোসেন প্রমুখদের অনেককেই পাকিস্তানি বাহিনী ধরে নিয়ে নির্যাতন করে হত্যা করেছে। এরপর কোথায় তাদের ফেলেছে, তা কেউ আজও জানে না।

## বধ্যভূমি ও গণকবর

১৯৭১ সালে বড়াইগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন স্থানে অনেক মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছিলেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দালালরা এ উপজেলাতেও বহু মানুষকে হত্যা করে বিভিন্ন স্থানে ফেলে রেখেছিল। ফলে এ উপজেলাতেও রয়েছে গণকবর। নিম্নে সেগুলোর বর্ণনা দেয়া হলো :

### কালিকাপুর গণকবর

১নং জোয়াড়ী ইউনিয়নের অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রাম। এখানে ৪ জন অজ্ঞাত পরিচয়ধারী শহীদদের গণকবর রয়েছে। এছাড়া এখানে আরও বহু মানুষদের হত্যা করা হয়েছে বলে জানা যায়। সকলকে একসাথে এখানে কবর দেয়া হয়েছে। বড়াইগ্রাম-ঢাকা রোডের পাশে এদের গণকবরের উপর একটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে।

### নটাবাড়িয়া কালির ঘুন গণকবর

জোয়াড়ি ইউনিয়ন ২জন ব্যক্তি সুশীল ও বিশ্বনাথকে এখানে কবর দেয়া হয়েছে। স্থানীয় উদ্যোগে চারদিকে বেষ্টনী তৈরি করা আছে। এ এলাকাটি মাঝগাঁও ইউনিয়নের অন্তর্গত।

### পারকোল গণকবর

৪নং নগর ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত পারকোল গ্রামে প্রায় ২১ জনের লাশ একসাথে কবর দেয়া হয়েছে। পারিবারিক উদ্যোগে একটি বেষ্টনী দেয়া আছে।

### ধানেদাহ গণকবর

নগর ইউনিয়নের ধানাইদহ ব্রিজের নিচে গণকবর রয়েছে। ধানাইদহ ব্রিজ প্রতিরোধে স্থানীয় জনগণ ও ই.পি.আর সদস্য প্রাণ হারায়। তাদের সকলকে এখানে একসাথে কবরস্থ করা হয়। এটি ধানাইদহ ব্রিজের পাশে অবস্থিত।

বড়াইগ্রাম উপজেলায় বধ্যভূমির খোঁজ তেমন পাওয়া যায়নি।

## মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও স্মারক

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে শহীদ ও গণহত্যায় শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে বড়াইগ্রাম উপজেলায় গণকবর সহ বিভিন্ন স্থানে যেসব স্মৃতিকাঠামো গড়ে উঠেছে, সেগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো :

### কালিকাপুর স্মৃতি সৌধ

১নং জোয়াড়ী ইউনিয়নের অন্তর্গত কালিকাপুর গ্রামে (বড়াইগ্রাম-ঢাকা রোডের পাশে) গণহত্যার শিকার শহীদদের গণকবরের উপর নির্মিত কালকাপুর স্মৃতিসৌধটি শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মিত।

### ধানাইদহ ব্রিজ স্মৃতিস্তম্ভ

ধানাইদহ ব্রিজ প্রতিরোধের যুদ্ধে শহীদদের গণকবরের উপর নির্মিত হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভটি। এটি ধানাইদহ ব্রিজের পাশেই অবস্থিত। গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে কালিকাপুর গণহত্যা সম্পর্কে জানা গিয়েছে। অন্যকোন গ্রন্থে এ সম্পর্কে জানা যায় না।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল হানাদার বাহিনী বড়াইগ্রাম উপজেলায় প্রবেশ করে। তারা ১১ই এপ্রিল ধানাইদহ ব্রিজ এ স্থানীয়দের প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। স্থানীয় জনগণ বীরত্বের সাথে লড়াই করে। এদের

মধ্যে অনেকে প্রাণ হারায়। এরপর দালাল রাজাকার আলবদর আলশামস বাহিনীর সহায়তায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পুরো বড়াই গ্রাম দখল করার চেষ্টায় রওনা হয়। তারা জানতে পারে যে স্থানীয় জনগণ মুক্তি যোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছে বা করছে। এতে ঘাতকরা বিভিন্ন এলাকা আক্রমণ করে লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, নির্যাতন চালায়। শিশু-বৃদ্ধ-মহিলা-পুরুষ কেউই তাঁদের শিকার থেকে বেঁচে ফেরেনি। এপ্রিল থেকে নভেম্বর মাসে প্রায় ১০০-১৫০ মানুষকে হত্যা করেছে হানাদাররা। নির্যাতন করেছে বহু নারীদের। বনপাড়া খ্রিষ্টান মিশনে আশ্রিতদের ধরে নিয়ে হত্যা ও নির্যাতন করেছে। এতকিছুর পরও বাঙালির মনোবল অটুট থেকেছে। বিজয় অর্জন করেছে। বড়াইগ্রাম বাজারের পশ্চিমে কয়েকশো মিটার দূরে নাটোর-গুরুদাসপুর সড়কের বেশ কিছু কুখ্যাত রাজাকারকে জনসাধারণ পিটিয়ে হত্যা করে সবাইকে একই গর্তে পুঁতে রেখেছিল একাত্তরের ডিসেম্বরে। সেই স্থানটিকে রাজাকারের মোড় বলে চিহ্নিত করেন অনেকেই। বর্তমানে নাটোর-ঢাকা মহাসড়ক নির্মাণের পর থেকে এই 'রাজাকারের  মোড়কে 'রাজ্জাকের মোড়' হিসেবে অভিহিত করা হচ্ছে।[৪৮] ৩০ নভেম্বরের দিকে এ উপজেলার অত্যাচারের মাত্রা কমে আসে। হানাদারদের সংখ্যাও কমে আসতে থাকে। মুক্তিযোদ্ধা ও সাধারণ জনগণের প্রচেষ্টায় ১৫ ডিসেম্বর বড়াইগ্রাম উপজেলাটি হানাদার মুক্ত হয় পুরোপুরি।

১৬ই ডিসেম্বর থেকে এ এলাকার মানুষও বিজয়ের আনন্দে আনন্দিত হয়েছে। ২১শে ডিসেম্বর নাটোরে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে গৌরবময় বিজয় অর্জন করেছে। ১৯৭১ সালে বড়াইগ্রাম উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পাকিস্তানি সেনাদের সহযোগী হিসেবে যেসব রাজাকার আলবদর-আলশামস-শান্তিকমিটির সদস্যরা কাজ করেন তাদের নাম সুজিত সরকারের *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থে তাদের অধিকাংশের সম্পর্কে জানা যায়। এ গ্রন্থে শান্তি কমিটির ১৭ জন সদস্য ও রাজাকার আল বদরদের ৭৫ জন সদস্যের তালিকা রয়েছে। ১৯৭১ সালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর ধর্মান্তকরণের মতো নির্যাতনও লক্ষ করা যায় বড়াইগ্রামে। বড়াইগ্রামের লক্ষীকোলে মুক্তিযোদ্ধাদের এ ধরনের ঘটেছে। গরুর মাংস খাইয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করা হয়। এছাড়া লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করে অত্যাচার এর ঘটনা নতুন নয় ।[৪৯]

তথ্য নির্দেশ

[১] জেলা বাতায়ন (http://baraigram.natore.gov.bd)

[২] সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া- ষষ্ঠ খন্ড*, *বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১, পৃ. ২৯৯-৩০০

[৩] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পৃ. ১৫৬

[৪] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৯৯-৩০০*

[৫] জেলা বাতায়ন (http://baraigram.natore.gov.bd)

[৬] জেলা বাতায়ন (http://majgaonup.natore.gov.bd)

[৭] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৯৯-৩০০*

[৮] জেলা বাতায়ন (http://majgaonup.natore.gov.bd)

[৯] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৯৯-৩০০*

[১০] জেলা বাতায়ন (http://majgaonup.natore.gov.bd)

[১১] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[১২] জেলা বাতায়ন (http://majgaonup.natore.gov.bd)

[১৩] জেলা বাতায়ন (http://nagorup.natore.gov.bd)

[১৪] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৯৯-৩০০*

[১৫] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[১৬] জেলা বাতায়ন (http://nagorup.natore.gov.bd)

[১৭] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[১৮] জেলা বাতায়ন (http://nagorup.natore.gov.bd)

[১৯] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[২০] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[২১] জেলা বাতায়ন (http://gopalpurup.natore.gov.bd)

[২২] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৯৯-৩০০*

[২৩] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৬

[২৪] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ২৯৯-৩০০*

[২৫] জেলা বাতায়ন (http://gopalpurup.natore.gov.bd)

[২৬] জেলা বাতায়ন (http://gopalpurup.natore.gov.bd)

[২৭] সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩৭

[২৮] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭

[২৯] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৮

[৩০] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০-১৫১

[৩১] আব্দুল জলিল সরকার (৫২), পিতাঃ মজির উদ্দিন সরকার, গ্রামঃ পারকোল, ইউনিয়নঃ নগর, উপজেলাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি, ২২ জুলাই ২০১৫

[৩২] রহিম বক্স (৬৫), পিতাঃ মজের বক্স মৌজাঃ নটাবাড়িয়া, ইউনিয়নঃ মাঝগাঁও। উপজেলাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি, ২২ জুলাই ২০১৫

[৩৩] মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শামসুল হক (৬৭), পিতা: কিফর উদ্দিন, উপজেলা: বড়াইগ্রাম, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বড়াইগ্রাম, ২২ জুলাই ২০১৫

[৩৪] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫০

[৩৫] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-১৯৫

[৩৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৫

[৩৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৩

[৩৮] সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, অনুপম, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৩৫

[৩৯] স্মরণিকা, *মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস* ২০০২, জেলা প্রশাসন, নাটোর, ২৬ মার্চ ২০০২, পৃ. ৩৩

[৪০] স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[৪১] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭

[৪২] প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৬-১৮৭

[৪৩] সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

[৪৪] স্মরণিকা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

[৪৫] সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬

[৪৬] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৭

[৪৭] সুকুমার বিশ্বাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬-১৩৭

[৪৮] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

[৪৯] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৭

# অষ্টম অধ্যায়

## নলডাঙ্গা উপজেলা

উত্তরবঙ্গের বধ্যভূমি নামে খ্যাত নাটোর জেলার অন্যতম উপজেলা নলডাঙ্গা। এটি নাটোর উপজেলার দক্ষিণে অবস্থিত। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এপ্রিল মাসে নাটোরে প্রবেশ করে । আর তাদের সাথে এ উপজেলার স্থানীয় কিছু দুর্বৃত্ত যোগ হয়ে এ উপজেলার হত্যা, ধ্বংস, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাট করে। যেহেতু এ উপজেলা নাটোর সদরের অর্ন্তভুক্ত ছিল, তাই নাটোর সদর উপজেলার মতো এ উপজেলাতেও স্বাধীন হবার বাসনায় বাঙালিরা উদ্বুদ্ধ ছিল। যারফলে তাদের এসব মুক্তিকামী জনতাকে বরণ করতে হয়েছে মৃত্যু, বঞ্চনা, অত্যাচার, ধর্ষণ ইত্যাদি।

**অবস্থান :**

নলডাঙ্গা উপজেলা নাটোর জেলার ৫টি ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ১৯৪৭ সালের পূর্বে নলডাঙ্গা নাটোর থানার অধীন ছিল। ১৯৪৭ সালে নলডাঙ্গা হাট প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া এর পার্শ্ববর্তী হালতি বিল, বারনই নদী প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এলাকার উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। ২০০০ সালে নাটোর সদর উপজেলার ব্রহ্মপুর, মাধনগর, খাজুরা, পিপরুল, বিপ্রবেলঘড়িয়া - এ ৫টি ইউনিয়ন নিয়ে এটি থানা-উপজেলায় রূপান্তরিত হয়। ২০০৩ সালে নলডাঙ্গা পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর অবস্থান ২৪.২৬ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৯.৯ পূর্ব দক্ষিণ অংশে নারদ নদের উত্তর তীরে অবস্থিত শহর নাটোর এক কিছু অংশকে নিয়ে গঠিত। এর উত্তরে নাটোর সদর উপজেলা। পূর্বে সিংড়া ও গুরুদাসপুর উপজেলা, দক্ষিণে বড়াইগ্রাম ও বাগাতিপাড়া উপজেলা এবং পশ্চিমে পুঠিয়া। এর আয়তন ১৭৪.৩৯ বর্গ কি.মি.। লোকসংখ্যা ১২৯৩০৪ জন। গ্রামের সংখ্যা ৯৯টি। বারনই নদী রয়েছে এখানে। এখানকার ৪টি বিলের মধ্যে হালতি বিল উত্তরবঙ্গে "মিনি সী বীচ" বলে খ্যাত। প্রচুর লোক আসে এটি ভ্রমণ করতে।[১]

এ উপজেলায় যেসব ইউনিয়ন, গ্রাম ও এলাকাতে গণহত্যা ও নির্যাতন অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর বর্ণনা উল্লেখ করা হল :

**বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়ন :**

নাটোর সদর উপজেলা থেকে সড়ক পথে ১২ কি.মি. এবং নাটোর রেলস্টেশন থেকে রেল পথে উত্তর দিকে ৮ কি:মিঃ স্থানে এর অবস্থান। ১৯৫৪ সালে বাসুদেবপুর রেলওয়ে স্টেশনের দক্ষিণ-পশ্চিম কর্ণারে বিপ্রবেলঘড়িয়া নামে একটি ইউনিয়ন পরিষদ স্থাপিত হয়। এক সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে বিপ্রবেলঘড়িয়ায় অনেক বিজ্ঞ ব্যক্তিত্বের লোক ছিলেন। এ কারণেই বিপ্রবেলঘড়িয়া নামকরণ হয়। মূলত "বিগ্য" শব্দ হতে "বিপ্র" শব্দটির উৎপত্তি হয় বলে জানা যায়। এ ইউনিয়নের ১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ১৬০৮১।[২] ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা বর্তমানে ২৮২১৮ জন। ছাতনী বারঘরিয়া হয়ে কাঠ্ঠয়াগাড়ী হয়ে ত্রিমোহনী হয়ে বিপ্রবেলঘড়িয়া পাঙ্গাল ব্রিজ সংলগ্ন হয়ে সেনভাগ হয়ে বাশভাগ স্লুইজ গেটে বারনই নদীর সংগে যুক্ত হয়েছে। খাল -(১) মির্জাপুর স্লুইচ গেইট হয়ে হরিদাখলসী হয়ে নলডাঙ্গা ভায়া বামন গ্রাম হয়ে শ্যামনগর বিল পর্যন্ত।

(২) হরিদাখলসী হয়ে রামশার কাজীপুর হয়ে বিল পর্যন্ত বিস্তৃত।

এ ইউনিয়নে সাঁওতাল উপজাতি রয়েছে।[৩]

**চকপাড়া :**

চকপাড়া গ্রামটি ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রায় অর্ধ মাইল ভিতর দিকে অবস্থিত। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা এর জনসংখ্যা ছিল ৪৫০ জন।[৪] ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী জনসংখ্যা বর্তমানে ৯৮৫ জন। রাস্তাঘাট পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও উন্নত। বাড়ি ঘর রয়েছে যা তা মূলত ইট, সিমেন্ট, টিন, মাটি, বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত। ১৯৭১ সালে চকপাড়া নামক এ হিন্দুপাড়ায় পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগিরা গণহত্যা সম্পাদন করে।[৫]

**নসরৎপুর :**

১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী  এ গ্রামের আয়তন ছিল ৫৭৪ একর ও জনসংখ্যা ছিল ৮৬১ জন।[৬] বর্তমানে জনসংখ্যা ১৪৭৭ জন। এ গ্রামটির রাস্তাঘাট অনেকক্ষেত্রেই চলার অনুপযোগী। এখানে প্রচুর আখ চাষ হয়। এছাড়া খেজুর গুড়ও প্রচুর উৎপাদিত হয়। ১৯৭১ সালে এ গ্রামের জনৈক এক প্রভাবশালী হিন্দু ব্যক্তিকে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী।[৭]

**বাসুদেবপুর :**

১৯৭৪ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী এ গ্রামের আয়তন ছিল ১৭০ একর ও জনসংখ্যা ৫০৩ জন।[৮] বর্তমানে এই গ্রামের জনসংখ্যা ৩৮৩ জন।[৯] ১৯৭১ সালে এখানে অবস্থিত একটি বিদ্যালয়ে পাকিস্তানি বাহিনী গণহত্যা চালায় বলে জানা যায়।

## সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন

৭ই মার্চের বঙ্গাবন্ধুর ভাষণ এ এলাকার মানুষদেরও উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারা প্রেরণা লাভ করেছিল দেশকে মুক্ত করার। নাটোর সদর থানায় সংগ্রাম কমিটি গঠনের পর পর এ এলাকায়ও সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয় মার্চের ভাষনের পরপরই। স্থানীয়ভাবে সকলে সংগঠিত হয়। আতিকুর রহমান তালুকদার, কদির উদ্দিন, নারায়ণ চন্দ্র সরকার প্রমুখরা আওয়ামী লীগের তথা এ সংগঠিত কমিটির অন্যতম ব্যক্তিত্ব ছিলেন। নাটোরের অন্যতম নেতা শঙ্কর গোবিন্দ চৌধুরীর সাথে তারাও একাত্ম হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর ঘোষণায় দেশকে স্বাধীন করতে। নাটোর সদর যেহেতু মূল কেন্দ্র ছিল, তাই এর সাথে মিলিত হয়েই কাজ করা হত।

## সংঘর্ষের সূত্রপাত

১৯৭১ সালের ১২ এপ্রিল নাটোর সদরে পাকিস্তানি বাহিনী প্রবেশ করে এবং সমগ্র নাটোরে তারা আধিপত্য বিস্তার করে। জুন মাসের দিকে প্রথম নলডাঙ্গায় আসে পাকিস্তানি বাহিনী। অন্যান্য উপজেলার মতো এখানেও তারা হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেয়েছিল। এছাড়া মুক্তিকামী আওয়ামী লীগ সমর্থনকারী বিভিন্ন নেতাদের ধরে হত্যা, নির্যাতন প্রভৃতি শুরু করেছিল। পরবর্তীতে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় কয়েকজন দোসরদের সহযোগীতায় তারা এখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে থাকে। এছাড়া নারীদের ধর্ষণ ও লুটপাট অব্যাহত ভাবে করতে থাকে।

## শান্তি কমিটি গঠন

নাটোর সদরে শান্তি কমিটি গঠিত হলে এখানেও জুন মাসের দিকে শান্তি কমিটি গঠিত হয়। শান্তি কমিটি চেয়ারম্যান ছিলেন ডা. নাসির উদ্দিন সরকার। তার নেতৃত্বে এ উপজেলায় বিভিন্ন মানবতাবিরোধী কর্মকান্ড চলতে থাকে।

## রাজাকার-আলবদরদের দ্বারা অপরাধের চিত্র

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী উপজেলায় প্রবেশ করে রাজাকার-আলবদরদের সাহায্যে। তারা এখানে ক্যাম্প করে সেখান থেকে হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করেছিল। এ উপজেলার নিরীহ মানুষদের উপর অত্যাচার করেছিল। কোন মানুষকে সন্দেহ হলে তাদের বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে এসে অত্যাচার, নির্যাতন করে হত্যা করত তারা। এ উপজেলায় পাকিস্তানি বাহিনী আসার পূর্বেই অনেকে পালিয়ে গিয়ে জীবন রক্ষা করেছে। নতুবা এই ঘাতকদের কাছে প্রাণ দিতে হত। যারা ছিলেন তারাও অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করেছিলেন। এ গ্রামের কেউ ভারতে আশ্রয় নিতে, কেউ বা প্রশিক্ষণ নিতে চলে গিয়েছিল।

## পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প সমূহ

নলডাঙ্গা উপজেলায় রাজাকার আলবদর বাহিনী জুন মাসের দিকে ক্যাম্প স্থাপন করে। এ উপজেলার ইউনিয়ন পরিষদের নিকবর্তী এলাকায় ক্যাম্প ছিল বলে জানা যায়। তবে, নলডাঙ্গা যেহেতু সে সময় নাটোর সদর উপজেলার অংশ ছিল, তাই মূলত গণহত্যা ও নির্যাতন মূলক কর্মকান্ডগুলি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সদরেই বেশি করে। বহু নারীকে তাঁরা তুলে নিয়ে যায় নাটোর সদরের ক্যাম্পগুলোতে। স্থানীয় রাজাকার আলবদর বাহিনীর সাহায্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী স্থানীয় ক্যাম্পগুলোতে অবস্থান করে স্থানীয় মানুষদের বিভিন্নভাবে নির্যাতন করত। অগ্নিসংযোগ, বিভিন্ন লোককে ধরে এনে নির্যাতন, পরে হত্যা, লুটপাট প্রভৃতি মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটন করত।

## নলডাঙ্গা উপজেলার গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

১৯৭১ সালে নলডাঙ্গা উপজেলার ইউনিয়নগুলোও গণহত্যা ও নির্যাতনের বাইরে ছিলনা। এ উপজেলার বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়ন ও ব্রহ্মপুর ইউনিয়নে গণহত্যা ও নির্যাতনের ঘটনার কথা জানা গেলেও অন্যান্য ইউনিয়নগুলোতে অগ্নিসংযোগ। লুটপাট এর কথা জানা যায়। গণহত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকলেও সেগুলো সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়নি।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো: হাকিম উদ্দিনের বক্তব্য থেকে জানা যায়,

> জুন মাসের মাঝামাঝি সময়ে বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়নের রাজাকার আলবদরদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নলডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় আক্রমণ চালায়। হাকিম উদ্দিন জানান, ১৯৭১ সালের দিকে বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়নের চকপাড়া গ্রামটি ছিল মূলত হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। আর বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়নের অন্যতম রাজাকার ছিলেন খাদেমুল ইসলাম। তাঁর সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী মধ্যরাতে অতর্কিতে আক্রমণ করে এ এলাকার নিরীহ জনতার উপর। সেপ্টেম্বর মাসের কোন একদিন চকপাড়া গ্রামের হিন্দু চারজন ব্যক্তি-শ্রী শান্তি চরণ ঘোষ, পরিমল চন্দ্র সরকার, সত্য সরকার, সুধীর চন্দ্র সরকার- এদেরকে সন্দেহ করে ঘাতক বাহিনী। তাঁদের বাড়ি থেকে চোখ বাঁধা অবস্থায় তুলে নিয়ে আসে ইউনিয়ন পরিষদের নিকটে। এরপর তাঁরা তাঁদের জঙ্গলে ঘেরা চকপাড়া গ্রামের একটি খোলা স্থানে অবস্থিত কূপের কাছে নিয়ে যায়। উল্লিখিত চারজন ব্যক্তির সাথে পরে আরও একজন ব্যক্তি। নারায়ণ চন্দ্র সরকারকেও ধরে নিয়ে আসে ঘাতক বাহিনীর দল। তিনি আওয়ামীলীগের সদস্য ছিলেন। ধরে আনা সকলকে যখন লাইনে দাঁড় করানো হয়, তখন নারায়ণ চন্দ্র সুযোগ বুঝে সেখান থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করে। কিন্তু বাকীদের আর বেঁচে ফিরে আসা হয়নি। অন্য চারজনকে (শান্তি, পরিমল, সত্য, সুধীর) লাইনে দাঁড় করিয়ে পিছ মোড়া করে

হাত বেঁধে, চোখ বাঁধা অবস্থায় গুলি করা হয়। এরপর তাদের কূপের মধ্যে ফেলে রাখা হয়। স্থানীয় লোকজন পরে এসে দেখে চকপাড়ার সেই কূপে লাশ গুলোর মাথা কূপে ঢোকানো, পায়ে জুতো পরা অবস্থায় উপর দিকে রয়েছে।[১০]

প্রত্যক্ষদর্শী বিশ্বনাথ সরকার জানান,

সেই দিনগুলো রাজাকার, আলবদর বাহিনীর লোকেরা বিভিন্ন ঘর বাড়িতে লুটপাট করে, অগ্নি সংযোগ করে। এমনকি অনেক নারী ও সেসময় নির্যাতনের শিকার হয়েছিল। হাকিম উদ্দিনের পিতা কছির উদ্দিন আওয়ামী লীগের সদস্য হওয়ায় তাঁকেও বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হতে হয়েছে।[১১]

মুক্তিযোদ্ধা হাকিম উদ্দিন জানান,

নসরতপুর গ্রামের বাসিন্দা দিলীপ কুমার রায়কে হত্যার কথা। দিলীপ কুমার জমিদার ছিলেন। তাই তাঁকে গুলি করে হত্যা করে তাঁর বাড়িঘর লুট করে ঘাতক-রাজাকার বাহিনী। বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়নের রামসার কাজীপুর গ্রামের ছাত্রলীগের বড়নেতা আতিকুর রহমান। পাকিস্তানি বাহিনী রাজাকারদের সাহায্যে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যায় নাটোর সাদরের নবাব সিরাজদ্দৌলা কলেজ ক্যাম্পে। সেখানে দীর্ঘদিন নির্যাতন করা হয় তাকে। এরপর রাজশাহী ক্যাম্পে নিয়ে সেখানেও চলে তার উপর অকথ্য নির্যাতন। এরপর সে সুযোগ পেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান।[১২]

ব্রহ্মপুর ইউনিয়নে নারী নির্যাতনের কথা বলতে গিয়ে হাকিম উদ্দিন জানান এক সাহসী নারীর কথা। তিনি বলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধে সহযোগিতা করতেন বিভিন্নভাবে। হঠাৎ করেই রাজাকার বাহিনীর মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনী তা জানতে পারে এবং সেই নারীর বাড়ি আক্রমণ করে তাকে নির্যাতন করে ফেলে রেখে যায়।[১৩] এভাবেই নলডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় রাজাকার বাহিনীর সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিংযোগ প্রভৃতি কর্মকান্ড সংঘটিত করে।

## নারী নির্যাতন

১৯৭১ সালে এ উপজেলায় রাজাকার আলবদর ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সাধারণ জনগণের উপর বিভিন্নভাবে নির্যাতন করেছিল। নারীরা যেমন নির্যাতিত হয়েছে, তেমনি গ্রামের লোকজনকেও সহ্য করতে হয়েছে অত্যাচার। নির্যাতিত নারীরা সামাজিক কারণে নিজেদের পরিচয় প্রকাশ্যে আনতে চান না। ফলে ছদ্ম নাম ব্যবহার করেই তাদের কথা তুলে ধরা হয়েছে এই অভিসন্দর্ভে। যেমন: রুবিনা আক্তার।

রুবিনা আক্তার বাড়ি নলডাঙ্গা উপজেলার ব্রহ্মপুর ইউনিয়নের হলুদগড় গ্রামে। স্বামী সন্তান নিয়ে বাস করতেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতেন। একদিন হঠাৎ রাজাকাররা পাকিস্তানি বাহিনীকে তাঁর বাড়ি দেখিয়ে দেয়। স্বাধীনতার ৩-৪ দিন আগের কথা। হঠাৎ পাকিস্তানি বাহিনী বাড়িতে প্রবেশ করে তাঁর উপর পাশবিক নির্যাতন চালায়। রুবিনা অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পর জ্ঞান ফিরে এলে একটা নৌকা ভাড়া করে বাবার বাড়ি পাবনা চলে যান। স্বামী-সন্তান সহ সেখানে ৩-৪ মাস অবস্থান করেন। পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাকে চাকরি দিতে চেয়ে ছিলেন, কিন্তু তিনি পড়ালেখা জানতেন না, পরে তার স্বামী কাইয়ুমকে চাকরি দেন। কিন্তু স্বামী তাকে ছেড়ে দেন কিছুদিন পর।

## ভিন্নধর্মী আরেকটি নির্যাতন

নাটোর সদর থানার উত্তরে নলডাঙ্গা রেল স্টেশন। রেল লাইন ভেদ করে বয়ে গেছে বারানঈ নদী। সেই ছোট নদীর ওপর রয়েছে একটি রেল ব্রিজ। উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এই রেলপথটির গুরুত্ব অসীম। সেই ব্রিজ পাহারা দেয়ার জন্য জোর করে বিভিন্ন গ্রাম থেকে লোকজনকে ধরে নিয়ে আসতেন। জনসাধারণ থাকতো তোপের মুখে। যে কোন সময় যদি মুক্তিযোদ্ধারা আক্রমণ করে, তাহলে পাহারারত সবাই মারা পড়তে পারে। তবু রাজাকার বা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ছাড় দিতো না। তার প্রধান কারণ জনগণকে প্রাণনাশের আশঙ্কাই বেশি থাকবে।

মুক্তিযোদ্ধারা জনগণের কথা ভেবেই ব্রিজ উড়িয়ে দিবে না, তাদের উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন হবে না। হানাদার আর তাদের সহযোগিরা এই কৌশল দীর্ঘদিন গ্রহণ করে। ব্রিজের চারপাশের লোকজন রোজা রেখেও ব্রিজ পাহারা দিয়েছে প্রাণের ভয়ে। এইভাবে একাত্তরের নয় মাস নানা প্রতিক্রিয়ায় ঘাতক-দালালেরা বাঙালিদের নির্যাতন করেছে।[১৪]

## নলডাঙ্গা উপজেলার নির্যাতন ও গণহত্যা

এ উপজেলার বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়নে গণহত্যা ও নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। এছাড়া ব্রহ্মপুর ইউনিয়নে নারী নির্যাতনের ঘটনার কথা জানা যায়। তবে অন্যান্য ইউনিয়নে লুট-পাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ছাড়া আর তেমন কিছু জানা যায় না। বড়াইগ্রাম উপজেলার নির্যাতন ও ৩ টি গণহত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

### চকপাড়া গণহত্যা

নাটোর সদর উপজেলা থেকে ১২ কি. মি. ও নাটোর রেলস্টেশন থেকে রেলপথে উত্তর দিকে ৮ কিলোমিটার স্থানে বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়ন। আর এ ইউনিয়নের একটি গ্রাম চকপাড়া। এটি নলডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ থেকে অর্ধ মাইল ভিতরদিকে অবস্থিত। হিন্দু অধ্যুষিত এ গ্রামটিতে জুন সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে বহু মানুষকে হত্যা করে ফেলে রাখা হয় কূপের মধ্যে। যুদ্ধ শেষে বহু মানুষের কঙ্কালের সন্ধান পাওয়া যায় এই কূপটিতে।[১৫] সেপ্টেম্বর মাসের কোন একদিন রাত দুটো আড়াইটার দিকে চকপাড়া গ্রামের রাজাকার কমান্ডার খাদেমুল ইসলামের নেতৃত্বে একদল রাজাকার পার্শ্ববর্তী শিবপুর গ্রামে বাড়ি থেকে শান্তি চরণ ঘোষ, পরিমল চন্দ্র সরকার, সত্য সরকার, সুধীর চন্দ্র সরকার, নারায়ণ চন্দ্র সরকারকে ধরে নিয়ে আসে ইউনিয়ন পরিষদে। সেখান থেকে তাঁদের হত্যার জন্য চকপাড়া গ্রামের মাঠের এক ধারে নিয়ে হাতমোড়া দিয়ে বেঁধে রাখে। এঁদের ছাড়াও সুজিত সরকার নিবারণ ঘোষ নামক আরও এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেছেন।

নারায়ন ঘোষ প্রস্রাব চাপার কথা বলে অনুনয় বিনয় করলে রাজাকারদের একজন তাঁর হাতের বাঁধন খুলে দেয়। প্রস্রাবের ভান করে নারায়ণ ঘোষ সুযোগ বুঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আখ খেতের মধ্যে দিয়ে পালিয়ে যান। তাঁকে উদ্দেশ্য করে রাজাকারেরা গুলি ছুঁড়লে তিনি খেতের মধ্যে শুয়ে আত্মরক্ষা করেন। এই ভাবে কিছুক্ষন শুয়ে থেকে যখন রাজাকারদের চলাফেরা সাড়া শব্দ বন্ধ হয়ে যায়, তখন তিনি হামাগুড়ি দিয়ে আখ খেত পার হয়ে অনেক কষ্টে পার্শ্ববর্তী গ্রামের এক সহৃদয় ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে আত্মরক্ষা করেন। তাঁকে না পেয়ে বাকি তিনজনকে জবাই করে চকপাড়ার এক পুরানো ইঁন্দারার (কূপ) মধ্যে ফেলে দেয়। এই ইন্দারায়

রাজাকার খাদেমুল ইসলাম এবং তার রাজাকার সঙ্গীরা আরো অনেককে হত্যা করে ফেলে দিয়েছে। তাঁদের কারো পরিচয় কেউ জানারও সুযোগ পায়নি।[১৬] পরবর্তীতে ধুলো মাটি জমা হয়ে কূপটির অনেকটা অংশই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। পরবর্তীতে কূপটি মাটি দিয়ে ভরাট করে দেয়া হয়েছে।

### বাসুদেবপুর গণহত্যা

বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়নের অন্তর্গত বাসুদেবপুর গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী প্রবেশ করে রাজাকার আলবদরদের সহযোগিতায়।তারা বাজার থেকে কয়েকজন হিন্দু যুবককে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহ করে ধরে নিয়ে আসে বাসুদেবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে। সেখানে তাদের গুলি করে হত্যা করা হয়। তাদের নাম পরিচয়ের কথা বলতে গিয়ে সুজিত সরকার তাঁর *'নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস'* গ্রন্থে সত্যানন্দ পালের নাম উল্লেখ করেছেন। অন্যান্যদের পরিচয় পাওয়া যায়নি।[১৭]

### নসরতপুর গণহত্যা

৫নং বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়নের নসরতপুর গ্রামের হিন্দু জমিদার পরিবারের দিলীপ কুমার রায় ছিলেন এলাকার ধনাঢ্য ব্যক্তি। বিশাল পরিবার ছিল তাঁর। স্থানীয় দালাল-রাজাকারের যোগসাযশে পাকিস্তানি বাহিনী হঠাৎ তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। এরপর বাড়ি ঘর লুটপাট করে অগ্নিসংযোগ করে।

## বধ্যভূমি ও গণকবর

নলডাঙ্গায় গণহত্যার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বধ্যভূমি ও গণকবর। স্বাধীনতা যুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে গণহত্যা হলেও বর্তমানে এই উপজেলার সেইসব স্থানে গণকবর ও বধ্যভূমি বর্তমানে দেখা যায়নি। গবেষণাকর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে চকাপাড়া কূপ বধ্যভূমির কথা জানা যায়।

### চকপাড়া কূপ বধ্যভূমি

জুন মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে বহু মানুষকে হত্যা করে চকপাড়া গ্রামের মাঠে অবস্থিত একটি কূপে ফেলে রাখা হত। সকলের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি এবং সঠিক সংখ্যাও জানা সম্ভব হয়নি। তবে প্রায়ই সাধারণ মানুষকে সেখানে এনে লাইনে দাঁড় করে, গুলি করে হত্যা করা হত বলে জানা যায়।

## নতুন কবরের সন্ধান লাভ

### নসরতপুর গণহত্যা

এই গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে এই নতুন নসরতপুর গণহত্যা ও নসরতপুর কবরের সন্ধান লাভ হয়েছে।

## মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি ও স্মারক

নলডাঙ্গা উপজেলায় শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে স্মৃতি ও স্মারক খুব বেশি গড়ে ওঠেনি এখনও।

### শহীদ নজমুল হক ডিগ্রি কলেজ

১৯৮৮ সালে নলডাঙ্গা উপজেলায় মুক্তিযুদ্ধে শহীদ নজমুল হকের নামে এ কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা হয়।

স্বাধীনতার ৪৫ বছর পার হলেও চকপাড়া বধ্যভূমিতে শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে আজও কোন ধরনের স্মৃতিতম্ভ বা স্মৃতি স্মারক নির্মাণের কেউ তেমন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। **১৯৭১** সালের পর বধ্যভূমির কূপটি মাটি দিয়ে ভরাট করা হয়েছিল। কিন্তু কোন স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি হয়নি। সেখানে স্কুল তৈরি করা হবে বলে জানা গিয়েছে। তবে স্থানীয় এলাকাবাসীর দাবি যেন সেখানে একটি স্মৃতি স্মারকও নির্মিত হয়।

নলডাঙ্গা উপজেলায় জুন মাস থেকেই ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল শান্তি বাহিনীর নাসিরুদ্দিন ও খাদেমুল ইসলামের নেতৃত্বে রাজাকার বাহিনী। হিন্দু মুসলিম, ধনী, গরিব কেউই রক্ষা পায়নি তাদের আক্রোশ থেকে। গণহত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ছিল নৈমিত্তিক ঘটনা। এ উপজেলার চকপাড়া গণহত্যা সম্পর্কে অধ্যাপক সুজিত সরকার *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। তবে সেখানে নামসংক্রান্ত কিছু ভুল ত্রুটি রয়েছে বলে জানা যায়। এই গ্রন্থ ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থে নলডাঙ্গা উপজেলার গণহত্যা সম্পর্কে জানা যায় না। নসরতপুর গণহত্যা সম্পর্কে কোন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এছাড়া সুজিত সরকারের গ্রন্থে এ উপজেলার বাসুদেবপুর হত্যাযজ্ঞ, নলডাঙ্গা রেলস্টেশনের জোরপূর্বক জনগণকে দিয়ে পাহারা দেয়ার কথা জানা যায়। এ উপজেলার কয়েকজন রাজাকারের নাম জানা যায় তাঁর বই থেকে। এই অভিসন্দর্ভে নলডাঙ্গা উপজেলার রাজাকারদের বিস্তারিত কিছু তথ্য দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। **১৯৭১** সালের ২১শে ডিসেম্বর নাটোর বিজয় অর্জন হয়। যারা যুদ্ধকালীন সময়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল, তারা নাটোর স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে নিজ এলাকায় ফিরে আসতে শুরু করে।

তথ্য নির্দেশ

[১] নাটোর জেলা বাতায়ন(http:// naldanga.nator.gov.bd/)

[২] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান* ১৯৭৪, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পৃ.১৪০-১৪১

[৩] নাটোর জেলা বাতায়ন(http://biprobelghoriaup.nator.gov.bd/)

[৪] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান* ১৯৭৪,প্রাগুক্ত, পৃ.১৪০-১৪১

[৫] নাটোর জেলা বাতায়ন(http://biprobelghoriaup.nator.gov.bd/)

[৬] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান* ১৯৭৪,প্রাগুক্ত, পৃ.১৪০-১৪১

[৭] নাটোর জেলা বাতায়ন(http://biprobelghoriaup.nator.gov.bd/)

[৮] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান* ১৯৭৪,প্রাগুক্ত, পৃ.১৪০-১৪১

[৯] নাটোর জেলা বাতায়ন(http://biprobelghoriaup.nator.gov.bd/)

[১০] মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হাকিম উদ্দিন (৬৫), পিতাঃ কছির উদ্দিন, ইউনিয়নঃ বিপ্রবেলঘড়িয়া, গ্রামঃ চকপাড়া, জেলাঃ নলডাঙ্গা। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ চকপাড়া, ১৮ জানুয়ারি, ২০১৬

[১১] বিশ্বনাথ সরকার (৭২), পিতাঃ মন্মথ নাথ সরকার, গ্রামঃ চকপাড়া, ইউনিয়নঃ বিপ্রবেলঘড়িয়া, উপজেলাঃ নলডাঙ্গা, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ চকপাড়া, নিজবাড়ি, ১৮ জানুয়ারি, ২০১৬

[১২] মোঃ হাকিম উদ্দিন, প্রাগুক্ত

[১৩] প্রাগুক্ত

[১৪] সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা এপ্রিল, ২০০৯, পৃ. ২৪৬

[১৫] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০-২৪১

[১৬] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪০-২৪১

[১৭] প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৩

# নবম অধ্যায়

## বাগাতিপাড়া উপজেলা

সমগ্র বাংলাদেশের জনগণের মত ‘বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো; তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা’-এ দুটি শ্লোগান বাগাতিপাড়া উপজেলার জনগণের মাঝেও পরিলক্ষিত হয়েছিল। সারা বাংলাদেশের মানুষের মতো বাগাতিপাড়া উপজেলার মানুষও চেয়েছিল বাংলাদেশকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করতে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও এদেশীয় দোসররা এ উপজেলায়ও সৃষ্টি করেছিল ভয়, মৃত্যু, নির্যাতন ধ্বংসযজ্ঞের বিভীষিকাময় পরিস্থিতি। কিন্তু এ এলাকায় তারা খুব বেশি সুবিধা করতে পারেনি। এ এলাকার জনগণের প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল তাদের বিরুদ্ধে। লুটপাট, ধ্বংসযজ্ঞ, হত্যা, নির্যাতন এ অঞ্চলেও চলে দীর্ঘ আট মাস ধরে। তবে হত্যা ও নির্যাতনের সংখ্যা খুব বেশি নয় এ এলাকায়। তারপরও এ উপজেলায় ও করুন মৃত্যু, নারী ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ছিল।

**অবস্থান :**

নাটোর জেলার ছোট একটি উপজেলা বাগাতিপাড়া। এর আয়তন ১৫৫.৪০ বর্গ কি.মি.। ২৪°১৫´ থেকে ২৪°২২´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°৫১´ থেকে ৮৯°০৩´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। সীমানা: উত্তরে নাটোর সদর উপজেলা, দক্ষিণে লালপুর উপজেলা, পূর্বে বড়াইগ্রাম উপজেলা, পশ্চিমে চারঘাট, বাঘা ও পুঠিয়া উপজেলা।[১] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ৬৮৮৬৭ জন।[২] বর্তমানে জনসংখ্যা ১১৮৯৪ জন(২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)।[৩] ৪টি ইউনিয়ন নিয়ে বাগাতিপাড়া থানা গঠিত হয় ১৯০৬ সালে পরে ফাগুরদিয়াড় ইউনিয়ন মূলত দয়ারামপুর ইউনিয়ন থেকে ভেঙ্গে আলাদা ইউনিয়ন করা হয়। বর্তমানে ৫টি ইউনিয়ন রয়েছে এই উপজেলায়। কথিত আছে নীলচর সাহেবরা স্থানীয় বাগদীদের দ্বারা প্রজাদের অত্যাচার করত। তাই প্রথমদিকে বাগদীপাড়া নাম থাকলেও পরে পরিবর্তন করে বাগাতিপাড়া রাখা হয়। নীলকুঠি উপজেলা সদর থেকে ২ কি.মি. পশ্চিমে বড়াল নদীর অপর পার্শ্বে অবস্থিত ছিল।

১৯৮৩ সালে বাগাতিপাড়া থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। ২০০৪ সালে বাগাতিপাড়া পৌরসভা স্থাপিত হয়। এই উপজেলাটি বড়াল নদীর মাধ্যমে দ্বিখন্ডিত হয়েছে। বড়ালনদী রাজশাহীর চারঘাট উপজেলায় পদ্মা থেকে উৎপত্তি হয়ে নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া, লালপুর, বড়াইগ্রাম, নাটোর সদর, গুরুদাসপুর হয়ে পাবনা জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যমুনায় মিশেছে। এক সময় এই নদীপথ যাতায়াতের মাধ্যমে ছিল। তবে এখন শুধু বর্ষা মৌসুমে এটা ব্যবহার উপযোগী। এ উপজেলায় সাঁওতাল, বাগতি, পাহাড়ি, ওরাঁও আদিবাসীর বসবাস রয়েছে।[৪]

এ উপজেলায় যেসব ইউনিয়ন, গ্রাম ও এলাকাতে গণহত্যা ও নির্যাতন অধিক পরিমাণে সংঘটিত হয়েছে সেগুলোর বর্ণনা উল্লেখ করা হল:

**জামনগর ইউনিয়ন:**

জামনগর ইউনিয়নের উত্তরে কাফুরিয়া, দক্ষিণে আঁড়ানী। পূর্ব দিকে পাঁকা ও বাগাতিপাড়া এবং বাগাতিপাড়া এবং পশ্চিমে নিমপাড়া অবস্থিত। বর্তমানে এর আয়তন ৭৪৩৬ একর।[৫] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ১৫,৭৪৮ জন।[৬] বর্তমানে জনসংখ্যা ২৬৪৫৮ জন (২০০১সালের আদমশুমারি অনুযায়ী) ও ৪১টি গ্রাম রয়েছে।[৭] এ অঞ্চলে কাঁচা রাস্তার পরিমাণ বেশি। এখানে বিভিন্ন

আদিবাসী বাস করে (প্রায় ৩৬টি জাতি)। এই ইউনিয়নের পাশ দিয়ে বড়াল নদী বয়ে গেছে। উপজেলা সদর থেকে এ ইউনিয়ন প্রায় ১৬ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত। এ ইউনিয়ন শঙ্খ শিল্পের জন্য বিখ্যাত।[৮]

**দয়ারামপুর ইউনিয়ন :**

বাগাতিপাড়া উপজেলা থেকে ৭ কি.মি. পূর্ব দিকেও নাটোর শহর থেকে ১৭ কি.মি. দক্ষিণে ৪নং দয়ারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ অবস্থিত। বর্তমানে এর আয়তন ১১৪৭৭ একর।[৯] ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জনসংখ্যা ছিল ২৪২৬৮ জন।[১০] বর্তমানে জনসংখ্যা ২৭২৪২ জন ও ১২টি গ্রাম রয়েছে(২০০১সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)।[১১] ডুমরাই খাল, মিশ্রিপাড়া জয়ন্তীপুর খাল ও বড়াল নদী রয়েছে এখানে। দিঘাপাতিয়া থেকে প্রায় ১২ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে এবং মালঞ্চি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ৫ মাইল পূর্বে বড়াল নদীর তীরে অবস্থিত দয়ারামপুর নামক স্থানে রাজবাড়ীটি অবস্থিত। এখানে প্রমথনাথের পুত্ররা থাকতেন। পূর্বে স্থানটির নাম ছিল নন্দকুজা। রাজবাড়ী নির্মিত হওয়ার পর দিঘাপাতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দয়ারামের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ হয় দয়ারামপুর। পরবর্তীতে রাজবাড়ী দয়ারামপুর সেনানিবাস গঠিত হয়। এ ইউনিয়নের অধিকাংশই মফস্বল শহরের মত।[১২]

**দয়ারামপুর :**

বাগাতিপাড়া উপজেলা থেকে পশ্চিমে এর অবস্থান। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর আয়তন ছিল ৫২৯ একর ও জনসংখ্যা ছিল ১৮৪১ জন।[১৩] ২০০১ সালে ছিল জনসংখ্যা ৩৯৬৯ জন, বর্তমানে রয়েছে ৪৩৮৮ জন (২০১১ এর আদমশুমারি)।[১৪] এখানে বড়াল নদীর উপর একটি ব্রিজ যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম। ১৯৭১ সালে দয়ারামপুর এ পাকিবাহিনী হত্যাকান্ড, লুট, অগ্নিসংযোগ করে।[১৫]

**বাগাতিপাড়া ইউনিয়ন :**

নাটোর হতে বাগাতিপাড়া উপজেলার পথে তমালতলা মোড় হতে ৩০০ মিটার দক্ষিণে এই ইউনিয়ন পরিষদ অবস্থিত। এটি তমালতলা মৌজায় অবস্থিত। ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এর জনসংখ্যা ছিল ১৩,১৪৭ জন।[১৬] বর্তমানে জনসংখ্যা প্রায় ২৬৭০৬ জন ও আয়তন ৭০৩০ একর (২০০১সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)। এ ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত।[১৭] এই ইউনিয়ন পরিষদের মধ্য দিয়ে নারদ নদী নাটোর সদর হয়ে কাঁফকো নামক জায়গা হয়ে জামনগরে ব্রজাপুর খালে পতিত হয়েছে। এছাড়া বড়াল নদীর একটি অংশ রয়েছে।[১৮]

## সংগ্রাম পরিষদ গঠন

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণে উপজেলার জনগণকে অনুপ্রাণিত করেছিল। তারাও শাসকগোষ্ঠীর শোষণ-বঞ্চনা থেকে দেশকে মুক্ত করার প্রত্যয় দীপ্ত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর ভাষণে যে নির্দেশ দেয়া হয় তা পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে বাগাতিপাড়াবাসী। এ লক্ষ্যেই ১১ই মার্চ তমালতলায় মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। এ সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন তমালতলীর বাসিন্দা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা মাজেদুর রহমান চাঁদ। এছাড়াও ছিলেন, আওয়ামীলীগের সদস্য সিরাজুল ইসলাম, আব্দুল ওয়াহেদ মোল্লা, কাজী ফজলুর রহমান, ওয়াকিল উদ্দিন, গোলাম রব্বানী, রফাতউল্লাহ সোনার প্রমুখ। তাঁরা বাগাতিপাড়া উপজেলার জনগণকে অনুপ্রাণিত করে দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে।

## প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা

বঙ্গবন্ধুর মার্চের ভাষণের ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ বাঙালি নানাভাবে প্রশিক্ষণ নিতে থাকে। বাগাতিপাড়ার জামনগর ইউনিয়নের বড়াল নদীর উন্মুক্ত প্রান্তরে এলাকার যুবকেরা প্রশিক্ষণ নেন। সংগ্রাম পরিষদ অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত আনসার ও উৎসাহিত যুবকদের স্থানীয়ভাবে রাইফেল প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। বাগাতিপাড়ার জামনগর ইউনিয়নের বড়াল নদীর উম্মুক্ত প্রান্তরে এলাকার যুবকেরা প্রশিক্ষণ নেন।

## সংঘর্ষের সূত্রপাত

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর অত্যাচারে বাঙালি অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। স্বাধীনদেশ হিসেবে বাংলাদেশকে ঘোষণা বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন। তার ঘোষণাটি তৎকালীন ইপিআর এ ট্রান্সমিটারে করে ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া উপজেলায় ছড়িয়ে পড়লো। ২৬শে মার্চ বাগাতিপাড়ার জনগণ বাংলাদেশকে মুক্ত করার স্লোগানে মুখরিত কর তুলল। এইদিন রাজশাহী সেনানিবাস অভিমুখে যাবার পথে বাগাতিপাড়া থানার অন্তর্বতী গালিমপুর বিলের কাছে স্বাধীনতাকামী জনতা, আনসার, মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আক্রমণের মুখে পড়ে পাকিস্তানি বাহিনী। এ সময় তাদের ৪ জন নিহত হয়। ২৯শে মার্চ লালপুরের ময়না প্রতিরোধ যুদ্ধে এ এলাকার মানুষ চলে গিয়েছিল সেখানে। সকলের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছিল। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল পাকিস্তানি বাহিনরি বিরুদ্ধে। ময়নার প্রতিরোধ যুদ্ধে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে আরেকটি সম্মুখ যুদ্ধে মুখোমুখি হয় জামনগর ইউনিয়নের গয়লার ঘোপ গ্রামে। এখানেও পাকিস্তানি ৪ সৈন্য মারা যায়। শহীদ হয় একজন মুক্তিযোদ্ধা শহীদ নায়েব আলী। এভাবে বারবার পর্যুদস্ত হয়ে পাকিস্তানি বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র উপজেলায় এপ্রিল মাসে। ক্যাম্প স্থাপন করে বড়াল নদীর তীরে। এছাড়া দয়রামপুর বাজার সংলগ্ন এলাকায় (বর্তমান কাদিরাবাদ সেনানিবাস) তারা ক্যাম্প স্থাপন করে।

## শান্তিকমিটি গঠন

পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী বাগাতিপাড়া দখল করে শান্তিকমিটি গঠন করে। যার প্রধান ছিলেন সরফরাজুল ইসলাম (লক্ষণহাটা) এছাড়া এর আরও সদস্য হল : আজিজুর রহমান, মনিরুজ্জামান, আফাজ উদ্দিন, মছের চেয়ারম্যান, খলিলুর রহমান সেক্রেটারি আফছার চেয়ারম্যান, নুরমন্ডল, আফছার মন্ডল প্রমুখ। এদের সাথে রাজাকার, আলবদর যুক্ত হয়ে পুরো এলাকায় ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করেছিল।

## রাজাকার আলবদর বাহিনী গঠন ও তাদের অপরাধের চিত্র

পাকিস্তানি বাহিনী বারবার পরাজিত হয়ে শান্তিকমিটির দালালদের সহায়তায় একটি রাজাকার ও আলবদর বাহিনী গড়ে তোলে। এদের প্রধান কার্যালয় হয় দয়রামপুর বাজারে। রাজাকার আলবদর বাহিনীর প্রধান ছিলেন কাজী আঃ রাজ্জাক। এছাড়াও ছিল আসমত আলী, হযরত আলী, আলিমুদ্দিন রাজাকার কমান্ডার, এরশাদ আলী, মোঃ আবুল হোসেন। আব্দুল জলিল প্রমুখ। দয়বামাপুর ক্যাম্পের রাজাকারদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে এলাকাবাসী। অত্যাচার, নির্যাতন, লুটপাট করে এলাকায়। নির্যাতন ও গণহত্যার দুই-একটি ঘটনা ঘটলেও লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। স্থানীয়রা অনেকেই যুদ্ধের শুরুতেই পাড়ি জমিয়েছিল ভারতে বা অন্য কোন নিরাপদ আশ্রয়ে। যারা ছিল তাদের মধ্যেই দুই এক জনের গণহত্যা ও ধর্ষণের কথা জানা যায়।

গোপনে হানাদার বাহিনীকে সাথে নিয়ে সরফরাজুল ইসলাম, লক্ষণহাটী গ্রামের হযরত আলী এবং রাজাকার কমান্ডার আসমত আলী সহ সারা উপজেলায় প্রতিটি গ্রামের বসতবাড়ী জ্বালিয়ে দিয়েছে, ধর্ষণ, লুটপাট করেছে। এছাড়াও বিভিন্ন গ্রামের যেমন কৃষ্ণপুর গ্রামের অমর কুমার সিংহের (শিক্ষক) বাড়ী থেকে রাজাকার কমান্ডার আব্দুল আলীম সহ দোসররা গরু বাছুর, ধান, চাউল লুট করে নেয়। তারা বিভিন্ন বাড়িতে খোঁজ করত পুরুষরা বাড়িতে আছে কিনা। যে বাড়িতে যুবক ছেলেরা না থাকত, সেখানে নেমে আসত নির্যাতন। বেগুনিয়া, দয়রামপুর, গালিমপুর, নূরপুর মালঞ্চ এলাকায় তারা হত্যা নির্যাতন চালায়। এছাড়া ঈশ্বরদী, শান্তাহার কাছাকাছি হওয়ার ঐ এলাকার অবাঙালিরা রেলপথে এসে ভাগাতিপাড়া উপজেলায় অত্যাচার করত পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিয়ে এসে। এছাড়া নওসেরা গ্রামের কুলকুঠী নামক স্থানে ইংরেজদের পরিত্যক্ত বাড়িতে ক্যাম্প করে পাকিস্তানি বাহিনীর সাহায্যে আক্রমণ করতে চাইলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। দয়রামপুর ও নওসোরা ক্যাম্প মুক্তিযোদ্ধারা ধ্বংস করেছিল। তারপরও ৮ মাস ধরে এ এলাকায়ও চলে ধ্বংসযজ্ঞ।

## পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প সমূহ

বাগাতিপাড়া উপজেলায় আলাদা করে কোন বন্দী শিবির বা নির্যাতন কেন্দ্র ছিল না। তারপরও কিছু কেন্দ্র ছিল যেখানে রাজাকার ও আলবদর বাহিনী ক্যাম্প করেছিল এবং এখান থেকে পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য করত। যেমন–

১. দয়রামপুর বাজার (বর্তমান কাদিরাবাদ সেনানিবাস)
২. বড়াল নদীর তীর-এ ক্যাম্প
৩. নওসেরা গ্রামের কুলকুঠীতে ইংরেজদের পরিত্যাক্ত বাড়ি। তবে এগুলোর একটিও বেশিদিন স্থায়ী হতে পারেনি। মুক্তিযোদ্ধারা ও স্থানীয় জনগণ সেগুলো ধ্বংস করে দিয়েছিল। তবে সারা উপজেলাই তাদের ক্যাম্প বা বন্দী শিবির হিসেবে অভিহিত হত।

## বাগাতিপাড়া উপজেলার গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ

১৯৭১ সালে এপ্রিল মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নাটোর শহরে প্রবেশ করার পরপর ধীরে ধীরে অন্যান্য উপজেলা আক্রমণ করে। থানা ঘেরাও করে সেসব এলাকাগুলোতে চালায় নির্মম হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতন প্রভৃতি। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে বাগাতিপাড়া উপজেলায় পাকিস্তানের এদেশীয় দালাল তাদের প্রভুদের আমন্ত্রণ জানায়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাদের সহযোগীদের সাহায্যে এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকার সাধারণ মানুষের মানুষকে অত্যাচার করেছে। নিরপরাধ বহু লোকদের হত্যা করেছে। সম্ভ্রম লুট করেছে বহু নারীদের। লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। নাটোর শহরে মিলিটারি এসেছে জানতে পেরে এ উপজেলার বহু মানুষ নিজেদের ঘরবাড়ি, ধন-সম্পদ সব কিছু ফেলে শুধুমাত্র জীবন আশ্রয়ের খোঁজে। যারা ছিল তাঁরা বিভিন্নভাবে অত্যাচারিত, নির্যাতিত হয়েছে। কেউ বা হাঁরিয়েছে নিজের জীবন।

বাগাতিপাড়া উপজেলার পাঁকা ইউনিয়নের বেগুনিয়া গ্রামের শিলা চক্রবর্তী জানান, কিভাবে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিয়ে এসে দালালরা নির্মমভাবে হত্যা করে স্বপন চক্রবর্তীকে। তিনি বলেন,

স্বপন কৃষিকাজ করা একজন সাধারণ মানুষ। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী দালালদের মাধ্যমে জানতে পেরেছিল তাঁর কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের একটি ছবি আছে। আর এ দোষেই অতর্কিত বাড়িতে হামলা চালিয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে নিকটবর্তী বড়াল নদীর ধারে ধরে নিয়ে আসে। সেখানে শেখ মুজিবের ছবি তাঁর বুকে ঝুলিয়ে গুলি করে হত্যা করে হানাদার বাহিনী।[১৯]

স্থানীয় দালাল ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যার পাশাপাশি নির্যাতন করতে থাকে তমালতলীর অনেক নারীকে। তমালতলীর নূরপুর মালঞ্চি গ্রামের কল্পনা রানীকে নির্যাতন করে ফেলে রেখে যায় তাঁর বাবার বাড়িতে। স্থানীয় করতোয়া পত্রিকার সাংবাদিক রেজাউল নবী রেনু সাক্ষাৎকারে জানান,

> কল্পনা তাঁর ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে বাবার বাড়ি এসেছিল। ভাই ফিরাগমনে গেলে বাড়িতে লোকজন কম ছিল। স্থানীয় দালালরা পাকিস্তানি সেনাদের নিয়ে আক্রমণ করে কল্পনাদের বাড়ি। সেখানেই তাঁকে ধর্ষণ ও নির্যাতন শেষে ফেলে রেখে যায়। পরবর্তীতে জলঙ্গি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও তাঁকে আর বাঁচানো যায়নি।[২০]

২৫শে এপ্রিল হানাদার বাহিনীর সাথে মুক্তিবাহিনীর সম্মুখ প্রতিরোধ যুদ্ধ হয় জামনগর থানায়। এতে শহীদ হন নায়েব আলী। পাকিস্তানি বাহিনীরও ৪-৫ জন সেনা মারা যাওয়ায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। ঐ দিনই পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যা করে পাকা ইউনিয়নের চকগোয়াশ গ্রামের আনসার কমান্ডার শমসের আলীকে। আয়েশা বেগম সাক্ষাৎকারে জানান, শমসের আলী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতেন। এটা জেনে যায় পাকিস্তানি বাহিনীর দালাল স্থানীয় হোমিও ডাঃ রজব বিহারী। শমসের আলীকে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। পরবর্তীতে জানা যায় লালপুর উপজেলার বাওড়া ব্রিজ এ তাঁকে হত্যা করে পানিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে।[২১] ২৬শে এপ্রিল ১৯৭১, দয়রামপুর বাজারে পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায় হত্যা করে দয়রামপুর বাজারের সম্ভ্রান্ত হিন্দু ধনী ব্যবসায়ী মেঘনাথ সাহাকে। রঘুনাথ সাহা সাক্ষাৎকারে জানান,

> এলাকার অবস্থা ভাল নয় বুঝতে পেরে পরিবারকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠালেও নিজে কয়েকদিন পরে বাড়িঘর ছাড়তে চাইলেন। তাই ২৬শে এপ্রিল বাড়িতে টাকা-পয়সা, সোনা যা ছিল, তা নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন পরিবারের কাছে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। স্থানীয় দালাল রাজাকার বাহিনী বিষয়টি জানতে পেরে পাকিস্তানি সেনাদের নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে। গুলি করে হত্যা করে। এরপর বাড়িঘর লুটপাট করে বাড়িকে ক্যাম্পে পরিণত করে। তমালতলীর আরও অনেক নারীকে সম্ভ্রম হারাতে হয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দালালদের কাছে। এভাবে স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত বাগাতিপাড়া উপজেলার বহু নারী যেমন নির্যাতিত হয়েছে, অনেক হারিয়েছে জীবন, সম্পদ প্রভৃতি।[২২]

## নারী নির্যাতন

১। কল্পনা রাণী কর্মকার : তমালতলার নুরপুর মালঞ্চি গ্রামের কর্মকার পাড়ার কল্পনারানী কর্মকার। বিয়ে হয়েছিল সিংড়া থানার হাতিয়ানদহে। ভাইয়ের বিয়েতে এসেছিলেন। ভাই ফিরাগমনে শ্বশুরবাড়ি গেলে বাড়িতে শুধু বাবা-মা ও বোন সহ একলা ছিলেন। হঠাৎ পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা বাড়ি আক্রমন করে। তারা কল্পনা সেখানে।

২। একজন সদ্য প্রসূতি মহিলার কথা জানা যায়। যিনি তমালতলার জনৈক মওলানার বাড়িতে ছিলেন। তাকে রাজাকার, আলবদররা ধর্ষণ করেছিল। এতে অবস্থা খারাপ হয় তার। মুক্তিবাহিনী জানতে পেরে তাকে ভারতের জলঙ্গী হাসপাতালে নিয়ে গেলেও আর বেঁচে ফিরেনি সে।[২৩]

নির্যাতনের এই ঘটনাগুলো জানা যায়। অন্যান্য কোথাও কোন নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটলেও তা জানা সম্ভব হয়নি। অনেকেই সেসব স্মৃতি আর মনে করতে চান না।

## বাগাতিপাড়া উপজেলার নির্যাতন ও গণহত্যা

বাগাতিপাড়া উপজেলার নির্যাতন ও ৩ টি গণহত্যা সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

### দয়রামপুর গণহত্যা

বাগাতিপাড়া উপজেলার দয়রামপুর ইউনিয়নের মেঘনাথ সাহা ছিলেন ধনী ব্যবসায়ী। স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠালেও নিজে বাড়িতে দিলেন কিছুদিন। কিন্তু পরিস্থিতি বেগতিক দেখে দেশ ছাড়তে যেতে মনস্থ করেন। তাই সোনা-টাকা-পয়সা নিয়ে ২৬শে এপ্রিল বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। এমন সময় রাজাকার কমান্ডার রাজ্জাক কাজী, আম্মাদ, আমীর হোসেন, সাজদার, বাহার, জোনার, মোসলেম ১২-১৪ জন রাজাকার নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনী তাকে দয়রামপুরেই গুলি করে হত্যা করে। এরপর তাঁর বাড়ি ঘর লুটপাট করে সেখানে ক্যাম্প স্থাপন করেছিল। পরদিন মেঘনাথ সাহার ছেলে এসে রঘুনাথ সাহা পরদিন এসে তাঁকে কবরস্থ করে। যদিও তাঁদের বাড়ি রাজাকার বাহিনী পুড়িয়ে দিয়েছিল।

### পাকা ইউনিয়ন গণহত্যা

শহীদ শমসের আলীর বাড়ি পাকা ইউনিয়নের চকগোয়াশ গ্রামে। তিনি আনসার কমান্ডার ছিলেন। পাকিস্তানিবাহিনীর সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধে ৪ জনকে হত্যা করেন। এ ঘটনার পর পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। শমসের আলী মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। এমন সময় স্থানীয় হোমিও ডাঃ রজব বিহারীদের নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনী নিয়ে আসে সেখানে। শমসের আলীকে তারা ধরে নিয়ে যায় বাওড়া ব্রিজে (লালপুর উপজেলার)। পরবর্তীতে জানা যায় তাকে সেখানে হত্যা করে পানিতে ফেলে দেয়া হয়েছে।

### বেগুনিয়া গ্রাম গণহত্যা

১৯৭১ সাল, এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়। সারাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা কায়েম করেছিল অত্যাচারের শাসন। নাটোর জেলার বাগাতিপাড়া থানার পাকা ইউনিয়নের ছোট গ্রাম বেগুনিয়া। তমালতলীবাজারের দক্ষিণে অবস্থিত এই গ্রামের একজন সাধারণ ব্যক্তি স্বপন চক্রবর্তী। সদ্য বিবাহিত স্বপন কৃষিকাজ করতেন। স্থানীয় দালালরা জানতে পারে, তাঁর কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের ছবি আছে। সুতরাং সে আওয়ামীপন্থী ও মুক্তিকামী। দালালরা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী নিয়ে হঠাৎ তাঁর বাড়ি ঘেরাও করে। সুজিত সরকার *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন- স্বপনের বাড়ি আক্রমণ করে তাঁর ঘর বাড়ি-ঘর লুটপাট করে। হঠাৎ ট্রাঙ্কের ভেতর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ছবি পায় এবং তখন তাঁকে ধরে নিয়ে যায় তমালতলী বাজারে। সেখানে বড়াল নদীর ধারে শেখ মুজিবের ছবি তাঁর গলায় ঝুলিয়ে গুলি করে হত্যা করে স্বপন চক্রবর্তীকে। এরপর সেই ছবিটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। পরিবারের লোকজন গিয়ে স্বপনকে বড়াল নদীর ধারেই কবরস্থ করে।[২৪]

## নতুন গণহত্যার সন্ধান লাভ

বাগাতিপাড়া উপজেলায় একটি নতুন গণহত্যার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

**দয়রামপুর গণহত্যা**

এই গবেষণাকর্মটি পরিচালনা করতে গিয়ে দয়রামপুরের মেঘনাথ সাহার গণহত্যা ও তাঁর কবরের সন্ধান লাভ হয়েছে।

১৯৭১ সালের এপ্রিল মাস থেকেই বাগাতিপাড়া উপজেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও এদেশীয় দালালরা হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ যেমন করেছিল, তেমনি লুটপাট, অগ্নিসংযোগও করেছিল। স্থানীয় জনগণ ও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধের কারণে এ এলাকায় তাদের ত্রাসের পরিমাণ কিছুটা কম ছিল। অন্যান্য এলাকায় অন্যান্য এলাকার তুলনায়। অনেকেই ভারতে বা অন্য কোন আশ্রয় নিয়েছিল। ফলে যারা যাননি, তাঁরাই মূলত পাকিস্তানি বাহিনী ও তার দোসরদের কোপানলে পড়েছিল। কিন্তু লুটপাট, অগ্নিসংযোগ ছিল চরমপর্যায়ে। বিভিন্ন বাড়ি ঘর লুটপাট করে খাদ্য পশু-পাখি, ধনসম্পদ নিয়ে যেত রাজাকার আলবদর বাহিনী। আবার ধনসম্পদ নিয়ে নিরীহ মানুষদের হত্যার ঘটনাও পরিলক্ষিত হয় বাগাতিপাড়া উপজেলায়।

এ সম্পর্কে সুজিত সরকার '*নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*' গ্রন্থে উলেখ করেছেন। অন্য কোন গ্রন্থে বাগাতিপাড়া উপজেলার গণহত্যা সম্পর্কে জানা যায় না। দয়রামপুর গণহত্যা সম্পর্কে কোন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এ ছাড়া শমসের আলী নিখোঁজ সম্পর্কেও কোন গ্রন্থে পাওয়া যায়নি। এই গবেষণাকর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে তথ্যগুলো সম্পর্কে জানা গিয়েছে। বাগাতিপাড়া উপজেলার গণহত্যায় থেকে দেখা যায়, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে মানুষদের হত্যা করা হয়েছিল। নির্যাতিত, লাঞ্ছিত হয়েছিল বহু নারী।

উপজেলা বাগাতিপাড়ার বিভিন্ন স্থান থেকে মুক্তিযোদ্ধারা একত্র হয়ে উপজেলার রেলব্রিজের হানাদার ক্যাম্প থেকে এবং আড়ানী থেকে রাজশাহী হতে ফিরে আসা পলাতক হানাদার বাহিনীর সুসজ্জিত (বেলুচ) সেনাসদস্যদের নাটোরে নিয়ে যাওয়া হয় ১৮শে ও ১৯শে ডিসেম্বর। ভারতীয় সেনাসদস্যদের কাছে আত্মসমর্পনের জন্য তাদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯৭১ সালের ১৮শে ও ১৯শে ডিসেম্বর সকাল ১১ ঘটিকায় মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ে যায়। ঐ দিনই বাগাতিপাড়ায় হানাদার মুক্ত হবার দিন।

তথ্য নির্দেশ

[১] সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া- নবম খন্ড*, *বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১, পৃ. ১৬৯-১৭০

[২] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, পৃ. ১৪৬-১৪৮

[৩] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ১৬৯-১৭০*

[৪] নাটোর জেলা বাতায়ন(http://bagatipara.natore.gov.bd/ )

[৫] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ১৬৯-১৭০*

[৬] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৮

[৭] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ১৬৯-১৭০*

[৮] নাটোর জেলা বাতায়ন(http://jamnagar.natore.gov.bd/ )

[৯] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ১৬৯-১৭০*

[১০] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৮

[১১] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ১৬৯-১৭০*

[১২] নাটোর জেলা বাতায়ন(http//dayarampurup.nator.gov.bd/)

[১৩] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৮

[১৪] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ১৬৯-১৭০*

[১৫] নাটোর জেলা বাতায়ন(http//dayarampurup.nator.gov.bd/)

[১৬] *গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৬-১৪৮

[১৭] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, *পৃ. ১৬৯-১৭০*

[১৮] নাটোর জেলা বাতায়ন(http://bagatipara.natore.gov.bd/ )

[১৯] শীলা চক্রবর্তী (৬০), স্বামীঃ নিরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গ্রামঃ বেগুনিয়া, পোঃ তমালতলা, থানাঃ বাগাতিপাড়া, জেলাঃ নাটোর। ইউনিয়নঃ পাকা সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিকঃ নিজ বাড়ি; ১৭ জুলাই, ২০১৫

[২০] রেজাউন নবী রেনু (৬৩), পিতাঃ নুর মোঃ সরকার, পেশাঃ সাংবাদিকতা (করতোয়া)। গ্রামঃ তমালতলা, ইউনিয়নঃ বাগাতিপাড়া, থানাঃ বাগাতিপাড়া, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ তমালতলা, ১৭ জুলাই, ২০১৫

[২১] আয়েশা বেগম (৭০), স্বামীঃ শহীদ শমসের আলী। গ্রামঃ চকগোয়াশ, পোঃ তমালতলা, ইউনিয়নঃ পাকা, থানাঃ বাগাতিপাড়া, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি, ১৭ জুলাই, ২০১৫

[২২] রঘুনাথ সাহা, পিতাঃ শহীদ মেঘনাথ সাহা। দয়রামপুর বাজার, থানাঃ বাগাতিপাড়া, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ ১৭ জুলাই, ২০১৫

[২৩] সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ২৬৪-২৬৫

[২৪] সুজিত সরকার, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬৪-২৬৫

# উপসংহার

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঘোষণার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চেষ্টা ও প্রতিরোধ করতে থাকে। দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি অর্জন করেছে তাদের স্বাধীনতা। আর এই স্বাধীনতা আমাদের অর্জন করতে হয়েছে ৩০ লক্ষ শহীদ, সাড়ে চার লক্ষ নারীর সম্ভ্রম, লক্ষ মানুষের বাড়িঘর ধ্বংস, নির্যাতনের মধ্য দিয়ে। বাঙালি জাতিকে ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের সহযোগী এদেশীয় রাজাকার আলবদর, আলশামস, শান্তিকমিটি ও অবাঙালি বিহারী সম্প্রদায় চালিয়েছে তাদের অস্ত্র আর অমানবিক হিংস্রতা। যে হিংস্রতা থেকে শিশু, নারী, বৃদ্ধ কেউ বাদ যায়নি। আর এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যে ধর্ষণ ছিল বাঙালির মনোবল ধ্বংস ও বাঙালিকে নিশ্চিহ্ন করে নতুন জাতি সৃষ্টির একটি পৈশাচিক পদ্ধতি। গণহত্যার সাক্ষী হিসেবে নাটোর জেলায় রয়েছে বহু গণকবর ও বধ্যভূমি। উত্তরবঙ্গের ভাগাড় বা বধ্যভূমি নামে পরিচিত ছিল এই নাটোর জেলা (১৯৭১ সালে)।[১]

নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা, নির্যাতন ও মানবতাবিরোধী অপরাধ নিয়ে বড় কোন কাজ এ পর্যন্ত হয়নি। নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে শুধমাত্র অধ্যাপক সুজিত সরকার কাজ করেছেন। *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থে তিনি  নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধ, গণহত্যা, নির্যাতন ও মানবতাবিরোধী অপরাধ সম্পর্কে লিখেছেন যা কোন কোন ক্ষেত্রে আংশিক ও খন্ডিত। গণহত্যা, নির্যাতন প্রভৃতি তথ্যগুলোর বর্ণনা অনেক ক্ষেত্রে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। অনেক তথ্য বাদ পড়েছে এই গ্রন্থে। এছাড়া অধ্যাপক আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস* (২য় খন্ড), সুকুমার বিশ্বাসের *একাত্তরের বধ্যভূমি*, অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত *মুক্তিযুদ্ধ কোষ* (২য় খন্ড), সাঈদ বাহাদুর রচিত *গণহত্যা ও বধ্যভূমি*-৭১, এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সম্পাদিত- *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*(৬ষ্ঠ খন্ড) গ্রন্থে নাটোর জেলার গণহত্যার মাত্র কয়েকটি বর্ণনা করা হয়েছে আংশিক ভাবে । নির্যাতন এর বর্ণনা উল্লিখিত বেশিরভাগ গ্রন্থ গুলোতে নেই। যেসব গ্রন্থে রয়েছে, তার বর্ণনাও আংশিক। ফলে অনেক তথ্য আজও অজানা রয়েছে। একারণেই মূলত মুক্তিযুদ্ধে নাটোর জেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও সহযোগীদের গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী অপরাধ নিয়ে কাজ করতে চেয়েছি।

এই গবেষণাকর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে গণহত্যা ও নির্যানের একটি বিশাল সংখ্যা পাওয়া গিয়েছে। প্রায় ৬৮টি স্থানের গণহত্যা বিষয়ে জানা যায় এই গবেষণাকর্ম পরিচালনা করতে গিয়ে। এছাড়া ১৮ জন নির্যাতিত নারীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। যদিও নির্যাতিত নারীর সংখ্যা এর চেয়ে অনেক বেশি। সামাজিকতার ভয়ে অনেকে বলতে চাননি। ফলে পুরো সংখ্যাটি জানা যায়নি। আমি মনে করি, গণহত্যা ও নির্যাতন সর্ম্পকিত তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে আরও অবকাশ রয়েছে। অনেক স্থানের গণহত্যা আজও অজানাই রয়েছে। কারণ অনেক এলাকায় নতুন বসতি হয়েছে। নতুন মানুষ এসেছে। তারা সেসব এলাকার গণহত্যা ও নির্যাতন সর্ম্পকে কিছুই জানেন না। এদেশের মাটির গভীর থেকে আজো উঠে আসে নির্যাতন আর নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের নির্মম চিহ্ন। গত ২৬শে মার্চ, ২০০০ সালে নাটোর জেলা থেকে পাওয়া যায় একটি হত্যাকাণ্ডের চিহ্ন। সদর থানার পট্টুয়াপাড়ার কুর্মির মাঠে একটি বাড়ির ভিত খনন করার সময় পাওয়া যায় ১০টি মাথার খুলি ও বেশ কিছু চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়গোড়। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের লোকজন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। ঘটনাস্থল থেকে ৫০০ গজ দূরেই মহারাজা হাইস্কুলে ছিলো পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প।[২] অনেক এলাকায় বয়স্ক লোক যারা তখন ছিলেন, তারা অনেকে মারা গিয়েছেন, অনেকে ভুলে গিয়েছেন। সেসব হারিয়ে যাওয়া তথ্য উদ্ধার

করা সম্ভব হলে গণহত্যার সংখ্যা দ্বিগুণ হতে পারে। যদিও এই গবেষণাকর্মে সম্পূর্ণ তথ্য উদ্ধারের যথাসম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী ঢাকায় যে গণহত্যা শুরু করেছিল ২৫শে মার্চ রাতে, তা আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি অঞ্চলে। অসীম সাহাসিকতা, ধৈর্য্য নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ সেই আতঙ্কের মোকাবেলা করেছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী  সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে, কখনও রাজনৈতিক নেতৃত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন দিক থেকে হত্যা করেছে শিশু, মহিলা বৃদ্ধ, যুবক প্রভৃতি। নাটোর পুরো জেলায় গণহত্যায় আনুমানিক প্রায় ১২ থেকে ১৫ হাজারের মত শহীদ হয়েছে।[৩] এর বাইরেও আরও কত মানুষ যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসরদের নৃশংসতার শিকার হয়েছে তার কোন সঠিক হিসাব পাওয়া কঠিন সে সময়কার পরিস্থিতি অনুযায়ী। প্রতিদিন শত শত জনতাকে লাইনে দাঁড় করে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে গলা কেটে, গুলি করে হত্যা করেছে। যদিও কোন কোন ক্ষেত্রে জানা যায়, গণহত্যার ক্ষেত্রে আনুমানিক হিসাব প্রায় ১৫ থেকে ১৬ হাজারের বেশি, কোন কোন ক্ষেত্রে ২০ হাজার এবং নির্যাতিত নারীদের সংখ্যা প্রায় ৩৫০-৪০০ জনের মতো। নাটোর ফুলবাগানে নয় মাসে অন্তত‌ঃ ১৫-১৬ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিল বলেও জানা যায়।[৪] মাঠ পর্যায়ে শহীদদের মধ্যে পরিচয় জানা গিয়েছে ৩৩৫ জনের। আর পরিচয় ছাড়া নাম জানা গিয়েছে ৫৬২ জনের। অধ্যাপক সুজিত সরকার *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* গ্রন্থে ৫৯৪ জন শহীদদের অসম্পূর্ণ তালিকা উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য বইয়ে এর সংখ্যা আরও কম। বিভিন্ন গ্রন্থে খণ্ড হিসাব পাচ্ছি ।

এই অভিসন্দর্ভ পরিচালনাকালীন মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের সময় গণহত্যায় শহীদদের সংখ্যার ব্যাপকতা লক্ষ করা গিয়েছে। যদিও সকল শহীদ ও নির্যাতিত নারীদের সম্পর্কে পুরোপুরি জানা যায় না। গণহত্যা, নির্যাতনের শিকার বহু মানুষ সেসময় ছিল আশ্রিত। কোন কোন ক্ষেত্রে বহু নারী-পুরুষকে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় ধরে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন ও হত্যা করা হত। ফলে সকলের পরিচয় সঠিকভাবে মনে রাখা সাক্ষাৎকারদাতাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তবে নাটোর জেলার গণহত্যা ও নির্যাতনের বিবরণ থেকে এ অঞ্চলে ১৯৭১ সালে রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি সংগঠন ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ব্যাপকতা অনুমান করা যায়।

নাটোরে বিহারীদের সাথে বাঙালির মধ্যে সংঘর্ষ দিয়ে গণহত্যার অন্যতম প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। এরপর সেখানে পরাজিত বিহারীরা পাকিস্তানি বাহিনীর সাথে হাত মিলিয়ে নাটোর জেলায় শুরু করে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড। পাকিস্তানি বাহিনী প্রথম লালপুর থানার ওয়ালিয়া ইউনিয়নে প্রবেশ করে এবং সেখানে স্থানীয় মুক্তিকামী জনতা, ইপিআর প্রভৃতির সাথে প্রতিরোধ যুদ্ধ করে। হত্যা করে লুকিয়ে থাকা বহু নিরীহ বাঙালিকে। আর পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে গিয়েও নিহত হয় বহু বাঙালি। মঙ্গলা নামক একজন কিশোর খেজুর গাছে উঠে পাকিস্তানি বাহিনীর গতিবিধি নির্ধারণ করতে থাকলে, তারা তাকে গুলি করে হত্যা করে। এক পর্যায়ে পাকিস্তানি বাহিনী পরাজিত হয়ে চলে গেলেও তাদের নির্মম হত্যাযজ্ঞ শেষ হয়নি। তারা পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করে ১২ই এপ্রিল নাটোর শহর পুরোটা আক্রমণ করে। ধীরে ধীরে নাটোর জেলার অন্যান্য থানাও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। নাটোর শহর ধ্বংস করেই তারা ছাতনী ইউনিয়নে চালায় নাটোর জেলার অন্যতম বড় গণহত্যা। প্রায় ৫০০ জনের মতো লোক হত্যা, বহু নারী ধর্ষণ করেও ক্ষান্ত হয়নি মানুষ

নামক পাকিস্তানি বর্বর বাহিনী ও তাদের দোসররা। তারা চৌকিরপাড়ে চালায় গণহত্যা, সেখানেও প্রায় ৫০-৬০জন  এছাড়া ফতেঙ্গাপাড়াতে শত শত মানুষকে মেরে নারোদ নদী অন্তর্গত খালে ফেলে দেয়। নাটোরের পাকিস্তানি ক্যাম্পগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন স্থান থেকে ধরে আনা বহু মানুষ নির্যাতিত, ধর্ষিত, নিহত হত।

ময়না প্রতিরোধ যুদ্ধের পর এপ্রিল মাসে লালপুরে পাকিস্তানি বাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করে। সে মাসের ৫ তারিখে গোপালপুর সুগার মিল ঘিরে ফেলে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগী সুগার মিলের জেনারেল ম্যানেজার লেঃ আনোয়ারুল আজীম সহ মিলের বহু মানুষকে হত্যা করে মিলে অবস্থিত গোপাল সাগর নামক পুকুরে (বর্তমানে শহীদ সাগর নামে পরিচিত) ফেলে দিয়েছিল। পুকুরের কেউ বেঁচে আছে বুঝতে পারলে পুনরায় গুলি করেছে। পুকুরের পাশে বহু মানুষকে জীবন্ত কবর দিয়েছে। গোপালপুর বাজারে প্রায় ১১জন বিভিন্ন পেশার মানুষকে হত্যা করে। তৎকালীন সময়ে নাটোরে অবস্থানরত বিহারীদের সাথে বাঙালিদের কোন বিরোধ ছিল না। তবুও দেখা যায় সাথে বিহারীরা বাঙালিদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানিদের সহযোগীতা করেছিল। এই প্রেক্ষিতে ‘মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী গবেষণা কেন্দ্র’ প্রকাশিত ‘রণাঙ্গন একাত্তর’ নামে মাহতাব উদ্দিন সম্পাদিত পত্রিকায় আগস্ট ১৯৮৬ সংখ্যায় এক লেখায় প্রত্যক্ষদর্শী গোপালপুর সুগার মিলের কর্মচারি আব্দুল জলিল শিকদার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন,

> গোপালপুরে কোন বিহারিকে বাঙালিরা নির্যাতন করেনি। ওরাই আগ বাড়িয়ে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিত। সব সময় ওরা ছিল আক্রমণাত্মক। বাঙালিরা ইচ্ছে করলে ওদের পিটিয়ে দেশ ছাড়া করতে পারত। কিন্তু কোন কালেই বাঙালিরা সে রকম নিষ্ঠুর আচরণ করেনি। আমার জানা মতে গোপালপুরে সে রকম ঘটনা ঘটেনি। লুটপাটের চক্রান্ত কতিপয় দালাল আর সাম্প্রদায়িক বাঙালিকে নিয়ে ওরাই করে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর তারাই আক্রমণ চালায় এবং তাদের ঘর-বাড়ি লুটপাট করে। এই ঘটনায় অধিকাংশ মুসলমান বাধা দিয়েছে। তাতেই ওরা ক্ষিপ্ত হয় সাধারণ মুসলমানের উপর। হিন্দু ও ভারতের অনুচর আখ্যা দিয়ে তাঁদের ওপর চড়াও হয়।[৫]

এ উদ্ধৃতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, গোপালপুরে বিহারী দালালরা সাধারণ মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ করেছিল হিন্দুদের সাহায্য করেছিল বলে। এছাড়া তাদের ভারতের অনুচর আখ্যা দিয়েছিল। হিন্দুদের হত্যা, বাড়ি-ঘর লুট, নির্যাতন করেছিল। শুধু তাই নয়, স্থানীয় দালালরাও তাদের সাথে যোগ দিয়েছিল।

বিলমারিয়ার নীলকুঠিতে ক্যাম্প করে সেখানে হত্যা ও ধর্ষণ চালায় বহু নর-নারীর উপর। রামকান্তপুর, ধুপইল, প্রভৃতি বহু গ্রামে গণহত্যা চালায়। আরেকটি নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালায় চংধুপইল এর বাওড়া ব্রিজে। বিভিন্ন স্থান থেকে ট্রেনে আনা হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে ব্রিজের নিচে নদীতে ফেলে দেয়া হত।

গুরুদাসপুর উপজেলায় রাজাকার বেশি ছিল। তাই সেখানে পাকিস্তানি বাহিনী  দ্রুতই প্রবেশ করেছিল। উপজেলার চাঁচকৈড় ও কাছিকাটা বাজারে লুটপাট, হত্যা, অগ্নি সংযোগ অব্যাহতভাবে চলে দীর্ঘ ৮ মাস ধরে। বিয়াঘাটে বহু মানুষকে নির্যাতন করে হত্যা করে পাশ্ববর্তী নন্দকুজা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে পাকিস্তানি বাহিনী ও তাদের দোসররা। নারিবাড়ী এলাকায় প্রায় ৩৭ জনকে হত্যা করে। ধারাবারিষা

ইউনিয়নের পোয়ালশুড়া পাটপাড়া গ্রামে ৭ জনকে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী। এছাড়াও বহু মানুষ হত্যা, নির্যাতন ও ধর্ষণ করে।

সিংড়া উপজেলায় ৮ই মে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দোসররা হত্যা, নির্যাতন, ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। প্রথমেই সিংড়া বাজার থেকে মুক্তিকামী চয়নকে নাটোর শহরে নিয়ে হত্যা করে ঐদিনই কলম, হাতিয়ানদহ ইউনিয়নে শুরু করে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ। কলমে আব্দুল হামিদ, আব্দুল আজিজ, বিশু শেখ সহ ৭-১০জন হত্যা করে। এছাড়া হাতিয়ানদহের বিভিন্ন স্থানে হত্যা, গণহত্যা চালায় পাকিস্তানি বাহিনী। ধরে নিয়ে যায় কয়েকজন নারীকে। পারসাঁঐল গ্রামেও বহু মানুষকে হত্যা করে। এছাড়া ভারতগামী বহু শরণার্থীকে হত্যা করে যারা সিংড়া উপজেলার ছিল। লারকিমারী বিল, আত্রাই নদী প্রভৃতি স্থানেও বহু মানুষকে হত্যা করে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

বড়াইগ্রাম উপজেলায় ১১ই এপ্রিল প্রবেশ করে পাকিস্তানি বাহিনী স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায়। পাকিস্তানি মেজর গিয়াসউদ্দিনের নেতৃত্বে বড়াইগ্রাম থানার পারকোল, নটাবাড়িয়া কালিরঘুন, জোয়াড়ি, কালিকাপুর, ধানেদহ প্রভৃতি এলাকায় হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ করে। মোজাহার বিহারি পুরো বড়াইগ্রামে সন্ত্রাসী কার্যকম চালায়। বনপাড়া মিশনে বিভিন্ন স্থান থেকে আসা আশ্রিত বহু মানুষকে হত্যা ও ধরে নিয়ে নির্যাতন করেছে। এছাড়া বহু নারীকে ধর্ষণ করেছে ধরে নিয়ে গিয়ে। পারকোলে একই পরিবারের বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেছে।

বর্তমান নলডাঙ্গা উপজেলা ১৯৭১ সালে নাটোর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই নাটোর শহরে হত্যা ও ধ্বংসের প্রভাব সেখানেও পড়ে প্রায় একই সময়। হিন্দু অধ্যুষিত বিপ্রবেলঘরিয়া ইউনিয়নের চকপাড়ায় তারা হত্যা করে চার জন লোককে। এছাড়া নসরতপুরের হিন্দু জমিদার দিলীপ কুমারকে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার ও তাদের দোসররা। ধর্ষণ করে হলুদগড়ে মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তাকারী রুবিনা আক্তারকে। এভাবে নাটোর শহর ও নলডাঙ্গাতে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, ধ্বংসযজ্ঞ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

বাগাতিপাড়া উপজেলাতেও পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকার-আলবদররা তেমন সুবিধা করতে পারছিল না। জামনগর গালিমপুর সম্মুখযুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে একপর্যায়ে তমালতলায় ধর্ষণ করে বাবার বাড়িতে বেড়াতে আসা কল্পনা রানীকে। হত্যা করে নিরীহ ব্যবসায়ী পাকা ইউনিয়নের স্বপন চক্রবর্তীকে। হত্যা করে দয়রামপুরের ধনী হিন্দু ব্যবসায়ী মেঘনাথ সাহাকে। লুটপাট করে তাঁর বাড়িঘর, আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল।

বিভিন্ন ক্যাম্প, স্কুল, কলেজের ছাত্রী, গৃহবধুদের ধরে এনে পৈশাচিক লালসা পূর্ণ করেছে হানাদাররা,রাজাকার, আলবদর, আলশামস সংগঠন। কখনও কখনও গণহারে ধর্ষণ করেছে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর এসব সহযোগী দালালদেও অনেকের বিচার হয়েছে যুদ্ধের পরপরই। যেমনঃ বাগাতিপাড়া উপজেলার জামনগরের মোঃ আনসার আলী, পিতাঃ মৃত মোঃ ওসমান মন্ডল ও গুরুদাসপুর উপজেলার আমিনুল হক, পিতাঃ বশিরুদ্দিন প্রমূখকে আটক করা হয়েছে ২০শে ডিসেম্বর, ১৯৭১ সালে। তারা রাজাকার ছিল।[৬] আবার এসব সহযোগী দালালদের অনেকেই এখনও জীবিত আছেন। আনুমানিক প্রায় ৪৫০ জনের কথা জানা যায়। কিন্তু এদের এখনও কোন বিচার হয়নি। অনেকের নাম অপরাধের তালিকায় নেই। আবার

যাদের আছে তাঁরাও ঘুড়ে বেড়াচ্ছেন মুক্তভাবে। অনেকে আবার প্রভাবশালী ও ক্ষমতাবান হওয়ায় বিচারের অন্তর্ভুক্ত হয়নি। একারণে নাটোর জেলার স্থানীয় জনগণ বিশেষ করে যারা ভুক্তভোগী আহত, শহীদদের পরিবার, নির্যাতিত, তাঁরা আশাহতভাবে দিনযাপন করছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানবতাবিরোধী তথা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে। সেটা শুধু কোন বিশেষ শ্রেণী নয়, বরং নিম্ন থেকে উচ্চ শ্রেণী পর্যন্ত সকল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার হয়েছে। কিন্তু এদেশে এখনও তা সম্ভব হয়নি।

নাটোর জেলায় কতগুলো সেনা ক্যাম্প ও রাজাকার ক্যাম্প ছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে মূল ক্যাম্প ছিল নাটোর দিঘাপতিয়ার উত্তরা গণভবন, ফুলবাগান ক্যাম্প। এছাড়া অন্যান্য উপজেলাতেও ছিল দয়রামপুরে কাদিরাবাদ সেনানিবাস, কয়েন বাজার ক্যাম্প, লালপুর থানা ক্যাম্প প্রভৃতি।

নাটোর জেলায় বেশ কয়েকজন বীরাঙ্গনা পাওয়া যায় যারা মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তা দিয়ে, দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে নিজেদের সম্ভ্রম হারিয়েছেন। কেউ কেউ সম্মানহানির সাথে সাথে হারিয়েছে সংসার, পরিবার। তারপরও জীবনযুদ্ধে হেরে যায়নি। অনেকে লোকলজ্জার ভয়ে গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। এসব বীরাঙ্গনাদের প্রাপ্য সম্মান দিয়ে স্বীকৃতি দিতে হবে। এছাড়া কালের সাক্ষী যেসব বধ্যভূমি, গণকবর রয়েছে সেগুলো এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের লেখনী সংরক্ষণ করতে হবে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য। গণকবর, বধ্যভূমিগুলো এখনও সংরক্ষিত করার তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। অনেক বধ্যভূমি ও গণকবরের স্থানগুলো ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা দখল করে নিয়েছে। অনেক বধ্যভূমি ও গণকবরে এখনও কোন স্মৃতিস্তম্ভ বা স্মারক নির্মিত হয়নি নাটোর জেলার স্থানীয় আধিবাসীদের দাবি যেন এসব স্থানগুলো সংরক্ষণ ও মানবতাবিরোধীদের বিচারের ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের মাধ্যমে যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছিল বাঙালি জাতির উপর, সে প্রেক্ষিতেই দিনটি গণহত্যা দিবস পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। গত ১১ই মার্চ ২০১৭ তারিখে ২৫শে মার্চকে গণহত্যা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। অন্যদিকে ২০১৫ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ আর্ন্তজাতিক গণহত্যা স্মরণ ও প্রতিরোধ দিবস হিসেবে ৯ই ডিসেম্বর পালন শুরু করে। এই দিবসের মূল লক্ষ্য হল গণহত্যা বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং গণহত্যায় শহীদ ব্যক্তিদের স্মরণ ও সম্মান করা। এসব দিবস পালনের মধ্য দিয়ে গণহত্যায় শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হলেও মানবতাবিরোধীদের বিচার হওয়াটাও জরুরি। ইতোমধ্যেই অনেক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন হলেও নাটোর জেলায় এখনও জীবিত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পন্ন হয়নি। এই বিচার কার্য দ্রুত সম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন।

আমাদের সকলেরই কর্তব্য, আমাদের এই গৌরবময় ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখা। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী পক্ষ যারা আজ জঙ্গীবাদ সৃষ্টি করছে, তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে নিজেদের সেই '৭১ এর গৌরব গাঁথা, সাহসিকতার মুক্তিকামী চেতনা বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নির্মূল করতে হবে সেই জঙ্গীবাদী স্বাধীনতা বিরোধীদের চেতনাকে। ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে পাকিস্তানি হানাদার ও রাজাকার আলবদর বাহিনী আত্মসমর্পণ করলেও নাটোর পুরোপুরি স্বাধীন হয়েছিল ২১শে ডিসেম্বর। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানার অধিকার আমাদের সকলের রয়েছে। তাই মুক্তিযোদ্ধা বা প্রত্যক্ষদর্শী যারা বেঁচে আছেন তারা যদি সেগুলো লিপিবদ্ধ না করে যান, তবে আমরা যেটুকু জেনেছি, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সেটুকু ছাড়া আর বেশি কিছু জানা সম্ভব হবে

না। তাই প্রত্যক্ষদর্শী ও মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে দাবি, তাঁরা যেন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির তথা মানবতাবিরোধী অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই জাতির দাবি।

তথ্য নির্দেশ

[১] সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, অনুপম, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ১৩৪

[২] *দৈনিক মাতৃভূমি*, ৩ এপ্রিল, ২০০০

[৩] *দৈনিক যুগান্তর*, ৬ ডিসেম্বর, ২০০০

[৪] হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র: অষ্টম খন্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা, জুন ১৯৮৪, পৃ. ৯৪

[৫] মাহতাব উদ্দিন (সম্পা.), একুশ থেকে একাত্তর, মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী গবেষণা কেন্দ্র, রাজশাহী, জুলাই ১৯৯৬। সুজিত, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১৯৬-১৯৭

[৬] এ এস এম সামছুল আরেফিন (সংকলন ও সম্পাদনা), *রাজাকার ও দালাল অভিযোগে গ্রেফতারকৃতদের তালিকা (ডিসেম্বর ১৯৭১ থেকে মার্চ ১৯৭২ পর্যন্ত)*, বাংলাদেশ রিসার্চ এ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ঢাকা, ২০০১

# পরিশিষ্ট

## পরিশিষ্ট: ১

### নাটোর সদর উপজেলায় গণহত্যায় শহীদদের তালিকা :

নাটোর সদরে ১৯৭১ সালে শহীদ ও নির্যাতিত হয়েছে বহু মানুষ। যুদ্ধময় পরিস্থিতিতে সকল শহীদদের সম্পর্কে জানা সম্ভব ছিল না। পুরো নাটোরে প্রায় ১২ থেকে ১৫ হাজার লোককে হত্যা করা হয়েছিল। এদের অনেককেই এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়েছে। ফলে শহীদদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ সম্ভব হয়নি। মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত শহীদদের নামের ২৩৭ জনের অসম্পূর্ণ তালিকা উল্লেখ করা হল যাদের পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় নি :

আব্দুল মান্নান, নূর মোহাম্মদ, আব্দুলাহ মুন্সী, নিমাই চৌধুরী, শুকুমার চৌধুরী, জসিম উদ্দিন শাহ, শাহাবুদ্দিন, কালাম প্রাং, ইসমাইল, ইব্রাহিম, শুটকা, কফিল উদ্দিন, সেকেন্দার, কোরবান আলী, কালু মিয়া, সুলতান মিয়া, আব্দুল সামাদ, আব্দুল কাদের, মনোয়ার হোসেন (মনু), ডাঃ আব্দুল হামিদ, সোনা চৌকিদার, চতু মন্ডল, মেছের প্রাং, হোসেন মন্ডল, কেয়ামত মোলা, কেকু প্রাং, আব্দুর রহমান, কাঁচু প্রাং, আয়ুব আলী মন্ডল, সৈয়দ আলী মুন্সী, পচাই দফাদার, হামিদ দফাদার, ময়দান মোলা, সাধু প্রাং, খলিল মন্ডল, শুকুর প্রাং, কালা চাদ, শুকলাল, জঙ্গী, আব্দুল কাশেম, আব্দুল জলিল, আব্দুস সামাদ, আব্দুল বাছেদ, রিয়াজ উদ্দিন সুলতান আহমেদ, মেহের আলী, ইয়ার উদ্দিন, এরফান আলী, আব্দুল ওয়াহেদ, শওকত আলী, ছাবের আলী, সানোয়ার আলী, আনোয়ার আলী, আনোয়ার হোসেন, রজব আলী, রইচ উদ্দিন, রহিম উদ্দিন, রামকান্ত, রাখাল চন্দ্র, আব্দুল হাসেন, আমিরুল ইসলাম, আশরাফ আলী, আক্রাম হোসেন, আকবর হোসেন, আক্কাস আলী, হারুন অর রশীদ, হারানচন্দ্র, হরিপদ, হৃদয়নাথ, হাবিবুর রহমান, আব্দুল হান্নান, পরিমল কুমার, প্রশান্ত কুমার, সাকব্বর হোসেন হান্নান, সাব্বির হোসেন, সোলেমান আলী, সুজাউদ্দিন, সাইফুল ইসলাম, সায়বর রহমান, সালাউদ্দিন, মামুনুর রশিদ, সামসুর রহমান, সামসুল ইসলাম, সামসুল হক, ইন্তাজুর রহমান, বদন শেখ, বাহার উদ্দিন, বাহাদুর আলী, বলরাম, মহাসিন আলী, আজহার আলী, বদন আলি শেখ, অধীর চন্দ্র ঘোষ, মোস্তাক হোসেন উলফাত, মন্মথ প্রামাণিক, বরদাচরণ রায়, হরিদাস, হাফিজুর, মেকু, ববি চক্রবর্তী, মধুসূদন রায়, বিনোদ বিহারী বাগচী, প্রবীরচন্দ্র চক্রবর্তী, বুধা রায়, কালীপদ মোহন্ত, অর্চনা মোহন্ত, বিজন বিহারী বাদ্যকর, পূর্ণচন্দ্র দাস, রমেশচন্দ্র রায়, শীতল চন্দ্র বাদ্যকর, কালীপদ দাস, বিধুভূষণ আচার্য্য, রইছ উদ্দিন সরকার, রজব আলী, মজিবর রহমান রেজা (পিতাঃ আঃ রহমান), আঃ রশিদ, বিফল চন্দ্র মন্ডল (পিতাঃ যুধিষ্ঠির মন্ডল), আতাউর রহমান আতা, সামসুল হুদা হ্যাপী, বলাই দেবনাথ বলরাম (পিতাঃ বংকু দেবনাথ), সামসুল আলম চৌধুরী মন্টু (পিতাঃ সমসের চৌধুরী), জহুরুল হক (পিতাঃ আমিনুল হক) সুনিল চন্দ্র দেব (পিতাঃ কালিপদ দেব), মফিজ সরদার (পিতাঃ কেতু সরদার), মহসিন (পিতাঃ আজগর আলী), নরেশ নাথ (পিতাঃ দেবেন্দ্র নাথ), বারেক মিঞা (পিতাঃ সফর আলী), আইয়ুব আলী (পিতাঃ বাবর আলী), আমিন মিঞা (পিতাঃ ওয়ালী মিঞা), খোরশেদ (পিতাঃ আরজাম মোলা), বয়তুলা প্রাং (পিতাঃ হেদায়েতুলা প্রাং), ফজলুল হক (পিতাঃ আবুল কাসেম), আঃ ছোবাহান, তছির প্রাং, সাধন প্রাং, রূপচান সরদার, আজিবর, মেজর আকরাম হোসেন, আঃ হাকিম, হাজী ওমর আলী, আব্দুর রাজ্জাক, ধীরেন্দ্র নাথ মন্ডল (পিতাঃবিপিন মন্ডল) (কাদিমসাতুরিয়া), ক্ষীতেন সরকার(পিতাঃ শশীভূষণ সরকার), শুকুমার বসাক(পিতাঃ বিধূষণ সরকার)

(আহম্মেদপুর), নুরুল ইসলাম (পিতাঃ সাদেক আলী আকন্দ) (চড় তেবাড়ীয়া), আক্তার হোসেন ভূইয়া(পিতাঃ নাছির উদ্দীন) (লক্ষীপুর), তমিজ উদ্দিন ভূইয়া (পিতাঃ আফছার উদ্দিন), শামসুদ্দিন (পিতাঃআমির উদ্দিন), আঃ মন্নাফ (পিতাঃকায়াত আলী) (পর আটঘরিয়া), মোঃ মমতাজুর রহমান(পিতাঃমোঃ তৈয়ব আলী), শ্রী শচীন্দ্রনাথ দাস, শ্রী বিজলী প্রাং, শ্রী কাশীনাথ প্রাং, বদ্দীনাথ মজুমদার, দুলাল প্রাং, গোপেশ্বর সরকার, ঠাকুর চরণ দাস, শ্রী নিতাই চন্দ্র মাস্টার, শ্রী গুরু পদ সরকার, উপেন্দ্রনাথ সরকার, ডাঃ রেনুপদ সরকার(পিতাঃউপেন্দ্রনাথ সরকার), বীরেন্দ্রনাথ মাষ্টার, নারায়ণ মন্ডল, নিখিল দাস, পিয়নাথ সরকার, রবিন্দ্রনাথ মন্ডল, নিরাপদ, মোহন কর্মকার, গোপাল দাস, ননী গোপাল, অনবিনাশ সরকার, গৌরপদ সরকার, বাসুদেব মন্ডল, মনোরঞ্জন সরকার, যতীন প্রাং, নারায়ণ সরকার, আব্দুস সালাম সরকার, কাশেম মিয়া, কাদের, করিম সরকার, আবুল কালাম, আলী আকরাম, ইউনুস আলী মৃধা, মকছেদ আলী, আব্দুস সামাদ মিয়া, হেদায়েত উলা, হাজী ওছিম উদ্দিন, কাজেম আলী, আফাজ উদ্দিন, বিফল মন্ডল, রাইচরণ মাহাতু, ধীরেন্দ্রনাথ মাহাতু, ষষ্টি মাহাতু, হাজী ওমর আলী, খোরশেদ আলী, আহাদ আলী, আব্দুস সামাদ, হুজুর আলী, বয়তুলা প্রাং, ফজলুল হক, ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার (সিংড়া), নিমাইচন্দ্র সরকার (পাবনা), পলানচন্দ্র মন্ডল (ধলা, লালপুর), কার্তিকচন্দ্র সরকার (বড়ইগ্রাম), অধীরচন্দ্র সরকার (বড়াইগ্রাম), বাসুদেব প্রামাণিক (বড়াই গ্রাম, পিতাঃ বাদলচন্দ্র প্রামাণিক), আকালু প্রামাণিক (বড়াইগ্রাম), গেদা বৈরাগী, হরিশচন্দ্র প্রামাণিক (শেখচিলান), নারায়ণ চন্দ্র প্রামাণিক (পিতাঃ দেবনাথ প্রামানিক), বৈদ্যনাথ প্রামাণিক (শেখচিলান), মোনা সরকার (পিতাঃ রজনীকান্ত সরকার), ভুপেশ্বর প্রামাণিক, অনিল চন্দ্র ঘোষ (ওয়ালিয়া), ভাদু ঘোষ বাবু (ওয়ালিয়া), অজিত কুমার ঘোষ (ওয়ালিয়া), কালিপদ সরকার (কদমচিলান), তারাপদ সরকার, সুকুমার সরকার (পিতাঃ কালিপদ সরকার), শঙ্কর সরকার (ওয়ালিয়া), চুনু সরকার (বড়াইগ্রাম), গোপাল চন্দ্র দাস (পিতাঃ গেদুচরণ) গৌরচন্দ্র সাহা (বড়াইগ্রাম), নিতাইচরণ দাস (বড়াইগ্রাম), রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক (পিতাঃ হারান চন্দ্র প্রাং) নিখিলচন্দ্র দাস (পিতাঃ সীতানাথ দাস), মানিক চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (বড়াইগ্রাম), মদন কুমার পাল, অক্ষয় কুমার পাল (বড়াইগ্রাম)। শহীদ শচীন সরকার(পিতাঃ ননী গোপাল সরকার,ওয়ালিয়া), মনীন্দ্রনাথ সরকার (পিতাঃযোগেন্দ্র নাথ সরকার), অজিত কুমার ঘোষ (পিতাঃ যদু ঘোষ,ওয়ালিয়া), অনিল কুমার ঘোষ (পিতাঃ যদু ঘোষ,ওয়ালিয়া),নির্মল কুমার ঘোষ (পিতাঃমৃত যদু ঘোষ,ওয়ালিয়া), জ্ঞানেন্দ্র নাথ চক্রবতী (পিতাঃযতিষ চক্রবর্তী), শম্ভু চরণ পাল(পিতাঃগোপীনাথ পাল), শংকর চন্দ্র সরকার (পিতাঃজানকী নাথ সরকার),কালীপদ সরকার (পিতাঃ প্রসন্ন কুমার সরকার),তারাপদ সরকার (পিতাঃ শহীদ কালী পদ সরকার)। (অসম্পূর্ণ)

**নাটোর সদরে গণহত্যায় শহীদ ও শহীদ পরিবার সমূহের পরিচয় :**

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য, প্রত্যক্ষদর্শী ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ,নাটোর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যেসব শহীদদের পরিচয় জানা যায় তাদের পরিচয় উল্লেখ করা হলো :

**আহাদ খামারু :** ছাতনী ইউনিয়নের গেদা খামারুর পুত্র আহাদ খামারুকে হত্যা ১৯৭১ সালে বিহারীরা কুপিয়ে হত্যা করে।

**কালা মিয়া ও তাঁর পরিবার :** ভাবনী গ্রামের কালামিয়া ও তাঁর বড় ছেলে রুহুল আমীনকে হানাদার বাহিনী হত্যা করে ছাতনী স্লুইচ গেইটে। কালা মিয়া কৃষি কাজ করতেন ও তাঁর ছেলে রুহুল আমীন ব্যবসায়ী ছিল। তাঁদের কুপিয়ে হত্যা করে হানাদাররা।

**এহছার উদ্দিন ও তাঁর পরিবার :** ছাতনী গ্রামের এহছার উদ্দিন শেখ এবং তাঁর স্ত্রীর ভাই ওসমান শেখকে হত্যা করে হানাদার ও দালালরা। পরে মাটি চাপা দেয়ার চেষ্টা করা হলে বিহারীর পুনরায় আসে। তারা চলে গেলে পুনরায় এহছার উদ্দিনের শাশুড়ির পড়ার কাপড় দিয়ে দাফন-কাফন করা হয়।

**মো: শফিউল্লাহ ও তাঁর পরিবার :** ছাতনী গ্রামের শফিউল্লাহ ও তাঁর ভাই আবু বক্করকে হত্যা করে হানাদার বাহিনী। শফিউল্লাহ কাঠমিস্ত্রি ছিলেন।

**মোঃ হাফিজুল্লাহ :** তিনি কৃষিকাজ করতেন। ছাতনী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তাঁকেও হত্যা করা হয় ছাতনী স্লুইচগেইটে।

**মনির উদ্দিন সরকার :** ছাতনী ইউনিয়নের সদস্য ডা: মনির উদ্দিন সরকার ছাতনী গ্রামবাসীকে বাঁচানোর জন্য আর্তি জানিয়েও নিজের ও গ্রামবাসীদের প্রাণ বাঁচাতে পারেননি। তাঁর তিন পুত্রকেও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী হত্যা করেছিল।

**মোজাহার উদ্দিন :**ছাতনীর মোজাহার উদ্দিন কৃষিকাজ করতেন। বিহারী ও হানাদার সৈন্যরা তাকে বাড়িতে কুপিয়ে হত্যা করে।

**হোসেন পাটোয়ারী :** পাটোয়ারী বাড়ি ছিল হোসেন পাটোয়ারীর। অর্তকিত হামলা করে বাড়িতে কুপিয়ে হত্যা করে তাঁকে হানাদাররা।

**নুরুজ্জামান :** ছাতনীর নওয়াব আলীর পুত্র নুরুজ্জামান কৃষিকাজ করতেন। পরিবারের সবাই পালিয়ে গেলেও তিনি বাড়িতেই ছিলেন। পরে তাঁকে সেখান থেকে ছাতনী স্লুইচগেইটে এনে হত্যা করে।

**নরেশ ঠাকুর :** বনবেলঘরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি। ঘোষপাড়ায় তাঁর বাড়ি ছিল। সেখান থেকে ধরে এনে হত্যা করে।

**শুকবাস মন্ডল :** ভাবনী গ্রামে শুকবাস মন্ডলের বাড়ি ছিল। কৃষিকাজ করতেন তিনি। তাঁর মাথায় গুলি করে হত্যা করা হয়।

**কাইচাম উদ্দিন ও তাঁর পরিবার :** ভাবনীর মিচু প্রামাণিকের পুত্র কাইচাম উদ্দিন কৃষিকাজ করতেন। তাঁর ভগ্নিপতি আব্দুর রহমান বেড়াতে এসেছিল তাদের বাড়ি। দু'জনকে ছাতনী স্লুইচগেইটে হত্যা করে হানাদার দালালরা।

**আছের শেখ :** ভাবনীর আছের শেখ কৃষক ছিলেন। ৫০ বছর বয়স্ক আছের শেখকেও ছাতনী স্লুইচগেইটে হত্যা করা হয়।

**হোসেন মন্ডল :** কৃষিকাজ করতেন ভাবনীর হোসেন।

**কছির উদ্দিন :** ভাবনী বাড়ি ছিল। কৃষি কাজ করতেন। ছাতনী স্লুইচগেইটে হত্যা।

**বাদেশ প্রাং ও সুলতান পাটোয়ারী :** এ দু'জন বয়স্ক ব্যক্তির ভাবনী বাড়ি ছিল। তাঁদের হত্যা করে হানাদাররা।

**কালা পাল :** কালা পালের বাড়ি ছিল ছাতনী উত্তর পাড়ায়। তাঁকে প্রথমে পিটিয়ে, পরে ছুরিকাঘাত করে হত্যা করা হয়।

**জসিম উদ্দিন :** ছাতনী গ্রামের একজন গ্রাম্য ডাক্তার ছিলেন তিনি। বাড়ির পার্শ্বে মাঠের ঝাড়ে জবাই করে ফেলে রেখে যায় হানাদার বাহিনী।

**আজাহার ও তাঁর পরিবার :** আজাহার, মনতাজ ও মোজাহার ভাই বাড়িতেই ছিল (ছাতনীতে)। ঘাতক দালালরা তাঁদের বাড়িতেই হত্যা করে।

**আবুল কালাম :** ছাতনীর আব্দুলের পুত্র আবুল কালাম নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন মসজিদে। তাঁকে মসজিদের পাশেই হত্যা করে ঘাতক দালালরা।

**আব্দুল জব্বার :** ছাতনীর আব্দুল জব্বার রিক্সাচালক ছিলেন।

**বাগচী পরিবার :** কালীপদ বাগচীসহ তাঁর ভাই ও কর্মচারী ও কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধাদের সহ বহু মানুষকে একত্রে হত্যা করে। কালীপদ বাগচী, কানাইলাল বাগচী, দুলাল বাগচী ও মতি বাগচী মূলত একসাথে ব্যবসা করতেন। তাঁদের দোকানের কর্মচারী সুনু দাস তাঁদের বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছিল। চৌকিরপাড় আক্রমণ করে বিহারী ও ঘাতকরা তাদের লাইনে দাঁড় করে হত্যা করে।

**ভবেশ দাস :** তিনি পড়াশুনা করতেন। উত্তর চৌকির পাড় বাড়ি ছিল। পিতা রাধা চরণ মিস্ত্রি গুলিবিদ্ধ হলেও বেঁচে যান। কিন্তু ভবেশ গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান।

**মনিন্দ্র নাথ রায় :** রাজবাড়ির পুরোহিত মনিন্দ্র নাথকে হত্যা করে উত্তর চৌকির পাড়ে।

**ভাদু চন্দ্র দাস ও পরিবার :** ভাদু চন্দ্র দাস, শম্ভু চন্দ্র দাস, দিলীপ চন্দ্র দাস, ফকির চন্দ্র, হরেন চন্দ্র দাস ও কার্তিক চন্দ্র দাস-একই পরিবারের ৭ জনকে একসাথে হত্যা করে হানাদার বাহিনী। ভাদু চন্দ্র দাসের বাড়ি দক্ষিণ চৌকিরপাড়। সেখানে তাঁর বোন জামাই, শ্যালক আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। তাঁদের বাড়িতে ব্রাহ্মণ নারায়ণ চক্রবর্তী, নারায়ণ ধোপা আশ্রয় নিলে তাদেরও একসাথে হত্যা করে।

**আক্তারুজ্জামান :** মুক্তিযোদ্ধা আক্তারুজ্জামানের বাড়ি খোলাবাড়িয়ায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েকদিন পূর্বে বাড়ি এসেছিলেন সকলকে দেখতে। বিহারীরা খবর পেয়ে তাঁকে রাস্তায় ধরে এনে হত্যা করে।

**নাছির উদ্দিন ভূইয়া :** খোলাবাড়িয়ার জমসেদ আলীর পুত্র নাছির উদ্দিন। তাঁর ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল বলে তাঁকে ধরে নিয়ে হত্যা করে হানাদার বাহিনী।

**মোঃ হায়দার আলী প্রাং :** খোলাবাড়িয়ার হায়দার কৃষক ছিলেন। তৎকালীন নাটোর ডাকবাংলাতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

**আমীর আলী :** বড় বাড়িয়া গ্রামের আমীর আলীকে হানাদাররা হত্যা করে তাঁর ছেলে মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিল বলে।

**আব্দুল আজীজ :** খোলাবাড়ীয়ার আব্দুল আজীজকেও আমীর আলীর সাথেই হত্যা করে।

**শহিদ মিয়া :** মুক্তিকামী শহীদ মিয়া বড় বাড়িয়ার হাছেন আলীর পুত্র। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল বলে তাকে হত্যা করে হানাদাররা।

**ফজলুল হক :** খোলাবাড়িয়ার আবুল কাশেমের পুত্র ফজলুল হক মুক্তিযোদ্ধা ছিল। পরে আর সন্ধান পাওয়া যায়নি।

**রইচ উদ্দিন কাজী :** হয়বতপুর গ্রামের আলী নেওয়াজের পুত্র রইচ উদ্দিন মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করতেন। রাজাকাররা তাকে তুলে নিয়ে যায় বাড়ি থেকে এবং হত্যা করে।

**শ্রী পদ সরকার ও সুধীর সরকার :** হরিপদ সরকারের ছেলে শ্রী পদ সরকার বিয়ে করেছিললালপুর থানার কদমচিলার ইউনিয়নের ধলা গ্রামে। বৈবাহিক সূত্রে তিনি শ্বশুর বাড়িতেই থাকতেন। ৩রা মে ৮৬ জনের সাথে তাঁকেও হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে হত্যা করে ফতেজ্ঞাপড়ায়। সাথে তাঁর স্ত্রীর ভাই সুধীর সরকারকেও হত্যা করে ধরে নিয়ে গিয়ে।

**গোপেশ্বর সরকার ও তাঁর পরিবার :** গুরুদাসপুর উপজেলার শীথলী গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল। কৃষিকাজ করতেন। লালপুরের ধলা গ্রামে ননী গোপালের মেয়েকে বিবাহ করে সেখানেই থেকে যান। ৩রা মে বনপাড়া শিশন থেকে ধরে নিয়ে ফতেঙ্গাপাড়া গ্রামে তাঁকে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার ও দালালরা। গোপেশরের শ্বশুর ননী গোপালকেও তাঁর সাথে হত্যা করে হানাদাররা।

**রবি সরকার ও অনাথ সরকার :** লালপুর থানার ধলা গ্রামের অনাথ সরকারের পুত্র রবি সরকার। ৩রা মে বনপাড়া মিশনে আশ্রয় থাকাকালীন হানাদার বাহিনী রবিকে ধরলে তাঁর পিতা অনাথ সরকারও সাথে যায়। উভয়কেই ফতেঙ্গাপাড়া গ্রামে হত্যা করে হানাদাররা।

**শান্তি নারায়ণ সরকার ও সুরেন সরকার :** লালপুরের ধলা গ্রামের সুরেন সরকারের পুত্র শান্তি নারায়ণ। উভয়কেই ফতেঙ্গাপাড়ায় হত্যা করা হয়।

**শচীন্দ্রনাথ দাস :** লালপুর থানার কদিমচিলানের ধলা গ্রামের অধিবাসী শচীন্দ্রনাথ কৃষিকাজ করতেন। লালপুরে হানাদার বাহিনী ঢুকেছে শুনে গ্রামের সকলের সাথে বনপাড়া মিশনে আশ্রয় নেয়। ৩রা মে হানাদার বাহিনী রাজাকার দালালদের নির্দেশে গ্রামের অন্যদের সাথে তাঁকেও তুলে নিয়ে ফতেঙ্গাপাড়ায় হত্যা করে।

**বাসুদেব কবিরাজ :** ধলা গ্রামের বাদল কবিরাজের (দৃষ্টিশক্তিহীন) পুত্র বাসুদেব। হানাদাররা তাঁকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় পিতা বাদল বাঁধা দিলেও শেষ রক্ষা হয়নি।

**হরিপদ সরকার :** ধলা গ্রামের হরিপদ সরকার কৃষিকাজ করতেন। হানাদার বাহিনী লালপুরে এলে গ্রামের সবার সাথে আশ্রয়ের খোঁজে গর্ভবতী স্ত্রীকে নিয়ে রওয়ানা দেন। পথে বড়াই গ্রামের মানিকপুরে তাদের কন্যা সন্তান হয়। এর পর তাঁরা বনপাড়া মিশনে যায়। সেখান থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে খাতকরা হত্যা করে ফতেঙ্গাপাড়ায়।

**ঠাকুর চরণ দাস ও তাঁর পরিবার :** লালপুর থানার সেকচিলান গ্রামের ঠাকুর চরণ দাস। তাঁর জামাতা খোলাবাড়িয়ার (নাটোর) নিরাপদ দাস পিতা হরিপদ দাসকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল শ্বশুর বাড়ি। ফলে বনপাড়াতেও তাঁরা একই সাথে ছিল। ৩রা মে এই তিনজনকেই একসাথে হত্যা করে ফতেঙ্গাপাড়া গ্রামে।

**বীরেন্দ্রনাথ সরকার :** তিনি ছাতিয়ানগাছা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক দিলেন। ৩রামে গণহত্যার শিকার হন ফতেঙ্গাপাড়ায়।

**নলিত কর্মকার :** সেকচিলান গ্রামের খগেন কর্মকারের পুত্র নলিত লোহার কাজ করতেন। ৩রা মে ফতেঙ্গাপাড়ায় বিহারীরা হত্যা করে।

**আব্দুস সালাম সরকার :** তিনি সমাজসেবক ছিলেন। নাটোর শহরে বাড়ি ছিল। হানাদার বাহিনী ফতেঙ্গাপাড়ায় ১৭মে হত্যা করে।

**কাশেম মিয়া :** হরিপুরের কাশেম মিয়া আওয়ামী লীগ সদস্য ছিলেন। ভাইয়ের কাপড়ের দোকানে ব্যবসা করতেন। হঠাৎ হানাদার বাহিনী দোকানে আক্রমণ করে তাঁর কাছে বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা পেলে তাঁকে ধরে এনে ফতেঙ্গাপাড়ায় হত্যা করে।

**মাহবুব আলী সেলিম :** মুক্তিযোদ্ধা মাহবুব আলী সেলিমকে হানাদার বাহিনী ধরে নিয়ে হত্যা করে মোকরামপুর কালভার্টে। তার লাশ চাইলেও পরিবারকে দেয়া হয়নি। পরবর্তীতে হানাদার বাহিনী চলে গেলে মুক্তিবাহিনীর সহযোগিতায় তাকে কবরস্থ করা হয় মিঠাপুকুর কালভাটের (মোকরামপুর) কাছে।

**জীবন কৃষ্ণ মানি :** নাটোর সদর হাসপাতালের কর্মচারী জীবন কৃষ্ণ মানি ভাড়া থাকতেন কাপুড়িয়াপট্টির মধু মিয়ার বাড়ি। বিহারীরা হানাদার বাহিনী নিয়ে তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে তাঁকে অত্যাচার করে। পরে আহত অবস্থায় সদর হাসপাতালে গেলে সেখানে গুলি করে হত্যা করে হানাদাররা।

**ডা. বলাই চন্দ্র :** কাপুড়িয়াপট্টির বলাই চন্দ্র ডাক্তার ছিলেন। বিহারী কয়েকজন মহিলা আরেক মহিলার বাচ্চা হবে বলে জোর করে ধরে নিয়ে যায় পৌরসভার ভেতরে। সেখানে বিহারীরা গুলি করে হত্যা করে।

**ডা. হেমচন্দ্র বসাক :** ডা. বসাকের জন্ম নাটোর শহরে। কলকাতা থেকে এল এম এফ পাস করেন। নাটোর এস ডি এম ও এইচ হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি মহারাজা জে এন স্কুলের সম্পাদক, সরকারি উচ্চ

বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদক, থানা কাউন্সিলের সদস্য ও নাটোর পৌরসভার কমিশনার ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর কর্মরত অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হয়।

**রেজাউন নবী :** নাটোরে মোহাম্মদ নাসির উদ্দিনের পুত্র রেজাউন নবী ছিলেন বনবেলঘড়িয়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। ছাত্রজীবনে তিনি নবাব সিরাজদৌলা সরকারি কলেজের ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি ছিলেন। ১৫ মে রাজাকাররা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে।

**শহীদ বাবুল :** বাবুল ছিলেন ছাত্রলীগের কর্মী এবং বিভিন্ন সময়ে স্বাধীনতার পক্ষে মাইকযোগে ঘোষনা প্রচার করতেন। এ কারণে অবাঙালি নরপশুদের সংবাদের ভিত্তিতে পাকিস্তানি সেনারা বাবুল ও তাঁর বাবাকে ধরে নিয়ে যায় উত্তরা গণভবনে অবস্থিত পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্পে। এখানে উভয়কে হত্যা করা হয়। তাঁদের লাশ পরবর্তীকালে পাওয়া যায়নি।

**কালী কর্মকার :** লালবাজারের স্বর্ণকার কালী কর্মকারকে ফুলবাগান ক্যাম্পে নিয়ে হত্যা করে হানাদাররা।

**হাবিবুর রহমান :** ফুড কন্ট্রোলার ছিলেন। রাণী ভবানী মহিলা মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্পের ইনচার্জ ছিলেন। সেখানে (অফিস) থেকে তুলে নিয়ে ফুলবাগানে হত্যা করে।

**ছোবহান ও হেমঠাকুর ঠাকুর :** ছোবহান লালবাজার থাকতেন। হেমঠাকুর জয় কালী বাড়ির পুরোহিত ছিলেন। বঙ্গজল থেকে ধরে নিয়ে হত্যা করে দু'জনকে ফুলবাগানে ।

**হরিবাদ্যকর ও সন্তোষ বাদ্যকর :** দিঘাপতিয়ার শিবদূর গ্রামের হরিবাদ্যকর ও তাঁর পুত্র সন্তোষ বাদ্যকরকে ফুলবাগানে নিয়ে হত্যা করে হানাদাররা।

**আকালু ঠাকুর ও জটু :** দিঘাপতিয়ার রাজার ঠাকুর ছিলেন আকালু এবং বঙ্গজলের জটু পড়াশুনা করতেন। উভয়কেই হত্যা করা হয় ফুলবাগানে।

**অধীর :** অধীরচন্দ্র ঘোষ নাটোরে অনুকুল দধি মিষ্টির দোকান ছিল। সেখানেই তাকে গুলি করে হত্যা করে হানাদাররা।

মোস্তাক হোসেন উলফাত: মোস্তাক হোসেন উলফাত কানাইখালী থাকতেন। তাঁদের বোর্ডিং ব্যবসা ছিল। তাঁকে হানাদার বাহিনী গুলি করে হত্যা করে।

**মন্মথ প্রামাণিক :** নাটোর শহরে হিন্দু ব্যবসায়ী মন্মথকে হত্যা করে হানাদাররা।

**বরদা চরণ রায় :** হালসা ইউনিয়নের বিপ্রহালসা গ্রামের বরদা চরণ রায় বিত্তবান হিন্দু ব্যক্তি ছিলেন। বাড়িতে আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে দালাল হানাদার বাহিনী।

**শহীদ মাহবুব আলী সেলিম :** শহীদ মাহবুব আলী সেলিম পিছিয়ে না গিয়ে বলেছিলেন, "মিছিলের দিন শেষ হয়ে গেছে এখন দরকার সশস্ত্র সংগ্রাম। সশস্ত্র সংগ্রামের সময় আমি নিশ্চয়ই এগিয়ে আসব।" সেলিম সশস্ত্র সংগ্রামে এগিয়ে এসেছিলেন। ১২ই এপ্রিল নাটোরে, এলো জল্লাদ খান সেনারা। মেতে উঠলো হত্যাযজ্ঞে।

২৭শে এপ্রিল কুখ্যাত মেজর শেরোয়ানী সেলিমকে উঠিয়ে নিয়ে গেল। কয়েকদিন পরে মোকরামপুর কালভার্টের কাছে পাওয়া যায় সেলিমের লাশ। অমানুষিক অত্যাচারে ক্ষতবিক্ষত, বুলেটে ঝাঁঝরা সেলিমের লাশ কবরস্থ করার অনুমতি মেলেনি। তবু সন্ধ্যার অন্ধকারে গোপনে সেলিমকে সমাধিস্থ করা হয়।

# পরিশিষ্ট: ২

**নাটোর সদর উপজেলার ঘাতক-দালাল রাজাকারের তালিকা ও পরিচয় :**

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, নাটোর সদর উপজেলা কমান্ড কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের ঘাতক-দালাল রাজাকারের তালিকা (যাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা যায় ) :

| ক্রমিক নং | রাজাকারের নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ইউনিয়ন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আবুবক্কর তারামিয়া (কমান্ডার) | আব্বাছ আলী | সড়কুতিয়া | লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া |
| ২ | আ: মান্নান | কালু শেখ | ঐ | ঐ |
| ৩ | ফাইজ উদ্দিন | হাফিজ উদ্দিন | ঐ | ঐ |
| ৪ | ইদ্রিস আলী | করিম শেখ | ঐ | ঐ |
| ৫ | কাদের | গফুর মন্সী | হয়বতপুর | ঐ |
| ৬ | আফাজ উদ্দিন | গফুর মুন্সী | ঐ | ঐ |
| ৭ | সিদ্দিক | করিম শেখ | ঐ | ঐ |
| ৮ | আজগর আলী | হাছেন আলী (তনু মুন্সী) | ঐ | ঐ |
| ৯ | আ: আজিজ আক্ন্দ | আমীর আকন্দ | ঐ | ঐ |
| ১০ | আলা উদ্দিন | মাছুম ফকির | ঐ | ঐ |
| ১১ | মৃত আশ্রব আলী | - | ঐ | ঐ |
| ১২ | মৃত-লাল মিয়া | আব্বাছ আলী | লক্ষীপুর | ঐ |
| ১৩ | মৃত-বারিক মুন্সী | - | ঐ | ঐ |
| ১৪ | মৃত-ছাত্তার | খাঁ | ঐ | ঐ |
| ১৫ | মৃত-মাজেদ | আক্কাস মুন্সী | দিয়ার সাতুরিয়া | ঐ |
| ১৬ | মৃত-মাজম | - | হয়বতপুর | ঐ |
| ১৭ | মোজা ফকির (মুজা) | - | ঐ | ঐ |
| ১৮ | মৃত-মুন্না | - | ঐ | ঐ |
| ১৯ | মৃত-কছিম উদ্দিন | - | ঐ | ঐ |
| ২০ | মৃত-বাচ্ছু | - | ঐ | ঐ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ২১ | মো: ফজলু | আফছার | ঐ | ঐ |
| ২২ | মৃত ওলিউল্লা কারি | - | গাজীপুর | ঐ |
| ২৩ | মৃত-আলাউদ্দিন | হাছেন আলী | ঐ | ঐ |
| ২৪ | আব্দুর রহমান আনোয়ারী (কমান্ডার) | হারুন প্রাং | মোকরামপুর | বড় হরিশপুর |
| ২৫ | মোঃ আনোয়ার হোসেন | জালাল উদ্দিন শেখ | দত্তপাড়া | ঐ |
| ২৬ | মোঃ ওয়াজেদ আলী প্রাং | আহাদ আলী প্রাং | ঐ | ঐ |
| ২৭ | মোঃ আবুল কালাম আজাদ | ময়েজ উদ্দিন | ঐ | ঐ |
| ২৮ | মোঃ নুরুল ইসলাম | আব্দুল লতিফ | ঐ | ঐ |
| ২৯ | মোঃ আসকান আলী | ওছমান আলী | হরিশপুর | ঐ |
| ৩০ | মোঃ আকবর আলী | সুমোন প্রাং | জেলার কান্দি | ঐ |
| ৩১ | মোঃ আকবর আলী | হেলাই মোল্লা | জাঠিয়ান | ঐ |
| ৩২ | মোঃ আখের আলী | রিয়াজ প্রাং | ঐ | ঐ |
| ৩৩ | মোঃ ওয়াকিব | আলহাজ্ব ইব্রাহিম | শঙ্কর ভাগ | ঐ |
| ৩৪ | মোঃ জামাল উদ্দিন | সোবহান হাজী | ঐ | ঐ |
| ৩৫ | মোঃ তমিজ উদ্দিন | আহাদালী (মামা) | গোয়ালডাঙ্গা | ঐ |
| ৩৬ | মোঃ রুবেল | - | জাটিয়ান | ঐ |
| ৩৭ | মোঃ রানা | - | বড় ভিটা | ঐ |
| ৩৮ | মোঃ সাজ্জাদ হোসেন | মহির শাহ | চরলক্ষীকোল | ছাতনী |
| ৩৯ | মৃত শাজাহান আলী | পচাই সরদার | চরলক্ষীকোল | ছাতনী |
| ৪০ | মৃত আব্দুল জব্বার | টুলু মন্ডল | তেলকুপি | ছাতনী |
| ৪১ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | মুচন | তেলকুপি | ছাতনী |
| ৪২ | মৃত জয়নাল | মেহের মন্ডল | তেলকুপি | ছাতনী |
| ৪৩ | মৃত তোফা | তছির | তেলকুপি | ছাতনী |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৪৪ | মোঃ আরমান আলী | ডুবাই মোল্লা | ফরিদপুর আসহাদী | ছাতনী |
| ৪৫ | মৃত আসতুল মৃধা | আকুল মৃধা | ফরিদপুর আসহাদী | ছাতনী |
| ৪৬ | মৃত আরশেদ গাজী | আয়ুব আলী গাজী | মাঝদিঘা | ছাতনী |
| ৪৭ | মৃত ইসহাক আলী | এয়সান আলী | মদনহাট | ছাতনী |
| ৪৮ | মোঃ তাজু | শামছুল ভূইয়া | তেলকুপি | ছাতনী |
| ৪৯ | তাফু | ওমর সরকার | তেলকুপি | ছাতনী |
| ৫০ | মোঃ ওমর আলী | মসলে মোল্লা | কেশবপুর | ছাতনী |

(অসম্পূর্ণ)(সূত্র :বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, নাটোর সদর উপজেলা কমান্ড কার্যালয়)

**১৯৭১-এ-নাটোর সদর থানার ঘাতক-দালাল যাদের পরিচয় জানা যায় :**

মূল ঘাতকদের মধ্যে ছিলেন-

১. হাফেজ আব্দুর রহমান জল্লাদের মতো নাটোর সদরে হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠেছিল। তার পিতা কাজী মইনউদ্দিন। হাফেজ আব্দুর একজন অবাঙালি ছিলেন। তিনি জামহুরিয়া মাদ্রাসা, নাটোরের অধ্যক্ষ ছিলেন। রাজাকার বাহিনীর অন্যতম এই জল্লাদ নাটোর সদর থানায় খুন, লুটপাট তথা নির্যাতনমূলক কাজ করেছেন। বিহারীদের সাথে সংঘর্ষের সময় তাকে আটক করা হলেও পরবর্তীতে ছাড়া পান। ছাতনী ইউনিয়নের গণহত্যা, নির্যাতনে মূল ভূমিকা রাখেন। মেজর শেরওয়ানিকে তিনি সহযোগিতা করেন বাঙালি নিধনে। পরবর্তীতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করলে হাফেজ আব্দুর আত্মসমর্পণ করে এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানে চলে যায়।
২. আলবদর বাহিনীর (নাটোর) প্রধান ছিলেন আব্দুল কাদের। তিনি জজকোর্টের উকিল ছিলেন। দেশ স্বাধীন হলে তার বিরুদ্ধে কেস করা হয়। তবে পরবর্তীতে আর বিচার হয়নি।
৩. মওলানা এসাহাক ছিলো কোম্পানি কমান্ডার রোজাকার, আলবদর বাহিনীর)। মওলানা ছিলেন। বিচারের পূর্বেই মারা যান।
৪. সাদেক আলী (অবাঙালি)। বাড়ি নাটোর সদর থানায়। ছাতান-ভাবনিসহ বহু স্থানে শতশত বাঙালি হত্যা করেছিল।
৫. ওয়ারেশ আলী নাটোর সদর থানায় হত্যা, লুটতরাজের সাথে জড়িত ছিলেন। তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন সদর থানার।
৬. মোঃ আব্দুর রহমান। পিতা: হারুন প্রাং। গ্রাম: ফতেঙ্গাপাড়া। ইউনিয়ন: বড় হরিশপুর। সে নাটোর আল-মাদ্রাসাতুল জামহুরীয়ার মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। ফতেঙ্গাপাড়া গণহত্যায় তার ভূমিকা ছিল। ফলে পরবর্তীতে তাকে রাজাকারের কমান্ডার করা আনোয়ারী উপাধি দেয়া। ফতেঙ্গাপাড়ায় বিভিন্ন স্থান

থেকে লোক এনে হত্যা ও গ্রামের জনগণকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে সেই লাশদের কবর দিতে বাধ্য করত। যুদ্ধের পর তার কোন বিচার হয়নি। বর্তমানে সে জামহুরীয়া মাদ্রাসায় আরবির শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছে।

৭. আলম নাটোর মহকুমা শান্তিকমিটির সদস্য ছিলেন। পিতা : হাসেম উদ্দিন। তিনি প্রথমদিকে ছাত্রলীগ করতেন। পাকিস্তানি বাহিনীকে স্বাধীনতার পক্ষের মানুষদের বাসস্থান চিহ্নিতকরণ, লুটপাট এ সাহায্য করে। পরবর্তীতে মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়।

এছাড়াও রয়েছে, আনোয়ার হোসেন (দত্তপাড়া), মোঃ ওয়াজেদ আলী (ফতেঙ্গাপাড়া), আবুল কালাম আজাদ (ফতেঙ্গাপাড়া), আকবর আলী (জোলার কান্দি) প্রমুখরাও আব্দুর রহমানের সাথে এ এলাকায় ত্রাস সৃষ্টি করে এছাড়াও রয়েছে রাজাকার চাঁন মিয়া (ব্যবসায়ী), শের মাহমুদ (অবাঙালি), জাকি চৌধুরী, শওকত আলী প্রমুখরাও নাটোর সদর থানায় হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট প্রভৃতি মানবতাবিরোধী অপরাধে যুক্ত ছিল।আরও অনেক আছেন বিভিন্ন ইউনিয়ন, পৌরসভার রাজাকার ও শান্তিকমিটির সদস্য।

**শান্তিকমিটির দালালদের তালিকা**

| ক্রমিক নং | দালালের নাম | পেশা | গ্রাম/ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১ | কাঁচু উদ্দিন মোক্তার | মোক্তার (আইনজীবী) | নাটোর শহর |
| ২ | আব্দুর সাত্তার খান চৌধুরী | ব্যবসা | নাটোর শহর |
| ৩ | আব্দুল সালাম খান চৌধুরী মিয়া | ব্যবসা | নাটোর শহর |
| ৪ | গোরশেদ খান চৌধুরী | ব্যবসা | নাটোর শহর |
| ৫ | মাকিম উদ্দিন মোল্লা | কৃষক | তেলকুপি |
| ৬ | আকুল মৃধা | কৃষক | তেলকুপি |
| ৭ | ছিম উদ্দিন | পোস্ট মাস্টার (খুনি ও লুটেরা) | বিপ্রহালসা |
| ৮ | মিয়ার উদ্দিন | কৃষক (খুনি ও লুটেরা) | বিপ্রহালসা |
| ৯ | গিয়াস উদ্দিন | কৃষক | রায় হালসা |
| ১০ | ছবির উদ্দিন | কৃষক | রায় হালসা |
| ১১ | আব্দুল খাঁ | কৃষক | রায় হালসা |
| ১২ | মানিক খাঁ | কৃষক | রায় হালসা |
| ১৩ | জামাল সরকার | কৃষক | রায় হালসা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৪ | আব্দুল করিম শিকদার | কৃষক (খুনি, ধর্ষক ও লুটেরা) | সেনভাগ (পিপরুল ইউপি) |
| ১৫ | আলিম উদ্দিন মন্ডল | কৃষক | সেনভাগ |
| ১৬ | আহসান থান্দার | কৃষক | সেনভাগ |
| ১৭ | আফিম উদ্দিন মন্ডল | কৃষক | সেনভাগ |
| ১৮ | মোস্তাজ আলী (অবাঙ্গালি) | ছোট ব্যবসায়ী (শত শত বাঙালির খুনি, ধর্ষক, লুটেরা) | নাটোর শহর |
| ১৯ | রংশাল হালসোনা | কৃষক | সেনভাগ |
| ২০ | নাছির উদ্দিন তালুকদার | কৃষক | নাটোর শহর, (এদের বাড়ি রাজাকার ও আলবদর রিক্রুটিং ও হত্যা-ধর্ষণ লুটের পরিকল্পনা কেন্দ্র ছিলো) |
| ২১ | রাহাত উল্লাহ্ | চেয়ারম্যান, হালসা ইউপি | ঘালসা |
| ২২ | আব্দুর রহমান (পিক রহমান) | ব্যবসায়ী | লালবাজার, নাটোর শহর |
| ২৩ | হাবিবুর রহমান | চেয়ারম্যান, মাধনগর ইউপি | পূর্ব মাধনগর |
| ২৪ | মোখলেসুর রহমান | কৃষক | পশ্চিম মাধনগর |
| ২৫ | ডা. নাছির উদ্দিন তালুকদার | গ্রাম্য চিকিৎসক | রামসা কাজিপুর, |
| ২৬ | আব্দুল কাদের | কৃষক | ছাতনী |
| ২৭ | আবুল ফজল | কৃষক | ছাতনী |
| ২৮ | আবুল হোসেন | কৃষক | লক্ষ্মীকোল |
| ২৯ | ডা. সিদ্দিক হোসেন | গ্রাম্য চিকিৎসক | লক্ষ্মীকোল |
| ৩০ | মো. শঙ্কর আলী | কৃষক | ঘাঁপানিয়া |
| ৩১ | আবুল কাশিম উদ্দিন | কৃষক | আঁচড়াখালি |
| ৩২ | আবুল হোসেন | কৃষক | সেনভাগ |
| ৩৩ | মানিক হাজি | কৃষক | শ্যামনগর |

(সূত্র : সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*)

# পরিশিষ্ট : ৩

## লালপুর উপজেলায় গণহত্যায় শহীদদের তালিকা :

১৯৭১ সালের ৩০শে মার্চ থেকে লালপুর উপজেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী দালাল, রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তিবাহিনী প্রভৃতি সংগঠনের দ্বারা সংঘটিত গণহত্যার শিকার হয়েছেন বহু মানুষ। ডিসেম্বর মাসের ১৩ তারিখ পর্যন্ত এই হত্যাযজ্ঞ অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। লালপুর উপজেলার ময়না, ধুপইল, গোপালপুর, রামকান্তপুর, রামকৃষ্ণপুর, বিলমাড়িয়া, মহেশপুর, ঘাটচিলান, লালপুর কলোনী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে এ হত্যাযজ্ঞ চালায় ঘাতক বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা। ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে গণহত্যার শিকার সকল শহীদদের নাম ও পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি। অনেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে এ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে। ফলে তাঁদের মধ্যে যাঁরা গণহত্যার শিকার হয়েছেন, তাদের পরিচয় জানা যায়নি সকল ক্ষেত্রে। এছাড়া এক এলাকা থেকে ধরে নিয়ে অন্য এলাকায় হত্যা করার ফলে সকলের পরিচয় জানা যায়নি। নির্যাতিত নারীরা লোকলজ্জা ও সামাজিকতার ভয়ে নির্যাতনের সেই ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে আনতে চান না। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ, লালপুর উপজেলা কমান্ড কার্যালয় প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, স্থানীয় স্মরণিকা, সুজিত সরকার লিখিত *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস* প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে লালপুর উপজেলার শহীদদের ১৪৫ জনের অসম্পূর্ণ তালিকা উল্লেখ করা হল যাদের পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় নি :

সৈয়দ আলী মোল্লা (পিতাঃ বাদল মোল্লা, ইউনিয়ন:ওয়ালিয়া), আরজ উদ্দিন মোল্লা, খন্দকার নুরুন-নবী মন্টু(পিতাঃ মসিউর মুন্সি, ইউনিয়ন:ওয়ালিয়া), কেরামত শেখ(পিতাঃ কুতুব উল্লা শেখ,ইউনিয়ন:ওয়ালিয়া), খাইরুল আনাম (ছাত্তার), বকস সরদার(পিতাঃ সিরাজ সরদার, ইউনিয়নঃ ওয়ালিয়া), আবুল কালাম আজাদ(পিতাঃ গোলেহার মুন্সি, ইউনিয়নঃ ওয়ালিয়া), আব্দুল কুদ্দুস(পিতাঃ আঃ সামাদ মিয়া, ইউনিয়নঃ মাছগাঁও),কালুমিয়া(পিতা:আঃসামাদ,মিয়া,ইউনিয়ন:মাছগাঁও),সেকেন্দরআলী(পিতা:রুমু,ইউনিয়ন:এবি,ইউ, পি),আছেরউদ্দিন(পিতা:ইয়ারউদ্দিন,ইউনিয়ন:গোপালপুর),চেরুপ্রাং(পিতাঃ চিনি প্রাং,ইউনিয়নঃ কদিমচিলান), নুরুননবী, ইয়াছিন আলী(পিতাঃ জসীম উদ্দিন, ইউনিয়ন:গোপালপুর), যুধিষ্টির প্রাং(পিতাঃ রাম ভদ্র প্রাং, ইউনিয়ন:গোপালপুর), মংলা দাস, সাহেব উল্লাহ(পিতাঃ আঃ লতিফ মুন্সি, ইউনিয়নঃ কদিমচিলান), নুরুল ইসলাম সরদার। জামেলা খাতুন, রাজলু প্রামাণিক, জিয়ার উদ্দিন, মোসলেম উদ্দিন (২), তয়েজ উদ্দিন, লাঠু প্রামানিক, নজরুল ইসলাম মুকুল, আবুল হোসেন প্রামাণিক, নায়েব আলী, রফিকুল ইসলাম, আব্দুল কুদ্দুস, ফালান, রজব আলী, তাইরুদ্দিন, আনিছুর রহমান, ইব্রাহিম, সুরাত আলী, জহুরুল ইসলাম, আরজেদ আলী, ইসমাইল হোসেন, মুকুল, আব্দুল কুদ্দুস। আব্দুল মন্ডল, বক্স, তাছের মোল্লা, কলি, মোজাম্মেল। ওমর আলী বিশ্বাস, মফিজ উদ্দীন, ছফের উদ্দিন মন্ডল, গোকুলচন্দ্র কুন্ডু, লখিন্দরচন্দ্র প্রামাণিক, আব্দুল হামিদ প্রামাণিক, মন্টু মিয়া, সফি প্রামাণিক, লাকি প্রামাণিক।সাইফুদ্দিন আহমেদ, আব্দুল মান্নান-২, গোলাম কিবরিয়া, মোসলেম, মোঃ আলী। আবীর আলী, আব্দুল আজিজ মেম্বর, ফেলু মিয়া, নজের আলী, মজিবর রহমান, আমীর হোসেন, আজাহার আলী, গোবরার পুত্র (অজ্ঞাত), ফজু মিয়া, তাজ আলী, ইসমাইল আলী খলিফা, ইসমাইল হোসেন-১ (বাথানবাড়ি), আব্দুল গণি, জমশেদ আলী, জমশেদ আলী-২, জব্বার খাঁ, সোহরাব হোসেন, ইসমাইল হোসেন-২(মহারাজপুর), ইসমাইল হোসেন-৩, ইসমাইল হোসেন-৪, ইসমাইল হোসেন-৫,খাইরুল আনাম (ওয়ালিয়া), শহীদ বক্স (ওয়ালিয়া), জাহাঙ্গীর হোসেন (বড় ময়না), কিয়ামত আলী, (নান্দ রায়পুর), মন্টু (ময়না), সাদের আলী (বিজয়পুর), আব্দুর রব, বৃন্দাবন হালদার, ছুরুত আলী, ভূপেন্দ্রনাথ

মজুমদার (ধলা), নিমাইচন্দ্র সরকার (পাবনা), পালান মণ্ডল, অনিল ঘোষ (ওয়ালিয়া), ভাদুবাবু ঘোষ (ওয়ালিয়া), অজিত ঘোষ (ওয়ালিয়া), শঙ্কর সরকার (ওয়ালিয়া), তারাপদ সরকার (কদমচিলান), শঙ্কর সরকার (ওয়ালিয়া), সুকুমার সরকার (কদমচিলান), কালিপদ সরকার (কদমচিলান), চুনু সাহা (দিয়ারপাড়া), গোপালচন্দ্র দাস (দিয়ারপাড়া), গৌরচন্দ্র সাহা (দিয়ারপাড়া), মোহাম্মদ আলী-১, মোহাম্মদ আলী-২, আবেদ আলী (পানঘাটা), ইসহাক আলী (মোহরকয়া), আবুর আলী (মোহরকয়া), মোসলেম মাস্টার (মোহরকয়া), মোয়াজ্জেম হোসেন (মোহরকয়া), সিরাজ প্রামাণিক (মোহরকয়া), নূরুন নবী (মোহরকয়া), বাহার উদ্দিন সরকার (মহারাজপুর), ইসমাইল হোসেন (মহারাজপুর), মকছেদ আলী (নাগশোষা), ফকির শাহ (নাগশোষা), সুরাত আলী (সন্তোষপুর), জহুরুল ইসলাম (লালপুর), আরজেদ আলী, আব্দুল কুদ্দুস, আব্দুল খলিল (বাথানবাড়িয়া), ছদের আলী, আব্দুল গণি, তাজ আলী (বিলমারিয়া), সফি প্রামাণিক (পঁয়তার পাড়া), লাকি প্রামাণিক, সাজেদুর রহমান, উপেন্দ্রনাথ মণ্ডল, জাবেদ আলী (মহেশর দুরদুরিয়া), নায়েব আলী (টিটিয়া), হেকমত আলী (দুরদুরিয়া), দুখু মিয়া (দুর্গাপুর), তৈজুদ্দিন (রামকান্তপুর), আবুল হোসেন (রামকান্তপুর), আনিসুর রহমান আনিস (দুর্গাপুর), রিজিয়া বেওয়া (রাকসা), খোন্দকার নূরুন নবী (রাকসা), করম আলী (ওয়ালিয়া), আবেদ আলী (পানাঘাটা), আবুল কালাম আজাদ (ধুপইল), আব্দুল কুদ্দুস (টিটিয়া), জয়নাল আবেদীন (ভবানিপুর), কেরু প্রামাণিক, আসাদুল হক। (অসম্পূর্ণ)

**লালপুর উপজেলার গণহত্যায় শহীদ ও শহীদ পরিবার সমূহের পরিচয় :**

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য, প্রত্যক্ষদর্শী ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ, লালপুর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যেসব শহীদদের পরিচয় জানা যায় তাদের পরিচয় উল্লেখ করা হলো :

**শহীদ মসলেম আলী মোল্লা ও শহীদ আবুল কাশেম মোল্লা :** ওয়ালিয়া ইউনিয়নের ময়না গ্রামের বাসিন্দা মসলেম ও আবুল কাশেম। তাঁদের পিতার নাম মসিউদ্দিন মোল্লা। মসলেম মোল্লা শিক্ষকতা করতেন এবং আবুল কাশেম কৃষিকাজ করতেন। এই দুই ভাইকে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ময়না গ্রামে আম গাছের সাথে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে ৩০ মার্চ ১৯৭১ তারিখে।

**ছইর প্রামাণিক :** পিতার নাম রুপলাল প্রাং। তাঁর বাড়ি ওয়ালিয়া ইউনিয়নের ধুপইল গ্রামে। ছইর প্রামাণিক কৃষিকাজ করতেন। ধুপইল গণহত্যায় তিনি শহীদ হন।

**মফিজউদ্দিন :** পিতার নাম পাঁচু প্রামাণিক। ধুপইল গ্রামের অধিবাসী মফিজ কৃষিকাজ করতেন। ধুপইল গণহত্যার শিকার তিনি।

**সুরেন মন্ডল ও তাঁর পরিবার :** ২৯শে মে ধুপইল গণহত্যায় সুরেন মন্ডল সহ তাঁর পরিবারের ৬ জন সদস্যকে হত্যা করে ঘাতক বাহিনী। সেদিন সুরেন মন্ডল তাঁর ছেলে ধনেশ্বর মন্ডল, ছোট দুই ভাই রুহিনী মন্ডল ও রসিক মন্ডলকে হত্যা ঐ করে ঘাতক বাহিনী। ধনেশ্বর মন্ডল সেনাদের কাছ থেকে বন্ধুক কেড়ে নিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেন। কিন্তু ফায়ার করতে জানতেন না তিনি। দৌড়ে পালাতে চেষ্টা করলেও তাই বাঁচতে পারেননি। সৈন্যরা পায়ে গুলি করে, এরপর কয়েকটি রাউন্ড গুলি করে হত্যা করে।এছাড়া সুরেনের ভাই দেবেন মন্ডল ও তাঁর ছেলে গঙ্গাধর মন্ডলকেও হত্যা করে ঘাতক বাহিনী।

**নরেন মন্ডল ও সতীশ মন্ডল :** ওয়ালিয়া ইউনিয়নের দিলালপুর গ্রামের বাসিন্দা নরেন মন্ডল ও তাঁর ভাই সতীশ মন্ডল। পিতার নাম যোগীন মন্ডল। নরেন ও সতীশ উভয়েই কৃষি কাজ করতেন। ধুপইল পঁয়তার পাড়া গণহত্যার শিকার এ দুই ভাই।

**ধুপইল পঁয়তার পাড়া গণহত্যায় শহীদদের ১৭ জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :**

| ক্রমিক নং | নাম | পিতা | গ্রাম | ইউনিয়ন | উপজেলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ওমর আলী বিশ্বাস | জহির উদ্দিন বিশ্বাস | ধুপইল | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ২ | সুরাত আলী | আরজ আলী | ধুপইল | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ৩ | সাজেদুর রহমান | আজাহার আলী প্রাং | দিলালপুর | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ৪ | সফের উদ্দীন | মছের মন্ডল | ধুপইল | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ৫ | বাদল প্রাং | দেলবর প্রাং | ধুপইল | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ৬ | দেবেন্দ্রনাথ কুন্ডু ১ | রুহিনী কুন্ডু | ধুপইল | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ৭ | নিতাই চন্দ্র কুন্ডু | পূর্ণ চন্দ্র কুন্ডু | ধুপইল | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ৮ | তারাপদ কুন্ডু | রাধা বিনোদ কুন্ডু | ধুপইল | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ৯ | দেবেন্দ্রনাথ কুন্ডু ২ | পূর্ণচন্দ্র কুন্ডু | ধুপইল | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ১০ | নকুল চন্দ্র কুন্ডু | আপাল চন্দ্র কুন্ডু | ধুপইল | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ১১ | টগর চন্দ্র কুন্ডু | শশী পাল | ধুপইল | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ১২ | অরুন কুমার কুন্ডু | তারাপদ পাল | ধুপইল | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ১৩ | বৃন্দাবন কুন্ডু | সুবল হালদার | ধুপইল | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ১৪ | সুরেন্দ্রনাথ মন্ডল | লক্ষন মন্ডল | দিলালপুর | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ১৫ | দেবেন মন্ডল | মহেষ মন্ডল | দিলালপুর | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ১৬ | কার্তিক মন্ডল | মহেষ মন্ডল | দিলালপুর | ওয়ালিয়া | লালপুর |
| ১৭ | উপেন মন্ডল | সুরেন্দ্রনাথ মন্ডল | দিলালপুর | ওয়ালিয়া | লালপুর |

(অসম্পূর্ণ) (সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ, লালপুর উপজেলা কমান্ড কার্যালয়)

**মুজিবর রহমান :** তিনি শিক্ষক ছিলেন। ৩১শে মে বিলমাড়িয়ার কজিপুর মাঠে তাঁকে গুলি করে এসিড ঢেলে পুড়িয়ে দিয়ে হত্যা করে ঘাতক-দালালরা।

**সাজদার রহমান :** আড়বাব ইউনিয়নের বিলশোলিয়া গ্রামে বাড়ি সাজদার রহমান এর। পিতার নাম আঃ রহমান। ব্যবসায়ী সাজদার রহমানের দোকান ছিল গোপালপুর বাজারে। ৫ই মে গোপালপুর বাজারে গণহত্যায় তাঁকে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও দালালরা।

বিলমাড়িয়ার বিলবাড়ীয়া গণহত্যায় শহীদদের ২৭ জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :

| ক্রমিক নং | নাম | পিতা | গ্রাম | ইউনিয়ন | উপজেলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মোঃ ইসমাইল হোসেন | ইয়াদালী | টেলাবপুর | বিলবাড়ীয়া | লালপুর |
| ২ | জমশেদ আলী | রমজান আলী প্রাং | বাথানবাড়ী | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ৩ | জামের আলী প্রাং | গবরা প্রাং | বাথানবাড়ী | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ৪ | ছাদের মোল্লা | সুববাজ মোল্লা | বাথানবাড়ী | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ৫ | খলিল মুল্লা | ইছর ডালি | টেলাবপুর | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ৬ | জামের আলী | আহম্মদ আলী | বাথানবাড়ী | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ৭ | মজিবর রহমান | ইদ্রীস সরকার | মোহরকয়া | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ৮ | মোয়াজ্জেম হোসেন | হারুন-অর রশিদ | মোহরকয়া | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ৯ | সিরাজ সরদার | ইংরাজ আলী সরদার | মোহরকয়া | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ১০ | ইরুননবী | ফাছু মিয়া | মোহরকয়া | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ১১ | ইছাহক আলী | সেকেন্দার আলী | মোহরকয়া | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ১২ | জুব্বার খাঁ | জানের খান | মোহরকয়া | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ১৩ | মজু শেখ | মেরাজ শেখ | মোহরকয়া | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ১৪ | সাবেদ সর্ণকার | ফাজিল সর্নকার | চকবাদকয়া | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ১৫ | বাহার সরকার | লয়েব উদ্দিন সরকার | চকবাদকয়া | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ১৬ | আজিজুল হক | তাহের মন্ডল | চকবাদকয়া | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ১৭ | মকছেদ আলী | ফুলবাস প্রাং | নাগশোকা | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ১৮ | মসলেম আলী | মকছেদ আলী | মোহরকয়া | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ১৯ | সেরাজ খলিফা | খায়ের উদ্দিন প্রাং | মোহরকয়া | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ২০ | ফকির শা | ইদু শা | নাগশোকা | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ২১ | মজু শেখ | মেনার শেখ | চকবাদকয়া | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ২২ | হরীনারায়ন মিস্ত্রী | কনুকন্দ হলদার | বিলমাড়ীয়া | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ২৩ | জসদা বেওয়া | কপি সরদার | বাথান বাড়ী | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২৪ | গবরা শা | জহরদী শা | নাগশোকা | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ২৫ | জান বক্স মন্ডল | কমেজ মন্ডল | বাথান বাড়ী | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ২৬ | কামেজ মন্ডল | - | টেলাবপুর | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |
| ২৭ | মজির আলী | আলেপ মাঝি | গোলারদাঁড় | বিলমাড়ীয়া | লালপুর |

(অসম্পূর্ণ)(সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ, লালপুর উপজেলা কমান্ড কার্যালয়)

**নীলকুঠি গণহত্যায় শহীদদের ৪ জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :**

| ক্রমিক নং | শহীদ | পিতা | গ্রাম | ডাকঘর | উপজেলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | গোসাই পদ | হৃদয় নাথ সরকার | পাটপাড়া | পাটপাড়া | গুরুদাসপুর |
| ২ | তারাপদ সরকার | কৃষ্টপদ | পাটপাড়া | পাটপাড়া | গুরুদাসপুর |
| ৩ | বানেশ্বর হালদার | কোকন হালদার | পাটপাড়া | পাটপাড়া | গুরুদাসপুর |
| ৪ | দীনেশ চন্দ্র হালদার | যোতিন্দ্রনাথ হালদার | পাটপাড়া | পাটপাড়া | গুরুদাসপুর |

(অসম্পূর্ণ)(সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ, লালপুর উপজেলা কমান্ড কার্যালয়)

**মোঃ শাহাদত হোসেন :** গোপালপুর ইউনিয়নের ভুঁইয়াপাড়া গ্রামে বাড়ি মোঃ শাহাদত হোসেন এর। পেশায় তিনি একজন ডাক্তার। তাঁর পিতার নাম মৃত ছইমুদ্দিন প্রামানিক। নিজ পেশা চিকিৎসার স্বার্থে গোপালপুর বাজারে এসে ৫ মে গণহত্যা শিকার হন শাহাদত হোসেন।

**তোফাজ্জল হোসেন :** গোপালপুর বাজার এর বাসিন্দা তোফাজ্জল হোসেন। তাঁর পিতার নাম দুখু ব্যাপারী। ব্যবসায়ী ছিলেন তোফাজ্জল। গোপালপুর বাজারে গণহত্যার শিকার হন তিনি।

**গোপালপুর বাজার গণহত্যায় শহীদদের ৯ জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :**

| ক্রমিক নং | নাম | পিতা | গ্রাম | ইউনিয়ন | উপজেলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সাদের প্রাং | নাছির প্রাং | বিজয়পুর | গোপালপুর | লালপুর |
| ২ | সাজদার রহমান | আঃ রহমান | বিলশোলিয়া | আড়বাব | লালপুর |
| ৩ | মখলেছুর রহমান | আঃ সামাদ | বাহদিপুর | গোপালপুর | লালপুর |
| ৪ | ইয়াছিন আলী | জসিম | বৈদ্যনাথপুর | গোপালপুর | লালপুর |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫ | মোজাম্মেল হক | মুন্সিজানমোহাম্মদ | বাউড়া | চংধুপইল | লালপুর |
| ৬ | আশরাফ আলী | আঃওয়াহাব সওদাগর | গোপালপুর | গোপালপুর | লালপুর |
| ৭ | আবুল হোসেন | হাজী হুরমুজ আলী | বরমহাটি | এবি,ইউ,পি | লালপুর |
| ৮ | বকস খলিফা | চান মিঞা | গোপালপুর | গোপালপুর | লালপুর |
| ৯ | কাজী চাঁন্দ মিয়া | কাজী ফজলুর রহমান | কাজী পাড়া | দয়ারামপুর | বাগাতিপাড়া |

(অসম্পূর্ণ)(সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ, লালপুর উপজেলা কমান্ড কার্যালয়)

**লেঃ আনোয়ারুল আজিম :** "আগে আমাকে গুলি কর। আমাকে গুলি না করে আমার লোকদের তোমরা গুলি করতে পারবে না।" বর্বর হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে কোন জননেতার উক্তি নয় এটা। এই উক্তি একজন দেশপ্রেমিক নির্ভীক বাঙালি মিল প্রশাসকের। এই প্রশাসক ছিলেন একজন লেফটেন্যান্ট আনোয়ারুল আজিম। তিনি গোপালপুরে নর্থ বেঙ্গল সুগার মিলের প্রশাসক ছিলেন। নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধে ও মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্নভাবে তিনি সাহায্য করেছেন। ৫ মে গোপালপুর চিনি কল গণহত্যায় প্রায় ৩০০-৪০০ জনের সাথে তাঁকেও হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও অবাঙালি দালালরা।

**গোপালপুর চিনিকল গণহত্যায় শহীদ শ্রমিক-কর্মচারী :** ১৯৭১ সালের ৫ই মে (বুধবার) পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গোপালপুর চিনিকলে আক্রমণ করে সেই মিলে কর্মরত প্রায় ৪২-৪৫ জন কর্মচারীসহ আখচাষী ও অন্যান্য প্রায় ২০০ জন মানুষকে হত্যা করে। লেফটেন্যান্ট আনোয়ারুল আজিম ছাড়া ৩৯ জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তালিকায় উল্লেখ করা হল :

| ক্রমিক নং | নাম | পদবী | গ্রাম | ইউনিয়ন | উপজেলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | শহীদুল্লাহ | প্রশাসনিক অফিসার | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ২ | গোলজার হোসেন | এ্যাকাউন্টটেন্ট ইনচার্জ | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৩ | গোলজার হোসেন তালুকদার | কেইন সুপারেনটেনডেন্ট | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৪ | আবুল হাসেম | এ,সি,ডি,ও | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৫ | আব্দুল মান্নান ভূইয়া | সহঃ হিসাব রক্ষন | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | অফিসার | | | |
| ৬ | এস,এম, এ রউফ | ষ্টেনোগ্রাফার | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৭ | মোঃ নুরুল হক | হেড ক্যাশিয়ার | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৮ | আজাহার আলী | ক্যাশিয়ার | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৯ | মকবুল হোসেন | হিসাব সহকারী | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ১০ | আবুল বাসার খান | একাউন্টস ক্লার্ক | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ১১ | আজিজুর রহমান | একাউন্টস ক্লার্ক | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ১২ | মুনসুর আলী | একাউন্টস ক্লার্ক | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ১৩ | সাজেদুল রহমান | একাউন্টস ক্লার্ক | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ১৪ | ইসমাইল হোসেন | করনীক | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ১৫ | মোঃ আবুল কাশেম | খালাশী | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ১৬ | আব্দুর রব | খালাসী | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ১৭ | এস,এম নজরুল ইসলাম | বৈদ্যুতিক ফিটার | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ১৮ | আয়েজ উদ্দিন | খালাসী | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ১৯ | মোসলেম উদ্দিন | শ্রমিক | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ২০ | হাবীবুর রহমান | পেট্রোল পাম্প করনীক | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ২১ | মোসাদ্দারুল হক | ক্লার্ক | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ২২ | মোকসেদুর আলম | ক্লার্ক | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ২৩ | আব্দুর রহমান আমিন | সি,আই,সি | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ২৪ | মোহাম্মদ আলী | নিরপত্তাপ্রহরী | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ২৫ | মোজ্জাম্মেল হক | নিরপত্তাপ্রহরী | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ২৬ | আব্দুল মান্নান | নিরপত্তাপ্রহরী | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ২৭ | ফিরোজ মিঞা | নিরপত্তাপ্রহরী | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ২৮ | আকতার উদ্দিন | নিরপত্তাপ্রহরী | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ২৯ | সোহরাব আলী | নিরপত্তাপ্রহরী | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৩০ | আনোয়ারুল ইসলাম | পিওন | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৩১ | পরেশ উল্লাহ | পিওন | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৩২ | আব্দুল মান্নান | পিওন | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৩৩ | সামসুল হুদা | হেড মিস্তি | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৩৪ | কামাল উদ্দিন | ম্যামিন ম্যান | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৩৫ | আঃ মজিদ | ম্যাশিন ম্যান | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৩৬ | তোফায়েল প্রাং | শ্রমিক | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৩৭ | এস,এম,এ কালাম | সি,এস,বি,এ | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৩৮ | আব্দুর রাজ্জাক | শ্রমিক | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৩৯ | শহীদুল্লাহ | কুক | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |
| ৪০ | সাইফুদ্দীন আহমেদ | চীফ এ্যাকাউন্টটেন্ট | ন,বে,সু,মি | গোপালপুর | লালপুর |

(অসম্পূর্ণ)(সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ, লালপুর উপজেলা কমান্ড কার্যালয়)

**সিরাজ প্রামাণিক ও কাদের প্রামাণিক :** দুয়ারিয়া ইউনিয়নের রামকান্তপুর গ্রামের মৃত মালিক উদ্দিন প্রাং এর দুই পুত্র আঃ কাদের ও সিরাজ উদ্দিন। উভয়ে কৃষিকাজ করতেন। ১৭ই এপ্রিল রামকান্তপুর গণহত্যায় তাঁর শহীদহন

**দুয়ারিয়ার রামকান্তপুর গণহত্যায় শহীদদের ১৩ জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :**

| ক্রমিক নং | নাম | পিতা | গ্রাম | ইউনিয়ন | উপজেলা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | হাজের উদ্দিন প্রাং | লবাই প্রাং | রামকান্তপুর | দুয়ারিয়া | লালপুর |
| ২ | আঃ মালেক | কফির প্রাং | রামকান্তপুর | দুয়ারিয়া | লালপুর |
| ৩ | আব্দুল কাশেম মন্ডল | চাঁদ আলি মন্ডল | রামকান্তপুর | দুয়ারিয়া | লালপুর |
| ৪ | আরসেদ আলী | মজির উদ্দিন | ডহরশৈল | দুয়ারিয়া | লালপুর |
| ৫ | এরশাদ আলী | বয়েন উদ্দিন | ডহরশৈল | দুয়ারিয়া | লালপুর |
| ৬ | মুনছের আলী | জয়নাল আবেদিন | ডহরশৈল | দুয়ারিয়া | লালপুর |
| ৭ | মসলেম উদ্দিন | তাজের মুন্সি | ডহরশৈল | দুয়ারিয়া | লালপুর |
| ৮ | ইসমাইল হোসেন | তাজের মুন্সি | ডহরশৈল | দুয়ারিয়া | লালপুর |
| ৯ | জিয়াউর রহমান | - | ডহরশৈল | দুয়ারিয়া | লালপুর |
| ১০ | আস্ত বিশ্বাস | গোপাল বিশ্বাস | ডহরশৈল | দুয়ারিয়া | লালপুর |
| ১১ | আঃ করিম | আদম আলী | ডহরশৈল | দুয়ারিয়া | লালপুর |
| ১২ | আবেদ আলী | সাহাদ আলী | ডহরশৈল | দুয়ারিয়া | লালপুর |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | মোল্লা | | | |
| ১৩ | সিরাজ উদ্দিন | ইয়াদ আলী প্রাং | রামকান্তপুর | দুয়ারিয়া | লালপুর |

(অসম্পূর্ণ)(সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ, লালপুর উপজেলা কমান্ড কার্যালয়)

**ওয়ালিয়ার ময়না গণহত্যায় শহীদদের ৩১ জনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় :**

| ক্রমিক নং | নাম | পিতা | গ্রাম | ডাকঘর | ইউনিয়ন | বধ্যভূমি |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আঃ গফুর | মছির উদ্দিন | ডাঙাপাড়াচিলান | কদিমচিলান | কদিমচিলান | ময়না |
| ২ | আবেদ আলী | তমেজ উদ্দিন | পানঘাটা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | ময়না |
| ৩ | জয়নাল আবেদীন | জফির উদ্দিন | ভবানীপুর | কদিমচিলান | কদিমচিলান | ময়না |
| ৪ | করম আলী | চিনি মদ্দিন | ভবানীপুর | পাঁচবাড়ীয়া | কদিমচিলান | ময়না |
| ৫ | সাইফুল ইসলাম | আঃ লতিব মুনসী | চান্দপুর | পাঁচবাড়ীয়া | কদিমচিলান | ময়না |
| ৬ | মমেনা বেগম | আঃ সাত্তার | ডাঙ্গাপাড়া চিলান | কদিমচিলান | কদিমচিলান | ময়না |
| ৭ | ইয়ার উদ্দিন | ইছাহক আলী | ডাঙ্গাপাড়া চিলান | কদিমচিলান | কদিমচিলান | ঘাটচিলান |
| ৮ | জালাল উদ্দিন | তফিজ উদ্দিন | ডাঙ্গাপাড়া চিলান | কদিমচিলান | কদিমচিলান | ঘাটচিলান |
| ৯ | কমেলা বেগম | ময়জুদ্দিন সা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | কদিমচিলান | ডাঙাপাড়া চিলান |
| ১০ | মজিবর রহমান সা | জমসেদ সা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | কদিমচিলান | ডাঙাপাড়া চিলান |
| ১১ | রহমালী সা | জমসেদ সা | গোধড়া | কদিমচিলান | কদিমচিলান | পারকুল |
| ১২ | রাইসুদ্দিন | করিম প্রাং | গোধড়া | কদিমচিলান | কদিমচিলান | বনপাড়া |
| ১৩ | তাহার আলী | করিম প্রাং | গোধড়া | কদিমচিলান | কদিমচিলান | তছির উদ্দিনের চাতালো ভুঁই |
| ১৪ | আঃ রহমান | মন্দরী প্রাং | গোধড়া | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ১৫ | ইসমাইল | নবির মোল্লা | গোধড়া | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | হোসেন | | | | | |
| ১৬ | নিয়ামত আলী | মেছের প্রাং | গোধড়া | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ১৭ | ননী গোপাল | মেছের প্রাং | গোধড়া | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ১৮ | দুলাল সরকার | কুশি সরকার | ধলা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ১৯ | শচীন দাস | শতিশ দাস | ধলা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ২০ | বিরেশ্বর প্রাং | বৃন্দাবন প্রাং | ধলা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ২১ | কাশিনাথ | বৃন্দাবন প্রাং | ধলা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ২২ | সুধীর সরকার | সম্ভুনাথ সরকার | ধলা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ২৩ | সন্তোষ সরকার | সুধীর সরকার | ধলা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ২৪ | বৈদ্যনাথ সরকার | শ্রীরাম সরকার | ধলা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ২৫ | বাসুদেব কবিরাজ | বাদল কবিরাজ | ধলা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ২৬ | আকালী মন্ডল | - | ধলা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ২৭ | বাসু মন্ডল | পলান মন্ডল | ধলা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ২৮ | অনাথ সরকার | প্রানকান্তি | ধলা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ২৯ | রবি সরকার | অনাথ সরকার | ধলা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ৩০ | গৌর সরকার | ভজহরি সরকার | ধলা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |
| ৩১ | গনেশ্বর | গোপাল | ধলা | কদিমচিলান | কদিমচিলান | |

(অসম্পূর্ণ)(সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ, লালপুর উপজেলা কমান্ড কার্যালয়)

১৯৭১ সালে লালপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে সংঘটিত গণহত্যায় শহীদদের সকলের পরিচয় পুরোপুরি জানা যায়নি। বিভিন্ন গ্রন্থ ও সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী তাদের পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে।

## পরিশিষ্ট : ৪

### লালপুর উপজেলায় গণহত্যা-নির্যাতনের ঘাতক-দালাল :

### ১৯৭১ সালের রাজাকারের তালিকা (যাদের পরিচয় জানা যায়নি) :

লালপুর উপজেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে শান্তিকমিটির পাশাপাশি রাজাকার-আলবদর, আলশামস বাহিনীও ছিল। আর এসব ঘাতক দালালরা পাকিস্তানিদের সহায়তা করে, লালপুর উপজেলায় গণহত্যা, নির্যাতন, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি অপকর্মও করেছে। এদের মধ্যে আসগর আলী ছিলেন অন্যতম। ওয়ালিয়ার অধিবাসী আসগর ছিলেন কৃষক। ১৯৭১ সালের গণহত্যা, ধর্ষণ, লুটপাটের সাথে জড়িত ছিলেন। আরও সদস্য হলঃ রুস্তম আলী (রাজাকার) (ওয়ালিয়া) আব্দুল মজিদ (কদমচিলান), মজিবর রহমান (নান্দ) মুক্তার হোসেন (গোপালপুর), আসগর আলী (আব্দুলপুর) প্রমুখ রাজাকার-আলবদর লালপুর উপজেলায় হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট করে। ওয়ালিয়া ইউনিয়নে ছেরু, জান প্রমুখ রাজাকার লুটপাট করে। এছাড়া নাটোরের আব্দুর রহমানও এ উপজেলায় ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। ময়েজ সরকার, গলেহার মুন্সি, মজের উদ্দিন সরকার (শান্তিকমিটি) প্রমুখ হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের সাথে জড়িত ছিল।

**রাজাকার / আল বদরদের তালিকা**

| ক্রমিক নং | ঘাতক-দালাদের নাম | পেশা | গ্রাম/ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১ | আসগর আলী | কৃষক, খুনি-ধর্ষক ও লুটেরা | ওয়ালিয়া |
| ২ | রুস্তম আলী | কৃষক | ওয়ালিয়া |
| ৩ | আলি হোসেন | কৃষক | ওয়ালিয়া |
| ৪ | নাদের আলী | কৃষক | ওয়ালিয়া |
| ৫ | আজু | কৃষক | ওয়ালিয়া |
| ৬ | খেজের আলী | কৃষক | ডুলবাড়ি |
| ৭ | নিজাম উদ্দিন | কৃষক | ধুপইল |
| ৮ | ময়েজ উদ্দিন | কৃষক | ধুপইল |
| ৯ | আব্দুল জলিল | কৃষক | কদমচিলাম |
| ১০ | কালু | কৃষক | কদমচিলাম |
| ১১ | আমজাদ আলী | কৃষক | কদমচিলাম |
| ১২ | চাঁদ মোহাম্মদ | কৃষক | কদমচিলাম |
| ১৩ | আজিজুল হক | কৃষক | কদমচিলাম |
| ১৪ | হাশেম আলী | কৃষক | কদমচিলাম |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৫ | হযরত আলী | কৃষক | কদমচিলাম |
| ১৬ | হাবিবুর রহমান | কৃষক | কদমচিলাম |
| ১৭ | আব্দুল মজিদ | কৃষক | কদমচিলাম |
| ১৮ | মকছেদ আলী | কৃষক | কদমচিলাম |
| ১৯ | মোবারক আলী | কৃষক | কদমচিলাম |
| ২০ | বাদশা প্রামানিক | কৃষক | কদমচিলাম |
| ২১ | আনছার আলী | কৃষক | শেখচিলান |
| ২২ | হাবিবুর রহমান | কৃষক | শেখচিলান |
| ২৩ | আজিজুল হক | কৃষক | শেখচিলান |
| ২৪ | আবুল কাশেম | কৃষক | শেখচিলান |
| ২৫ | আকছাদ আলী | কৃষক | শেখচিলান |
| ২৬ | আব্দুল মজিদ | কৃষক | শেখচিলান |
| ২৭ | আনোয়ারুল ইসলাম | কৃষক | শেখচিলান |
| ২৮ | রাহাতুল্লাহ্ | কৃষক | গোপালপুর |
| ২৯ | নাজিম উদ্দিন | কৃষক | নুরুল্লাহ্পুর |
| ৩০ | রণজিৎ (ডাকনাম) | কৃষক | গোপালপুর |
| ৩১ | রইচ উদ্দিন | কৃষক | চামটিয়া |
| ৩২ | মহসিন আলী | কৃষক | নওদাপাড়া |
| ৩৩ | মহির উদ্দিন | কৃষক | নওদাপাড়া |
| ৩৪ | হাশেম আলী | কৃষক | নওদাপাড়া |
| ৩৫ | জাহের উদ্দিন | কৃষক | ফানশিপাড়া |
| ৩৬ | হাজের উদ্দিন | কৃষক | দুরদুরিয়া |
| ৩৭ | হাইফত আলী | কৃষক | দুরদুরিয়া |
| ৩৮ | মোশারফ হোসেন | কর্মচারি, চিনিকল | আব্দুলপুর |
| ৩৯ | কাফি | কৃষক | লালপুর |
| ৪০ | জুবায়ের আহমেদ | কৃষক | গোপালপুর |
| ৪১ | আব্দুল মজিদ বিহারি | কৃষক | পাকুন্দা |
| ৪২ | আবুল কাশেম | কৃষক | আব্দুলপুর |
| ৪৩ | আব্দুর রহিম | কৃষক | বিলশালিয়া |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৪৪ | সেলিম | কৃষক | হাঁসবাড়িয়া |
| ৪৫ | লোকমান আলী | কৃষক | হাঁসবাড়িয়া |
| ৪৬ | সাজদার আলী | কৃষক | মহেশপুর |
| ৪৭ | চাঁন্দ মিয়া | কৃষক | চাঁদপুর |
| ৪৮ | তোফাজ্জল হোসেন | কৃষক | চাঁদপুর |
| ৪৯ | ভেদু | কৃষক | ইয়ার কলোনি, গোপালপুর |
| ৫০ | মুক্তার হোসেন | কৃষক | ইয়ার কলোনি, গোপালপুর |
| ৫১ | সোনা | কৃষক | শিবপুর |
| ৫২ | এজহার বিহারি | কৃষক | গোপালপুর |
| ৫৩ | উসমান আলী-১ | কৃষক, পিতা: ইমান (ইদু) | গোপালপুর |
| ৫৪ | উসমান আলী-২ | কৃষক, পিতা: আব্দুল ওহাব | গোপালপুর |
| ৫৫ | নাজিম উদ্দিন | কৃষক | গোপালপুর |
| ৫৬ | ঊাবলু | কৃষক | গোপালপুর |
| ৫৭ | জালাল উদ্দিন | কৃষক | বিরোপাড়া |
| ৫৮ | বামার | কৃষক | শিবপুর |
| ৫৯ | আব্দুল মতিন | কৃষক | বৈদ্যানাথপুর |
| ৬০ | আবু বকর | কৃষক | আব্দুলপুর |
| ৬১ | আসগর আলী | কৃষক | আব্দুলপুর |
| ৬২ | আনসার আলী | কৃষক | ওয়ালিয়া |
| ৬৩ | নাদের আলী | কৃষক | ধূপইল |
| ৬৪ | গণ্ডু | কৃষক | ধূপইল |
| ৬৫ | বয়েজ উদ্দিন | কৃষক | নান্দ |
| ৬৬ | আমজদা হোসেন | কৃষক | নান্দ |
| ৬৭ | মজিবর রহমান | কৃষক | নান্দ |

( *সূত্র:* সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*)

## শান্তিকমিটির তালিকা

| ক্রমিক নং | ঘাতক-দালাদের নাম | পেশা | গ্রাম/ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১ | আলহাজ্ব শাহাদ আলী মণ্ডল | কৃষক, চেয়ারম্যান, শান্তিকমিটির | ফুলবাড়ি |
| ২ | ডা. আব্দুল আজিজ সরকার | গ্রাম্য চিকিৎসক, খুনি ও দালাল | ওয়ালিয়া |
| ৩ | জসীম উদ্দিন মন্ডল | কৃষক, থানার প্রধান খুনি ও দালাল | ফরিদপুর |
| ৪ | চাঁদ মোহাম্মদ | কৃষক | কদমচিলাম |
| ৫ | আব্দুল গোফুর | কৃষক | কদমচিলাম |
| ৬ | খবির উদ্দিন | কৃষক | কদমচিলাম |
| ৭ | মোবারক হোসেন | কৃষক | কদমচিলাম |
| ৮ | হাবিবুর রহমান | কৃষক | লালপুর |
| ৯ | কলিম উদ্দিন | কৃষক, কুখ্যাত লুটেরা, খুনি, ধর্ষক | ওয়ালিয়া |
| ১০ | মোহাম্মদ আলী | কৃষক | কদমচিলাম |
| ১১ | হারেজ উদ্দিন | শিক্ষক | দুরাদুরিয়া |
| ১২ | চুনু সরকার | কৃষক | কলসনগর |
| ১৩ | কাজী জাবেদ আলী | কৃষক | কলসনগর |
| ১৪ | কাজী আবুল হোসেন | কৃষক | কলসনগর |
| ১৫ | আব্দুল মজিদ (অবাঙালি) | খুনি, ধর্ষক ও লুটেরা | আব্দুলপুর |
| ১৬ | আমিন মাস্টার | শিক্ষক | ময়না |
| ১৭ | উমর আলী খান | কৃষক | চংধুপইল |
| ১৮ | মৌলভী জামাল উদ্দিন | কৃষক | মহেষপুর |
| ১৯ | আব্দুস সোবহান | কৃষক | চামটিয়া |
| ২০ | মশাররফ হোসেন | কৃষক | আব্দুলপুর |
| ২১ | এলাহী ডাক্তার | কৃষক | ওয়ালিয়া |
| ২২ | তসিকুল ইসলাম | কৃষক | বিলমারিয়া |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ২৩ | আজের উদ্দিন সরকার | কৃষক | মোহরকয়া |
| ২৪ | আহসান মোল্লা | কৃষক | বিলশালিয়া |
| ২৫ | গোলাম রাব্বানি | কৃষক | রঘুনাথপুর |
| ২৬ | মোসলেম শাহ্ | কৃষক | বোয়ালিয়াপাড়া |
| ২৭ | সমশের ডিলার | কৃষক | বড়বরিয়া |
| ২৮ | আবেদ আলী | কৃষক | কলসনগর |
| ২৯ | খবির উদ্দিন | কৃষক | কেশবপুর |
| ৩০ | আব্দুল কাফি | কৃষক | মহেশপুর |

( *সূত্র:*সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*)

## পরিশিষ্ট: ৫

**লালপুর উপজেলার একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা :**

'মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী গবেষণা কেন্দ্র' প্রকাশিত 'রণাঙ্গন একাত্তর' নামে মাহতাব উদ্দিন সম্পাদিত পত্রিকায় আগস্ট ১৯৮৬ সংখ্যার এক লেখায় প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল জলিল শিকদার বর্ণনা করেছেন। এখানে তার সেই অভিজ্ঞতালব্ধ বর্ণনা হুবহু তুলে ধরা হলো :

"৫ই মে ১৯৭১। আনুমানিক সকাল সাড়ে দশটা। ওয়ার্কসপে ডিউটি করছি। এমন সময় আমার ছোট ভাই মো. আবদুল হাসেম শিকদার দৌড়াতে দৌড়াতে ওয়ার্কসপের ভেতরে এলো। সে হাঁপাতে হাঁপাতে বলল..মিলে পাকিস্তানি আর্মি এসে গেছে। আপনার তাড়াতাড়ি পালান। সে ইক্ষু ওজন করণিকের চাকরি করত। তাকে বললাম, 'আগে তুমি পালাও, আমারা আসছি।' সে চলে গেল। তাকে বিদায় দিয়ে সরে লেদ মেশিনের কাছে এসেছি, এরি মধ্যে তিনজন পাকসেনা ওয়ার্কসপের মধ্যে ঢুকে পড়লো। দু'জন পাকসেনা আমার দু'পাশে এসে দাঁড়াল। অপরজন পিঠে রাইফেল ঠেকিয়ে বললো...ইয়ে বাঙালি চলো, মিটিং হোগা, মিটিংমে চলো।' ঘটনার আকস্মিকতার আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বেরুচ্ছে না। মঞ্জুর ইমাম একজন অবাঙালি ওয়ার্কসপে কাজ করতো। সে উপস্থিত ছিল। সে দ্রুত আমার সামনে এসে দাঁড়ালো এবং মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো-ইয়ে হামারা দোস্ত আদমি হ্যায়।' সে একটু থেমে পুনরায় বললো, 'ঠিক হ্যায়, মিটিংমে চলো। কুচ ডর নেহি।' তার মাথায় একটা বড় সাদা রুমাল বাঁধা দেখলাম। পরে বুঝতে পারলাম, সব অবাঙালিই মাথায় রুমাল বেঁধেছিল। এটা তাদের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা-যাতে ভুলক্রমে কোন অবাঙালি মারা না পড়ে। আমাকে সে দোস্ত আদমি বলে পাকিস্তানি সেনাদের কাছে সনাক্ত করে ছিল। পরে বুঝেছি, এই 'দোস্ত' শব্দটির অর্থ বন্ধু নয়, দুষমণ। সেদিন অবাঙালিরা এই সাংকেতিক শব্দ দ্বারা বাঙালিদের সনাক্ত করে দিয়েছিল। মিলে দু'চার জন যে মানবতাবাদী অবাঙালি ছিল না, তা নয়। তবে এটা ঠিক যে, সেদিন অধিকাংশ অবাঙালি কর্মচারি বাঙালি কর্মচারিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। তারা প্রায় সবাই বাঙালিদের হত্যা ও তাদের বাড়ি-ঘর লুটপাট করেছিল। তারা অধিকাংশই বাঙালিদের তাদের শত্রু মনে করে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। বাঙালিদের কোন আন্দোলন-সংগ্রামকে তারা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বলে মনে করে সেই আন্দোলন-সংগ্রাম থেকে নিজেদের দূরত্ব বজায় রাখত। বাঙালিদের আন্দোলন-সংগ্রামের প্রকাশ্যে বিরোধিতা করত এবং নানা রকম অপকথা-অপপ্রচার চালাত। প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক কথা বলে মিলের সুস্থ পরিবেশ কলুষিত করতেও তারা দ্বিধা করত না। মিলের যাবতীয় গোপন তথ্য তারা পাকিস্তানিদের কাছে পাচার করত। তাদের মিল আক্রমণের জন্য প্ররোচিতও তারাই করেছিল। ময়না প্রতিরোধে মিলের কর্মকর্তা-কর্মচারিরা মিলের অস্ত্র নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিল, এসব বানোয়াট তথ্য তারা পাকিস্তানি আর্মিদের দিয়েছিল বলেই হয়ত পাকিস্তানি আর্মিরা মিল আক্রমণে পরিকল্পনা করে। সেই পরিকল্পনার বেদনাদায়ক পরিণতিই হচ্ছে ৫ই মে নর্থবেঙ্গল সুপার মিল আক্রমণ এবং নির্বিচারে হত্যা ও বাঙালিদের ঘর-বাড়ি লুটপাট। এই লুটপাট অবাঙালিরাই করেছে। বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সনাক্ত করেছিল ওই সব অবাঙালি ঘাতক-দালালেরা। তাদের সঙ্গে সাতচল্লিশোত্তর বাংলাদেশে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তাহলে সবই ছিল মিথ্যে? সত্যি তাই। তারা আমাদের বন্ধু আর মানুষ মনে করেনি। এক ধর্মাবলম্বী উম্মতও ভাবেনি। তাই একাত্তরে এমন অমানবিকভাবে নির্যাতন করতে পেরেছিল।

যাহোক, আমার ছোট ভাই মেশিনিস্ট কামাল উদ্দিন আহম্মদ (শহীদ), হেলপার আয়েজ উদ্দিন (শহীদ), হেলপার আবদুল মজিদ (শহীদ), খালাসি আবদুল রাজ্জাক (শহীদ), ফিটার মো. তোফাজ্জল হোসেন ও আমাকে ওয়ার্ককসপ থেকে বের করে জেনারেল অফিসের সামনে নিয়ে এলো। সেখানে মিলের এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর লেফ. (অব.) আনোয়ারুল আজিমসহ অনেককেই ধরে নিয়ে এসে মাটিতে বসিয়ে রাখা হয়েছে। আমরাও তাদের কাছে গিয়ে বসলাম। একজন পাকিস্তানি আর্মী অফিসার আনোয়ারুল আজিম সাহেবকে রক্ষ্য করে বলল-'কিস্‌নে মেজর আসলাম কো মারা হ্যায়?' আজিম সাহেব বাংলাতেই জবাব দিলেন, 'আমার জানি না। তবে যারা মেরেছে তারা ওপারে চলে গেছে (ওপার বলতে তিনি 'ভারত' বুঝিয়েছিলেন)। আমরা এ সম্বন্ধে কিছু জানি না। আমরা কিছু বলতে পারব না। আমরা নির্দোষ।' এরপর পাকিস্তানি আর্মি অফিসার বলল-ঠিক হ্যায়, ওঠো, উধার চলো।' হাত উঁচিয়ে কলোনির দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত করলো সে। আমরা উঠে কলোনির দিকে হাঁটা ধরলাম। আর্মিরা আমাদের ঘিরে আছে। আমরা জেনারেল অফিসের সামনে থেকে পুর্ব দিকে যাচ্ছি। সিকিউরিটি অফিসের পশ্চিমে নতুন বি-টাইপ কোয়ার্টারের সামনাসামনি আসতেই পাকিস্তানি আর্মি অফিসারটি কি মনে করে পিছন থেকে বলে উঠলো-'তোম লোগ লেট যাও'। 'লেট যাও'-অর্থাৎ শুয়ে পড়ো। আমরা সবাই উপড় হয়ে শুয়ে পড়লাম। এ সময় ইক্ষু বিভাগের সহকারি হিসাব রক্ষক আবদুল মান্নান ভূঁইয়া (শহীদ) সাহেব এলেন। তিনি পরহেজগার মানুষ। নামাজী। মাওলানা হিসেবে তিনি পরিচিত ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর ভাই (শ্যালক) এখানে (মিলে তার বাসাভবনে) বেড়াতে এসেছিল। সেও আমাদের সাথে আটকা পড়েছে। হয়তো তার ধারণা হয়েছিল, আর্মিরা তাকে কিছু বলবে না। সম্ভবত তিনি শ্যালককে স্ত্রীর অনুরোধে মুক্ত করতে এসেছিলেন। তিনি হয়তো বলতেন, 'আমার শ্যালক এখানে বেড়াতে এসেছে, সে নির্দোষ। দয়া করে তাকে ছেড়ে দিন।' কিন্তু তার সে কথা আর কোনদিন বলা হয়নি। শ্যালককে বাঁচাতে এসে তিনি নিজেই শহীদ হয়েছিলেন। তার পোশাক দেখেই পাকিস্তানি আর্মি অফিসার বললো, 'আরে মাওলানা তোম, তোম কিয়া মাঙতে হ্যায়?' অফিসারের ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গির কথা শুনেই মান্নান ভূঁইয়া সাহেবের কথা নিমিষে মিলিয়ে গেল। তবু খানিজ পর নিজেকে সামলে তিনি বলেন, 'স্যার, আমি কোরআন তেলোয়াৎ করতে চাই।' পাকিস্তান অফিসারের ভ্রু কুঁচকে উঠে মান্নান সাহেবের কথা শুনে। সে এক মুহূর্ত কি যেন ভাবল। তারপর হুকুম দিল, 'আচ্ছা ঠিক হ্যায়, পড়হো।' আমরা তখনও উপুর হয়ে শুয়ে আছি। মান্নান সাহেব দাঁড়িয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে খুব দরদমাখা সুরে বেশ উচ্চকণ্ঠে কোরআন তেলোয়াৎ করতে লাগলেন। যতদূর মনে পড়ে, তিনি সেদিন সুরা তইয়বার শেষ দুই রুকু পাঠ করলেন। তিনি যখন কোরআন তেলোয়াৎ করছিলেন, তখন পাকিস্তানি সেনারা পরস্পরের মধ্যে হাসি মস্করা করছিল। আর বলছিল, 'শালা কোরন ডি পড়হনে জানতা হ্যায়। আখরি বার পড়হো।' কোরআন তেলোয়াৎ শেষ হলে পাকিস্তানি অফিসারটি মান্নান সাহেবকে নির্দেশ করে, 'ঠিক হ্যায়, মাওলানা তুম ভি লেট যাও।' ভুঁইয়া সাহেবও তখন আমাদের সঙ্গে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়েন। এরপর পাকিস্তানি আর্মিরা আমাদের বেধড়ক মারতে শুরু করল। কাউকে কাউকে লাথি মারতে মারতে মুখখিস্তি করল। যাকে তারা হাত ও পায়ের কাছে যে ভাবে পেল চোখ-মুখ, কোন কিছু না দেখে এলোপাথাড়ি লাথি মারল এবং রাইফেলের বাট-কুঁদো দিয়ে নির্মমভাবে মারতে শুরু করল। পাকিস্তানি অফিসারটি যখন জিজ্ঞেস করল, 'বাতাও কিসনে মেজর আসলামকো মারা হ্যায়, বাতাও বাঞ্চোৎ।' এ কথার জবাবে মিলের এ্যাডমিনিস্ট্রেটর আজিম সাহেব বলেন, 'আমার মিলের লোকজন এখানে যারা আছেন, তারা কিছুই জানেন না। আমিও জানি না। তবু যদি তোমরা অবিশ্বাস করো আর আমাদের মারো, তাহলে কেবল আমাকেই মারো। এরা সবাই নির্দোষ, এদের ছেড়ে দাও।' পাকিস্তানি অফিসারটি তার কথা শুনে তখন বলে, 'ঠিক হ্যায়, ওঠো।' আমরা সবাই উঠলাম। আমাদের সবাইকে নিরাপত্তা অফিসের সামনে নিয়ে এলো। এখানে রাস্তা তিনভাগে ভাগ হয়ে গেছে। রাস্তার একটা অংশ

দক্ষিণ গেটের দিকে একটা পুর্ব গেটের দিকে আর একটা পশ্চিমে জেনারেল অফিসের দিকে বয়ে গেছে। নিরাপত্তা অফিসের সামনে ওরা আমাদের থামতে বলল। তারপর নিজেদের মধ্যে মিনিট দুয়েক আলাপ করল। তাদের আলাপ থেকে যেটুকু বোঝা গেল, তা হচ্ছে আশেপাশে কোন পুকুর আছে কিনা সেটা তারা জানতে চাচ্ছে। তাদের সঙ্গে মিলের অবাঙালি কর্মচারিরা ছিল। তারা একজন খুব সম্ভব তার নাম হাবিলদার মিয়া বখ্‌শ খান কিংবা প্রহরী শের খান-তারা উভয়েই মিলের নিরাপত্তা কর্মচারি ছিল। তবে এই মুহূর্তে তাদের নাম নির্দিষ্ট করে বলতে পারছিনা। অনেক দিন আগের কথা। স্মৃতি তাই প্রতারণা করছে। তবে এটা ঠিক এই দুজনের যে কোন একজন পুকুর দেখিয়ে দিয়েছিল। কারণ তারা মাথায় সাদা রুমাল বেঁধে তখন পর্যন্ত পাকিস্তানি আর্মিদের সঙ্গে ছিল। তাদের সঙ্গে অন্য অবাঙালিরাও ছিল-হয়ত আমাদের গুলিবিদ্ধ হওয়ার দৃশ্য দেখে মজা পাওয়ার আশায়। সে সাথে তাদের পাকিস্তানি বন্ধুদের কোন আদেশ তামিল করার জন্য তারা সঙ্গে ছিল। তারই অংশ হিসেবে তাদের মধ্যে যে কোন একজন পুকুর দেখিয়ে দিয়েছিল, এটা সত্য। অমাদের পুকুর পাড়ে হত্যা করলে ভাল হবে, এই পরামর্শও তারা দিয়েছিল। নিরাপত্তা অফিসের একেবারে কাছে উত্তরে 'গোপাল সাগরে'র দিকে পাকিস্তানিরা তাদের অবাঙালি বন্ধুদের পরামর্শানুযায়ী হেঁটে যাওয়ার নির্দেশ দিল। 'গোপাল সাগর' ওই পুকুরটার নাম। বায়াত্তরে পর তার নাম রাখা হয়েছে 'শহীদ সাগর'। যাহোক, আমরা সবাই সেই পুকুরের ঘাটে গিয়ে উপস্থিত হলাম এবং বুঝাতে পারলাম, এখানে আর কিছুক্ষণের মধ্যে বিনা অপরাধে গুলি করে হত্যা করা হবে। আমাদের পুকুরের ঘাটে এনেই দেখলাম পাকিস্তানি আর্মিদের মধ্যে এক ধরণের যুদ্ধের প্রস্তুতি। তারা ব্যস্ত হয়ে উঠল। দ্রুত পুকুরের সামনে পড়ে থাকা পরিত্যাক্ত একটা তেলের ড্রাম নিয়ে এল। সেই তেলের ড্রামের উপর তারা এল.এম.জি সেট করল। তিনজন এল.এম.জি-র কাছে দাঁড়াল। বাকিরা আমাদের মাঝখানে রেখে তিনদিকে পরিজশন নিল। আমাদের পেছনে পুকুর। ওরা সম্মুখ থেকে গুলি করবে আর আমরা এক একজন গুলি বিদ্ধ হয়ে পুকুরে লুটিয়ে পড়ব। কেউ আহত হলেও বাঁচতে পারবেন না। পুকুরের পানিতে জ্ঞান হারিয়ে আহত হলেও ডুবে মরবেন। আমরা প্রত্যেকেই বেঁচে থেকে মৃত্যুর হিম শীতল এক দুঃসহ স্বাদ অনুভব করছিলাম। কেউ সাহস করে কারো কাছে চিরদিনের মতো বিদায় নেয়ার এবং পরস্পর দীর্ঘদিন একসঙ্গে চাকরি করেছি, বসবাস করেছি, কতো ভুলভ্রান্তি আর অন্যায় অপরাধ করেছি তার জন্য মাপ-ছাপও মুখ খুলে চাইতে পারছিলাম না। মৃত্যু যে আমাদের সম্মুখে এক বিবেক-বুদ্ধি আর কর্তব্যশূন্য হয়ে দেখা দিয়েছে। কাকে কি বলব, কি হবে আর বলে? কে শুনবে কার কথা? সবাই মৃত্যুর এই আয়োজন দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ়। আমাদের সামনে দক্ষিণে, দক্ষিণ-পূর্বে, ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ঘাতক পাকিস্তানিরা সশস্ত্র আজরাইল হয়ে দাঁড়িয়ে। পুকুরের উত্তর-পুর্বে মিলের উঁচু প্রাচীর। পশ্চিমে অফিসারদের কোয়ার্টার। হঠাৎ কেউ দৌড়ে যে পালানো ঝুঁকি নেবেন তারও কোন উপায় নেই। পালানোর সব পথ বন্ধ। অতএব নিঃশব্দে মৃত্যুর গলায় মালা দিয়ে তাকে বরণ করে নিতে হবে। আমার শুধু মনে হচ্ছে, জীবনের এই পরাজয় মেনে নেয়া যায় না। দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে যদি মরতাম, তাহলে কোন দুঃখ ছিল না। তা না করে আমরা মরছি বিনা লড়াইয়ে, ভীরুর মতো। এই মৃত্যুতে কি গৌরব আছে? কে আমাদের মনে রাখবে? আমরা আজরাইলকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখতে পাচ্ছি আজরাইলরূপী খুনি পাকিস্তানিদের। মৃত্যু বুঝতে পেরে অনেকেই পুকুরঘাটে অজু করলেন। কেউ কেউ অন্যের দেখাদেখি অজু করার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমন সময় একজন পাকিস্তানি আর্মি গর্জে উঠল, 'খবরদার, কই পানিমে মাত উতরানা।' অজু বন্ধ হয়ে গেল। একজন পাকিস্তানি অফিসার সামনে এগিয়ে এল। ফর্সা, লম্বা-বিড়ালের মতো কয়রা চোখ। সৈন্যদের উদ্দেশ্যে কি যেন বলল সে। ভাষা বুঝতে পারলাম না। সম্ভবত পাঞ্জাবি ভাষায় সে কথা বলল। পরে শুনেছি এই অফিসারটি ছিল পাঞ্জাবি খিশ্চান। নাম মেজর উইলিয়াম। সে ছিল এই মিল অপারেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার। তার কথা শুনেই

বুঝেছিলাম এখনই আমাদের গুলি করা হবে। কেননা তার কথার পর সব পাকিস্তানি সৈন্য একেবারে এটেনশন পজিশনে দাঁড়িয়ে গেল। সবার হাতের অস্ত্র আমাদের দিকে তাক করল। আমরা সে দৃশ দেখে 'লা ইলাহা ইলল্লিলাহ্হু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্' পড়তে শুরু করলাম। আমি ছিলাম একেবারে প্রথম সারিতে পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। আমার ঠিক পেছনেই ছিলেন আজিম সাহেব। আল্লাহর নাম জপ করছি আর মনে মনে বলছি, 'হে আল্লাহ এই অন্যায় অবিচারের বিচার তুমি করো, প্রভু। এই ঘাতক বেঈমানদের শাস্তি দিও....'

এইসব এলোমেলো ভাবনার মধ্যে যখন আমরা মৃত্যুর অপেক্ষা করছি, ঠিক সেই সময় হঠাৎ গর্জে উঠল মৃত্যুদূত। চারিদিকে আগুনের ফুলকি। মৃত্যু যন্ত্রণায় বিপন্ন মানুষের গগন বিদীর্ণ করা আর্তনাদের সঙ্গে স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্রের নিকট আওয়াজ এক অভাবনীয় দৃশ্যের অবতারণা করল। আমার কানের পাশে দিয়ে অসংখ্য তপ্ত গুলি সাঁই সাঁই করে বেরিয়ে গেল। আমি কি ভাবে যে কখন ঘাটের সিঁড়ির উপর শুয়ে পড়লাম। আমার বাম হাত বুকের নিচে আর ডান হাত ছড়ানো। মাথাটা সিঁড়ির একটা ধাপির উপর একটু আড়ালে পড়েছিল। আমার উপর দিয়ে হাজার হাজার গুলি সাঁই-সোঁ শব্দে ভেসে গেল। সবাই গুলিবিদ্ধ হয়ে উন্মাদের মতো ছুটাছুটি করছিলেন। সবাই বাঁচতে চান। কিন্তু ঘাটের ক্ষুদ্র পরিসরে কে কোথায় আশ্রয় পাবে কিংবা পালাবেন? প্রত্যেকেই গুলিবিদ্ধ হয়ে জবাই করা মুরগির মতো হাত-পা ছুটাছুটি করতে করতে এক সময় নিঃসার হয়ে পড়ছিলেন। আমার ওপর কয়েকটা লাশ এসে পড়ল। লাশের তলায় চাপা পড়ে গেলাম। আমি তখনো সংজ্ঞা হারাইনি। কষ্ট হলেও লাশের চাপ সহ্য করে চুপ করে থাকলাম। তবু শুনতে গেলাম, কে যেন পাকিস্তানিদের উদ্দেশ্য করে তাকে বাঁচানোর জন্য কাকুতি-মিনতি করছেন। লাশের তলা থেকে অনেক কষ্টে চোখ মেলে দেখলাম ইলেকট্রিশিয়ান নজরুল ইসলাম সাহেব। তিনি ঘাটের পশ্চিম পাশে পানিতে নেমে গিয়েছিলেন। তিনি সৈন্যদের উদ্দেশ্য করে হাত জোর করে বলছেন, 'কসম খোদাকি, কসম কোরানকি, পহেলে মেরে এক বাত শুনিয়ে...' তার আর কথা বলা হলো না। গুড়ুম করে বার দুই আওয়াজ হলো, নজরুল সাহেব চিরদিনের মতো পুকুরের পানিতে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। স্তব্ধ হওয়ার আগে কয়েক দণ্ড শুধু পানি উথালি-পাথালি করলেন বেঁচে থাকার চেষ্টায়। খুব বেশিক্ষণ পাকিস্তানিদের গুলি খরচ দেননি বাঙালিরা। অতিরিক্ত হলে সাত মিনিট। এরই মধ্যে মিল চত্বরে এক নারকীয় হত্যাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেললো কুখ্যাত খুনিরা। কিন্তু ঘাতক পাকিস্তানিরা খানিক পরেই লক্ষ্য করেন দুইজন বাঙালি তখনো বেঁচে আছে। তারা পুকুরের পানিতে নেমেছিলেন। ডুব সাঁতার দিয়ে ছিলেন। নিঃশ্বাস নেয়ার জন্য মাথা তুলতেই তারা টের পান সেটা। মিনিট তিনেক সৈন্যরা সন্ত্রস্ত দুইজনের সাথে তামাশা করল। তারপর তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি করল। দুইজনের নশ্বর দেহ পানিতে তলিয়ে গেল। আমি তাকিয়ে দেখি ভারপ্রাপ্ত হিসাব রক্ষক সাইফুদ্দিন আহম্মদ আর হেড ক্যাশিয়ার নূরুল ইসলাম সাহেব ছিলেন ওই দুই হতভাগ্য ব্যক্তি। আমি সিঁড়ি আর লাশের আড়াল না হলে বাঁচতে পারতাম না এবং এই নারকীয় দৃশ্য দেখার অভিজ্ঞতা আজ আপনাদের বলতে পারতাম না। বেঁচে গিয়েছিলাম বলে আজ সেই দুর্দিনের দুঃসহ ঘটনার কথা লিপিবদ্ধ করছি মুক্তি যুদ্ধের প্রায় তিন দশক পর। স্মৃতি তবু অনেকটা থিতিয়ে গেছে। কত খুঁটি-নাটি ঘটনার কথা মনে নেই। কত ঘাতক-দালালের নাম মনে নেই। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জসীম মন্ডল নামে এক বাঙালি ঘাতক-দালাল জড়িত ছিল। সে একাত্তরের নয় মাসে হত্যা-ধর্ষণ-লুটপাট-অগ্নিসংযোগসহ এমন কোন মানবতা বিরোধী কাজ নেই যা করেনি। তার মতো ঘাতক-দালাল লালপুর এলাকায় দ্বিতীয়টি ছিল না।

আমাদের সবাইকে গুলি করার পর মৃত্যু নিশ্চিত করার জন্য ওরা আবার গুলি বর্ষণ করে। সেই সময় আমার ছড়িয়ে থাকা ডান হাত গুলিবিদ্ধ হয়। সম্ভবত তারা লাশের গাদা লক্ষ্য করে পুনরায় গুলি বর্ষণ করেছিল।

তখন নির্দিষ্টভাবে আর কাউকে গুলি করেনি। তখন আর কেই বা ছিলেন যে ওরা গুলি করবে? গুলি বিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে আঁধার হয়ে এলো। মনে হল আমি আঁধারে হারিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু চেষ্টা করলাম মানসিক শক্তি অর্জন করার জন্য। খানিক বাদে আমার যন্ত্রণা সত্ত্বেও জ্ঞান ফিরে এলো। চোরা দৃষ্টিতে দেখলাম খুনিরা নিজেদের মধ্যে কি সব আলাপ করছে। তখন আমার হাতের ফিনকি দিয়ে রক্ত ঝরছে। অতি কষ্টে হাতটা মাথার উপর তুলে নিলাম। রক্তে আমার শরীর ভিজে গেল। উদ্দেশ্য হচ্ছে ওরা যেন আমাকে দেখে বুঝতে না পারে যে আমার মৃত্যু হয়নি। রক্ত দেখে বুঝবে আমিও মারা গেছি। কিন্তু সব সময় খুব সতর্ক থেকেছি-যাতে ওরা একটুও বুঝতে না পারে। আমার মাথা সানের ধাপের উপর। পা পানির মধ্যে। পাকিস্তানিরা লাশগুলো লাথি মেরে পানিতে ফেলে দিল। আমাকেও দিল। কিন্তু আল্লাহর হাজার শুকুর ওরা বুঝতে পারেনি আমি বেঁচে আছি। সব লাশ পানিতে ফেলে দিলে আমার শরীরটাও পানিতে পড়ল। কিন্তু মাথাটা পড়ল উপরে। এতে আমার মৃত্যুবৎ পড়ে থাকতে অসুবিধে হচ্ছিল না। ভালভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলাম। আমি মাথা তুলে পাকিস্তানিদের দেখতে পাচ্ছিলাম না। আমার কাছাকাছি এ্যাডমিনিস্ট্রেটর অফিসার শহীদুল্লাহ্ সাহেব পড়ে আছেন। তার অর্ধেক শরীর সিঁড়িতে, অর্ধেক পানিতে। যন্ত্রণায় তাঁর বুকটা বিকৃত। কিন্তু তাঁকে অক্ষত মনে হচ্ছিল। তিনি আমার জীবন্ত উপস্থিতি বুঝে বললেন, ‘জলিল মিয়া চুপ করে পড়ে থাকুন, পাকিস্তানিরা এখনো যায় নি।’ তার কথা শুনে আমি পূর্ববৎ পড়ে রইলাম। অল্পক্ষণের মধ্যে গাড়ির শব্দ ভেসে এল। তারা যাওয়ার আগে মিলের সুইপার ভিখুরামকে ডেকে আদেশ দেয় দ্রুত লাশগুলো গর্ত করে কবর দিতে। তারপর ওদের লাল গাড়িটা চলার শব্দ শুনলাম। আমি তখন শহীদুল্লাহ সাহেবকে বললাম, ‘চলেন যাই।’ তিনি বললেন, আমি পারব না, আপনি পারলে দ্রুত সরে পড়ুন। খোদা হাফেজ।’ তাঁর চলার শক্তি ছিল না। নিম্নাঙ্গে তিনি গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন। তিনি আমার কাছে সাহায্যও চাননি। তাঁর ওই অবস্থা আমার কাছে সাহায্য চাইতে পারতেন। আমিই বরং সাহায্য করার প্রস্তাব দেইনি। তিনি কেবল বার বার আমাকে ঘটনাস্থল থেকে দ্রুত সরে পড়ার অনুরোধ জানান। আমি তখন অতিকষ্টে একটা হাতে ভর করে পুকুর থেকে উঠে পশ্চিমপাশে চলে গেলাম। পশ্চিম পাড়ে একটা আমগাছ ছিল। ডালপালা তার পানির মধ্যে ঝুলে পড়া ছিল। সেই গাছটা আজো আছে। সে ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে আছে। গাছটার নিচ পর্যন্ত আসতেই আমি হাঁপিয়ে উঠলাম। তারপর যে নারকীয় দৃশ্য দেখলাম তা আরো ভয়াবহ। দেখলাম একদল বিহারি লাঠি-সড়কি আর মিলের রাইফেল নিয়ে পুকুর পাড়ে এল। তাঁরা যতদূর পারল প্রতিটা লাশ পরীক্ষা করে নিশ্চিত হচ্ছিল তারা মারা গেছে কিনা। শহীদুল্লাহ্ সাহেবের কাছে এসে যখন দেখল তিনি মারা যাননি। তখন তাঁকে বাঁশের লাঠি দিয়ে বিহারিরা পিটিয়ে হত্যা করল। তিনি প্রথম আঘাত খেয়েই সংজ্ঞা হারালেন। তারপর লাঠি আর সড়কির নির্মম আঘাতে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢোলে পড়লেন। ভিখুরামও সে নারকীয় দৃশ্য দেখে কাঁদতে শুরু করে। তখন তাঁকে হত্যার হুমকি দিয়ে কান্না থামিয়ে লাশ কবর দেয়ার আদেশ ওই বিহারিরাও করে। ভিখুরাম তার স্ত্রীকে নিয়ে লাশ কবর দেয়ার জন্য গর্ত খুঁড়তে শুরু করে। সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে আমি বাড়ির দিকে রওনা দেই। আর ভাবি, শহীদুল্লাহ্ সাহেব কি বুঝেছিলেন, বিহারিরা এসে জীবিতদের আরেকবার আক্রমণ করবে। তাই আমাকে দ্রুত সরে পড়ার জন্য তাঁর এই অনুরোধ। তিনি বুঝেছিলেন, আমি তাকে সাহায্য করতে গেলে দু’জনই মারা পড়ব। তার চলার শক্তি ছিল না। সেই অবস্থায় সাহায্য করতে গেলে দু’জনই ধরা পড়ে মৃত্যুবরণ করতে হত। লোকটার উপযুক্ত চিকিৎসা হলে তিনি বাঁচতেন। আমারই মতো এই দুনিয়ার আলো-হাওয়ার প্রিয়জনের সান্নিধ্যে বাকি জীবনটা একাত্তরের ভয়াবহ স্মৃতি নিয়ে বসবাস করতেন। আজ তিন দশক পরও আমার শহীদুল্লাহ সাহেবের সেই অনুরোধমাখা কথাগুলো কানে বাজে, ‘আপনি তাড়াতাড়ি চলে যান জলিল মিয়া, যান দেরী করবেন না, যান।’ এই কথাগুলো বলতে কষ্টে তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে উঠেছিল। তাঁর মুখ্যকৃতির স্মৃতিটাও উজ্জ্বল হয়ে আছে।

সেই একাত্তরের পাঁচই মে। তখন সবে মধ্যাহ্ন। গ্রীস্মের তীব্র রোদে তখন সমস্ত প্রকৃতি আলোকিত হলেও আমাদের এই বাঙালিদের জীবন ছিল ঘন আঁধারে ভরা।

সেই নিকষ আঁধারের মধ্যে কেন যে বেঁচে থাকার বড় সাধ জাগে প্রতিটি জীবের, জানিনা। আমারও কেন জানিনা সেই সাধ প্রবলতর হয়েছিল, সেটাও এই মুহূর্তে ব্যাখ্যা করতে পারব না। আমি আহত হয়েও বাম হাত দিয়ে গুলিবিদ্ধ ডান হাতটা ধরে অফিসার্স কোয়ার্টারগুলোর পেছন দিয়ে আরো পশ্চিমে এগিয়ে এলাম। এই পূর্বে এদিকে কখনো আসার প্রয়োজন হয়নি বলে আসিনি। দু'টো বাড়ির ফাঁক দিয়ে বিহারি নাপিতকে পুর্ব দিকে যেতে দেখলাম। আমি ওর ভয়ে আরো পশ্চিম দিকে কয়েক কদম দ্রুত এগিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে লুকানোর চেষ্টা করলাম। ও দেখে ফেললে বিপদ হবে। ওর চেহারায় কেমন রুদ্রমূর্তি লক্ষ করলাম। অথচ এই নাপিত দুদিন আগে কি বিনয়ের সাথে আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে। ওরা তখন ছিল অনুগত। গোপালপুরে কোন বিহারিকে বাঙালিরা নির্যাতন করেনি। ওরাই আগ বাড়িয়ে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিত। সব সময় ওরা ছিল আক্রমণাত্মক। বাঙালিরা ইচ্ছে করলে ওদের পিটিয়ে দেশ ছাড়া করতে পারত। কিন্তু কোন কালেই বাঙালিরা সে রকম নিষ্ঠুর আচরণ করেনি। আমার জানা মতে গোপালপুরে সে রকম ঘটনা ঘটেনি। লুটপাটের চক্রান্ত কতিপয় দালাল আর সাম্প্রদায়িক বাঙালিকে নিয়ে ওরাই করে। সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর তারাই আক্রমণ চালায় এবং তাদের ঘর-বাড়ি লুটপাট করে। এই ঘটনায় অধিকাংশ মুসলমান বাধা দিয়েছে। তাতেই ওরা ক্ষিপ্ত হয় সাধারণ মুসলমানের উপর। হিন্দু ও ভারতের অনুচর আখ্যা দিয়ে তাঁদের ওপর চড়াও হয়।

যাহোক, আমি কয়েক দণ্ড আড়ালে লুকিয়ে থেকে রেল লাইন ধরে এগিয়ে গেলাম। হঠাৎ হাবিলদার মিয়া বখশ খান আর প্রহরী শের খানের সামনে পড়ে যাচ্ছিলাম প্রায়। তারা আজকের অপারেশনে এত খুশি যে সেই গল্পে এত মশগুল ছিল আমাকে লক্ষ্যই করতে পারল না। তবু আমি ভাবলাম আমাকে দেখতে পেলে আর জীবিত রাখবে না। এই দুই ঘাতক পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে সারা সময় ছিল। তারা বিভিন্ন বিষয়ে পাকিস্তানি হানাদারদের সাহায্য পরামর্শ দিয়ে আজকের অপারেশনে এত নিরীহ বাঙালি নিধনে সহযোগিতা দিয়েছে। আমাকে দেখতে পেলে হত্যা করবে। তারা গল্প করতে করতে ফ্যাক্টরি থেকে তাদের কলোনির দিকে যাচ্ছিল। আমি তাদের দেখে কোন ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল না পেয়ে একটা লাইনে দাঁড়ানো মালগাড়ির ওয়াগণের আড়ালে লুকালাম নিজেকে। তখনো আমার হাত দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত ঝরছে। ভীষণ যন্ত্রণা অনুভব করছি। সেই যন্ত্রণা মৃত্যুর আতঙ্কের কাছে তুচ্ছ। তার কথা সে সময় মনেই ছিল না। আমি যে ভাবে ওয়াগণের আড়ালে লুকিয়েছিলাম তারা একবার আমার দিকে তাকালেই আমাকে দেখতে পেত। কারণ তাদের থেকে আমি মাত্র কয়েক গজ-খুব বেশি হলে পাঁচ-সাত গজ দূরে লুকিয়েছিলাম। ওরা চলে যাওয়ার পর মিলের মেইন গেটের দিকে তাকালাম। মিলের গেট বন্ধ। গ্রসওয়ে ব্রিজ দিয়ে গেটের দিকে ছুটলাম। ওটা খোলা ছিল। সেই পথ দিয়েই বেরিয়ে এলাম মিলের ভিতর থেকে। মিলের দক্ষিণ-পশ্চিমে ই-টাইপ কোয়ার্টারে আমার বাসা। সেদিকে দ্রুত এগোতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পা উঠছিল না। সমস্ত শরীর ভারী হয়ে যাচ্ছিল ক্রমান্বয়ে। আমাদের বাসভবনের কাছাকাছি হয়ে দেখলাম অবাঙালিদের সঙ্গে গোপালপুর এলাকার কতিপয় সাম্প্রদায়িক বাঙালি আমাদের বাসভবনগুলো লুটপাটে লিপ্ত। তাদের মধ্যে মালামাল লুটের জন্য হুল্লোর পড়ে গেছে। তারা কোন দিকেই খেয়াল করছে না। একটু দূর থেকে দেখলাম আমাদের বাসভবনের সম্মুখে অবাঙালি ড্রাইভার আলী মর্তুজা আর খালাসী হাসান আলী রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে লুটপাটে যাতে বাঙালিরা বাঁধা দিতে না পারে, সে জন্য পাহারার দায়িত্বে নিয়োজিত। তাদের হাতে ওগুলো মিলের রাইফেল। একদিন এই ড্রাইভার আর খালাসী দশ হাত দূরে থেকে আমাদের আভূমি নতজানু হয়ে

সালাম দিত। বিনয়াবনত হয়ে কুশল জিজ্ঞেস করত। আজ সেই তারাই আমাকে সামনে পেলে ওই রাইফেল দিয়ে হত্যা করবে। রাইফেল না থাকলেও তো কিলিয়েই হত্যা করবে-এমন জোশে তারা আছে। এই কি ইসলামের আদর্শ? ওদের রুদ্র আর ধ্বংসাত্মক মূর্তি দেখে এই প্রশ্নটাই বার বার জাগছে, এই কি ইসলামের আদর্শ আর শিক্ষা? সবাই লুটের মাল একটা ট্রাকে তুলছে। আমাকে ওরাও দেখতে পেল না। আমি দূর থেকে ওদের চেহারা দেখে সাধ্য মত চেষ্টা করে একটু দ্রুত আমার চাচা আবদুল সোবহান সাহেবের বাসভবনের দিকে গেলাম। পথে হেলপার আফতাব উদ্দিনের সঙ্গে দেখা হল। সে বলল, 'আপনার জন্য সবাই ভীষণ উদ্বিগ্ন হয়ে আছে।' সে আমার দূরাবস্থা দেখে আমাকে ধরে চাচার ওখানে নিয়ে গেল। চাচা আমার অবস্থা দেখে ধরে একটা ইজি চেয়ারে আমাকে আধশোয়া করে দিলেন। তারপর মিলের পশ্চিমে আমাকে লেংগুরপাড়া গ্রামে আসলাম সরকারের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। চারজন আমাকে একটা খাটিয়ায় তুলে সেখানে পৌঁছে দিলেন। প্রিয়জনদের সংস্পর্শে আমার হাতের ব্যথা যেন বৃদ্ধি পেল। এতক্ষণ ছিল মৃত্যু ভীতি। এখন শুরু হল গুলিবিদ্ধ হাতের যন্ত্রণার কষ্ঠ। অসহ্য যন্ত্রণা। গুলির বিষক্রিয়ার জন্য এই যন্ত্রণা। আমার বাসভবনের এক গোপনস্থানে সাতশো টাকা আর এগার ভরি সোনার গহনা ছিল। সে কথা মনে হতেই আমার ছোট ভাই আবুল হোসেনকে পরের দিন ওগুলো কোথায় আছে সে তথ্য দিয়ে তাকে পাঠালাম নিয়ে আসতে। সে ওগুলো পেয়েছিল। কিন্তু ফেরার পথে ওকে বিহারিরা দেখতে পেয়ে তল্লাসী করে নগদ টাকা আর সোনা কেড়ে নেয়। তাকে মারধোরও করে। আমারই বোকামি হয়েছিল ওই মুহুর্তে তাকে সেখানে পাঠানো। তাকে যে ওরা জীবনে মেরে ফেলেনি এটাই হাজার শুকুর। সোলায়মান সাহেব জানালেন, লেংগুরপাড়া নিরাপদ স্থান নয়। তার চেয়ে চিকাদহ গ্রামে যাওয়াই উত্তম। পরের দিন চিকাদহ আবদুল সোবহান সাহেবের বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে চারদিন থাকার পর হাতের অবস্থা ক্রমেই উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে খারাপ হতে লাগল। তখন সবাই পরামর্শ দিলেন এখানে এভাবে আর কিছুদিন থাকলে হাত কেটেও বাঁচানো যাবে না। তারপর আমাকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে পাঠিয়ে দেয়া হল। সেখানে বহরমপুর হাসপাতালে দীর্ঘ পাঁচ মাস চিকিৎসার পর আমি সুস্থ হয়ে উঠি। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর আমাকে শারীরিকভাবে অযোগ্য ঘোষণা করে বাধ্যতামূলক অবসর দেয়া হয়। আমি সেই আদেশের বিরুদ্ধে মামলা করে ত্রিশ মাস পর সিভিল সার্জেন্টের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মামলার রায়ে ফিজিক্যাল ফিটনেস আছে এই মর্মে আমাকে চাকরিতে পুনর্বহাল করা হয়। আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের গুলিতে আহত হই। আমাকে যুদ্ধোত্তর দেশে আর্থিকভাবে বিপন্ন থাকার পরও ত্রিশ মাস যে মানসিক ও আর্থিক বিপর্যয়ের মধ্যে রেখেছিল, সেই কষ্টের ভাষা জানানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবু লড়াই করেছি। মুক্তিযুদ্ধে সেই লড়াই আমাদের শিখিয়ে গেছে। বাঙালিদের মধ্যে অন্যায়-অপরাধের বিরুদ্ধে এই লড়াই করার মানসিক শক্তি থাকলে এ জাতি বিশ্বে মাথা তুলে দাঁড়াবেই-এ কথা আমি বিশ্বাস করি, আমার সন্তানদেরও সে কথা বলি।

( *সূত্র:*সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*)

# পরিশিষ্ট : ৬

**গুরুদাসপুর উপজেলায় গণহত্যায় শহীদদের তালিকা :**

গুরুদাসপুর উপজেলায় ১৯৭১ সালে এপ্রিল মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত প্রায় ১০০-১৫০ মানুষকে হত্যা করেছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও রাজাকার-আলবদর দালালরা। সঠিক সংখ্যা না জানা গেলেও সাক্ষাৎকার ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানা যায় বিয়াঘাট গ্রামে প্রায় ৫৭ জন বা তার অধিক, উত্তর নারিবাড়ী প্রায় ১৭ জন, পোয়ালশুড়া পাট পাড়ায় প্রায় ৬ জন, কাছিকাটা ও চাঁচকৈড় বাজারে প্রায় ৬ জনকে হত্যা করা হয়। পুরোপুরি সঠিক হিসাব জানা বা রাখা যুদ্ধময় পরিস্থিতিতে সম্ভব হয়নি।অনেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে এ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে। ফলে তাঁদের মধ্যে যাঁরা গণহত্যার শিকার হয়েছেন, তাদের পরিচয় জানা যায়নি সকল ক্ষেত্রে। এছাড়া এক এলাকা থেকে ধরে নিয়ে অন্য এলাকায় হত্যা করার ফলে সকলের পরিচয় জানা যায়নি। নির্যাতিত নারীরা লোকলজ্জা ও সামাজিকতার ভয়ে নির্যাতনের সেই ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে আনতে চান না। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, গুরুদাসপুর উপজেলা কমান্ড কার্যালয়, মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে যেসব তথ্য পাওয়া গিয়েছে, সেখানে সকলের পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় নি। তাঁদের ৫৮ জনের অসম্পূর্ণ  তালিকা উল্লেখ করা হল :

আব্দুল খালেক, রেকাতুল্লাহ, আব্দুস সাত্তার, অমর চন্দ্র কুন্ড, ডা. মহন্ত, সীতানাথ, শহীদ, সুবল, আব্দুর জব্বার(পিতাঃ আয়েন উল্লা সরকার), সাইফুল ইসলাম (সাইদুর) (পিতাঃ হাবিবর রহমান), আব্দুর রাজ্জাক (পিতাঃ আব্দুর রহমান), আজিজুল প্রাং (পিতাঃ পচা প্রাং), আব্দুল, আলিমুদ্দিন ব্যাপারী (পিতা:রুস্তম ব্যাপারী), সাজেদুর রহমান (পিতাঃ সাহেব উল্লা), দুখু মিয়া, কার্তিক শেখ (পিতাঃ ফজি প্রাং), হযরত আলী (পিতাঃ ওলি সরদার), লোকমান হোসেন (পিতাঃ মফিজ উদ্দিন), মোজাহার আলী (পিতাঃ কালু প্রাং), তছের আলী (পিতাঃ ছহির প্রাং), আরমান আলী (পিতাঃ কোরমান), নিতু প্রাং (পিতাঃ ওলি প্রাং), মজিবর রহমান (পিতাঃ কালু প্রাং), ওসমান গনি (পিতাঃ ওলি প্রাং), মগরব আলী (পিতাঃ লালমোহন শেখ), আশু মৃধা (পিতাঃ তুমির মৃধা), আলিমুদ্দিন, মজিবুর রহমান (পিতাঃ কালু প্রাং), নিয়মিত আলী (পিতাঃ সমতুল্লা প্রাং), যাদু মিয়া (পিতাঃ সমতুল্লা প্রাং), নিয়ামত আলী (পিতাঃ রহিম প্রাং), দুখাই সরদার (পিতাঃ অছিমুদ্দিন সরদার), মজের উদ্দিন প্রাং (পিতাঃ আকপদ আলী), আক্কাছ আলী (পিতাঃ কলিমুদ্দিন), নাছির উদ্দিন (নকছের) (পিতাঃ জেহের আলী), গোসাই পদ সরকার (পিতাঃ হৃদয় নাথ সরকার), তারাপদ সরকার (পিতাঃ কৃষ্টপদ), বানেশ্বর হালদার (পিতাঃ কোকন হালদার), দীনেশ চন্দ্র হালদার (পিতাঃ যোতিন্দ্রনাথ হালদার),মোবারক হোসেন (কালান্দর), কৃষ্টলাল কুন্ডু (গুরুদাসপুর বাজার), মহেন্দ্রনাথ নাগ (নাড়ীবাড়ি), বনি আমিন (মহারাজপুর), মকবুল হোসেন (পাথুরিয়া), আকসার আলী (আলীপুর), আবু সাঈদ (আলীপুর), বিমল কুণ্ডু (গুরুদাসপুর বাজার), অবনীভূষণ মিত্র (গুরুদাসপুর)। (অসম্পূর্ণ)

**গুরুদাসপুর উপজেলার গণহত্যায় শহীদ ও শহীদ পরিবার সমূহের পরিচয় :**

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য, প্রত্যক্ষদর্শী ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ,গুরুদাসপুর এবং বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যেসব শহীদদের পরিচয় জানা যায় তাদের পরিচয় উল্লেখ করা হলো :

**শহীদ আফাজ উদ্দিন :** পিতা:মৃত ছহির উদ্দিনের পুত্র আফাজ উদ্দিনের বাড়ি বিয়াঘাট গ্রামে। তিনি পেশায় কৃষক ছিলেন। দুই মেয়ে ও দুই ছেলে সহ স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন ভাই বাবা মার সাথে। হানাদার বাহিনী গুরুদাসপুর এলে স্ত্রীসহ দুই মেয়েকে এবং অন্যদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু তিনি পথে ধরা পড়েন হানাদার বাহিনীর হাতে। পরে তাঁর সাথে আরও প্রায় ৩২ জনকে ধরে নিয়ে যায় তাঁর বাড়ির উঠোনে। সেখানেই তাঁদের গুলি করে হত্যা করা হয়।

**শহীদ রিয়াজ উদ্দিন মুন্সী ও শহীদ  কায়েম উদ্দিন :** পিতা: মৃত বছির উদ্দিন। বিয়াঘাট গ্রামের রিয়াজ উদ্দিন দিনমজুর ছিলেন। দুই পুত্র ও তিন কন্যা, স্ত্রী সহ বাস করতেন। জুলাই মাসে বিয়াঘাট গ্রামে হানাদার বাহিনী আসে। সেসময় তিনি গ্রামের বাবলাতলা নামক স্থানে ধান কাটছিলেন। মিলিটারি এসেছে দেখে বাড়ির সকলকে সাবধান করতে তিনি বাড়িতে দৌড়ে আসেন। স্ত্রীকে বলেন, “আমার ছোট ছেলেকে দেখে রেখো। মিলিটারি এসেছে গ্রামে। আমি দেখে চলে আসবো।” এই বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসেছেন। পথে দেখেন বন্ধু কায়েম উদ্দিনকে হানাদার বাহিনী ধরেছে। বন্ধুকে বিপদে দেখে স্থির থাকতে পারেননি রিয়াজ উদ্দিন। তিনি হানাদার বাহিনীর কাছে গিয়ে বলেন, “আমরা ভাল, আমাদের ছেড়ে দেন।” কিন্তু হানাদাররা কায়েম উদ্দিন ও রিয়াজকে ধরে নিয়ে যায় ছহির উদ্দিনের বাড়ি। সেখানে ৩৩ জনের সাথে গুলি করে হত্যা করে। কায়েম উদ্দিন- পিতা: কালিমুদ্দিন প্রাং। কায়েম উদ্দিন কৃষিকাজ করতেন। চার ছেলে ও চার মেয়ে, স্ত্রী ও বাবা-মা সহ থাকতেন বিয়াঘাটে।

**শহীদ হাকিম উদ্দিন প্রামানিক :** হাকিম উদ্দিন এর বাড়ি বিয়াঘাট গ্রামে। পিতা: ফাদিল প্রাং। জুলাই মাসে হানাদার বাহিনী গ্রামে প্রবেশ করলে প্রতিবেশী শাখাওয়াত সাবধান করে যান হাকিম উদ্দিনকে। হাকিম উদ্দিন পরিবারের সকলকে পালাতে বলেন। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ও বড় কন্যা থেকে গেলেন। বড় কন্যার স্বামী আকতার উদ্দিন আহমেদ পাকিস্তানি সেনা ছিলেন। কোন কারণে পশ্চিম পাকিস্তানে আটকে পড়েছিলেন। ফলে হাকিম উদ্দিনের কন্যা তাঁর বাড়িতেই ছিলেন। হাকিম উদ্দিন কোথাও লুকাতে চেয়েছিলেন। কারণ হানাদাররা বাড়ির সব পুরুষদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিল বলে শুনেছেন। কিন্তু তাঁর আগে গবাদি-পশুটিকে নিরাপদ আশ্রয়ে রেখে যেতে চেয়েছিলেন। তাই গরুটিকে নিয়ে রাস্তায় বের হওয়ার সাথে সাথে হানাদাররা তাঁকে ধরে ফেলে এবং নিয়ে গিয়ে ছহির উদ্দিনের বাড়িতে ৩৩ জনের সাথে গুলি করে হত্যা করে। তাঁর বাড়িতে আক্রমণ করলে স্ত্রী ও কন্যা পাকিস্তানি সেনার পারিবার বলে সে যাত্রায় রক্ষা পেয়েছিলেন।

**শহীদ শ্রমিক গণ :** আসকান আলীর বাড়ি নারায়নপুর গ্রামে। পিতার নাম আফুস্য। আহম্মেদ আলী ফকিরের বাড়ি উত্তর নারিবাড়ী। পিতার নাম মছের ফকির। আসকান ও আহম্মেদ আলী মাটি কাটতে বিয়াঘাট গ্রামে এলে মাটি কাটার সময় হানাদার বাহিনী তাঁদের ধরে নিয়ে যায় ও হত্যা করে। উল্লেখ্য তাঁরা শ্রমিক ছিলেন। আরেকজন জদু শেখ। তাঁর বাড়ি হামলাই কোল গ্রামে। পিতার নাম হাসান আলী। তিনি শ্রমিক ছিলেন, হানাদাররা তাঁকেও ধরে নিয়ে আসকান, আহম্মেদ আলীর সাথে হত্যা করে।

**শহীদ কৃষক গণ :** মজের উদ্দিন প্রাং-এর বাড়ি পোয়ালশুড়া পাটপাড়ার বিন্যাবাড়ী গ্রামে। পিতার নাম আকপদ আলী। আক্কাজ আলীর বাড়ি পাটপাড়া গ্রামে। পিতার নাম কলিমুদ্দিন। নাছির উদ্দিন (নকছের) এর বাড়ি পাটপাড়া গ্রামে। পিতার নাম জেহের আলী। তাঁরা তিনজনই কৃষক ছিলেন। এবং মাঠে ধান কাটছিলেন।

জুলাই মাসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এলে তারা পাটপাড়ার কুটিবাড়ির নিকট বিলে লুকায়। হানাদাররা তাঁদের দেখে ফেলে এবং গুলি করে হত্যা করে। পরে স্থানীয়রা তাঁদের পোয়ালশুড়া পাটপাড়া গ্রামের গোরস্থানে কবরস্থ করে।

**শহীদ শীতানাথ হালদার ও শহীদ বলরাম হালদার :** শীতানাথ ও বলরামের বাড়ি উত্তর নারিবাড়ী। তাঁরা দুই ভাই। পিতার নাম হারান হালদার। শীতানাথ ব্যবসা করতেন এবং বলরাম মৎসজীবী ছিলেন। তাঁরা হঠাৎ শুনতে পান হানাদার বাহিনী এসেছে গ্রামে। এদিকে শীতানাথের স্ত্রী সাবিত্রী সরকার ৮ মাসের গর্ভবতী। তাই স্ত্রীকে এই অবস্থায় নিতে চাইলেন না। আর যেহেতু পুরুষদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তাই ভয় একটু কম। তাই স্ত্রীকে রেখেই বাড়ি থেকে বের হয়েছেন। নন্দকুজা নদীর পথ ধরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হানাদার বাহিনী তাঁকে ধরে ফেলে। বড় ভাই বয়স্ক বলরাম হালদার বাড়িতে ছিলেন সন্তানদের নিয়ে। যখন শুনলেন ছোট ভাই শীতানাথকে হানাদাররা ধরেছে নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। দৌড়ে গেলেন ভাইকে বাঁচাতে। তার তখন তাতে ধরে ফেলে হানাদার শীতানাথ ও বলরামকে ধরে নিয়ে আরো প্রায় ১৬-১৭ জনের সাথে লাইনে দাঁড় করে উত্তর নারিবাড়ীতে হত্যা করে ঘাতক হানাদাররা।

**শহীদ নীলরতন সরকার ও তাঁর পরিবার :** নীলরতনের বাড়ি উত্তর নারিবাড়ী গ্রামে। পিতার নাম মনিন্দ্রনাথ সরকার। নীলরতন নারায়ণপুর স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। মনিন্দ্রনাথ (পিতা: জ্ঞানেন্দ্রনাথ সরকার) ডাক্তার ছিলেন। নীলরতন প্রতিবেশীদের সাথে বাইরের ঘরে তাস খেলছিলেন। দুপুরবেলা হানাদার বাহিনী বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করে। তখন মনিন্দ্রনাথ দুপুরের খাবার খেতে রান্নাঘরে যাচ্ছিলেন। এমন সময় হানাদার বাহিনী বাড়ির মধ্যে ঢুকে তাঁকে ধরে। বাড়ির ভেতর চেঁচামেচি হচ্ছে শুনে নীলরতন বাহির ঘর থেকে ভেতরে আসে। তিনি তাঁর বাবাকে ছেড়ে দিতে বলেন। দুই পক্ষ একটু হাতাহাতি হয়। সেখানেই দু'জনকে গুলি করে হানাদাররা। পরে বাড়িঘর লুটপাট করে আগুন ধরিয়ে দেয়।

**নবরাম মজুমদার :** নবরামের বাড়ি উত্তর নারিবাড়ী। পিতার নাম বলরাম মজুমদার। তিনি দক্ষিণ নারিবাড়ী স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। নীলরতনদের বাড়িতে তাস খেলাছিলেন উত্তর নারিবাড়ীতে। হানাদাররা নীলরতন ও তাঁর পিতা মনিন্দ্রনাথকে হত্যা করলে নবরাম পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু হানাদাররা তাঁকেও গুলি করে হত্যা করে।

**শহীদ সুধীর চন্দ্র হালদার ও শহীদ সুবোধ চন্দ্র হালদার :** সুধীর চন্দ্র হালদারের বাড়ি উত্তর নারিবাড়ী। পিতার নাম  রামরূপ হালদার। সুধীর চন্দ্র বিড়ির ব্যবসা করতেন। সুধীরের পুত্র সুবোধ চন্দ্র পড়াশুনা করতেন। সুধীর চন্দ্র বাজারে গিয়েছিলেন। বাজার থেকে ফিরছিলেন নদীর পথ ধরে। পথে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তাঁকে ধরে ফেলে। সুধীর চন্দ্রের স্ত্রী সাবিত্রী হালদার স্বামী বাড়ি ফিরছেনা দেখে শঙ্কিত হয়ে আছেন। গ্রামে মিলিটারি ঢুকেছে। তাই মনে ভয় কাজ করছে। কিশোর ছেলে সুবোধ চন্দ্রকে বললেন বাবার খোঁজ নিতে। ভাবলেন কিশোর ছেলেকে হয়ত কিছু বলবে না। হানাদাররা। সুবোধ রাস্তায় বের হলে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সৈন্যরা তাঁকে তাড়া করে। তখন সুবোধ মায়ের কাছে ফিরে আসে। কিন্তু হানাদাররা তাঁর পিছু নেয়। মায়ের কাছ থেকে জোর করে টেনে নিয়ে যায় তাঁকে। তখন বারবার মায়ের দিকে করুণভাবে তাকাচ্ছিলেন।

মা সাবিত্রী হানাদারদের কাছে করুন আকুতি জানালেও তারা ছেড়ে দেয়নি। গুলি করে হত্যা করে সুধীর চন্দ্র ও তাঁর ছেলে সুবোধ চন্দ্রকে এপ্রিল মাসের ১৯ তারিখে।

**দীলিপ কুমার সরকার :** দীলিপ কুমারের বাড়ি উত্তর নারিবাড়ী গ্রামে। তাঁর পিতার নাম সুধির চন্দ্র সরকার। তিনি ইপিসিএস পাশ করে এসটিও-এর চাকুরী লাভ করেছিলেন। চাকরিতে যোগদান করার আর মাত্র তিনদিন বাকী। প্রতিবেশী নীলরতনের সাথে তাস খেলছিলেন। নীলরতনকে গুলি করছে দেখে তিনি পালাচ্ছিলেন নবরামের সাথে। কিন্তু হানাদার বাহিনী এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়তে লাগলে তাঁর শরীরেও গুলি লাগে। সেখানেই মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

**শহীদ সুরেশ চন্দ্র ও শহীদ মানিকচন্দ্র মালাকার :** সুরেশ চন্দ্রের বাড়ি উত্তর নারিবাড়ী। পিতার নাম জগবন্ধু মালাকার। সুরেশ চন্দ্রের ছেলে মানিক চন্দ্র মালাকার। সুরেশ চন্দ্র মালাকারের কাজ করতেন। মালিক চন্দ্র হামলাইকোল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তাঁরা  দু'জন বাড়িতেই ছিলেন। গুলির শব্দ শুনে বাইরে বের হয়ে আসেন। তখন হানাদাররা তাঁদের ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যদের সাথে হত্যা করে।

**বিষ্টপদ ঘোষ :** তাঁর বাড়ি উত্তর নারিবাড়ী গ্রামে। তিনি দই-ছানার ব্যবসা করতেন। দুই ছেলে, দুই মেয়ে ও স্ত্রী সহ বাড়িতেই ছিলেন। হানাদার বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে অন্যদের সাথে লাইনে দাঁড় করে গুলি করে হত্যা করে।

**যদুনাথ কর্মকার :** তাঁর বাড়ি  গুরুদাসপুরে কর্মকার পাড়ায়। পিতার নাম সুক চরণ কর্মকার। পাকিস্তানি বাহিনী দেখে মুক্তিকামী যদুনাথ 'জয় বাংলা' বলে শ্লোগান তোলে। তখন হানাদাররা তাঁকে গুলি করে হত্যা করে। তিনি হোমিও ডাক্তার ছিলেন।

**দুখু রাম হালদার :** তাঁর বাড়ি উত্তর নারিবাড়ী গ্রামে। পিতার নাম রামলাল হালদার। স্ত্রী সন্তান নিয়ে বাড়িতে ছিলেন। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এসেছে শুনে জঙ্গলে গিয়ে লুকালেন। কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্য তাঁকে দেখে ফেলে এবং ধরে নিয়ে হত্যা করে নারিবাড়ীতে।

**শহীদ দুলাল মালাকার ও শহীদ** গেদু **মালাকার :** তাঁদের বাড়ি উত্তর নারিবাড়ী এলাকায়। দুলাল মালাকারের পিতার নাম রবিন্দ্রনাথ মালাকার। তিনি মালাকারের কাজ করতেন। দুলালের কাকা গেদু মালাকারের পিতার নাম বিজয় চন্দ্র মালাকার। তাঁদের উভয়কেই বাড়ি থেকে টেনে বের করে আনে হানাদার বাহিনী। এরপর অন্যদের সাথে লাইনে দাঁড় করে গুলি করে হত্যা করে।

**শহীদ বাদল চৌধুরী :** তাঁর বাড়ি উত্তর নারিবাড়ী। পিতার নাম কোমদ নাথ চৌধুরী। স্ত্রীসহ বাড়িতে ছিলেন। হঠাৎ হানাদার বাহিনী বাড়িতে প্রবেশ করে তাঁকে ধরে বের করে আনে ও হত্যা করে।

**শহীদ অমর চন্দ্র কুন্ড :** তাঁর বাড়ি গুরুদাসপুরে। তিনি একজন বড় ব্যবসায়ী ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের লোক ছিলেন। পরিবারের সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে গিয়েছিল। অমর চন্দ্রও আশ্রয় নিয়ে ছিল একটি মুসলিম পরিবারে। কোন কাজে ছেলে অর্দ্ধেন্দু কুমার বাজারে যাচ্ছিলেন (২৩শে মে)। হঠাৎ রাস্তায় তাঁকে ধরে ফেলে হানাদাররা। অর্দ্ধেন্দুকে ধরে নিয়ে যায় কাছিকাটা বাজার কালি মন্দিরে। অর্দ্ধেন্দু কোন ক্রমে পালাতে সক্ষম

হয়। কিন্তু অমরচন্দ্র ছেলে অর্দ্ধেন্দু বাজারে হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়েছে শুনে বাজারে আসেন। তখন হানাদাররা অর্ধেন্দুর বাবা অমর চন্দ্র জানতে পেরে তাঁর উপর অত্যাচার করে। বেয়োনেট চার্জ করতে থাকার এক পর্যায়ে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

**শহীদ গোলাম রব্বানী রঞ্জু :** শহীদ রঞ্জু ৭ই মে ১৯৫০ সালে নাটোরের কানাইখালীতে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থায় তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৮ সালে নাটোর মহকুমা ছাত্রলীগের সহ-সম্পাদক ছিলেন। শহীদ রঞ্জুর পিতা মোঃ আব্দুর রশিদ এবং মাতা বেগম নুরুন নাহার। যুদ্ধকালে শহীদ রঞ্জু নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলেজের বি,কম ২য় বর্ষের ছাত্র ছিলেন। আত্মপ্রত্যয়ী শহীদ রঞ্জু 'যুব সংঘ' কানাইখালীর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

২৫শে মার্চ অভিশপ্ত রাতের পর দেশকে শত্রুমুক্ত করার দীপ্ত শপথ নিয়ে রঞ্জু হাতে অস্ত্র তুলে নেন। শহীদ রেজাসহ সহযোদ্ধাদের সঙ্গে বিভিন্ন খন্ড যুদ্ধে অংশ নেন। গুরুদাসপুর উপজেলার মশিন্দা গ্রামে রাত্রিযাপন কালে স্বাধীনতার শত্রু রাজাকারদের হাতে ধরা পড়েন। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭১, চাঁচকৈড় রাজাকার ক্যাম্পে চরম নির্যাতনের মুখে শহীদ হন রঞ্জু।

**শহীদ মুজিবুর রহমান (রেজা) :** বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা বলতে গেলে যাঁদের সংগ্রামী জীবনের কথা অবধারিতভাবে এসে যায়, তাদের মধ্যে শহীদ রেজা অন্যতম। পিতার নাম আবিদুর রহমান এবং মাতা মোছাঃ নাদিরা বেগম। তিনি ১ বৈশাখ ১৩৫৯ বাংলা সনে নাটোরের গাড়িয়াখানায় জন্মগ্রহণ করেন।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলেজে পড়াকালীন সময়ে ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। ১৯৬৯-এর গণ আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী শহীদ রেজা ছিলেন নাটোর মহকুমা ছাত্রলীগের সংগঠক। অসামান্য কর্মদক্ষতা এবং সাংগঠনিক কুশলতায় ১৯৭০-৭১ সালে তিনি নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কলেজের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী হন।

১৯৭১ এর মার্চ-এপ্রিল মাসে পাকিস্তানি বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য রাস্তায় ব্যারিকেড দেয়া এবং আহম্মদপুর সেতু ভেঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর গতিরোধ সহ বিভিন্ন খন্ডযুদ্ধে অংশ নেন। রাজাকাররা শহীদ রেজাকে চাঁচকৈড় রাজাকার ক্যাম্পে ধরে নিয়ে অমানুষিক নির্যাতন করে। এই বীর মুক্তিযোদ্ধা ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৭১ রাজাকারদের হাতে শহীদ হন।

**শহীদ রেকাতুল্লাহ ও শহীদ আব্দুস সাত্তার :** গুরুদাসপুরের বিলসা গ্রামে উভয়ের বাড়ি ছিল। তাঁরা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন। এই দুই মুক্তিযোদ্ধা অপারেশন চালানোর এক পর্যায়ে মশিন্দা ইউনিয়নের নাজিম উদ্দিনের বাড়ি আশ্রয় নিয়েছিলেন। রাজাকাররা সেখান থেকে তাঁদের ধরে নিয়ে হানাদারদের হাতে তুলে দেয়। ১৫ সেপ্টেম্বর চাঁচকৈড় বাজার নিকটস্থ নন্দকুজা নদীর ধারে হাত বেঁধে দু'জনকে গুলি করে হত্যা করে।

**শহীদ আব্দুল খালেক :** ১৯শে জুন ১৯৭১ উত্তর নাড়ীবাড়ির আব্দুল খালেককে হত্যা করে হানাদার বাহিনী। আব্দুল খালেকের ভাই সাইফুল ইসলাম মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়ে ছিলেন। ফলে তাঁদের পরিবারের উপর চাপ

প্রয়োগ করতে থাকে রাজাকার আবু দাউদ, আমজাদ হোসেন, আব্দুল কাশেম মোল্লা প্রমুখ। শেষে সাইফুলকে না পেয়ে তাঁর ছোট ভাই আব্দুল খালেককে ধরে নিয়ে যায় ও **১৯** জুন হত্যা করে।

## পরিশিষ্ট : ৭

**গুরদাসপুর উপজেলার ঘাতক দালালদের তালিকা :**

১৯৭১ সালে গুরুদাসপুর এ হত্যা, নির্যাতন, লুটপাট ও ধ্বংসযজ্ঞে পাকিস্তানি বাহিনীকে সাহায্য করেছিল রাজাকার, আলবদর, আলশামস ও শান্তি কমিটি।মাঠ পর্যায়ে সাক্ষাৎকার থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে গুরদাসপুরের ঘাতক দালালদের অসম্পূর্ণ তালিকা উল্লেখ করা হল :

তাহের উদ্দিন( পিতাঃ আব্দুল আজিজ), মোঃ আব্দুল্লাহ, (পিতাঃ জাবেদ আলী), মৃত মোঃ আমীর আলী,( পিতাঃ রাহেদ আলী), মৃত মোঃ বিশু (পিতাঃ লুৎফর রহমান), মৃত মোঃ আব্দুস সাত্তার,( পিতাঃ মোকসেদ আলী), মৃত মওলানা মোঃ ইসমাইল হোসেন ( পিতাঃ এলাহী বক্স), ছইম উদ্দিন,এছাড়াও মোবারক আলবদর কমান্ডার ছিলেন। কাশেম মাস্টার, খাজা মাস্টার প্রমুখ আলবদর কমিটির প্রধান সদস্যদের অন্যতম।

মূল ঘাতকদের মধ্যে এ এলাকার স্থানীয়দের মধ্যে যাঁদের পরিচয় জানা যায় তাঁরা হলেন :

১. মোস্তাজ বিহারী। তিনি হাবিব ব্যাংকের কর্মকর্তা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় নাটোর জেলার অন্যতম ঘাতক দালাল অবাঙালি হাফেজ আব্দুর রহমানের সহযোগী ছিলেন তিনি। গুরুদাসপুরের নারিবাড়ী গণহত্যা, সিংড়ার কলম গণহত্যায় তার ভূমিকা ছিল অন্যতম।
২. মওলানা মোঃ ইসহাক আলী, পিতাঃ দবির উদ্দিন হাজী। তিনি কমান্ডার ছিলেন। বিয়াঘাট গণহত্যায় তিনি জড়িত ছিলেন।
৩. আবু দাউদ রাজাকার ছিলেন। পিতাঃ আব্দুস সামাদ।
৪. এহসান আলী। পিতাঃ এলাহী বক্স। এহসান আলী রাজাকার কমান্ডার ছিলেন।
৫. ওছির উদ্দিন রাজাকার ছিলেন।
৬. আব্দুস সাত্তার। পিতা : মোকসেদ আলী।

উপরোক্ত কয়েকজন নাজিরপুর হাইস্কুলের হেডমাস্টার লুৎফর রহমানকে হত্যা করেন। পরে মুক্তিযোদ্ধারা এদের মধ্যে আবু দাউদ ছাড়া সকলকে হত্যা করে। দাউদ এখনও বেঁচে আছে।

**রাজাকার/ আল বদরদের তালিকা**

| ক্রমিক নং | ঘাতক-দালাদের নাম | পেশা | গ্রাম/ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১ | দাউদ হোসেন | ব্যবসায়ী | খামার চাঁচকৈড় |
| ২ | আবুল কালাম | ব্যবসায়ী | খামার চাঁচকৈড় |
| ৩ | কালাম হোসেন | কৃষক | খামার চাঁচকৈড় |
| ৪ | মোকা বিশ্বাস | কৃষক | খামার চাঁচকৈড় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৫ | শাহজাহান বিশ্বাস | কৃষক | খামার চাঁচকৈড় |
| ৬ | আমজাদ হোসেন | ব্যবসায়ী | চাঁচকৈড় |
| ৭ | নেফাজউল্লাহ্ | ব্যবসায়ী | গুরুদাসপুর |
| ৮ | আবু দাউদ | কৃষক | গুরুদাসপুর |
| ৯ | আব্দুল হালিম | ব্যবসায়ী | গুরুদাসপুর |
| ১০ | রফিকুল ইসলাম | ব্যবসায়ী | গুরুদাসপুর |
| ১১ | মমতাজ বিহারি (অবাঙালি) | ব্যাংক কর্মচারী | গুরুদাসপুর |
| ১২ | সামশুল হক মাস্টার | শিক্ষক | ঘাঁসমারি |
| ১৩ | ওমর আলী | কৃষক | ঘাঁসমারি |
| ১৪ | তোফাজ্জল হোসেন | কৃষক | ঘাঁসমারি |
| ১৫ | হবিবুর রহমান | কৃষক | ঘাঁসমারি |
| ১৬ | আব্দুস সাত্তার | কৃষক | ঘাঁসমারি |
| ১৭ | সামশুল ইসলাম | কৃষক | মর্শিদা |
| ১৮ | আবুল কাশেম | কৃষক | জুমাইনগর |
| ১৯ | দেদার হোসেন | কৃষক | ঝাউপাড়া |
| ২০ | আব্দুল জলিল | কৃষক | ঝাউপাড়া |
| ২১ | ছমির প্রমাণিক | কৃষক | মহারাজপুর |
| ২২ | দাউদ আলী | কৃষক | মহারাজপুর |
| ২৩ | নাজির উদ্দিন | কৃষক | মহারাজপুর |
| ২৪ | মৌলভী মতিউর রহমান | ইমাম (লুটেরা ও খুনি) | জ্ঞানদানগর |
| ২৫ | শাহজাহান আলী | কৃষক | যোগেন্দ্রনগর |
| ২৬ | ভাদু হাজি | কৃষক | খুবজিপুর |

( *সূত্র:*সুজিত সরকার, নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস)

**শান্তিকমিটির দালালদের তালিকা**

| ক্রমিক নং | দালালের নাম | পেশা | গ্রাম/ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ০১ | আলহাজ্ব আব্দুল জলিল | ব্যবসায়ী দালাল শ্রেষ্ঠ | গুরুদাসপুর |
| ০২ | আবুল কাশেম মোল্লা | প্রধান শিক্ষক, চাঁচকৈড় উচ্চ | চাঁচকৈড় |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | বিদ্যালয় দালাল শিরোমনি | |
| ০৩ | ইয়ার উদ্দিন মিয়া | কৃষক লুটেরা | চাঁচকৈড় |
| ০৪ | আলহাজ্ব আমির হোসেন | ব্যবসায়ী ও কৃষক লুটেরা | গুরুদাসপুর |
| ০৫ | আবুল কাশেম মেম্বর | কৃষক লুটেরা | গুরুদাসপুর |
| ০৬ | সলেমান আলী | কৃষক | গুরুদাসপুর |
| ০৭ | মকছেদ আলী | কৃষক | গুরুদাসপুর |
| ০৮ | তারা; পিতা-ওয়াজেদ আলী | কুখ্যাত খুনি, দালাল ও লুটেরা | গুরুদাসপুর |
| ০৯ | আখেজ উদ্দিন | কৃষক | রানিগ্রাম |
| ১০ | দেল মোহাম্মদ | কৃষক | ঘাঁসমারি |
| ১১ | মকছেদ আলী | কৃষক | হামলাইকোল |
| ১২ | মেহের আলী বিশ্বাস | ব্যবসায়ী | চাঁচকৈড় কাচারিপাড়া |
| ১৩ | মফিজ উদ্দিন | কৃষক | দক্ষিণ নাড়ীবাড়ি |
| ১৪ | আব্দুর রাজ্জাক | ব্যবসায়ী | গুরুদাসপুর |
| ১৫ | চাঁন্দু মোল্লা | কৃষক | শিকারপুর |
| ১৬ | আমির হোসেন | গ্রাম্য চিকিৎসক | গুরুদাসপুর |
| ১৭ | আবুল কাশেম | শিক্ষক খুনি ও লুটেরা | আরাবারিষা |
| ১৮ | মৌলানা ইসহাক আলী | মাদ্রাসা শিক্ষক লুটেরা ও খুনি | মহারাজপুর |
| ১৯ | শরিফ উদ্দিন প্রামানিক | কৃষক | যোগেন্দ্রনগর |
| ২০ | আজিজ মাস্টার | শিক্ষক | ডবলসা |
| ২১ | মতিউর রহমান (মতি ডাকাত নামে পরিচিত) | ডাকাতি ও খুন-লুট | ধামাইজ |

( *সূত্র:* সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*)

# পরিশিষ্ট : ৮

## সিংড়া উপজেলায় গণহত্যায় শহীদদের তালিকা :

নাটোর থেকে আব্দুল করিম রাজাকারের পরামর্শে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী সিংড়া উপজেলায় প্রবেশ করে। আলবদর, আলশামস, শান্তি কমিটির রাজাকার সদস্যরা মিলিতভাবে হানাদারদের সাথে হত্যাকান্ড চালায় কলম, হাতিয়ানদহ, লারকিমারী বিল, সিংড়া বাজার, উত্তর দমদমা, আত্রাই, কতুয়াবাড়ী, লালোর প্রভৃতি স্থানে। নারী ধর্ষণ, লুটপাট, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগও করে তারা। অনেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে এ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে। ফলে তাঁদের মধ্যে যাঁরা গণহত্যার শিকার হয়েছেন, তাদের পরিচয় জানা যায়নি সকল ক্ষেত্রে। এছাড়া এক এলাকা থেকে ধরে নিয়ে অন্য এলাকায় হত্যা করার ফলে সকলের পরিচয় জানা যায়নি। নির্যাতিত নারীরা লোকলজ্জা ও সামাজিকতার ভয়ে নির্যাতনের সেই ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে আনতে চান না। এরকম পরিস্থিতিতে সকলের পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি বা মনে রাখা সম্ভব হয়নি প্রত্যক্ষদর্শীদের সকলের পক্ষে।ফলে শহীদদের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ সম্ভব হয়নি সকল ক্ষেত্রে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দেয়া তথ্য, সিংড়া মুক্তিযোদ্ধা সংসদ ও বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শহীদদের নামের৩৮ জনের অসম্পূর্ণ তালিকা উল্লেখ করা হলযাদের পরিচয়সম্পর্কে জানা যায় নি :

ইন্দু শেখর চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ সাহা, নিয়োতী রাণী, সুরেন্দ্র নাথ সাহা, পালানচন্দ্র দাস, বাদামওয়ালা , অজ্ঞাত ২ জন, অনিমেষ পাল, অধর বিশ্বাস, তোরাব আলী, আবুল কাশেম, মোজ্জেম হোসেন, আজিজুল প্রাং, কাতেব আলী, নূরা, মতিলাল কাঁসারি, ধর্ম কাঁসারি, খাদেম আলী, হরেরাম সাহা, বঙ্কু বিহারী সাহা, রণজিৎ সাহা, নিমাই পাল, বলরাম পাল, গোবিন্দ প্রাং, আশুতোষ শীল, অমল কুমার সরকার, হরেন মাষ্টার, মফিজ সরদার, ক্ষিতিষ নাপিত, শ্যামলকান্তি ধর, সুনীল সূত্রধর, বিষ্ণুপদ দত্ত, হরিপদ দত্ত , নির্মল সান্যাল, দুইশত অজ্ঞাত পরিচয়ধারী, ভূপেন্দ্রনাথ মজুমদার।

## সিংড়া উপজেলার গণহত্যায় শহীদ ও শহীদ পরিবার সমূহের পরিচয় :

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য, প্রত্যক্ষদর্শী ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ,নাটোর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যেসব শহীদদের পরিচয় জানা যায় তাদের পরিচয় উল্লেখ করা হলো :

**রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী :** উত্তর দমদমার বাসিন্দা রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি দমদমা উচ্চবিদ্যালয়ের সংস্কৃতের শিক্ষক ছিলেন। সমাজসেবক ছিলেন। ১৯৭১ সালে এপ্রিল মে মাসের মাঝামাঝি সময় স্বাধীনতা বিরোধীরা চাকু ও হাসুয়া দিয়ে তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করে।

**চয়েন উদ্দিন মোল্লা :** সিংড়া থানার বালুয়া বাসুয়া নামক স্থানে তাঁর বাড়ি ছিল। তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। ছাত্রলীগ করতেন। তাঁর ভাই মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছিলেন এবং আওয়ামী লীগ সমর্থক ছিলেন বলে ১৮ এপ্রিল সিংড়া বাজার থেকে ধরে নিয়ে গিয়ে ১৯ এপ্রিল নাটোর পাকিস্তানি বাহিনীর মাধ্যমে হত্যা করে সিংড়া থানা পুলিশ।

**আশুতোষ মৈত্র :** লালোর ইউনিয়নের ডাঙা পাড়া গ্রামের আশুতোষ মৈত্র। পিতার নাম কৈলাশ মৈত্র। পাকিস্তানি বাহিনী কলমে এসেছে শুনে জঙ্গলে গিয়ে লুকায়। কিন্তু তামাক খাওয়ার জন্য বাড়িতে এলে রাজাকার চাঁদ ও মণ্ডলার সহায়তার পাকিস্তানি বাহিনী তাঁকে বাড়িতে গুলি করে হত্যা করে। তিনি কৃষিকাজ করতেন।

**আব্দুল হামিদ ও তাঁর ভাই আবুল কালাম আজাদ :** কলম ইউনিয়নের কদমতলীর কুমারপাড়া গ্রামে তাঁদের বাড়ি। পিতার নাম মুন্সী ইসলাম উদ্দিন। আব্দুল হামিদ কৃষিকাজ করতেন। তাঁর ভাই আবুল কালামও কৃষিকাজ করতেন। নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন আব্দুল হামিদ। তাঁকে সেখান থেকে ধরে আনে। বাড়িতে লুটপাট করছিল রাজাকাররা। বাধা দিতে গেলে আবুল কালামকে ধরে। তারপর ৭ জনকে একসাথে লাইনে দাঁড় করে গুলি করে হত্যা করে।

**আব্দুল আজিজ :** কদমতলী কলমের বাসিন্দা আব্দুল আজিজ। পিতার নাম আব্দুর রহমান। আব্দুল আজিজ দর্জির কাজ করতেন। পাশাপাশি ব্যবসা করতেন। ক্ষেত্রে কর্মরত কৃষকদের (কমলা) খাবার দিতে যাবার পথে পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন ও ঐ গ্রামের ৭জনের সাথে হত্যা করে।

**আব্দুল করিম:** সিরাজগঞ্জের চৌহালী গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল করিম। তিনি কৃষি কাজ করতেন। শ্বশুর বাড়ি কলমের কদমতলী গ্রামে বেড়াতে গিয়েছিলেন। হানাদার বাহিনী এলে তাঁকেও ধরে ও হত্যা করে।

**আব্দুল হালিম :**কদমতলী কলমের বাসিন্দা তিনি। তাঁর পিতার নাম আব্দুর রহমান। দশম শ্রেণীতে পড়তেন। মিলিটারি এলে রাস্তায় ছিলেন মহিষের গাড়িতে লুকিয়ে তাঁকেও ৭জনের সাথে লাইনে। পালানোর সুযোগ পাননি। দাঁড় করায় মাইটালের পাশে। গুলি লেগে অনেক আহতাবস্থায় তাঁর বাবা ঘরে নিয়ে আসেন। রক্ত ধুয়ে দিলেও যন্ত্রণাতো রয়েই গেল। তখন হালিম তাঁর পিতাকে বলেন, 'আমাকে আরেক ছোড়া মারেক বাপ, জান বারাক'। মাগরিবের সময় মারা যান। কলম হাইস্কুলে পড়তেন।

**বিশু শেখ :** কদমতলী গ্রামের বিশু কৃষিকাজ করতেন। গুলির শব্দ শুনে আব্দুর রহমানের বাড়িতে ধানের গোলায় লুকিয়েছিল দরজা আড়াল করে। রাজাকাররা দেখতে পেয়ে তাঁকে বের করে আনে ও লাইনে দাড় করে ৮ই মে গুলি করে হত্যা করে ।

**শশধর প্রাং :** হাতিয়ানদহ গ্রামের অধিবাসী শশধর। পিতার নাম বন্য প্রাং। গ্রামে হানাদার বাহিনী এলে জঙ্গলে লুকিয়েছিলেন। তখন হানাদার বাহিনীর অবিরাম গুলিতে পরিবার থেকে আলাদা হয়ে যান। ঘাতকরা তাঁকে ধরে লাইনে দাঁড় করে ২২ জনের সাথে। গুলি করে হত্যা করে তাঁকে।

**হরিদাস রায়:** পূর্ব বাড়ি নাটোরের রায় হালসায় ছিল। পরে বড় ভাই বলরামের কাছে হাতিয়ানদহে বাড়ি করেন। পিতার নাম সুরেন্দ্র নাথ রায়। হানাদার বাহিনী তাঁকেও বগুড়া পাড়া গ্রামে গুলি করে হত্যা করে।

**শহীদ বলরাম চন্দ্র কুন্ডু ও তাঁর পরিবার :** হাতিয়ানদহে বাড়ি ছিল বলরাম চন্দ্রের। পূর্ব নিবাস রায় হালসায়। ব্যবসার সুবিধার্থে হাতিয়ানদহে আসেন। পিতার নাম মহেশ চন্দ্র কুন্ডু। তাঁর বাড়িতে নাটোর থেকে অনেক মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। দালালরা জানতে পেরে বাড়িতে আক্রমণ করে। তখন বলরাম চন্দ্র, তাঁর ভাই

হরিদাস, ব্রাহ্মণ শশাঙ্ক শেখর চক্রবর্তী ও বলরামের পুত্র বিনয় কৃষ্ণকে লাইনে এনে দাঁড় করায়। শশাঙ্ক অন্ধ বলে তাঁকে ছেড়ে দেন। বিনয়কৃষ্ণ আহত হয়ে অজ্ঞান হয়েছিলেন। বলরাম ও হরিদাস ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান।

**ইন্দু শেখর চক্রবর্তী :** হাতিয়ানদহে থাকতেন। পুরোহিত ছিলেন। পিতার নাম সুধাংশু শেখর চক্রবর্তী। তাঁকেও জঙ্গল থেকে ধরে এনে লাইনে দাঁড় করে হত্যা করে।

**শশী ভূষণ মিস্ত্রী :** পিতার নাম ষষ্টিচরণ মিস্ত্রী। হাতিয়ানদহে তাঁর বাড়ি ছিল। তাঁকেও জঙ্গল থেকে লুকিয়ে থাকা অবস্থায় ধরে পাকিস্তানি বাহিনী ও হত্যা করে।

**ভোলানাথ কর্মকার:** তাঁর বাড়ি হাতিয়ানদহে। পিতার নাম যদুনাথ কর্মকার। লোহার কাজ করতেন। পরিবারের সবাইকে লুকিয়ে নিজেও লুকিয়ে ছিলেন। গুলির শব্দ শুনে ছেলে বিজয় বের হয়ে পিতার কাছে আসেন। ঘাতকরা টের পেয়ে যায় ও ভোলানাথকে ধরে অত্যাচার করে। এরপর বাবা ও ছেলেকে ধরে লাইনে দাঁড় করায়। গুলি করা শুরু হলে পিতা ভোলানাথ ছেলে বিজয়কে জাপটে ধরে রাখে যেন ছেলের শরীরে গুলি না লাগে।

নিজের শরীরে গুলি লাগার পরও তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোর গুলি লাগেনি"। ছেলে বলে না" এদিকে গুলি লাগার কয়েক মিনিটের মধ্যেই মারা যান ভোলানাথ কর্মকার।

**গোকুল চন্দ্র প্রামাণিক :** হাতিয়ানদহের বাসিন্দা গোকুল কৃষিকাজ করতেন। পিতার নাম নিতাই চন্দ্র প্রামাণিক। গুলির শব্দ শুনে জঙ্গলে লুকিয়েও প্রাণ বাঁচাতে পারেননি।

**নরেশ কুন্ডু :** ঈশ্বরদী বাড়ি ছিল নরেশ কুন্ডের। পিতার নাম নগেন্দ্র নাথ কুন্ডু। গান বাজনা করত। ইন্দু শেখরকে ওস্তাদ মানত। বোনের বাড়ি হাতিয়ানদহে এসে থাকতেন নরেশ। ইন্দু শেখরের সাথে তাঁকেও গুলি করে হত্যা করে হানাদার বাহিনী।

**মাদার দাস :** পিতার নাম বৈদ্যনাথ দাস। হাতিয়ানদরে মাদার দাস ডাব ব্যবসায়ী ছিলেন। গুলির শব্দ শুনে জঙ্গলে লুকিয়েছিল। পেটে গুলি করে ও লাঠি পেটা করেছিল হানাদাররা। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন। পরে বাড়ি নিয়ে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারা হয়।

**পাঁচু বাদ্যকর :** সাঁঐল বাড়ি ছিল পাঁচু বাদ্যকরের। পিতার নাম সুবোল বাদ্যকর। ঢুলী ছিলেন পাঁচু। জঙ্গলে লুকানো অবস্থায় ছিলেন। পরে লাইনে দাঁড় করে হত্যা করে ঘাতক দালালরা।

**শশধর প্রাং :** হাতিয়াদহে বাড়ি ছিল তাঁর। পিতার নাম বন্য প্রাং। আওয়ামী লীগের সদস্য শশধর সরকার মনে করে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে এসে গুলি করে হত্যা করে।

**বিশ্বনাথ দাস :** পিতার নাম বিপদ দাস। হাতিয়ানদহে কৃষিকাজ করতেন। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকলে সেখান থেকে ধরে হত্যা করে।

**সুনীল চন্দ্র :** হাতিয়ানদহে বাড়ি। তাঁকেও গুলি করে হত্যা করে।

**রতিকান্ত সাহা :** পিতার নাম মদনমোহন সাহা। হাতিয়ানদহে বাড়ি ছিল। পড়াশুনা করতেন। মিলিটারি এলে বাড়িতে লুকিয়েছিলেন। রাস্তায় পাকিস্তানি সৈন্যরা একটি যুবতী মেয়েকে ধরে। সেটা দেখে সহ্য করতে না পেরে মেয়েটিকে বাঁচাতে রতিকান্ত বের হয়ে আসেন। তখন তাকে পেটাতে পেটাতে দীঘলগ্রাম গামী রোডে এনে হত্যা করে।

**রথীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য :** পিতার নাম চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। হাতিয়ান্দহে বাড়ি। তাঁকেও লুকিয়ে থাকা অবস্থায় গুলি করে। পরে তাঁকে চিকিৎসার জন্য লালোর ইউনিয়নের মটগ্রামে নিয়ে যাওয়া হলে ভোর রাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে। সেখানেই তাঁকে মাটি চাপা দিয়ে সমাধি দেয়া হয়।

**সুরেশ সাহা :** নাটোর শহরে বাড়ি সুরেশ সাহার। চালের ব্যবসা করতেন। নাটোরে মিলিটারি এলে হাতিয়ানদহে এসে লুকায়। সেখানেও তাঁকে ধরে ও হত্যা করে হানাদাররা।

**হারান চন্দ্র প্রাং :** পিতার নাম নবীন প্রাং। হাতিয়ানদহের দীঘল গ্রামে বাড়ি ছিল। মেয়ে বিয়ে দিয়েছিলেন হাতিয়ানদহে। মেয়ের বাড়িতে আসার পথে শীতলী তলায় মেশিন গানের গুলি লেগে মারা যান। তিনি কৃষক ছিলেন।

**শশী প্রামাণিক :** রাজমিস্ত্রী ছিলেন। মিলিটারি চলে গিয়েছে ভেবে বাজারের দিকে যাচ্ছিলেন। পথে দীঘল গ্রাম রোডে গুলি করে হত্যা করে হানাদার বাহিনী।

এছাড়াও অনিমেষ পাল, অধর বিশ্বাস, পালানচন্দ্র দাস, কৃষ্ণকান্ত সরকারের কন্যা নিয়োতা রাণীকে বাদামওয়ালা ও দু'জন অজ্ঞাত পরিচয়ধারীকে হত্যা করে হাতিয়ানদহে।

## পরিশিষ্ট : ৯

### সিংড়া উপজেলায় '৭১ সালে ঘাতক দালাল :

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ,সিংড়া উপজেলা কমান্ড কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের রাজাকারের তালিকা (যাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা যায় ) ঃ

| ক্রমিক নং | রাজাকারের নাম | পিতা | গ্রাম | ইউনিয়ন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | মোঃ রমজান আলী | তাহাজ উদ্দিন | ভুলবাড়ীয়া | ছাতারদিঘী |
| ২ | মোঃ ভরসা | কোকা শাহ | একলাছপুর | ঐ |
| ৩ | মোঃ আঃ রশিদ | রহমান আলী | করচমারিয়া | ঐ |
| ৪ | মোঃ ওসমান ফকির | রমজান ফকির | সোয়াইড় | রাঃ খাজুরা |
| ৫ | মোঃ মজিবর রহমান | ময়েজ প্রাং | সোয়াইড় | ঐ |
| ৬ | মোঃ গোলাম ফারুক (ফটিক) | মোবারক হোসেন | চৌগ্রাম | চৌগ্রাম |
| ৭ | মোঃ আজাহার আলী | মানিক প্রাং | বেলোয়া | সুকাশ |
| ৮ | নূর মোহাম্মদ | মুছা মন্ডল | আগমুরশন | ঐ |
| ৯ | মোহাম্মদ আলী | ছলিমুদ্দিন | কচুয়া | ঐ |
| ১০ | মোঃ আফসার আলী | সোবাহানআলী | মৌগ্রাম | ঐ |
| ১১ | মোঃ জোনাব আলী | ছাপা মেম্বর | নিশ্চিতপুর | ঐ |
| ১২ | মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | ইয়ার উদ্দিন | কালিনগর | ঐ |
| ১৩ | মোঃ ময়েজ উদ্দিন | মল্লিক | কালিনগর | কলম |
| ১৪ | নুর মোহাম্মদ | নজির উদ্দিন | কালিনগর | ঐ |
| ১৫ | মোহাম্মদ আলী সর্দার | আহম্মদআলী | নজরপুর | ঐ |
| ১৬ | মোঃ আফতাব শেখ | সোবাহান শেখ | পারসা ঐল | ঐ |
| ১৭ | মোঃ এরশাদ | খায়ের সর্দার | উত্তর দমদমা | সিংড়া পৌরসভা |
| ১৮ | মোঃ শুকুর আলী | বলি ফকির | বালু ভরা | ঐ |
| ১৯ | দবির উদ্দিন | ঝমুর | উত্তর ঢাকঢোর | লালোর |
| ২০ | মকছেদ আলী | হারান আলী | হামির ঘোষ | ঐ |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (শান্তিকমিটির নেতা) | | | |
| ২১ | মোঃ  কালাম | কফিল উদ্দিন | কংশপুর | শেরকোল |
| ২২ | মোঃ আব্বাস | আজগর আলী | পমগ্রাম | ঐ |
| ২৩ | মোঃ যাদু | জহির মোল্লা | সিধাখালী | ঐ |
| ২৪ | মোঃ বদর উদ্দিন | সাধু প্রাং | হামিরঘোষ | লালোর |
| ২৫ | মোঃ আবুল হোসেন | হারান কাসারী | হামির ঘোষ | ঐ |
| ২৬ | মোঃ  হানিফ আলী | ফকির চাঁন | বারইহাটি | ঐ |
| ২৭ | মোঃ নুরুল ইসলাম | আমজাদ হাজী | বারইহাটি | ঐ |

(অসম্পূর্ণ) (সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ,সিংড়া উপজেলা কমান্ড)

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সিংড়া উপজেলা কমান্ড কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের সিংড়া শান্তি কমিটির সদস্যদের নামের তালিকা :

| ক্রমিক নং | রাজাকারের নাম | পদবী | গ্রাম |
|---|---|---|---|
| ১ | ফজলুর রহমান | চেয়ারম্যান | ছোট চৌগ্রাম |
| ২ | আবুল কাশেম মিয়া | ভাইস চেয়ারম্যান | জোড়মল্লিকা |
| ৩ | আজাহার আলী | ভাইস চেয়ারম্যান | সাতপুকুরিয়া |
| ৪ | হাজী মোঃ মকসেদ আলী | ভাইস চেয়ারম্যান | হামিরঘোষ |
| ৫ | আব্দুল জলিল মিয়া | সেক্রেটারী | হাঁসপুকুরিয়া |
| ৬ | রওশন আলী | সদস্য | বামিহাল |
| ৭ | শামসুল ইসলাম খান | সদস্য | কালিগঞ্জ |
| ৮ | করিম শেখ | সদস্য | কলম |
| ৯ | রিয়াজ শেখ | সদস্য | বাহাদুরপুর |
| ১০ | মোঃ আব্দুল খালেক | সদস্য | পারসাঁঐল |
| ১১ | বরজাহান আলী বিশ্বাস | সদস্য | ঊড়বাড়ী |
| ১২ | কফিল উদ্দিন মিয়া | সদস্য | শেরকোল |
| ১৩ | মফিজ উদ্দিন | সদস্য | ধুলাউড়ি |
| ১৪ | ডাঃ মোঃ আফিজ উদ্দিন | সদস্য | দমদমা |
| ১৫ | মোহাম্মদ আলী ধুনকর | সদস্য | সিংড়া বাজার |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৬ | মফিদুল ইসলাম | সদস্য | ছোটচৌগ্রাম |
| ১৭ | ডাঃ আব্দুল গফুর | সদস্য | ঊড়িয়া |
| ১৮ | আব্দুল হামিদ রিফুজি | সদস্য | কালিগঞ্জ বাজার |
| ১৯ | মোজাম্মেল হক | সদস্য | ঘরনী |
| ২০ | ময়েজ উদ্দিন মেম্বার | সদস্য | সোয়াইড় |
| ২১ | আব্দুর রহমান | সদস্য | সোয়াইড় |
| ২২ | কেফাতুল্লাহ মেম্বার | সদস্য | নিংগইন |
| ২৩ | খালেক মৌলভী | সদস্য | সোয়াইড় |

(অসম্পূর্ণ)(সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ,সিংড়া উপজেলা কমান্ড)

**রাজাকার, আলবদর যাঁদের পরিচয় জানা যায় :**

সিংড়া থানাতে **১৯৭১** সালে এপ্রিলে পাকিস্তানি বাহিনী প্রবেশ করলে তাদের সহযোগিতা করার জন্য সৃষ্টি হয় রাজাকার, আলবদর আলশামস বাহিনীর। মূল ঘাতকদের মধ্যে ছিলেন নাটোরের হাফেজ আব্দুর রহমান যিনি বিভিন্ন সময় সিংড়া উপজেলায় ঘাতক দালালদের পরামর্শ, সাহায্য করতেন। তবে এ এলাকার স্থানীয়দের মধ্যে যাঁদের পরিচয় জানা যায় তাঁরা হলেন :

১. **মোঃ মজিবর রহমান :** পিতা- ময়েজ প্রাং। তার বাড়ি সোয়াইড় গ্রামে। কলম ইউনিয়নে হত্যা, ধ্বংস, লুটপাটে জড়িত ছিল।
২. **রাজাকার আব্দুল করিম :** সেও কলম গ্রামে মজিবরের সাথে ছিল।
৩. **মোঃ বদর উদ্দিন :** পিতা- সাধু প্রাং। হামিরঘোষ এলাকার বদর সিংড়া থানায় ধ্বংস, হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত ছিল।
৪. **ফজলার রহমান :** নাটোর জেলার অন্যতম মুসলিম লীগ নেতা ছিলেন সিংড়ার ছোটচৌগ্রামের ফজলার রহমান। সিংড়ায় শান্তিকমিটি গঠিত হয়েছিলো তার নেতৃত্বে। রাজাকার বাহিনীও তারই পরামর্শে সিংড়ায় গঠিত হয়েছিলো। তার সঙ্গে জেলা পর্যায়ের স্বাধীনতা বিরোধী নেতাদের নিবিড় সম্পর্ক এবং যোগাযোগ ছিলো। নাটোর শহরের স্বাধীনতা বিরোধী অনেক নেতাদের থেকে তার সাংগঠনিক যোগ্যতা ছিলো বেশি। তার পরামর্শে নাটোর মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। স্বাধীনতার পূর্বে তিনি চৌগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভালো ইংরেজি জানতেন। যতোদূর জানা যায়, তিনি অধিকাংশ সভায় ইংরেজিতে বক্তব্য দিতেন। এ ছাড়া, আইয়ুব খান ও ফাতেমা জিন্নাহ্‌র নির্বাচনে তিনি আইয়ুব খানের পক্ষাবলম্বন করার সুবাদে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁর সঙ্গে হানাদার বাহিনীর সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। শুধু সিংড়া নয়, নাটোর জেলায় স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতা তার নেতৃত্বেই পরিচালিত হতো। সুতরাং সিংড়ার স্বাধীনতা বিরোধীদের পুরোধা ছিলেন এই ফজলার রহমান-এ কথা যাঁরা সাক্ষাৎকার

দিয়েছেন তাঁরা সবাই এক বাক্যে বলেছেন। ফজলার রহমান অবশ্য শান্তিকমিটির অন্যান্য সদস্যর তুলনায় সাধারণ মানুষের উপকার করেছেন। তার উপস্থিতিতে কিংবা নির্দেশে কাউকে হত্যা বা কারো ঘরবাড়ি লুট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়নি বলেও অনেকে বলেছেন। তিনি অনেক সংখ্যালঘুকেও সহযোগিতা করেছেন। অ্যাডভোকেট কৃষ্ণ কমল দত্ত তার আশ্রয়ে থেকে আত্মরক্ষা করেন। এ রকম অনেকেই তার সাহায্য পেয়ে ধনে-প্রাণে রক্ষা পেয়েছেন। এ কথা অস্বীকার করলে ইতিহাসের তথ্য বিভ্রান্তির দায় নিতে হবে। অনেক শান্তিকমিটির সদস্য এবং রাজাকার (আল বদর নয়) গোপনে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। এমন কি, নিজের বাড়িতে পর্যন্ত আশ্রয় এবং নানা তথ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রেখেছেন। সিংড়া থানার মুক্তিযোদ্ধা ও আওয়ামী লীগ নেতা শাহজাহান আলী , মুক্তিযোদ্ধা সায়বর আলী এক সাক্ষাৎকারে এ তথ্য দিয়েছিলেন। তবে তিনি মনে-প্রাণে পাকিস্তানের অখণ্ডতার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন। সে কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার লক্ষ্যে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। কাউকে হত্যা কিংবা কারো ঘর-বাড়ি লুটপাট ও পুড়িয়ে দিয়ে সে লক্ষ্য পূরণে তিনি সাধ্য মতো বিরোধিতা করেছেন। শান্তি কমিটির নেতা হয়েও তিনি ছিলেন মানুষের পক্ষে।

এছাড়াও ছিল ভুলবাড়িয়ার তাহাজ উদ্দিনের ছেলে মোঃ রমজান আলী, চৌগ্রামের মোঃ গোলাম ফারুক, পারসাঁঐল গ্রামের মোঃ আফতাব শেখ (পিতা- আহম্মদ আলী) প্রমুখ।

**রাজাকার/ আল বদরদের তালিকা**

| ক্রমিক নং | নাম | পেশা | গ্রাম/ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১ | আব্দুল করিম | কৃষক, খুনি, লুটেরা, ধর্ষক | বড় শাঁওইল |
| ২ | সেরাজ হক | কৃষক | কলম |
| ৩ | আমজাদ হোসেন | কৃষক | আলম |
| ৪ | আব্দুল আজিজ | কৃষক | বড় শাঁওইল |
| ৫ | আব্দুল হামিদ | কৃষক | ছোট চৌগাম |
| ৬ | গিয়াস উদ্দিন | কৃষক | ঊরিয়া |
| ৭ | আব্দুল খালেক | কৃষক | বড় শাঁওইল |
| ৮ | আবুল হোসেন | কৃষক | সাত পুকুরিয়া |
| ৯ | তায়েব উদ্দিন | কৃষক | কদমা |
| ১০ | ছয়ফুর রহমান | কৃষক | ঊাঁশবাড়িয়া |
| ১১ | আব্দুল মান্নান | কৃষক | ঊাঁশবাড়িয়া |
| ১২ | কাছের আলী | কৃষক | ধামাইজ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৩ | ইসহাক আলী | কৃষক | ধামাইজ |
| ১৪ | আব্দুল জলিল | কৃষক | ধামাইজ |
| ১৫ | শামসুল হক | কৃষক | ধামাইজ |
| ১৬ | দেলোয়ার হোসেন দেলু | কৃষক | ধামাইজ |
| ১৭ | ফজলাল হক | কৃষক | আগতিরাইল |
| ১৮ | আকবর খাঁ | কৃষক | আগতিরাইল |
| ১৯ | আকবর মণ্ডল | কৃষক | হিজলা |
| ২০ | মজিবর রহমান | কৃষক | বনকুঁড়ি |
| ২১ | তাজুল ইসলাম | কৃষক | ঢাকঢোল |
| ২২ | ময়েজ উদ্দিন | কৃষক | সোয়াইর |
| ২৩ | ওসমান আলী | কৃষক | সোয়াইর |
| ২৪ | মবের আলী | কৃষক | ভোগা |
| ২৫ | ফটিক উদ্দিন | কৃষক | কদমা |
| ২৬ | বাচ্চু | কৃষক | ছোট চৌগ্রাম |
| ২৭ | অধ্যাপক নওজেশ আলী | কৃষক | চৌগ্রাম |
| ২৮ | আশরাফ আলী | কৃষক | খাজুরা |
| ২৯ | রহমতুল্লাহ | কৃষক | ডলহুলিয়া |
| ৩০ | এরশাদ আলী | কৃষক | ইন্দ্রাসন |
| ৩১ | আসকান আলী | কৃষক | ইন্দ্রাসন |
| ৩২ | আক্কাস আলী | কৃষক | ইন্দ্রাসন |
| ৩৩ | আমজাদ হোসেন | কৃষক | ইন্দ্রাসন |
| ৩৪ | আব্দুর রাজ্জাক | কৃষক | তাহিয়া |
| ৩৫ | মো. ফটিক আলী | কৃষক | চৌগ্রাম |
| ৩৬ | আফসার আলী | কৃষক | চৌগ্রাম |
| ৩৭ | আব্দুল আজিজ | কৃষক | চৌগ্রাম |
| ৩৮ | আব্দুর রাজ্জাক | কৃষক | চৌগ্রাম |
| ৩৯ | ওসমান গণি | কৃষক | চৌগ্রাম |
| ৪০ | পচা মীর | কৃষক | চৌগ্রাম |

( *সূত্র:*সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*)

# পরিশিষ্ট : ১০

## বড়াইগ্রাম উপজেলায় গণহত্যায় শহীদদের তালিকা :

বড়াইগ্রাম উপজেলাতেও আলবদর-আলশামস-রাজাকার প্রভৃতি দালালদের সহযোগিতায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী গণহত্যা ও নির্যাতন সহ বিভিন্ন মানবতাবিরোধী কর্মকান্ড চালিয়েছিল ১৯৭১ সালে। তারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন স্থানে বহু মানুষকে হত্যা করেছে। এ উপজেলার প্রায় ১০০-১৫০ মানুষকে হত্যা করেছে হানাদাররা। অধ্যাপক সুজিত সরকারের *'নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস' গ্রন্থে* পারকোল, ধানাইদহ, নটাবাড়িয়া কালির ঘুন, বনপাড়া মিশন ও অন্যান্য গণহত্যা মিলে প্রায় ৭২ জনের নাম উল্লেখ করেছেন। সুকুমার বিশ্বাস *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর* গ্রন্থে শুধুমাত্র বনপাড়া মিশন গণহত্যার কথা উল্লেখ করেছেন।অনেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে এ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে। ফলে তাঁদের মধ্যে যাঁরা গণহত্যার শিকার হয়েছেন, তাদের পরিচয় জানা যায়নি সকল ক্ষেত্রে। এছাড়া এক এলাকা থেকে ধরে নিয়ে অন্য এলাকায় হত্যা করার ফলে সকলের পরিচয় জানা যায়নি। নির্যাতিত নারীরা লোকলজ্জা ও সামাজিকতার ভয়ে নির্যাতনের সেই ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে আনতে চান না। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বড়াইগ্রাম উপজেলা কমান্ড কার্যালয়, মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য এবং সুজিত সরকারের গ্রন্থ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে শহীদদের বড়াইগ্রাম উপজেলার শহীদদের ৭৫ জনের অসম্পূর্ণ তালিকা  উল্লেখ করা হল যাদের পরিচয় সম্পর্কে জানা যায় নি :

বৈষ্টমি (স্বামীঃ বিজয় শীল), ছলিম শাহ, লছিম উদ্দিন (পিতাঃ মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার), ইছারুদ্দিন (পিতাঃ মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সাত্তার),আব্দুর রাজ্জাক (পিতাঃ লছিম উদ্দিন), আব্দুর রহমান (পিতাঃ শুকলাল মিয়া), জামাত আলি (পিতাঃ বয়েন উদ্দিন),  রহিমুদ্দিন (পিতাঃ ছাইদুর রহমান), আছানত বিবি (স্বামী-শাহ চাঁদ), শাহচাঁদ (পিতাঃ লাল চান), জাগাদ্দিন , খেয়াল (পিতাঃ কাদের প্রামানিক,  বিল্টু বিশ্বাস (পিতাঃ গৌরচন্দ্র বিশ্বাস), দুলাল বিশ্বাস (পিতাঃ হরিপদ বিশ্বাস), আজহার মালিহা (পিতাঃ জসিম উদ্দিন মালিহা), জাফর উদ্দিন, আছির উদ্দিন সরকার (পিতাঃ নূর মোহাম্মদ সরকার), মজনু মিয়া (পিতাঃ রাখের আলি), কাঁলাচাদ, রমজান আীল (পিতাঃ ওবাদ আলী), কেরামত আলী (পিতাঃ খাদেম আলী), রাশেদা বিবি (স্বামীঃ কেরামত আলী), হালিমা বেগম, আক্তার আলি, লবিন প্রামাণিক, আব্দুল হক (পিতাঃ কসিম উদ্দিন), মাহির উদ্দিন, রাহাতন বিবি (স্বামীঃ আছান উদ্দিন), নছিম উদ্দিন,আনসার আলী পিয়ার,সিরাজুল ইসলাম,দুলাল, বিল্টু , সুশীল পাল, বিশ্বনাথ চাকী, অধীরচন্দ্র সাহা, আন্তন বিশ্বাস, অনিল পিউরিফিকেশন, ইমরান আলী (গ্রাম সভাপতি, আওয়ামী লীগ), শাহ্জাহান আলী, আফাজ উদ্দিন, ফকির উদ্দিন মোল্লা, নারায়ণ পালের পুত্র, যতীন্দ্রনাথ পাল, পঞ্চানন দত্ত, রথীকান্ত দাস, হরেন্দ্রনাথ দাস, অধীর চন্দ্র সাহা , পঞ্চানন মিয়া, অনন্ত মাঝি, ইমান আলী, জামাত খামারু (পিতাঃ বয়েন উদ্দিন), জাগাদ্দিন, রহিমুদ্দিন, খেয়ালা প্রাং (পিতাঃ কাদের প্রাং), আছানত বিবি, মজনু , রাহাতন বিবি, নজের আলী, ফকির উদ্দিন মোল্লা, খোদা বক্স (পিতাঃ আছের উদ্দিন), হাসেন আলী (পিতাঃ সাহেব উল্লা), রহমান প্রাং (পিতাঃ সুখলাল প্রাং),জব উদ্দিন (পিতাঃ আলু প্রাং), শুকুর ধারা (পিতাঃ শ্রী কৃষ্ণ), ঝফির প্রাং (পিতাঃ কফির প্রাং), ইনু (পিতাঃ বাকের আলী), ওছির উদ্দিন, নাজিম উদ্দিন (পিতাঃ জসিম উদ্দিন), আজাহার আলী (পিতাঃ জসিম মালিথা), শাহাতন

খাতুন (স্বামী শাহ চান), ইছার উদ্দিন, নবিন প্রাং (পিতাঃ ইনাত প্রাং), হালিমা খাতুন (স্বামী খাদম আলী), রাহাতুন খাতুন (পিতা:জজে আহসান)। (অসম্পূর্ণ)

**বড়াইগ্রাম উপজেলার গণহত্যায় শহীদ ও শহীদ পরিবার সমূহের পরিচয় :**

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য, প্রত্যক্ষদর্শী ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ,নাটোর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যেসব শহীদদের পরিচয় জানা যায় তাদের পরিচয় উল্লেখ করা হলো :

**শহীদ ছবির উদ্দিন সরকার ও তাঁর পরিবার : ১৯৭১** সালে **১১** এপ্রিল নগর ইউনিয়নের পারকোল গ্রামে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী আক্রমণ করে এবং নিরীহ বহু মানুষকে হত্যা করে। তাঁদের শিকারে পড়ে ছবির উদ্দিন ও তাঁর পরিবারের প্রায় **১০-১১** জন মানুষ প্রাণ হারায়। পিতাঃ আজিম সরকার। ছবির উদ্দিন সরকার ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী, কন্যা, সহ আরও আত্মীয় স্বজন প্রাণ হারান। তাঁরা হলেন :

১.গোলাপী (ছবির উদ্দিনের স্ত্রী), ২. জালেমা খাতুন (ছবির উদ্দিনের কন্যা), ৩. মাজেদ আলী (পিতাঃ বাদশা মিয়া) (বোনের ছেলে, কৃষিকাজ করতেন), ৪. শুকুর আলী (ছবির উদ্দিনের ভাই, কৃষক ছিলেন), ৫. জান মোহাম্মদ (শুকুর আলীর ছেলে), ৬. জয়নব বিবি (স্বামীঃ মজিরুদ্দিন মিয়া) (ছবিরের ভাবী), ৭. জাহাঙ্গীর আলম (পিতাঃ মজিরুদ্দিন মিয়া) (ছবিরের ৪ বছরের ভ্রাতৃস্পুত্র),৮. ইলিম শাহ, ৯. আছের উদ্দিন (পিতাঃ আন্তুল সরকার), ১০. বেগুনী (স্বামী-আজিম উদ্দিন সরকার)(ছবির উদ্দিনের মা), ১১. রঙ্গলাল এবং ১২. ছবির উদ্দিন নিজে শহীদ হন। উল্লেখ্য ছবির উদ্দিনের আরেক ভ্রাতৃস্পত্র কানু সরকার আহত হন।

**মাজেদ আলী :** মামা ছবির উদ্দিনের বাড়ি থাকতেন। তিনি কৃষিকাজ করতেন। পিতার নাম বাদশা মিয়া।

**আছের উদ্দিন :** হানাদার বাহিনী এলে তিনি সকলকে সাবধান করেন যারা লুকিয়েছিল পাশের জঙ্গলে। বলেন, ‘তোরা উঠিস নারে, গুলি করে মেরে দিবে’। কিন্তু তিনি নিজেই গুলি লেগে প্রাণ হারান।

**মনোরঞ্জন শীল :** পিতাঃ মাখনচন্দ্র শীল। মনোরঞ্জন নাপিত ছিলেন। বাড়ির সবাই নিরাপদ আশ্রয়ে গেলেও তিনি যাননি। জানালার কাছে বসেছিলেন, হানাদার বাহিনী তাঁর বাড়িতে ঢুকে গুলি করে হত্যা করে।

**শহীদ সাজদার রহমান ও তাঁর পরিবার :** সাজদার রহমান ছবির উদ্দিনের আত্মীয় ছিলেন। তাঁর ছেলে শাহাদাৎ হোসেন মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ভারতে প্রশিক্ষণরত ছিলেন সে সময়। পারকোল আক্রমণ করলে হানাদার বাহিনী হাতে সাজদার রহমান সহ পরিবারের ৬ জন সদস্য প্রাণ হারান।

১.সাজদার রহমান, ২. আদরী খাতুন (সাজদার এর স্ত্রী), ৩. আনজেরা (সাজদার এর কন্যা), ৪.আসিয়া (সাজদার এর কন্যা), ৫.আবু তালেব (পিতাঃ আহাদ আলী)(আনজেরার পুত্র) এবং ৬.আছের উদ্দিন (সাজদার এর নাতি)।

**শহীদ ইয়াদ আলী :** শহীদ ইয়াদ আলীর বাড়ি দোগাছি গ্রামে। পিতা আব্দুল কাদের প্রামাণিক। **১৯৬৭** সালে জি.আর.পিতে যোগ দেন। **১৯৭১** সালে হাবিলদার পদে পদোন্নতি পেয়ে লালমনিরহাট বিভাগীয় রেলওয়ে অফিসে যোগদান করেন। সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দ্বারা উৎসাহিত হন ও যুবকদের প্রশিক্ষণ দেন। যুদ্ধ

শুরু হলে স্ত্রী-সন্তানদের নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠালেও নিজে বাড়িতেই থেকে যান। অবাঙালি খুনিরা তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যা করে।

**শহীদ মুক্তিযোদ্ধা আব্বাস আলী :** বড়াইগ্রাম থানার দোগাছি গ্রামে দুর্লভ মন্ডলের পুত্র। তিনি পাবনা এডওয়ার্ড থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করেন। প্রথমে চাঁদপুর নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক ও পরে পাঁচবাড়িয়া উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। ভারতে গিয়ে প্রশিক্ষণ নেন ও মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধ করেন। ২২ জুলাই তাঁকে লালপুর থানা থেকে ধরে নিয়ে যায় নাটোর সদর ক্যাম্পে। জানা যায় সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

**শহীদ আব্দুল আজিজ :** বড়াই গ্রাম থানার কুজাইল গ্রামে আব্দুল আজিজের জন্ম। পিতার নাম বেলাল উদ্দিন প্রামানিক। ঈশ্বরদী কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে মেরী গাছা উচ্চবিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন এবং তার পূর্বে নানাভাবে সাহায্য করেছেন স্বাধীনতা সংগ্রামে। লালপুর থেকে তাঁকেও নাটোর ক্যাম্পে নিয়ে যায় ও হত্যা করে। মৃতদেহ স্বজনেরা পাননি।

**শহীদ আবু রায়হান :** বড়াই গ্রাম থানার মেরীগাছা গ্রামে শহীদ আবু রায়হান জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম উমেদ আলী। নাটোর কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন। লালপুর থানা থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যায় নাটোর ক্যাম্পে। আর ফিরে আসেনি। ধারণা করা হয় সেখানেই তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

**শহীদ শাহাদাৎ হোসেন :** বড়াইগ্রামের ঢুলিয়া গ্রামে ১৯৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজাউল্লাহ। ভালো খেলোয়ার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। ঢুলিয়ার আব্দুল জব্বার মন্ডলের বাড়িতে আশ্রিত থাকাকালীন ঘাতক দালালরা হানাদার বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করে। ঘটনাস্থলেই গুলিবিদ্ধ হয়ে তিনি মারা যান।

**শহীদ আমজাদ হোসেন :** বড়াইগ্রাম থানার নগর ইউনিয়নের থানাইখাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম আজমত আলী প্রামাণিক। মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ঘাতক-দালালরা স্বাধীনতা যুদ্ধের পর হত্যা করে।

## পরিশিষ্ট : ১১

**বড়াইগ্রাম উপজেলায় ১৯৭১ সালে ঘাতক-দালাল রাজাকার :**

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বড়াইগ্রাম উপজেলা কর্মান্ড কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের রাজাকার, আলবদর, আলসামস্ ও মুজাহিদদের নামের তালিকা উল্লেখ করা হল (যাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা যায় ) :

| ক্রমিক নং | নাম | পিতা | গ্রাম | ইউনিয়ন | অপরাধের বিবরণ |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | মোঃ হাবিবুর রহমান | গাদু প্রাং | কুমরুল | জোয়াড়ী | রাজাকার কমান্ডারের সহযোগীতায় সম্পূর্ণ অপরাধমূলক কাজসংঘটিত হয়। |
| ২ | মোঃ আঃ রহিম | নঈম উদ্দীন | কৈডিমা | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৩ | মোঃ খাইরুল ইসলাম | মোহাম্মদ আলী | কৈডিমা | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৪ | মোঃ নুরু | আন্তল | আহম্মেদপুর | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৫ | মোঃ আব্দুল আলী | দরবেশ আলী | আহম্মেদপুর | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৬ | মোঃ ইমাজ উদ্দীন | আঃ রশিদ মন্ডল | কুমরুল | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৭ | মোঃ ইউসুফ আলী | আহসান মন্ডল | কুমরুল | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৮ | মোঃ মুসা | ময়লাল শেখ | কুমরুল | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৯ | মোঃ আসমত আলী | ওসমান | কুমরুল | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১০ | মোঃ খলিল উদ্দীন | ডুমন সরদার | রামাগাড়ি | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১১ | কেচি | ইব্রাহিম | রামাগাড়ি | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১২ | মোফিজ উদ্দীন | হজরত প্রাং | কাছুটিয়া | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১৩ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | ইয়াছিন আলী | জোয়াড়ী | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৪ | মোঃ ফজি | আইন আলী | ঋবানীপুর | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১৫ | আমির হোসেন | - | জোয়াড়ী | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১৬ | মজনু | নবীর মোল্লা | ঋবানীপুর | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১৭ | পুকাড়ি | সুটকা প্রং | ঋবানীপুর | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১৮ | হাশেম আলী | কছের আলী | ঋবানীপুর | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১৯ | মজনুসাহা | পিয়ার সাহা | চক বড়াইগ্রাম | বড়াইগ্রাম | মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে চরম অত্যাচারী ও ঘাতক রাজাকার |
| ২০ | এন্নাফ | ওমর ফকির | চক বড়াইগ্রাম | - | ঘাতক রাজাকার |
| ২১ | লখাই | যোগী | ওয়না | - | ” |
| ২২ | লিয়াকত আলী | সবর উদ্দিন | ভরট | - | ” |
| ২৩ | নরু সিয়া | ছোলামউদ্দিন | বড়াইগ্রাম | - | ” |
| ২৪ | আ: বাতেন | বারু ফকির | বড়াইগ্রাম | - | ” |
| ২৫ | খোকা | কাশেম ভাদুরী | মৌখড়া | - | ” |
| ২৬ | মকবুল হোসেন | এনাত খলিফা | মৌখড়া | - | ” |
| ২৭ | বেলাল হোসেন | মুনছের আলী | ডবষ্ণুপুর | - | ” |
| ২৮ | কফি | আঃ কুদ্দস | ওয়না | - | ” |
| ২৯ | মিয়ার উদ্দিন | কুড়াইলা | ওয়না | - | ” |
| ৩০ | সামসুল | মেঘাই | লক্ষীকোল | - | ” |
| ৩১ | বাজু প্রাং | আজিম উদ্দিন | বড়াইগ্রাম | - | ” |
| ৩২ | মফিজ উদ্দিন | ছায়েদ আলী | বড়াইগ্রাম | - | ” |
| ৩৩ | কাজিম উদ্দিন | ছোবহান ফকির | লক্ষীকোল | - | ” |
| ৩৪ | মোঃ আয়েছ আলী | ফতে আলী | ওয়না | - | ” |
| ৩৫ | মান্নান শেখ | এবাদ উল্লাহ | ওয়না | - | ” |
| ৩৬ | মোঃ হিরা | কুদ্দুছ মৌলিক | চৌমহন | জোয়াড়ী | রাজাকার |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | কমান্ডার |
| ৩৭ | হেদায়েতুল (ফরহাদ) | বুজুর আলী | চরগোবিন্দপুর | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৩৮ | মোঃ রবিউল | হাইদার আলী | চৌমহন | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৩৯ | মোঃ ঈমান শেখ | কসির শেখ | চৌমহন | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৪০ | মোঃ এবাদ | ফয়জাল | চৌমহন | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৪১ | আবদু ছাত্তার | ইব্রাহিম | চৌমহন | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৪২ | মোঃ মজিবুর রহমান | আয়েজ উদ্দীন | চৌমহন | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৪৩ | মোঃ তফিজ উদ্দীন | রবেবছ | চৌমহন | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৪৪ | মোঃ আবুল | হায়াতুল্লা | চৌমহন | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৪৫ | চাঁন মোহাম্মদ | রুস্তম আলী | চৌমহন | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৪৬ | আবু জাফর | ওহমান | চৌমহন | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৪৭ | সুক চান্দ | আলেক চাঁদ | চৌমহন | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৪৮ | নুরুল ইসলাম | আহম্মদ আলী | সড়াবাড়ীয়া | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৪৯ | কালাম উদ্দীন সরকার | মনির উদ্দীন | সড়াবাড়ীয়া | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৫০ | সুন উদ্দীন শেখ | নুরুদ্দীন মেখ | চৌমহন | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৫১ | হামিদ | তাহের | চৌমহন | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৫২ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | আহাদ আলী | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৫৩ | মোঃ আজগর আলী | বাহার উদ্দিন | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৫৪ | মোঃ নুরুল ইসলাম | ইচা হক আলী | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৫৫ | মোঃ তৈয়ব উদ্দিন | সাদেক আলী | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৫৬ | মোঃ নুরুল ইসলাম | মোত্তালেব | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৫৬ | মোঃ আজগর আলী | গেদু প্রাং | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৫৭ | মোঃ আঃ মান্নান | বাকেসর প্রাং | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৫৮ | মোঃ আবুল কাশেম | তারণ প্রাং | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৫৯ | আঃ রাজ্জাক | মোফিজ উদ্দিন | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৬০ | জাকারিয়া | কলিম উদ্দিন | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৬১ | মোঃ আঃ হালিম | হাতেম আলী | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৬২ | মোঃ আনছার আলী | আবেদ আলী | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৬৩ | মোঃ আব্দুল জব্বার | মজা মৃধা | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৬৪ | কলিমুদ্দিন | মোজাফ্ফরহোসেন | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৬৫ | মোঃ আঃ বারেক | বাকেবার আলী | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৬৬ | মোঃ আওছান আলী | প্রাণ বক্স | ধানাইদহ | নগর | সাধারণ রাজাকার |
| ৬৭ | মোঃ খোরশেদ আলী | বন্দি মন্ডল | নগর | নগর | সাধারণ রাজাকার |
| ৬৮ | মোঃ আবেদ আলী | পর্বত মন্ডল | নগর | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৬৯ | মোঃ নূরে আলম | মতলেব ফকির | মেরীগাছা | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৭০ | মোঃ সামছুজ্জোহা | আল হামুদ বিশ্বাস | নগর | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৭১ | মোঃ আঃ ওয়াহেদ | গেদু মন্ডল | নগর | নগর | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৭২ | মোঃ আবু বক্কার | তোফিজ প্রাং | থানাইখাড়া | নগর | ঘাতক |
| ৭৩ | মোঃ আজমত আলী | খোকা বিশ্বাস | নগর | নগর | সাধারণ |
| ৭৪ | মোঃ আঃ আওয়াদ | চেরু প্রাং | নগর | নগর | ঘাতক |
| ৭৫ | মোঃ বাবু | শামছুদ্দিন | ধানাইদহ | নগর | স্পেশাল রাজাকার (ঘাতক) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৭৬ | মোঃ মোয়াজ্জেম খাঁ | হাফেজ মহিউদ্দিন | ধানাইদহ | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৭৭ | মোঃ আঃ সাত্তার | সাজদার প্রাং | ধানাইদহ | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৭৮ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | ভাদ্রি ফকির | ধানাইদহ | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৭৯ | মোঃ তজিম উদ্দিন | আহম্মদ সরদার | ধানাইদহ | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৮০ | আঃ মতিন | পচা মন্ডল | কয়ান | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৮১ | মোঃ কোমর উদ্দিন | খায়ের সরকার | কয়ান | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৮২ | মোঃ আঃ মজিদ | ময়েজ উদ্দিন | কয়ান | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৮৩ | মোঃ মুনতাজ | ময়েজ প্রাং | কয়ান | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৮৪ | আঃ সাত্তার | ময়েজুদ্দিন | কয়ান | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৮৫ | মোঃ আঃ করিম | জামাল প্রাং | কয়ান | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৮৬ | তুফান | আনছার আলী | কয়ান | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৮৭ | মোঃ আমজাদ হোসেন | আরজান প্রাং | কয়ান | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৮৮ | তুফান আলী | পচা | কয়ান | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৮৯ | মোঃ সরোয়ার | আবুল সরকার | কৃষ্ণপুর | চান্দাই | ঘাতক রাজাকার |
| ৯০ | মোঃ মজাহার আলী | হবু মন্ডল | নগর | নগর | ঘাতক রাজাকার |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ৯১ | মোজাফফর আলী | হাফেজ মহি উদ্দিন | ধানইদহ | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৯২ | মোঃ তোসলেম উদ্দিন | হাতেম | জামাইদিঘি | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৯৩ | মোয়াল্লেম হোসেন | হাফেজ মহি উদ্দিন | ধানাইদহ | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৯৪ | মোঃ ইয়াছিন | প্রান বক্স | ধানাইদহ | নগর | ঘাতক রাজাকার |
| ৯৫ | মোঃ আঃ রশিদ | মুনা হালদার | ঊনপাড়া | মাঝগাঁও | রাজাকার কমান্ডার |
| ৯৬ | মোঃ খবির উদ্দীন | কবি প্রাং | তিরাইল | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৯৭ | মোঃ আঃ লতিফ | মতিন মোল্লা | ঊনপাড়া | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৯৮ | মোঃ আতাউজ্জামান | হাইদার আল | ঊনপাড়া | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ৯৯ | মোঃ আমিন উদ্দীন | আসরাফ আলী | ঊনপাড়া | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১০০ | মোঃ মুনা | আসরাফ আলী | ঊনপাড়া | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১০১ | মোঃ শেখা | মতিন চকিদার | ঊনপাড়া | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১০২ | মোঃ নবীউল্ল্যাহ | আলী আরজান | চরনোটবাড়ী | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১০৩ | মোঃ রেকাত উল্ল্যাহ | রকিবুল্লা | ঊনপাড়া | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১০৪ | মোঃ আঃ রব | খলিল | ঊনপাড়া | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১০৫ | মোঃ আঃ রহমান | নইর উদ্দীন | গুনাইহাটি | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১০৬ | আঃ জব্বার | চুনু | গুনাইহাটি | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১০৭ | কালু মোল্লা | চিনু মোল্লা | ছাতিয়ানগাছা | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১০৮ | মোঃ আঃ রাজ্জাক কাজি | হারান কাজি | হারোয়া | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১০৯ | মোঃ খলিলুর রহমান | নংগুর | তিরাইল | ” | দুর্ধর্ষ রাজাকার |
| ১১০ | ইদ্রিচ আলী মিয়া | নুরু মিয়া | গোপালপুর | গোপালপুর | ভারতে |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | আত্মগোপন রত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তারা বহু লুটপাটের সাথে জড়িত ছিল। |
| ১১১ | নওশের আলী মিয়া | নুরু মিয়া | গোপালপুর | গোপালপুর | ভারতে আত্মগোপন রত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তারা বহু লুটপাটের সাথে জড়িত ছিল। |
| ১১২ | মোঃ সোহরাব হোসেন | আমিন উদ্দিন | পূর্ণ কলস | গোপালপুর | লুটপাটের সাথে জড়িত ছিল। |
| ১১৩ | মোঃ হযরত আলী | দরবার আলী | পূর্ণ কলস | গোপালপুর | সাধারণ রাজাকার। |
| ১১৪ | মোঃ নূর মহাম্মদ | দেলওয়ার হোসেন খান | পূর্ণ কলস | গোপালপুর | বর্তমানে সকলে জামাতে ইসলামের সাথে জড়িত। |
| ১১৫ | আবু বক্কার সিদ্দিক | বেলায়েত হোসেন | গড়মাটি | গোপালপুর | এ সকল প্রকার হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ কাজে জড়িত ছিল। |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ১১৬ | মোঃ আব্দুর রহমান | সৈয়দ আলী | পূর্ণকলস (রাজাপুর) | গোপালপুর | বর্তমান অবস্থা ভাল। |
| ১১৭ | আরশেদ আলী | খোরশেদ আলী | নওগ্রাম | গোপালপুর | যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধার হাতে নিহত হয়। |
| ১১৮ | নুর মোহাম্মদ | অলি মোহাম্মদ | ডশবপুর | গোপালপুর | লুটপাটে জড়িত ছিল। |
| ১১৯ | মোঃ তৌহিদ মিয়া (বিহারি) | মিরখান মিয়া | গোপালপুর | গোপালপুর | সকল অপকর্মের সাথে জিড়ত ছিল। |
| ১২০ | তুফানি (বিহারী) | জগত বিহারী | গোপালপুর | গোপালপুর | দুর্ধর্ষ রাজাকার। লুটপাটে জড়িত ছিল। বর্তমানে সে খুলনায় বাস করে। |
| ১২১ | মোঃ রজব আলী | আজির উদ্দিন | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | হত্যাকারী আলবদর। হত্যা করেছে বীর মুক্তিযোদ্ধা আক্কাছ আলী, পিতা: আজাহার আলী, গ্রাম : দিয়ার |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | গাড়ফা। |
| ১২২ | মোঃ মমতাজ উদ্দিন | মইর উদ্দিন | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১২৩ | ছানোয়ার | ডাঃ সুজাব আলী | রাজেন্দ্রপুর | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১২৪ | সুলতান মাহমুদ | ছয়াতুল্যা মোল্লা | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১২৫ | তজু ফকির | ময়েজ ফকির | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১২৬ | আরশেদ আলী | ছয়না প্রাং | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১২৭ | মুনু মিয়া | আজের প্রাং | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১২৮ | গন্ধ প্রাং | গঞ্জের আলী | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১২৯ | মোঃ মোহন প্রাং | কেফাত প্রাং | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৩০ | মোঃ আফছার প্রাং | অলি প্রাং | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৩১ | ফয়জা প্রাং | ময়জা প্রাং | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৩২ | মোঃ মসলেম প্রাং | ময়জা প্রাং | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৩৩ | আমজাদ | ইফাজ উদ্দিন | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৩৪ | ভাদু মোল্লা | মইর উদ্দিন মোল্লা | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৩৫ | মোঃ আলতাব মোল্লা | মইর উদ্দিন মোল্লা | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৩৬ | মোঃ কফির প্রাং | হুরমুজ প্রাং | দিয়ার | চান্দাই | সাধারণ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | গাড়ফা | | রাজাকার |
| ১৩৭ | সোহরাব প্রাং | ছাবেদ প্রাং | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৩৮ | আঃ সাত্তার | তাজের উদ্দিন | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৩৯ | মোঃ আফছার | হায়দার প্রাং | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৪০ | মোঃ ইয়ার আলী | কবির প্রাং | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৪১ | মোঃ আঃ জলিল প্রাং | কবির প্রাং | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৪২ | আঃ কাশেম | মোজাহার বিঃ | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৪৩ | মোঃ ফজলুল হক | জবান আলী | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৪৪ | মোঃ আঃ কুদ্দুস | ইসমাইল | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৪৫ | মোঃ মুনসুর আলী | জয়না মোল্লা | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৪৬ | বেলায়েত মোল্লা | জয়নাল মোল্লা | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৪৭ | মোঃ ময়নাল | আঃ জব্বার | দাশ-গ্রাম | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৪৮ | মোঃ আঃ সালাম | রইশ উদ্দিন | দাশ-গ্রাম | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৪৯ | মোঃ আঃ সাত্তার | আঃ বশীদ | দাশ-গ্রাম | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৫০ | মোঃ নূর মোহাম্মদ | আহাদ আলী | দাশ-গ্রাম | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৫১ | মোঃ নূর | হারান আলী | দাশ-গ্রাম | চান্দাই | সাধারণ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | রাজাকার |
| ১৫২ | মোঃ ইসাহাক | জোনাব আলী | দাশ-গ্রাম | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৫৩ | মোঃ ইদ্রিশ আলী | দেলবর | দাশ-গ্রাম | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৫৪ | রেকাত প্রাং | রিফাত প্রাং | দাশ-গ্রাম | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৫৫ | মোঃ আজিজুল প্রাং | মুনছের প্রাং | দাশ-গ্রাম | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৫৬ | মোঃ আঃ রাজ্জাক | মজির উদ্দিন | দাশ-গ্রাম | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৫৭ | মোঃ আবু বকর সিদ্দিক | কেফাত উল্লা | রাজেন্দপুর | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৫৮ | মোঃআতাউর রহমান | দেরাজ প্রাং | রাজেন্দপুর | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৫৯ | মোঃ সরোয়ার সরকার | আবুল সরকার | কৃষ্ণপুর | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |
| ১৬০ | আলাউদ্দিন | আবুল | কৃষ্ণপুর | চান্দাই | সাধারণ রাজাকার |

(অসম্পূর্ণ) (সূত্র : বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বড়াইগ্রাম উপজেলা কমান্ড কার্যালয়)

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বড়াইগ্রাম উপজেলা কর্মান্ড কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক গঠিত শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের নামের তালিকা উল্লেখ করা হল(যাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা যায় ) :

| ক্রমিক নং | নাম | পিতা | গ্রাম | ইউনিয়ন | উপজেলা | অপরাধের বিবরণ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আঃ মজিদ মিয়া | নঈম উদ্দিন | কৈড়িমা | জোয়াড়ী | বড়াইগ্রাম | লুটতরাজ, নারী ধর্ষণ, হত ও অগ্নিসংযোগ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ইত্যাদি কাজে জড়িত, ছিল। |
| ২ | নিজামুদ্দিন মন্ডল | কছের মন্ডল | রামাগাড়ী | জোয়াড়ী | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ছিলো। |
| ৩ | নঈম উদ্দিন আহম্মেদ | বদর উদ্দিন | কুমরুল | জোয়াড়ী | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ৪ | মোঃ আকবর আলী | দূর্লভ | কাচুটিয়া | জোয়াড়ী | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ৫ | আক্কাছ পাটোযারী | লাল পাটোয়ারী | বড় ভবানীপুর | জোয়াড়ী | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ৬ | করম আলী সরকার | পাতানী সরকার | দ্বারী খৈইর | নগর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন |
| ৭ | আজির উদ্দিন | দুর্লভ প্রাং | কয়ান | নগর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির মেম্বার লুটতরাজ ধর্ষণ হত্যা, অগ্নী সংযোগকারী। |
| ৮ | জমির উদ্দিন | ময়েজ উদ্দিন প্রাং | ধানাইদহ | নগর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির মেম্বার লুটতরাজ ধর্ষণ হত্যা, অগ্নি সংযোগকারী। |
| ৯ | রহমত আলী | চিকু মন্ডল | নগর | নগর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। |
| ১০ | আঃ জব্বার | হাজী | মেরীগাছা | নগর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | মোহসীন আলী | | | | চেয়ারম্যান ছিলেন। |
| ১১ | আজিমুদ্দিন | ইসমাইল সরকার | নিতাইও নগর | নগর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। |
| ১২ | লোকমান | কাজেম মোল্লা | চৌমহান | জোনাইল | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। |
| ১৩ | গোলজার | এশারত সরকার | এাড়িয়া | বড়াইগ্রাম | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। |
| ১৪ | মোহাম্মদ আলী | হাজী তমিজ উদ্দিন | রাজশাহী | মাঝগাঁও | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ১৫ | রফিকুল্যা মৃধা | রহিম মৃধা | ঊনপাড়া | মাঝগাঁও | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ১৬ | ইয়াছিন আলী | কুপু প্রামানিক | হারোয়া | মাঝগাঁও | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ১৭ | কাশেম আলী সরকার | দেদার সরকার | হারোয়া | মাঝগাঁও | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ১৮ | দীল মোহাম্মদ | দবির উদ্দিন | হারোয়া | মাঝগাঁও | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ১৯ | ছালামত মুন্সী | মুনছের আলী খাঁ | ঊনপাড়া | মাঝগাঁও | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ২০ | আঃ রহমান সরকার | রুই বলি সরকার | তিরাইল | মাঝগাঁও | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ২১ | ডাঃ জসিম | ছাবের প্রাং | তিরাইল | মাঝগাঁও | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির মেম্বার লুটতরাজ |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি কাজ করেছে সহায়তাকারী |
| ২২ | ডাঃ মোঃ সাবের আলী | ফজর মোল্লা | মালীপাড়া (বনপাড়া) | মাঝগাঁও | বড়াইগ্রাম | লুটতরাজ ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ইত্যাদি কাজ করেছে সহায়তাকারী |
| ২৩ | ছিদ্দিক মাষ্টার | আজমত মালিক | মালীপাড়া (বনপাড়া) | মাঝগাঁও | বড়াইগ্রাম | সাধারণ মেম্বর |
| ২৪ | রুস্তম ভূইয়া | সুবেদ আলী ভূইয়া | আগ্রাণ | মাঝগাঁও | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য লুটতরাজ ও দর্ষণ করত। |
| ২৫ | এরাদ আলী | এবাদ প্রাং | ঊহিমালী | মাঝগাঁও | বড়াইগ্রাম | সকলেই সদস্য |
| ২৬ | খোরশেদ মোল্লা | সামসুদ্দিন জেল্যা | ধানাইদহ | নগর | বড়াইগ্রাম | |
| ২৭ | মোঃ মোজাহার খা | হাফেজ খহিমুদ্দিন | ধানাইদহ | নগর | বড়াইগ্রাম | |
| ২৮ | শাহাদৎ হোসেন | ছবের আলী | হারোয়া | মাঝগাঁও | বড়াইগ্রাম | |
| ২৯ | মোঃ এরশাদ আলী | ইয়াছিন প্রাং | তিরাইল | মাঝগাঁও | বড়াইগ্রাম | |
| ৩০ | রহমত উল্লা | চিকু মন্ডল | নগর | নগর | বড়াইগ্রাম | |
| ৩১ | আশহাদ বিশ্বাস | মৃত ছদির বিশ্বাস | নগর | নগর | বড়াইগ্রাম | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৩২ | মমিন উদ্দিন প্রাং | আক্কাছ মন্ডল | পাঁচবাড়িয়া | | বড়াইগ্রাম | |
| ৩৩ | বুলুর আলী | দেরাজ তুল্যা | চেহিমন | জোনাইল | বড়াইগ্রাম | |
| ৩৪ | আবুল হোসেন সরকার | দুখু সরকার | কৃষ্ণপুর | চান্দাই | বড়াইগ্রাম | বৃহত্তর গোপালপুর ইউনিয়নে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সকল প্রকার অপরাধের মূল নায়ক |
| ৩৫ | ইজ্জত মন্ডল | - | কৃষ্ণপুর | চান্দাই | বড়াইগ্রাম | সক্রিয় সদস্য |
| ৩৬ | শাহাদৎ আলী | বশির মোল্ল্যা | সাতইল | চান্দাই | বড়াইগ্রাম | সক্রিয় সদস্য |
| ৩৭ | মোঃ এরশাদ আলী | স্বরুপ প্রাং | দোশগ্রাম | চান্দাই | বড়াইগ্রাম | সক্রিয় সদস্য |
| ৩৮ | মাওঃ ফজলুর রহমান | হাশেম প্রাং | ভান্ডারদহ | চান্দাই | বড়াইগ্রাম | সক্রিয় সদস্য |
| ৩৯ | নজির মাঝি | বশির মাঝি | দাশগ্রাম | চান্দাই | বড়াইগ্রাম | সক্রিয় সদস্য |
| ৪০ | আঃ রহিম | কাজেম সরকার | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | বড়াইগ্রাম | সক্রিয় সদস্য |
| ৪১ | আবু বক্কার পাঠান | মুন্সী পাঠান | দিয়ার গাড়ফা | চান্দাই | বড়াইগ্রাম | সক্রিয় সদস্য |
| ৪২ | নূর মোহাম্মদ হাজী | মনির উদ্দিন | সাতইল | চান্দাই | বড়াইগ্রাম | সক্রিয় সদস্য |
| ৪৩ | শামসুল হক | ছইমুদ্দিন | লক্ষীকোল | গোপালপুর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ৪৪ | ছবির সরকার | - | গোপালপুর | গোপালপুর | বড়াইগ্রাম | সদস্য |
| ৪৫ | কাঞ্চি মন্ডল | - | চকপাড়া | গোপালপুর | বড়াইগ্রাম | সদস্য |
| ৪৬ | কোবাদ গাইন | - | ভরট | গোপালপুর | বড়াইগ্রাম | সদস্য |
| ৪৭ | ইয়াজ উদ্দিন | তমেজ উদ্দিন | এাড়িয়া | গোপালপুর | বড়াইগ্রাম | সদস্য |
| ৪৮ | আঃ জলির মন্ডল | আঃ জব্বার মন্ডল | ধামনিয়াপাড়া | গোপালপুর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ৪৯ | মেহের আলী | সবুর আলী | বড়াইগ্রাম | গোপালপুর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ৫০ | মোজাম্মেল হক | - | গোপালপুর | গোপালপুর | বড়াইগ্রাম | মেম্বর |
| ৫১ | মোশাররফ | - | গোপালপুর | গোপালপুর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ৫২ | মোঃ জনাব আলী | - | গোপালপুর | গোপালপুর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ৫৩ | শামসুর রহমান মন্ডল | নওয়াব আলী মন্ডল | গোপালপুর | গোপালপুর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ৫৪ | দেলোয়ার খান | - | পূর্ণ কলশ | গোপালপুর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ৫৫ | আলাউদ্দিন বিহারী | - | পূর্ণ কলশ | গোপালপুর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |
| ৫৬ | আব্দুল মালেক বিশ্বাস | আঃ সালেক | পূর্ণ কলশ | গোপালপুর | বড়াইগ্রাম | শান্তি কমিটির সদস্য |

(অসম্পূর্ণ) (সূত্র :বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বড়াইগ্রাম উপজেলা কমান্ড কার্যালয়)

**১৯৭১-এ-বড়াইগ্রাম থানার ঘাতক-দালাল যাদের পরিচয় জানা যায় :**

মূল ঘাতকদের মধ্যে ছিলেন-

১. বড়াইগ্রাম থানার মোজাহার বিহারি ভীষণ নিষ্ঠুর ব্যক্তি ছিল। তার বাড়ি ধানাইদহে। একাত্তরে তার আশ্রয়ে নাটোর থেকে বহু অবাঙালি এবং পাকিস্তান সমর্থক বাঙালি আশ্রয়লাভ করে। ধানাইদহ এলাকায় অসংখ্য বাঙালি হত্যার নায়ক এই মোজাহার বিহারি।

২. মোহাম্মদ আলী পাঁচ বাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিল। বাড়ি পাঁচ বাড়িয়াতে। ১৯৭১ সালের কুখ্যাত দালাল, খুনি ও লুটেরা।

৩. কমল সরকার ছিলেন রাজাকার কমান্ডার। সংগ্রামপুরে তার বাড়ি। বড়াইগ্রামে হত্যা, ধর্ষণ প্রভৃতির সাথে জড়িত ছিলেন।

৪. মোবারক উল্লাহ, পিতাঃ মোজাফফর হোসেন গ্রামঃ মেরীগাছা, নগর ইউনিয়ন। সে আলবদর বাহিনীর কমান্ডার ছিল। বর্তমানে সে কয়েক কোটি টাকার মানুষ। পূর্বের অবস্থা খুবই শোচনীয় ছিল।

৫. সায়দুল ইসলাম। পিতাঃ মারফত আলী। গ্রামঃ মেরীগাছা, নগর ইউনিয়ন। মোঃ রাজাকার ছিল। লুট-পাট, করে বর্তমানে ধনী ও বিত্তশালী ব্যক্তিতে পরিণত হয়েছে।

৬. কলিমুদ্দিন রাজাকার ছিলেন কষাই।

৭. মোঃ মাহাবুল হোসেন মিয়া, পিতাঃ রায়হান। গোপালপুর বাড়ি। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর সহযোগী হিসেবে মুলাডুলি কেন্দ্রিয় খাদ্য গুদামে ডিটটিরত ছিল। সেখানে পাবনা জেলা শান্তি কমিটির অন্যতম নেতা ইছহাক আলী খানের নির্দেশে বহুলোকের হত্যার সাথে জড়িত ছিল। পরবর্তীকালে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর দেশে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় মুলাডুলি খাদ্যগুদামে ডিউটির কাজ করছেন।

৮. মোঃ আঃ জলিল মিয়া, পিতাঃ মোজাম্মেল হক মিয়া, রাজাকার জলিল নামে পরিচিত এই ব্যক্তি দুর্ধর্ষ রাজাকার। সকল লুটপাটের সাথে জড়িত ছিল। সাধারণ মানুষের খাসী, মুরগী ধরে পাক বাহিনরি হাতে তুলে দিত। বিজয়ের সময় ভারতে চলে গিয়েছিল। জিয়া ক্ষমতা গ্রহণের পর বাংলাদেশে ফিরে আসে।

৯. মোঃ খন্দকার আবু তালেব। পিতাঃ খন্দকার মছির উদ্দিন। গোপালপুরের রাজাকার তালেব বর্তমানে গোপালপুর ইউনিয়নের জামাতে ইসলামীর সভাপতি হিসেবে দায়িত্বরত।

১০. আঃ মজিদ মিয়া, পিতাঃ নঈম উদ্দিন গ্রামঃ কৈডিমা, জোয়াড়ী ইউনিয়ন। একাত্তরে লুটতরাজ, নারী ধর্ষণ, হত্যা, অগ্নিসংযোগের সাথে জড়িত ছিল।

১১. আজির উদ্দিন, শান্তি কমিটির মেম্বর। লুটতরাজ, ধর্ষণ, হত্যা প্রভৃতির সাথে জড়িত।

১২. আবুল হোসেন সরকার, পিতাঃ দুখু সরকার, চান্দাই ইউনিয়নের কৃষ্ণপুর গ্রামে বাড়ি। বৃহত্তর গোপালপুর ইউনিয়নে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান সকল প্রকার অপরাধের মূল নায়ক।

১৩. মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া, পিতাঃ নুরু মিয়া। গোপালপুর ইউনিয়নবাড়ি। রাজাকার আলাউদ্দিন যুদ্ধকালীন সময়ে পাকশী এলাকার সীমান্তে প্রহরায় নিয়োজিত ছিল। সম্মুখ সময়ে মুক্তিবাহিনীর

হাতে বন্দী হয়। (ঐ যুদ্ধে আমি আমজাদ হোসেন ছিলাম) মিত্র বাহিনীর হেফাজতে ভারতের কারাগারে স্থান হয়। মুক্তি পাওয়ার পর জিয়াউর রহমানের সময় রেলওয়েতে চাকুরি জুটিয়ে নেয়। গোপালপুর গ্রামে ফিরে আসে নি। সৈয়দপুরে বসবাস করে।

এছাড়া আব্দুর রাজ্জাক (কৃষক, পিতা: মফিজ উদ্দিন), আব্দুর রব বেপারী (বনপাড়া), লাল মিয়া (আহম্মদপুর) প্রমুখ ও বড়াইগ্রাম উপজেলায় হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট, নির্যাতন ও পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগিতায় ছিলেন। এছাড়া নাটোর সদরের মন্টু, দায়েরপাড়া (লালপুর) এর আনসার প্রমুখর মাধ্যমে পাকিস্তানি বাহিনী বড়াইগ্রামে প্রবেশ করেছিল।

# পরিশিষ্ট: ১২

**নলডাঙ্গা উপজেলার গণহত্যায় শহীদদের তালিকা :**

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এবং তাদের সহযোগী রাজাকার, আলবদর, আল-শামস বাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে বহু মানুষ শহীদ হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের সকলের নাম জানা সম্ভব হয়নি। তাই তাঁদের তালিকা আজও অসম্পূর্ণ। যাদের নাম জানা গেছে, তাও পরিপূর্ণ নয়। বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও গ্রন্থে প্রাপ্ত সাত জন শহীদের নাম জানা যায়। দুই জন শহীদের পরিচয় জানা যায় নি। তাঁরা হলেন – নিবারণ ঘোষ, সত্যানন্দ পাল। (অসম্পূর্ণ)

বাকী পাঁচ জন শহীদের পরিচয় জানা যায়। তাঁরা হলেন –

**শ্রী শান্তি চরণ ঘোষ :** বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়নের বাসিন্দা শ্রী শান্তি চরণ ঘোষ পেশায় ছিলেন একজন কৃষক। পুত্রকন্যা নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। স্থানীয় রাজাকার খাদেমুল ইসলাম তাঁকে মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে বাড়ি থেকে ডেকে পাঠায় সেপ্টেম্বর মাসের এক গভীর রাতে। পরে চকপাড়া মাঠে আরও কয়েকজনের সাথে গুলি করে লাইনে দাঁড় করিয়ে। এরপর সেই মাঠে একটি কূপে পড়েছিল তাঁর লাশ।

**পরিমল চন্দ্র সরকার :** তাঁর বাড়ি বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামে। তিনি পেশায় একজন কৃষক ছিলেন। বাড়ি থেকে রাজাকার বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে চকপাড়া গ্রামে হত্যা করে।

**সত্য সরকার :** বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়নের নগেন্দ্রনাথ সরকারের পুত্র সত্য সরকার। তিনি পড়াশুনা করতেন। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেছিলেন। হিন্দু এই যুবককে রাজাকার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায় চকপাড়া গ্রামে। সেখানে হত্যা করে।

**সুধীর চন্দ্র সরকার :** বৈদ্য বেলঘরিয়ার অধিবাসী সুধীর চন্দ্র সরকার গ্রামেই কৃষিকাজ করতেন। স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বাড়ি ছিলেন। তাঁকেও মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে রাজাকার বাহিনী ধরে নিয়ে যায় বাড়ি থেকে। চকপাড়া গ্রামে হাত বেঁধে, চোখ বেঁধে হত্যা করে কূপে ফেলে রেখে যায়।

**দিলীপ কুমার রায় :** বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়নের নসরতপুর গ্রামের কালী সুন্দর রায়ের পুত্র দিলীপ কুমার রায়। জমিদার ছিলেন তাঁরা। ভাই বোন, ছেলে মেয়ে নিয়ে একত্রে সবাই বাস করতেন। সম্পদশালী এই ব্যক্তির উপর কুদৃষ্টি পড়ে রাজাকার বাহিনীর। অতর্কিত হামলা করে বাড়িতে একদিন। বাড়িতেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরে তাঁর পরিবারকে ভয় দেখিয়ে বাড়িঘর লুট-পাট ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

## পরিশিষ্ট: ১৩

**নলডাঙ্গা উপজেলায় স্বাধীনতা বিরোধী ঘাতক-দালাল-রাজাকার :**

নলডাঙ্গা উপজেলায় জুন মাসের দিকে রাজাকার-আলবদর বাহিনী গঠিত হয়। আর তারা বিভিন্ন স্থানে ক্যাম্প করে। পাকিস্তানি বাহিনী এসব ক্যাম্পগুলোতে বিভিন্ন স্থান থেকে মহিলাদের ধরে নিয়ে এসে নির্যাতন করত। এছাড়া এসব ক্যাম্প থেকে সমগ্র উপজেলায় হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পরিকল্পনা করত। নলডাঙ্গা উপজেলার অন্যতম প্রধান রাজাকার খাদেমুল ইসলাম। এছাড়াও তার সাথে ছিলেন রশীদ খান, মতিয়ার রহমান, তমিজ খমার, ইব্রাহিম শাহ, মোঃ রহিম প্রাং, মোঃ সমশের আলী প্রমুখ।

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, নলডাঙ্গা উপজেলা কমান্ড কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের রাজাকারের তালিকা(যাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা যায় ) :

| ক্রমিক নং | নাম | পিতা | ঠিকানা | ইউনিয়ন |
|---|---|---|---|---|
| ১ | আঃ কাদের খান | কছিম খান | উঁশিলা | মাধনগর |
| ২ | আ: লতিফ খান | ঐ | উঁশিলা | মাধনগর |
| ৩ | আমিন উদ্দিন | আছির উদ্দিন | উঁশিলা | মাধনগর |
| ৪ | কাজেম উদ্দিন | আয়েজ উদ্দিন | উঁশিলা | মাধনগর |
| ৫ | মোসলেম উদ্দিন | মনির মিনা | উঁশিলা | মাধনগর |
| ৬ | আয়েজ উদ্দিন | ওছিমুদ্দিন | সোনাপাতিল | মাধনগর |
| ৭ | ফায়েজ উদ্দিন | ময়েজ উদ্দিন | সোনাপাতিল | মাধনগর |
| ৮ | সামসুল প্রাং | মারফত প্রাং | সোনাপাতিল | মাধনগর |
| ৯ | তাছির প্রাং | মারফত | সোনাপাতিল | মাধনগর |
| ১০ | ছলিম উদ্দিন | তাসির উদ্দিন | পশ্চিম মাধনগর | মাধনগর |
| ১১ | হামেদ আলী | মহর আলী | পশ্চিম মাধনগর | মাধনগর |
| ১২ | শমশের আলী | রাবন প্রাং | পশ্চিম মাধনগর | মাধনগর |
| ১৩ | আইয়ুব আলী | কানা আইকদ্দিন | পশ্চিম মাধনগর | মাধনগর |
| ১৪ | রমজান আলী | সজ্জের আলী | পশ্চিম মাধনগর | মাধনগর |
| ১৫ | ময়েজ উদ্দিন প্রাং | মছির উদ্দিন | পূর্ব মাধনগর | মাধনগর |
| ১৬ | সুলেমান শেখ | সুকালে শেখ | পশ্চিম মাধনগর | মাধনগর |
| ১৭ | শাহাদাৎ হোসেন | রুকিল উদ্দিন | পশ্চিম মাধনগর | মাধনগর |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৮ | আব্বাছ আলী | চাঁদ আলী | পশ্চিম মাধনগর | মাধনগর |
| ১৯ | সৈয়দ আলী | রূপচাঁদ | পূর্ব মাধনগর | মাধনগর |
| ২০ | মুনসের আলী | বিনোদ আলী | পূর্ব মাধনগর | মাধনগর |
| ২১ | মজিবর রহমান শেক | কাদের শা | পশ্চিম মাদনগর | মাধনগর |
| ২২ | ফজল শা | কাদের শা | পশ্চিম মাদনগর | মাধনগর |
| ২৩ | মজিবর রহমান | জাকির | পশ্চিম সাধনগর | মাধনগর |
| ২৪ | নজরুল ইসলাম | ইয়াকুব আলী | পশ্চিম মাদনগর | মাধনগর |
| ২৫ | ছায়েদ আলী | ছাবের আলী | পূর্ব মাধনগর | মাধনগর |
| ২৬ | ইয়াছিন আলী | পাঁচাই প্রাং | সড়কুতিয়া,পীরগাছা | ব্রক্ষপুর |
| ২৭ | ইয়াকুব আলী | পাঁচাই প্রাং | সড়কুতিয়া,পীরগাছা | ব্রক্ষপুর |
| ২৮ | লইমুদ্দিন | অলিমদ্দিন | সড়কুতিয়া,পীরগাছা | ব্রক্ষপুর |
| ২৯ | মজিবর রহমান | আতব উদ্দিন | সড়কুতিয়া,পীরগাছা | ব্রক্ষপুর |
| ৩০ | আঃ আজিজ | জয়া চকিদার | সড়কুতিয়া,পীরগাছা | ব্রক্ষপুর |
| ৩১ | আয়েন উদ্দিন | আজিম উদ্দিন | সড়কুতিয়া,পীরগাছা | ব্রক্ষপুর |
| ৩২ | মোঃ আব্দুল আজিজ | তছির প্রাং | সড়কুতিয়া,পীরগাছা | ব্রক্ষপুর |
| ৩৩ | মোজাহার আলী | বাজন মুনসি | চকসড়কুতিয়া,পীরগাছা | ব্রক্ষপুর |
| ৩৪ | আফছার | কিচু মৃধা | চকসড়কুতিয়া,পীরগাছা | ব্রক্ষপুর |
| ৩৫ | মোঃ আক্কাছ আলী | ইসমাইল | বাঙ্গাল খলসী, ব্রক্ষপুর | ব্রক্ষপুর |
| ৩৬ | এংলা | সবল শাহ | বাঙাল খলসী, ব্রক্ষপুর | ব্রক্ষপুর |
| ৩৭ | ইছব | বাদলা | বাঙাল খলসী, ব্রক্ষপুর | ব্রক্ষপুর |
| ৩৮ | হাসেম | ফুলচাঁন দেওয়ান | বাঙাল খলসী, ব্রক্ষপুর | ব্রক্ষপুর |
| ৩৯ | আবু সাইদ | মলা বস্ক | হলুদ ঘর | ব্রক্ষপুর |
| ৪০ | মোঃ রহিম প্রাং | তমিজ | নলডাঙ্গা | ব্রক্ষপুর |
| ৪১ | মোঃ তাহের প্রাং | চেরু প্রাং | নলডাঙ্গা | ব্রক্ষপুর |
| ৪২ | মোঃ সমশের আলী | মোঃ মহসিন | বুড়ির ভাগ | ব্রক্ষপুর |
| ৪৩ | দেলবর | তলু প্রাং | বুড়ির ভাগ | ব্রক্ষপুর |
| ৪৪ | কিয়ামত প্রাং | গেতু প্রাং | ব্রক্ষপুর | ব্রক্ষপুর |

(অসম্পূর্ণ) (সূত্র :বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, নলডাঙ্গা উপজেলা কমান্ড কার্যালয়)

**খাদেমুল ইসলাম :** নলডাঙ্গা উপজেলার আলবদর-রাজাকার বাহিনীর অন্যতম প্রধান ছিলেন খাদেমুল ইসলাম। তিনি চট্টগ্রামে শিক্ষকতা করতেন। ঐসময় কর্মস্থল ছেড়ে নলডাঙ্গায় আসেন। তখন তাঁর দাপটে সমগ্র বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়ন ছিলো প্রকম্পিত। তাঁর বিরুদ্ধে কারো টুঁ শব্দটি করার সাহস ছিলো না। সে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলো। নারী ধর্ষণের মতো বর্বর এবং ক্ষমাহীন অপরাধ সে অক্লেশে করেছে। পাকিস্তানিদের আপ্যায়নের কথা বলে সে হাজার হাজার টাকা চাঁদা জোর করে তুলেছে। একাত্তরে রাজাকার কমান্ডার খাদেমুল ইসলামের এই নৃশংস ভূমিকার কথা এক সাক্ষাৎকারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রফেসর ড. আব্দুস সোবহান বর্ণনা করেছেন। রাজাকার খাদেমুল ইসলাম একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে নগ্নভাবে সহযোগিতা করেছে এবং বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে কারো খাসি, কারো গরু, হাঁস মুরগি আর চাল ও টাকা জোরপূর্বক আদায় করেছে। এছাড়া, বিপ্রবেলঘড়িয়া ইউনিয়নে একাত্তরে যে সব খুন ও নির্যাতন হয়েছে, সবই তাঁর নেতৃত্বে হয়েছে।

সে অসংখ্য বাড়ি ঘরে আগুন দিয়েছে। বহু স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিকে পাকিস্তানি হানাদারদের ধরিয়ে দিয়েছে। আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের বাড়ি চিনিয়ে দিয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিবাসিদের তো সে মানুষই মনে করতো না। তাঁদের সঙ্গে গর ছাগলের মতো আচরণ করেছে। তাঁদের সহায়-সম্পত্তি জোর করে কেড়ে নিয়েছে। তারা নিজেরা অনেককে প্রকাশ্যে ধরে এনে হত্যা করেছে। ৪ ডিসেম্বর বৈদ্য বেলঘড়িয়া গ্রামের চার ব্যক্তিকে গভীর রাতে ঘুম থেকে ডেকে তুলে অপহরণ করে তার তিনজনকে নির্মমভাবে হত্যা করা একটি উলেখযোগ্য মর্মান্তিক দৃষ্টান্ত। এই রাজাকার কমান্ডার পারিবারিকভাবে পাকিস্তানের কট্টর সমর্থক ছিলো। ছাত্র জীবনেও সে পাকিস্তানের সমর্থনের সাম্প্রদায়িক দল ও সংগঠন জামাত ইসলাম ও ছাত্র সংঘের মিটিং মিছিলে অংশ গ্রহণ করেছে। এইসব দলের প্রচারেও সে ছিলো অগ্রসৈনিক।

একাত্তরের বিজয়ের পর এই রাজাকার কমান্ডার দেশ ছেড়ে চট্টগ্রামে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে। পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর এই নরঘাতক ও দালাল ধর্ষক সামরিক সরকারের তত্ত্বাবধানে পুনর্বাসিত হয়ে সরকারি চাকুরিতে নিযুক্তি পায়। অথবা এমন হতে পারে আত্মগোপনের সময় সে চট্টগ্রামে অবস্থান কালে মিথ্যে পরিচয় দিয়ে এই সরকারি চাকরিতে যোগ দেয়ার সুযোগ নেয়। বর্তমানে সে সরকারি কলেজে বাইয়োলোজি বিভাগের ডেমনেস্ট্রেটর পদে কর্মরত। যথারীতি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ বিরোধী সংগঠনে ও অপপ্রচারের সঙ্গে যুক্ত আছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে তার অপরাধ ক্ষমাহীন। এই কুখ্যাত ঘাতক দালারের পিতার নাম হাজি ছইম উদ্দিন।

( *সূত্র:* সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*)

**নাসির উদ্দিন সরকার :** তিনি শান্তিকমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। যুদ্ধকালীন সময়ে বিভিন্ন রকম মানবতাবিরোধী কর্মকান্ডে যুক্ত ছিলেন যুদ্ধপরবর্তী সময়ে তাঁর কোন বিচার হয়নি। তিনি মারা গেছেন। উল্লে-খ্য, তিনি মুসলীম লীগের সক্রিয় সদস্য ছিলেন।

( *সূত্র:* সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*)

## পরিশিষ্ট: ১৪

### বাগাতিপাড়া উপজেলার গণহত্যায় শহীদদের তালিকা :

১৯৭১ সালে বাগাতিপাড়া উপজেলায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের সহযোগী দালাল রাজাকার বাহিনী অনেক মানুষকে হত্যা করেছিল। মিলিটারি এসেছে জানতে পেরে বহু মানুষ নিরাপদ আশ্রয়ে পালিয়ে গিয়েছিল, যারা ছিল তাদের অনেকে দালালদের অত্যাচার নির্যাতন সহ্য করেছে, কেউ তাদের তোষামোদ করে জীবন বাঁচিয়েছে। আবার কেউবা প্রাণ হারিয়েছে। শহীদ হওয়া সকলের নাম জানা সম্ভব হয়নি তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে।অনেকে বিভিন্ন এলাকা থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে এ উপজেলার বিভিন্ন স্থানে। ফলে তাঁদের মধ্যে যাঁরা গণহত্যার শিকার হয়েছেন, তাদের পরিচয় জানা যায়নি সকল ক্ষেত্রে। এছাড়া এক এলাকা থেকে ধরে নিয়ে অন্য এলাকায় হত্যা করার ফলে সকলের পরিচয় জানা যায়নি। নির্যাতিত নারীরা লোকলজ্জা ও সামাজিকতার ভয়ে নির্যাতনের সেই ঘটনাগুলো প্রকাশ্যে আনতে চান না। বিভিন্ন সাক্ষাৎকার ও গ্রন্থে প্রাপ্ত ১০ জন শহীদের নাম এবং পরিচয় জানা যায় :

স্বপন চক্রবর্তী, শমসের আলী এবং মেঘনাথ সাহা, ওমর আলী (ভিতরভাগ), নায়েব আলী (জামনগর), আব্দুল জলিল (ঘোষপাড়া), আলী প্রামাণিক (হাঁপানিয়া), অজ্ঞাত কবিরাজ (হাঁপানিয়া), তারাপদ পাল (ধূপইল), টগর পাল (ধূপইল)। ( অসম্পূর্ণ )

### বাগাতিপাড়া উপজেলার গণহত্যায় শহীদ ও শহীদ পরিবার সমূহের পরিচয় :

মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য, প্রত্যক্ষদর্শী ও বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ,নাটোর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যেসব শহীদদের পরিচয় জানা যায় তাদের পরিচয় উল্লেখ করা হলো :

**শহীদ স্বপন চক্রবর্তী :** বাগাতিপাড়া উপজেলার পাকা ইউনিয়নের বেগুনিয়া গ্রামের অধিবাসী স্বপন চক্রবর্তী। পেশায় কৃষিকাজ করতেন। সদ্য বিয়ে করেছেন। বিয়ের বছর শুরু হল মুক্তিযুদ্ধ। অনেকেই নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে চলে গেলেও স্বপন বাড়িতেই রইলেন। সরলমনা স্বপন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের একটি ছবি কিনে এনেছিলেন। স্থানীয় দালালরা বিভিন্ন এলাকায় লুটপাট, হত্যা, নির্যাতন করছে। দালালরা হঠাৎ স্বপনের বাড়িতে আক্রমণ করে হানাদার বাহিনী নিয়ে। স্বপনের কাছে শেখ মুজিবরের ছবি আছে জানতে পেরে তাকে ধরে নিয়ে যায় তমালতলী বাজারে। বড়াল নদীর ধারে বঙ্গবন্ধুর ছবি ঝুলিয়ে গুলি করে হত্যা করে তাঁকে। পরে সেখানেই কবরস্থ করা হয় তাঁকে।

**শহীদ শমসের আলী :** পাকা ইউনিয়নের চকগোয়াশ গ্রামে পরিবার নিয়ে বাস করতেন শমসের আলী। তিনি আনসার কমান্ডার ছিলেন। পাশাপাশি ব্যবসা করতেন। সাহসী শমসের আলী দেশকে স্বাধীন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। তাই মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিতেন নিজে নিজেই। জামনগর প্রতিরোধ যুদ্ধে তিনি অংশ নিয়েছিলেন। সেখানে পাকিস্তানি ৪-৫জন সৈনিক মারা যায়। স্থানীয় রাজাকার রজব বিহারী সেসম্পর্কে জানতে পেরে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে নিয়ে এসে তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে। তাঁকে ধরে নিয়ে যায় লালপুর উপজেলার বাওড়া ব্রিজে। সেখানে তাঁকে হত্যা করে পানিতে ফেলে দেয়।

**শহীদ মেঘনাথ সাহা :** বাগাতিপাড়া উপজেলার দয়রামপুর ইউনিয়নের সম্ভ্রান্ত হিন্দু প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন মেঘনাথ সাহা। ব্যবসা করতেন তিনি। মিলিটারি এসেছে জানতে পেরে ছেলে মেয়ে সহ পরিবারের সকলকে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠালেও নিজে বাড়িতেই থেকে যান। অবস্থা বেগতিক দেখে তিনি বাড়ি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। ১১ বৈশাখ, ২৬ এপ্রিল তিনি টাকা-পয়সা সব নিয়ে দয়রামপুর বাজার দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। স্থানীয় রাজাকাররা জানতে পেরে পাকিস্তানি সৈন্যদের নিয়ে তাঁকে ঘেরাও করে তাঁর কাছ থেকে সব লুটপাট করে। পরে সেখানেই গুলি করে হত্যা করে। পরে তাঁর ঘর বাড়ি লুটপাট করে ক্যাম্প স্থাপন করে দালালরা, হত্যার পরদিন মেঘনাথ সাহার ছেলে রঘুনাথ সাহা স্থানীয়দের সাহায্যে তাঁকে দয়রামপুর বাজারে কবরস্থ করে চলেযান। তাঁদের বাড়ি-ঘর পরবর্তীতে পুড়িয়ে ফেলে রাজাকাররা।

## পরিশিষ্ট: ১৫

**বাগাতিপাড়া উপজেলার ঘাতক-দালাল রাজাকারের তালিকা ও পরিচয় :**

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাগাতিপাড়া উপজেলা কমান্ড কার্যালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধী  শান্তি কমিটি, রাজাকার, আলবদর, আলশাম্‌সের তালিকা (যাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানা যায় ) :

| ক্রমিক নং | ইাম | পিতা | ঠিকানা | উপজেলা |
|---|---|---|---|---|
| ১ | কাজী আঃ রাজ্জাক (রাজাকার কমান্ডর) | কাজী আঃ রহমান | দয়ারামপুর, কাজীপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ২ | মোঃ আহম্মদ আলী | ফুল প্রাং | দয়ারামপুর | বাগাতিপাড়া |
| ৩ | মোঃ জোনাব আলী | ফজের আলী | দয়ারমপুর, মিশ্রিপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ৪ | মোঃ শাজাহান আলী | তজু মোল্লা | হিজলী পাবনাপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ৫ | মোঃ  আলতাব মুন্সি | মেহের মুন্সি | হিজলী পাবনাপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ৬ | মোঃ সাজদার রহমান | আবেদুল্লা | দয়ারামপুর বিলপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ৭ | মোঃ আগো আলী | গোলাম রসুল | দয়ারামপুর বিলপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ৮ | মোঃ আমিন উদ্দিন | খানদার আলী | দয়ারামপুর বিলপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ৯ | মোঃ বাহার উদ্দিন | মেরু প্রাং | ভাটকুজা দয়ারামপুর | বাগাতিপাড়া |
| ১০ | মোঃ রহমতুল্লামন্ডল | শুকটা মন্ডল | মিশ্রিপাড়া, দয়ারামপুর | বাগাতিপাড়া |
| ১১ | মোঃ মসলেম উদ্দিন | ফয়েজ উদ্দিন | নন্দীকুজা, দয়ারামপুর | বাগাতিপাড়া |
| ১২ | মোঃ ফজলুর রহমান | আফাজ উদ্দিন | নন্দীকুজা, | বাগাতিপাড়া |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | দয়ারাম পুর | |
| ১৩ | মোঃ আবুল কাসেম খাঁ | - | যোগীপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ১৪ | মোঃ শাহাদৎ হোসেন | - | যোগীপাড়া, বাগীপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ১৫ | মুক্তার হোসেন | - | যোগীপাড়া, বাগীপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ১৬ | আবুল হোসেন | - | বারইপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ১৭ | মজির উদ্দিন | - | মাছিমপুর | বাগাতিপাড়া |
| ১৮ | আহসান হাবিব | - | ঘোরলাজ | বাগাতিপাড়া |
| ১৯ | হযরত আলী | - | লক্ষণহাটী | বাগাতিপাড়া |
| ২০ | আসমত আলী (রাজাকার) | - | পেড়াবাড়ি | বাগাতিপাড়া |
| ২১ | মহির উদ্দিন | - | বড়পুকুড়িয়া | বাগাতিপাড়া |
| ২২ | সরফারাজুল ইসলাম (শান্তি কমিটি) | - | লক্ষণহাটী | বাগাতিপাড়া |
| ২৩ | আবুল কাসেম | - | ফাগুয়ারদিয়ার | বাগাতিপাড়া |
| ২৪ | আজিজুর রহমান (শান্তি কমিটি) | - | ফাগুয়ারদিয়ার | বাগাতিপাড়া |
| ২৫ | মনিরুজ্জামান (শান্তি কমিটি) | - | বারইপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ২৬ | আজিমুদ্দিন | - | গালিমপুর | বাগাতিপাড়া |
| ২৭ | শমশের আলী মোল্লা | - | চকতকিনগর | বাগাতিপাড়া |
| ২৮ | আলিমুদ্দিন (রাজাকার কমান্ডার) | - | চকগোয়াশ | বাগাতিপাড়া |
| ২৯ | আঃ হালিম (রাজাকার) | - | চকগোয়াশ | বাগাতিপাড়া |
| ৩০ | রহমত আলী (রাজাকার) | - | চকগোয়াশ | বাগাতিপাড়া |
| ৩১ | ইল্টু | বাদাল | পারকুঠি | বাগাতিপাড়া |
| ৩২ | মজিবুর রহমান | রতন প্রাং | পারকুঠি | বাগাতিপাড়া |
| ৩৩ | রজব আলী | - | বড়বাঘা | বাগাতিপাড়া |
| ৩৪ | আবুল হোসেন | - | পাঁকা | বাগাতিপাড়া |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ৩৫ | আফাজ উদ্দিন (শান্তি কমিটি) | - | ছোট চিথলিয়া | বাগাতিপাড়া |
| ৩৬ | বয়েজ উদ্দিন বিশ্বাস | - | বড় চিথলিয়া | বাগাতিপাড়া |
| ৩৭ | এরশদ আলী (রাজাকার) | - | মালিগাছা | বাগাতিপাড়া |
| ৩৮ | মছের চেয়ারম্যান (পিচকমিটি) | - | দয়ারামপুর | বাগাতিপাড়া |
| ৩৯ | খলিলুর রহমান (পিচকমিটি) | - | লৌরগোপ | বাগাতিপাড়া |
| ৪০ | আফছার চেয়ারম্যান (পিচকমিটি) | - | জামনগর | বাগাতিপাড়া |
| ৪১ | নুরমন্ডল (পিচকমিটি) | - | জামনগর | বাগাতিপাড়া |
| ৪২ | আফছার মন্ডল (পিচকমিটি) | - | জামনগর | বাগাতিপাড়া |
| ৪৩ | মোঃ কাসেম সরকার | কেজার আলী মাস্টার | মাকুপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ৪৪ | মোঃ আবুল হোসেন (রাজাকার) | ময়েজ মোল্লা | মাকুপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ৪৫ | ইউসুফ আলী | - | যোগীপাড়া | বাগাতিপাড়া |
| ৪৬ | সাখাত আলী | - | তকিনগর | বাগাতিপাড়া |

(অসম্পূর্ণ)(সূত্র:বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাগাতিপাড়া উপজেলা কমান্ড কার্যালয়)

এছাড়াও আরও অনেকে ছিলেন। এদের অনেককে স্থানীয়রা শাস্তি দিয়েছিল, অনেকের বিচার হয়নি আজও।

## রাজাকার/ আল বদরদের তালিকা

| ক্রমিক নং | দালালদের নাম | পেশা | গ্রাম/ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১ | মহির উদ্দিন (খুনি ও ধর্ষক) | কৃষক | ঊাহারপাড়া |
| ২ | আব্দুল জলিল (কুনি ও লুটেরা) | কৃষক | গৈলার |
| ৩ | কাজী আব্দুর রাজ্জাক | ব্যবসায়ী | নন্দিকুজা |
| ৪ | মোসলেম উদ্দিন | কৃষক | নন্দিকুজা |
| ৫ | ফজলুল হক | কৃষক | নন্দিকুজা |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ৬ | ফজলুর রহমান | কৃষক | নন্দিকুজা |
| ৭ | আহম্মদ আলী | কৃষক | মিশ্রিপাড়া |
| ৮ | উমেদ আলী | কৃষক | মিশ্রিপাড়া |
| ৯ | জনাব আলী | কৃষক | মিশ্রিপাড়া |
| ১০ | রহমাতুল্লাহ | কৃষক | মিশ্রিপাড়া |
| ১১ | নজরুল ইসলাম | কৃষক | জামনগর ঘোষপাড়া |
| ১২ | কাদের আলী | কৃষক | ঘাঁপানিয় |
| ১৩ | মহির উদ্দিন প্রামানিক | কৃষক | জামনগর পূর্বপাড়া |
| ১৪ | নওশাদ আলী | কৃষক | পুল্যাপাড়া বজরাপুর |
| ১৫ | শমসের আলী | কৃষক | খোরালাজ |
| ১৬ | আমজাদ আলী | ব্যবসায়ী | দয়ারামপুর |
| ১৭ | আসমত আলী | কৃষক | পোড়াবাড়িয়া |
| ১৮ | কাজী সাজু (খুনি, ধর্ষক, লুটেরা) | কৃষক, (সম্মুখ যুদ্ধে ধৃত, গণআদালতে অভিভুক্ত হয়ে নিহত) | দয়ারামপুর |
| ১৯ | মো. গোলে (খুনি, ধর্ষক ও লুটেরা) | কৃষক | নন্দিকুজা |
| ২০ | সাজদার আলী | কৃষক | ডবলপাড়া |
| ২১ | আগের আলী (আগো) | কৃষক | ডবলপাড়া |
| ২২ | আমিন উদ্দিন | কৃষক | ডবলপাড়া |
| ২৩ | আহম্মদ আলী | কৃষক | ভাটকুজা |
| ২৪ | বাহার উদ্দিন | কৃষক | ভাটকুজা |

(সূত্র:সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*)

**শান্তিকমিটির তালিকা**

| ক্রমিক নং | দালাদের নাম | পেশা | গ্রাম/ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| ১ | আব্দুল হান্নান (কুখ্যাত খুনি, লুটেরা ও দালাল) | কৃষক, দালাল শিরোমনি | চরগোয়াসি |
| ২ | আলিমুদ্দিন (কুখ্যাত ঘাতক- | প্রধান শিক্ষক, দয়ারামপুর | দয়ারামপুর |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | দালাল | | |
| ৩ | লাল মিয়া | কৃষক | মিশ্রিপাড়া |
| ৪ | মোছের আলী | কৃষক | নন্দিকুজা |
| ৫ | মকছেদ চৌধুরী | কৃষক | নন্দিকুজা |
| ৬ | আজিম উদ্দিন | কৃষক | গালিমপুর |
| ৭ | সরফরাজ | কৃষক | লক্ষ্মণহাটি |
| ৮ | হযরত আলী | কৃষক | লক্ষ্মণহাটি |
| ৯ | খলিলুর রহমান (কুখ্যাত খুনি ও লুটেরা) | শিক্ষক, দয়ারামপুর | দয়ারামপুর |
| ১০ | কাজী আব্দুল কুস্‌দুস | কৃষক | চিথলিপাড়া |
| ১১ | বেলাল উদ্দিন মৃধা | কৃষক | চিথলিপাড়া |
| ১২ | উমেদ আলী | কৃষক | চিথলিপাড়া |
| ১৩ | এছার উদ্দিন | কৃষক | চিথলিপাড়া |
| ১৪ | কেতু প্রামানিক | কৃষক | চিথলিপাড়া |
| ১৫ | কাজী শাহজাহান | কৃষক | চিথলিপাড়া |
| ১৬ | আব্দুল গাফ্‌ফার | কৃষক | চিথলিপাড়া |
| ১৭ | আখতার হোসেন (যুদ্ধের সময় ধৃত ও নিহত) | কৃষক, খুনি ও লুটেরা | দয়ারামপুর |
| ১৮ | জয়েন উদ্দিন | কৃষক | মিশ্রিতপাড়া |
| ১৯ | আজিম উদ্দিন | কৃষক | মিশ্রিতপাড়া |
| ২০ | আয়েজ উদ্দিন প্রামানিক | কৃষক | ভাটকুজা |
| ২১ | মোজাহার উদ্দিন | কৃষক | ভাটকুজা |
| ২২ | ডা. আহাদ আলী | কৃষক | ডবলপাড়া |
| ২৩ | খোদাবক্স সরকার | গ্রাম্য চিকিৎসক, খুনি লুটেরা | সোনাপুর |
| ২৪ | তেংগর (ডাঙ্গর) খাঁ | কৃষক | সোনাপুর |
| ২৫ | বদিউর রহমান | কৃষক | জয়ন্তিপুর |
| ২৬ | আলাউদ্দিন আল ফারুকি | মৌলভি, লুটেরা, ধর্ষক ও খুনি | বাটিকামারি |

( *সূত্র:*সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*)

# আলোকচিত্র

ফতেঙ্গাপাড়া বধ্যভূমি

১৯৭১- এ রামপুরা খালে বহু মানুষকে হত্যা

ফতেঙ্গাপাড়া শহীদ স্মৃতিসৌধ

শহীদ মাহবুব আলী সেলিমের কবর

মোকরামপুর গণহত্যার স্থান

তেবাড়িয়া ব্রিজ গণহত্যার স্থান

আহমেদপুর ব্রিজ গণকবর

লিয়াকত আলী ব্রিজে হ্যাপী, অবিনাশ ও আতাউর রহমান আতাকে হত্যা করে হানাদার বাহিনী

সামসুল হুদা হ্যাপী, অবিনাশ ও আতাউর রহমান আতার গণকবর

নাটোর সদর হাসপাতালের পুরুষ ওয়ার্ডে জীবনকৃষ্ণ মানিকে হত্যা করে হানাদার বাহিনী

শকুলপট্টির গ্রীন একাডেমীর পিছনে বহু মানুষকে হত্যা করে
পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দালালরা

কাপুড়িয়াপট্টির কালীবাড়ি হলে অনেক বাঙালিকে হত্যা করে পুঁতে রাখা হত

লালবাজার কালী বাড়ি ক্যাম্প

ছাতনী  গণকবর ও শহীদ মিনার

ছাতনী দিঘীর পাড়ে অনেক বাঙালিকে হত্যা করে

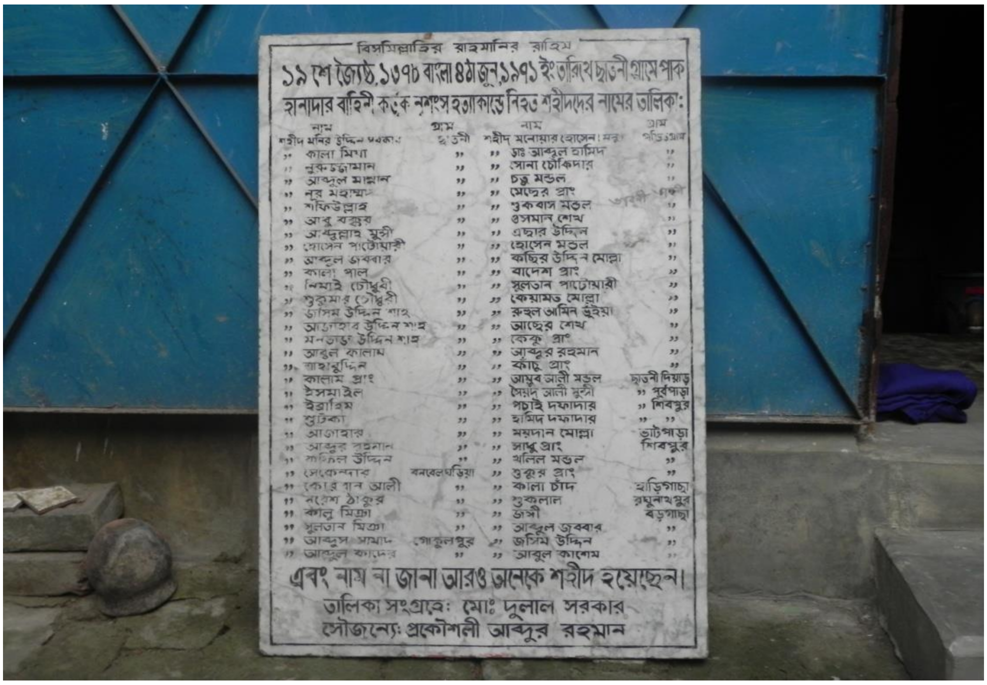


ছাতনী গণহত্যায় শহীদদের নামফলক

ফুলবাগান শহীদ স্মৃতি মিনার

ফুলবাগান বধ্যভূমি

নাটোর উপজেলা পরিষদ ক্যাম্প

নাটোর উপজেলা পরিষদ মসজিদটি জোরপূর্বক বহু মানুষ দিয়ে নির্মাণ করে হানাদার বাহিনী

চৌকিরপাড় বধ্যভূমি যেখানে বর্তমান নাটোর হোমিওপ্যাথিক মেডিকেল কলেজ অবস্থিত

উত্তর চৌকির পাড় গণহত্যার স্থান(কালুর মোড় সড়কের পাশে)

কানাইখালী শহীদ স্মৃতিসৌধ

মাদ্রাসা মোড় স্মৃতিস্তম্ভ

শংকর গোবিন্দ চৌধুরী চত্বর

লালপুর ময়না শহীদ স্মৃতিসৌধ

লালপুর ময়নার এই আম গাছের সাথে বেঁধে গুলি করে হত্যা করে মোসলেম আলী মোল্লা,

সৈয়দ আলী মোল্লা ও আব্দুস সাত্তারকে

লালপুর রামকান্তপুর বধ্যভূমি

লালপুর রামকান্তপুরে ঘাতক বাহিনীর নির্যাতনের শিকার তইজ উদ্দিন

গোপালপুর সুগার মিলে শহীদ সাগর স্মৃতিস্তম্ভ

শহীদ সাগর পুকুরে প্রায় ৩০০-৪০০ জন লোককে হত্যা করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী

গোপালপুর চিনিকলের প্রশাসক শহীদ লেফটেন্যান্ট আনোয়ারুল আজিম

পরিবারের সাথে লেঃ আনোয়ারুল আজিম

লেঃ আনোয়ারুল আজিম কে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করা হয়

লেঃ আনোয়ারুল আজিমের ব্যবহার্য জিনিসপত্র

গোপালপুর চিনিকলের  সি,আই,সি শহীদ আব্দুর রহমান আমিন

গোপালপুর চিনিকলের এ,সি,ডি,ও শহীদ আবুল হাসেম

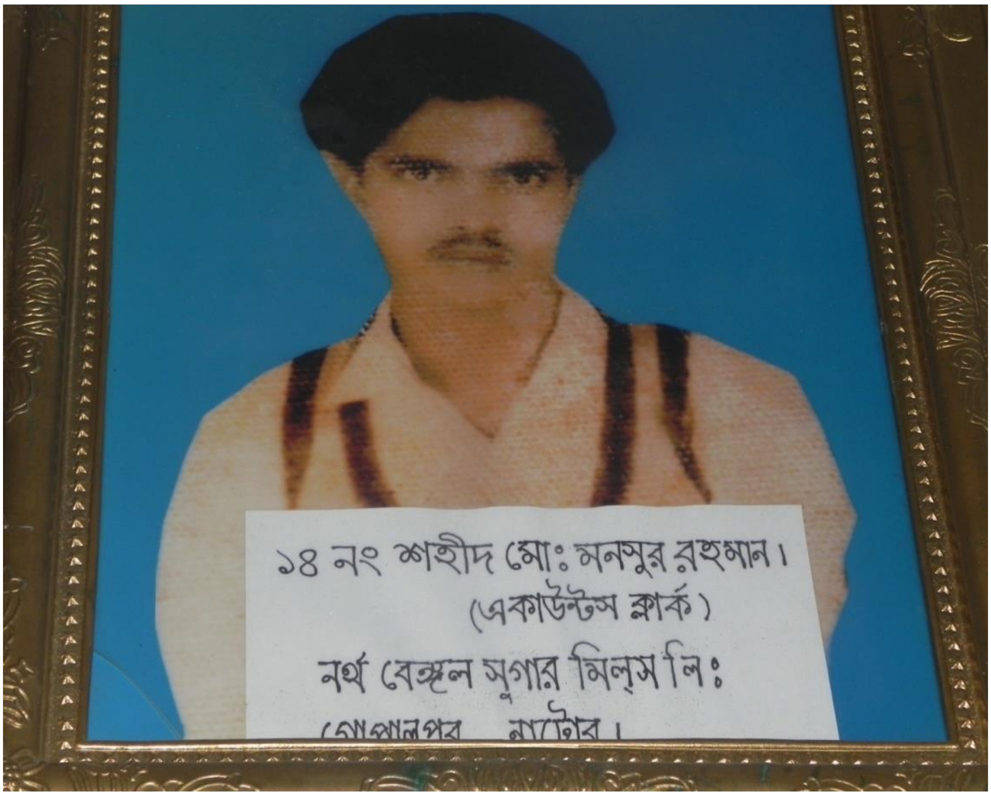


গোপালপুর চিনিকলের একাউন্টস ক্লার্ক শহীদ মুনসুর রহমান

গোপালপুর চিনিকলের ক্লার্ক শহীদ মোসাদ্দারুল হক

গোপালপুর চিনিকলের চীফ এ্যাকাউন্টটেন্ট শহীদ সাইফুদ্দীন আহমেদ

গোপালপুর চিনিকলের বৈদ্যুতিক ফিটার শহীদ এস,এম নজরুল ইসলাম

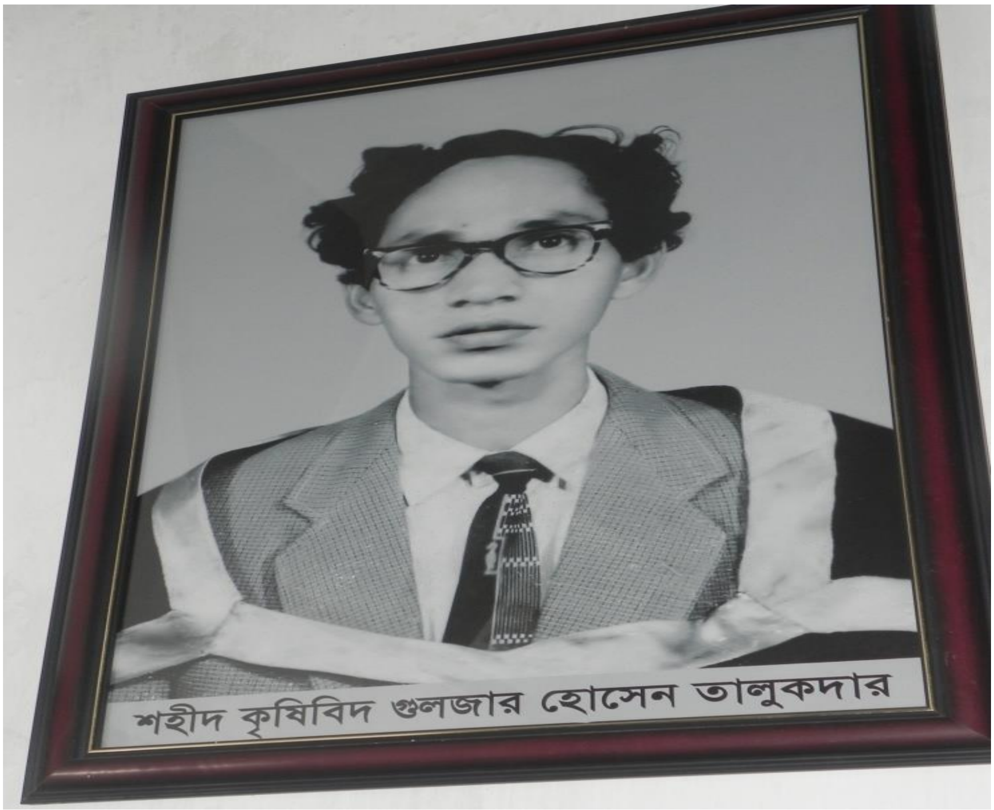


গোপালপুর চিনিকলের কেইন সুপারেনটেনডেন্ট শহীদ গোলজার হোসেন

গোপালপুর চিনিকলের সি,এস,বি,এ শহীদ এস,এম,এ কালাম

লালপুর ধুপইল-পঁয়তার পাড়া বধ্যভূমি ও স্মৃতিসৌধ

লালপুর বিলমাড়িয়া গণকবর

বিলমাড়িয়া শহীদ স্মৃতিসৌধ

লালপুর নীলকুঠি ক্যাম্প (বর্তমানে সেখানে বিলমারিয়া উচ্চ বিদ্যালয় অবস্থিত)

প্রায় রাতে একটি সার্টল ট্রেন এসে রাত ১১/১২ টার দিকে লালপুর বাওড়া

ব্রিজে লোকজনকে হত্যা করা হতো

বাওড়া ব্রিজ গণকবর

গুরুদাসপুর বিয়াঘাট গণহত্যার স্থান ১(ছহির উদ্দিনের উঠান)

গুরুদাসপুর বিয়াঘাট গণহত্যার স্থান ২

গুরুদাসপুর বিয়াঘাট উচ্চবিদ্যালয় স্মৃতিস্তম্ভ

গুরুদাসপুর পোয়ালশুড়া পাটপাড়া স্মৃতিস্তম্ভ

তুলসী নদী ব্রিজ যেটি মুক্তিযোদ্ধারা ভেঙ্গে ফেলে নাটোর-গুরুদাসপুরের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে

উত্তর নারিবাড়ীর শীতানাথ ও বলরাম হালদারের সমাধি

উত্তর নারিবাড়ীর নীলরতন, মনীন্দ্রনাথ ও নবরামের সমাধি

দীলিপ, সুরেশ সহ ১১ জনের সমাধি

সিংড়ার উত্তর দমদমার রথীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাড়ি

সিংড়ার কলম গণকবর

সিংড়ার কলম গণহত্যার স্থান

সিংড়ার হাতিয়ানদহ গণকবর ও স্মৃতিসৌধ

হাতিয়ানদহ গণহত্যার স্থান ২

হাতিয়ানদহ গণহত্যার স্থান ৩

সিংড়ার লারকিমারী বিলে প্রায় দুই শত লোককে হত্যা করে পাকিস্তানি বাহিনী

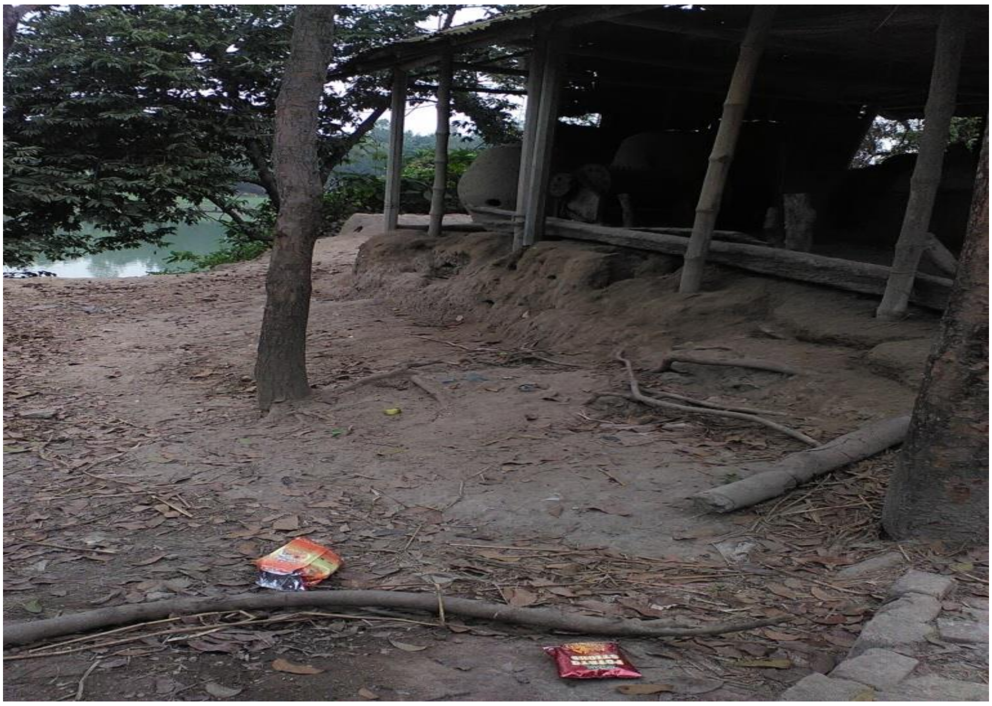

মফিজ সরদারের কবর (লারকিমাড়ি বিল গণহত্যার শিকার)

বড়াইগ্রামের ধানাইদহ ব্রিজে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে স্থানীয়রা

বড়াইগ্রামের ধানাইদহ গণকবর

বড়াইগ্রামের পারকোল গণকবর

বড়াইগ্রামের কালিকাপুর স্মৃতিসৌধ

বড়াইগ্রামের নটাবাড়িয়া কালির ঘুণে গণহত্যার শিকার বিশ্বনাথ চাকী ও সুশীল পালের কবর

বড়াইগ্রামের বনপাড়া রোমান ক্যাথলিক মিশন

নলডাঙ্গার চকপাড়া গ্রাম কূপ গণহত্যার স্থান

নলডাঙ্গার নসরতপুর গ্রামের দিলীপ কুমারকে হত্যার স্থান

পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাকান্ডের শিকার নলডাঙ্গার নসরতপুর গ্রামের দিলীপ কুমারের সমাধি

বাগাতিপাড়ার দয়রামপুরে রাজাকার বাহিনীর হত্যার শিকার মেঘনাথ সাহার সমাধি

বাগাতিপাড়ার বেগুনিয়া গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনী র হত্যার শিকার শহীদ স্বপন চক্রবর্তীর সমাধি

নাটোর মহারাজা জে.এন স্কুল এন্ড কলেজ যেখানে পাকিস্তানি বাহিনীর ক্যাম্প ছিল

# গ্রন্থপঞ্জি

*Dhaka University Institutional Repository*

## সহায়ক গ্রন্থ


আবু সাইয়িদ, *যুদ্ধাপরাধ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ*, সূচীপত্র, ঢাকা, ২০০৮

আজাদুর রহমান চন্দন, *যুদ্ধাপরাধ ও গণহত্যা*,স্বরাজ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮

আসাদুজ্জামান আসাদ, *একাত্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন*,সময় প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৯২

আহমেদ শরীফ, *নীলফামারী ১৯৭১, গণহত্যা ও নির্যাতন*, সুবর্ণ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫

অ্যান্থনী মাসকারেণহাস, *দ্যা রেইপ অব বাংলাদেশ*, পপুলার পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮৯

এম এ হাসান, *যুদ্ধ ও নারী*, তাম্রলিপি, ঢাকা, ২০১০

এম এ হাসান, *প্রসঙ্গ ১৯৭১ মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ*, অনন্যা, ঢাকা, ২০০৬

জয়ন্ত কুমার রায়, ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, *উত্তরবঙ্গের নগরায়ণ*, নাটোর, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৬

তপন কুমার দে, *গণহত্যা*, নওরোজ সাহিত্য সংসদ,ঢাকা, ২০০১

তপন পালিত, *মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার আন্দোলন (১৯৭১-২০১৩)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা,২০১৬

ফজলুর রহমান, *বাংলাদেশের গণহত্যা*, শিখা প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০

মোঃ মাকসুদুর রহমান, *নাটোরের মহারানী ভবানী*, রাজশাহী, ১৯৯৮

মুনতাসীর মামুন, *শান্তিকমিটি ১৯৭১*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১২

মুনতাসীর মামুন, *বীরঙ্গনা ১৯৭১*, সুবর্ণ, ঢাকা, ২০১৩

মুনতাসীর মামুন, *রাজাকারের মন*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০২

শাহরিয়ার কবির, *একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, সময়, ঢাকা, ২০১০

সাঈদ বাহ্াদুর, *গণহত্যা ও বধ্যভূমি ৭১/১ম খন্ড]*, মুক্তচিন্তা, ঢাকা, ২০০৭

সুকুমার বিশ্বাস, *একাত্তরের বধ্যভূমি ও গণকবর*, অনুপম, ঢাকা, ২০১০

সুজিত সরকার, *নাটোর জেলার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, গতিধারা, ঢাকা, ২০০৯

হাসিনা আহমেদ, *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ -চতুর্থ খন্ড*, অনন্য, ঢাকা, ২০০৭

রবার্ট পেইন (ভাষান্তরঃ গোলাম হিলালী), *ম্যাসাকার, বাংলাদেশ গণহত্যার ইতিহাস ভয়ংকর অধ্যায়*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৯

*গ্রাম জনসংখ্যা পরিসংখ্যান ১৯৭৪*, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

## সম্পাদিত গ্রন্থ

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস দ্বিতীয় খন্ড*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১০

আতাফুল হাই *শিবলী* (সম্পা.), *স্থানীয় ইতিহাস*,সংখ্যা ৭, রাজশাহী, ২০১২

খালেদ বিন জয়েনউদ্দিন (সম্পা.), *বাংলাদেশ গণহত্যা '৭১*, বর্ণায়ন,ঢাকা, ২০০৯

মোঃ জয়নাল আবেদীন (সম্পা.), *একাত্তরের বধ্যভূমি*, পালক পাবলিশার্স, ঢাকা

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সেনাসদর, শিক্ষা পরিদপ্তর, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, (৬ষ্ঠ খন্ড), এশিয়া পাবলিকেশনস্‌, ঢাকা, ২০০৮

মাহতাব উদ্দিন (সম্পা.), *রণাঙ্গন একাত্তর*, মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী গবেষণা কেন্দ্র, রাজশাহী, ১৯৮৬

মাহতাব উদ্দিন (সম্পা.), *একুশ থেকে একাত্তর*, মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী গবেষণা কেন্দ্র, রাজশাহী, ১৯৯৬

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, দ্বিতীয় খন্ড, সময়, ঢাকা, ২০১৩

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, চতুর্থ খন্ড, সময়, ঢাকা, ২০১৩

শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলাদেশের লোকজ সংস্কৃতি গ্রন্থমালা (নাটোর)*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১৪

সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী*, *অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম (প্রধান সম্পাদক), *বাংলাপিডিয়া*,১ম-১০ম খন্ড, *বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ*, *দলিলপত্র:* অষ্টম খন্ড, হাক্কানী পাবলিশার্স, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮৪

Ashraf siddiqui (gerenal editor), *Bangladesh District Gazetteers*, Rajshahi, Bangladesh Government Press, Dacca, 1976

## বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ নাটোর কতৃক সংগৃহীত তথ্য

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, নাটোর সদর উপজেলা কমান্ড কার্যালয়

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বড়াইগ্রাম উপজেলা কমান্ড কার্যালয়

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সিংড়াউপজেলা কমান্ড কার্যালয়

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, নলডাঙ্গাউপজেলা কমান্ড কার্যালয়

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, বাগাতিপাড়া উপজেলা কমান্ড কার্যালয়

বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, লালপুর উপজেলা কমান্ড কার্যালয়

## পত্রিকা

*দৈনিক মুক্তকণ্ঠ*, ১৩ এপ্রিল, ১৯৯৮

*দৈনিক সংবাদ*, স্বপন দাস , ৬ জুন ১৯৯৫

*দৈনিক পূর্বদেশ*, স্বপন দাস, ৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২

## স্মরণিকা / সাময়িকী

শাহরিয়ার কবির, *শহীদ স্মারক বক্তৃতা-১ , বাংলাদেশের গণহত্যা , আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও বিচার*, ১৯৭১ গণহত্যা-নির্যাতন আর্কাইভ ও জাদুঘর ট্রাস্ট, ঢাকা, মে ২০১৫

মোহাম্মদ গোলাম রব্বানী,*আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনালস) আইন , ১৯৭৩ সহজপাঠ*, একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ঢাকা, ২৭ মে ২০০৯

স্মরণিকা, *মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস* ২০০২, জেলা প্রশাসন, নাটোর, ২৬ মার্চ ২০০২

স্মরণিকা, *মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস* ২০০৩, জেলা প্রশাসন, নাটোর, ২৬ মার্চ ২০০৩

স্মরণিকা, *স্বাধীনতা রজত জয়ন্তী ১৯৯৮*, নাটোর জেলা, ১৯৯৮

স্মরণিকা, *১৪তম লালপুর উপজেলা স্কাউটস সমাবেশ , ২০১৪*, বাংলাদেশ স্কাউটস লালপুর উপজেলা লালপুর, নাটোর

## ব্যবহৃত ওয়েবসাইট

নাটোর জেলা বাতায়ন (http://natoresadar.natore.gov.bd)

https://en.wikipedia.org/wiki/Natore_District

(http://chhatniup.natore.gov.bd.)

(http://dighapatiaup.ratore.gov.bd)

(http://baraharishpurup.natore.gov.bd)

(http://lalpur.nator.gov.bd)

(http://chongdhupailup.natore.gov.bd)

(http://bilmariaup.natore.gov.bd)

(http://duariaup.natore.gov.bd)

(http://oaliaup.natore.gov.bd)

(http://gurudaspur.natore.gov.bd)

(http://biaghatup.natore.gov.bd)

(http:dharabarishaup.natore.gov.bd)

(http://mashindaup.natore.gov.bd)

(http://singranatore.gov.bd)

(http://kalamup.natore.gov.bd)

(http://hatiandahaup.natore.gov.bd)

(http://baraigram,natore.gov.bd)

(http://majgaonup.natore.gov.bd)

(http://nagorup.natore.gov.bd)

(http://gopalpurup.natore.gov.bd)

(http://baraigramnatore.gov.bd)

(http:// naldanga.nator.gov.bd/)

(http://biprobelghoriaup.nator.gov.bd/)

(http://bagatipara.natore.gov.bd/ )

(http//dayarampurup.nator.gov.bd/)

**সাক্ষাৎকার**

বীর মুক্তিযোদ্ধা হুজুর আলী খান, পিতাঃ রশিক আলী খান, মৌজাঃ মোকরামপুর, ইউনিয়নঃ বড় হরিশপুর, উপজেলাঃ নাটোর সদর জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : নিজবাড়ি, ১৬ জানুয়ারি, ২০১৬।

মাসুদ আহমেদ ও মোঃ আব্দুর রহিম, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : ২৪ নভেম্বর, ২০১৪ ।

শ্রী আনন্দ জমাদার (৬৭), পিতাঃ ভিখু জমাদার, নাটোর সদর হাসপাতাল। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ :নাটোর সদর হাসপাতাল, ১৬ জানুয়ারি ২০১৬।

তপন কুমার সিংহ (৬০), এলাকাঃ কালীবাড়ি, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : নাটোর কালীবাড়ি, ২৪ নভেম্বর, ২০১৪ ।

নিতাই চন্দ্র বাগচী (৬০), পিতাঃ শহীদ কানাইলাল বাগচী, মহল্লাঃ উত্তর চৌকির পাড়, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : নিজবাড়ি, ২৩ নভেম্বর, ২০১৪ ।

সমীপ বাগচী, পিতাঃ কালী চন্দ্র বাগচী, বাড়িঃ দক্ষিণ চৌকির পাড়, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ২৬ নভেম্বর, ২০১৪ ।

সাবিত্রী বিশ্বাস (৬৫), পিতাঃ রাধা চরণ দাস মহল্লাঃ উত্তর চৌকির পাড়, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ২৩ নভেম্বর, ২০১৪।

প্রদীপ কুমার দাস (৫৬), পিতাঃ শহীদ ভাদু চন্দ্র দাস বাড়িঃ দক্ষিণ চৌকির পাড়, উপজেলাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ২০ জুলাই, ২০১৫।

হরিদাসী মোহন্ত, বাড়িঃ দক্ষিণ চৌকির পাড়, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : নিজবাড়ি, ২৩ নভেম্বর, ২০১৪।

মাধব চন্দ্র দাস (৭০), বাড়িঃ দক্ষিণ চৌকির পাড়, থানাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি, ২৩ নভেম্বর, ২০১৪।

দিপালী রায় (৭০), বাড়িঃ দক্ষিণ চৌকির পাড়, থানাঃ নাটোর সদর, জেলাঃ নাটোর সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : নিজবাড়ি, ২৩ নভেম্বর ২০১৪।

মোঃ ওসমান আলী প্রামাণিক (৭০), পিতাঃ ফয়েজুদ্দিন প্রমাণিক, বাড়ি; হালসা, ইউনিয়নঃ হালসা, সভাপতি, নাটোর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ। জেলাঃ নাটোর সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ। জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : হালসা বাজার, ১৯ জানুয়ারি ২০১৬।

মোঃ হারুন অর রশীদ (ইউপি সদস্য (৫২), পিতাঃ আরব আলী শেখ, গ্রামঃ ময়না, ইউনিয়ন, ওয়ালিয়া, উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ ময়না, ১৭ জুলাই ২০১৫।

মোসাম্মত ছানোয়ার (৫১), স্বামীঃ আব্দুর রহমান, গ্রামঃ ময়না, ইউনিয়নঃ ওয়ালিয়া, উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ ময়না বধ্যভূমি, ১৭ জুলাই ২০১৫।

আব্দুল কুদ্দুস মোল্লা (৬০), পিতাঃ সৈয়দ আলী মোল্লা, ঠিকানাঃ ঐ। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ ময়না বধ্যভূমি, ১৭ জুলাই ২০১৫।

মোঃ তইজ উদ্দিন মন্ডল, (৬৫), পিতাঃ তফেজ উদ্দিন। গ্রামঃ রামকান্তপুর, ইউনিয়নঃ দুয়ারিয়া, উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ রামকান্তপুর বধ্যভূমি, ১৬ জুলাই ২০১৫।

মোঃ বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ মতিউর রহমান (৬২), পিতাঃ আব্দুল মজিদ সরকার। গ্রামঃ কদিমচিলান, ইউনিয়নঃ কদিমচিলান, উপজেলাঃ লালপুর, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ ময়না, ১৭ জুলাই ২০১৫।

জোৎস্না বেওয়া, স্বামীঃ শহীদ তোফাজ্জল, ঠিকানাঃ গোপালপুর বাজার, লালপুর, নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ ১৬ জুলাই ২০১৫। নিজবাড়ি।

বাবুল আক্তার (৫০), পিতাঃ শহীদ ডা. শাহাদাত হোসেন। ঠিকানাঃ গোপালপুর বাজার, লালপুর, নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ গোপালপুর বাজার, ১৬ জুলাই ২০১৫।

মোঃ নজরুল ইসলাম (৫৫), পিতাঃ আছির উদ্দিন আমীন। ঠিকানাঃ গোপালপুর পৌরসভা, গোপালপুর সুগার মিল, লালপুর, নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ গোপালপুর সুগারমিল, ১৬ জুলাই ২০১৫।

খন্দকার জালাল আহমেদ (৭০), পিতাঃ খন্দকার হীমাদ উদ্দিন আহমেদ। ঠিকানাঃ ঐ। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ গোপালপুর সুগার মিল, ১৬ জুলাই ২০১৫।

Dhaka University Institutional Repository

রেজাউল করিম (৫৫), পিতা: হাসান আলী। গ্রাম: বাওড়া, ইউনিয়ন: ধুপইল, উপজেলা: লালপুর জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ১৬ জুলাই ২০১৫ বাওড়া ব্রিজ।

মোঃ আব্দুল গফুর (৭২), গ্রাম: ধুপইল পঁয়তার পাড়া, ইউনিয়ন: ওয়ালিয়া, উপজেলা: লালপুর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ধুপইল গণকবর, ১৬ জুলাই ২০১৫।

মোঃ আমীর হোসেন (৬০)। ঠিকানা: ঐ। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ঐ।

সন্তোষ কুমার মন্ডল (৫৫), গ্রাম: দিলালপুর, ইউনিয়ন: ওয়ালিয়া, উপজেলা: লালপুর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: দিলালপুর, ১৬ জুলাই ২০১৫।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক (৬৪) (অবসরপ্রাপ্ত সার্জেন্ট), ঠিকানা: বিলমারিয়া, লালপুর, নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: ১৬ জুলাই ২০১৫, বিলমারিয়া হাট।

হারান হালদার (৯২), পিতা: রামেশ্বর হালদার, ঠিকানা: ঐ। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: বিলমারিয়া, ১৬ জুলাই ২০১৫।

মোঃ নুরুল ইসলাম (৭২), বাড়ি: ছাতনী স্লুইচ গেইট, ইউনিয়ন: ছাতনী, উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ: ২৬ নভেম্বর, ২০১৪।

মোঃ আবুল কাশেম (৫৮), পিতা: ফজলুর রহমান ভূইয়া, বাড়ি: ছাতনী। জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : ছাতনী স্লুইচ গেইট, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬।

মোঃ মফিজ উদ্দিন (৮১), পিতা: আসাদুল্লাহ মিয়া, বাড়ি: ছাতনী ইউনিয়ন পরিষদ। জেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : ছাতনী স্লুইচ গেইট, ১৯ জানয়ারি, ২০১৬।

মোঃ তোফাজ্জেল হোসেন সরকার (৬৪), পিতা: ছিট সরকার, গ্রাম: মাঝদিঘা, ইউনিয়ন: ছাতনী, উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ: ছাতনী স্লুইচ গেইট, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬।

মোঃ মকসেদ আলী মোল্লা (৬৭), বাড়ি: ছাতনী, ইউনিয়ন: ছাতনী, উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ: নাটোর মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ, ২৫ নভেম্বর ২০১৪।

আব্দুল গফুর সরকার (৬০) , গ্রাম: ছাতনী, ইউনিয়ন: ছাতনী, উপজেলা: নাটার সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : ছাতনী স্লুইচ গেইট, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬।

আবুল কালাম মাস্টার (৭৬), পিতা: ফজলুর রহমান, গ্রাম: ছাতনী, ইউনিয়ন: ছাতনী, উপজেলা: নাটার সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : ছাতনী স্লুইচ গেইট, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬।

নুরুল আমিন ভূঁইয়া, পিতা: কালা মিয়া হাজী। গ্রাম: ভাবনী, ইউনিয়ন: ছাতনী উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬।

আবু তাহের (৬৫), পিতাঃ চান মিয়া, গ্রাম: ভাবনী, ইউনিয়ন: ছাতনী, উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি, ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬।

গোবিন্দ চরণ পাল (৭০), পিতা: চন্দ্রনাথ পাল, বাড়ি: তেবাড়িয়া হাট, ইউনিয়ন: তেবাড়িয়া উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : তেবাড়িয়া হাট, ১৯ জানুয়ারি ২০১৬।

Dhaka University Institutional Repository

মোঃ মজিবর রহমান ভূইয়া, পিতা: আক্তারুজ্জামান ভূইয়া, গ্রাম: চর তেবাড়িয়া, ইউনিয়ন: লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া, উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : চর তেবাড়িয়া, ১৯ জানুয়ারি ২০১৬।

মোঃ ইছহাক আলী (৫৬), পিতা: মোঃ হায়দার আলী প্রাং, বাড়ি: লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া, উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : ১৯ জানুয়ারি, ২০১৬।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ ইব্রাহিম মিয়া (৭০), পিতা: শহীদ আমীর আলী। গ্রাম: বড় বাড়ীয়া, ইউনিয়ন: লক্ষীপুর খোলাবাড়িয়া, উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : চর তেবাড়িয়া, ১৯ জানুয়ারি ২০১৬।

শ্রীমতি বুলু বালা দাসী (৭০), স্বামী: শচীন্দ্রনাথ। গ্রাম: ধলা, ইউনিয়ন: কদিমচিলান, উপজেলা: লালপুর, জেলা: নাটোর সদর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি। ১৫ জানুয়ারি ২০১৬।

মোঃ আব্দুর রহিম (৬৩), গ্রাম: কান্দিপিটুয়া, উপজেলা: নাটোর সদর, জেলা: নাটোর সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ নাটোর মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ, ২৫ নভেম্বর ২০১৪।

বিমল চন্দ্র হালদার (৭৫), পিতা: রঘুনাথ চন্দ্র হালদার, গ্রাম: উত্তর নারিবাড়ী, গুরুদাসপুর পৌরসভা, উপজেলা: গুরুদাসপুর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজবাড়ি, ২৩ জুলাই ২০১৫।

সাবিত্রী সরকার (৭০), স্বামী: শহীদ শীতানাথ সরকার, গ্রাম: উত্তর নারিবাড়ী, গুরুদাসপুর পৌরসভা, উপজেলা: গুরুদাসপুর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজবাড়ি, ২৩ জুলাই ২০১৫।

আক্কাছ আলী (৭৫), পিতা: শহীদ ছহির উদ্দিন পরমানিক, গ্রাম: বিয়াঘাট, ইউনিয়ন: বিয়াঘাট, উপজেলা: গুরুদাসপুর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: বিয়াঘাট উচ্চ বিদ্যালয়, ২৩ জুলাই, ২০১৫

মো: মুজিবর রহমান (৪৫), পিতা: শহীদ রিয়াজ উদ্দিন মুন্সী, গ্রাম: বিয়াঘাট, ইউনিয়ন: বিয়াঘাট, উপজেলা: গুরুদাসপুর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: বিয়াঘাট উচ্চ বিদ্যালয়, ২৩ জুলাই ২০১৫।

নিখিল চন্দ্র সরকার (৬২), পিতা: হৃদয় নাথ সরকার, গ্রাম: পোয়ালশুড়া পাটপাড়া, ইউনিয়ন: ধারাবারিষা, উপজেলা: গুরুদাসপুর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ২৩ জুলাই ২০১৫।

বিশ্বনাথ ধর সরকার (৬৫), পিতা: নিবারণ চন্দ্র ধর সরকার, উপজেলা: গুরুদাসপুর, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: বিয়াঘাট, ২৩ জুলাই ২০১৫।

মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল ওদুদ (৬৪), পিতা: ওয়াহেদ আলী, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সাংসদ সিংড়া। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সিংড়া, ১৭ জানুয়ারি ২০১৬।

অধ্যাপক আব্দুর রহমান (৬৪), পিতা: মুন্সী ইসলাম উদ্দিন, গ্রাম: কুমারপাড়া (কদমতলী) ইউনিয়ন: কলম, উপজেলা: সিংড়া, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: নিজ বাড়ি, ১৭ জানুয়ারি, ২০১৬।

বিনয়কৃষ্ণ কুন্ডু (৮১), পিতা: বলরাম চন্দ্র কুন্ডু, গ্রাম: হাতিয়ানদহ, ইউনিয়ন: হাতিয়ানদহ, উপজেলা: সিংড়া, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: হাতিয়ানদহ বাজার, ১৭ জানুয়ারি ২০১৬।

বিজয় কর্মকার (৫৮), পিতা: শহীদ ভোলানাথ কর্মকার, গ্রাম+ইউনিয়ন: হাতিয়ানদহ, উপজেলা: সিংড়া, জেলা: নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখ: হাতিয়ানদহ বাজার, ১৭ জানুয়ারি ২০১৬।

গোপাল বিহারী দাস (৫৭), পিতাঃ বনবিহারী দাস, গ্রামঃ সাঁঐল, ইউনিয়নঃ কলম, উপজেলাঃ সিংড়া, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ সিংড়া বাসষ্ট্যান্ড, ২০ জানুয়ারি ২০১৬।

আব্দুল জলিল সরকার (৫২), পিতাঃ মজির উদ্দিন সরকার, গ্রামঃ পারকোল, ইউনিয়নঃ নগর, উপজেলাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি, ২২ জুলাই ২০১৫।

রহিম বক্স (৬৫), পিতাঃ মজের বক্স মৌজাঃ নটাবাড়িয়া, ইউনিয়নঃ মাঝগাঁও। উপজেলাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি, ২২ জুলাই ২০১৫।

মুক্তিযোদ্ধা মোঃ শামসুল হক (৬৭), পিতাঃ কিফর উদ্দিন, উপজেলাঃ বড়াইগ্রাম, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ বড়াইগ্রাম, ২২ জুলাই ২০১৫।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ হাকিম উদ্দিন (৬৫), পিতাঃ কছির উদ্দিন, ইউনিয়নঃ বিপ্রবেলঘড়িয়া, গ্রামঃ চকপাড়া, জেলাঃ নলডাঙ্গা। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ চকপাড়া, ১৮ জানুয়ারি, ২০১৬।

শ্রী বিশ্বনাথ সরকার (৭২), পিতাঃ মন্মথ নাথ সরকার, গ্রামঃ চকপাড়া, ইউনিয়নঃ বিপ্রবেলঘড়িয়া, উপজেলাঃ নলডাঙ্গা, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকারের স্থান ও তারিখঃ চকপাড়া, নিজবাড়ি, ১৮ জানুয়ারি, ২০১৬

শিলা চক্রবর্তী (৬০), স্বামীঃ নিরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, গ্রামঃ বেগুনিয়া, পোঃ তমালতলা, থানাঃ বাগাতিপাড়া, জেলাঃ নাটোর। ইউনিয়নঃ পাকা সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখ : নিজ বাড়ি; ১৭ জুলাই, ২০১৫।

রেজাউন নবী রেনু (৬৩), পিতাঃ নুর মোঃ সরকার, পেশাঃ সাংবাদিকতা (করতোয়া)। গ্রামঃ তমালতলা, ইউনিয়নঃ বাগাতিপাড়া, থানাঃ বাগাতিপাড়া, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ তমালতলা, ১৭ জুলাই, ২০১৫।

আয়েশা বেগম (৭০), স্বামীঃ শহীদ শমসের আলী। গ্রামঃ চকগোয়াশ, পোঃ তমালতলা, ইউনিয়নঃ পাকা, থানাঃ বাগাতিপাড়া, জেলাঃ নাটোর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ নিজবাড়ি, ১৭ জুলাই, ২০১৫।

রঘুনাথ সাহা, পিতাঃ শহীদ মেঘনাথ সাহা, দয়রামপুর বাজার, থানাঃ বাগাতিপাড়া, জেলাঃ নাটোরর। সাক্ষাৎকার স্থান ও তারিখঃ ১৭ জুলাই, ২০১৫